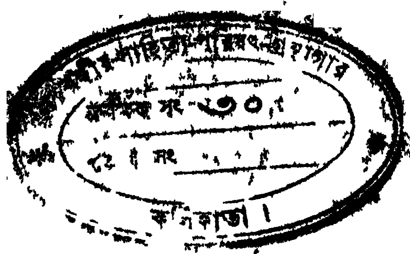
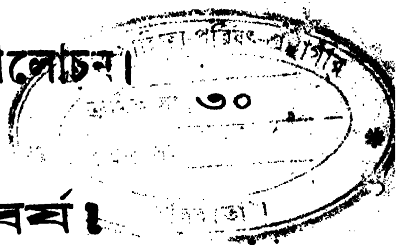


অঙ্কুর
২য় বর্ষ
১৩১৩-১৪

অঙ্কুর।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।



দ্বিতীয় বর্ষ।

১৩১৩—১৪।



সম্পাদক—পণ্ডিত শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ।

সহযোগী সম্পাদক—শ্রীআনন্দ গোপাল ঘোষ।



কলিকাতা

৫।১২ নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, মণিকা প্রেসে

শ্রীহেমচন্দ্র দে দ্বারা মুদ্রিত

ও

৭ নং রামতনু বসুর লেন, 'অঙ্কুর'-কার্য্যালয় হইতে

সহযোগী সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ২৲ দুই টাকা।

সূচী।

গদ্যাংশ।

পদ্যাংশ।

২য় বর্ষের লেখক ও লেখিকাগণ।

শ্রীমতী অনুপমা দেবী।
শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।
„ আনন্দগোপাল ঘোষ।
মৌলবী আবদুল করিম সাহেব, বি, এ।
„ সেখ আহাম্মদ সোবাহান সাহেব।
শ্রীমতী উৎপলিনী সিংহ।
শ্রীযুত কালীবর বেদান্তবাগীশ।
„ কুঞ্জবিহারী লালা।
„ কুমুদরঞ্জন মল্লিক, বি, এ।
„ কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ, জ্যোতিঃশেখর।
শ্রীমতী জগদীশ্বরী দেবী।
শ্রীযুত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত।
শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।
শ্রীযুত দক্ষিণারঞ্জন মজুমদার।
„ দ্বিজেন্দ্রনাথ পাল।
„ ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।
„ ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম, এ।
„ ধীরেন্দ্রলাল সেন।
„ নারায়ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।
মৌলবী সৈয়দ নূরুল হোসেন সাহেব।
শ্রীযুত মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য, বি, এ।
„ যাদবেশ্বর তর্করত্ন (মহামহোপাধ্যায়)।
„ যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।
শ্রীমতী রত্নমালা দেবী।
শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।
„ ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল, এম, আর, এ, এস।
„ শশধর রায়, এম, এ; প্রভৃতি।



অঙ্কুর।

বীজাদঙ্কুরনিষ্পত্তিরঙ্কুরাদ্বৃক্ষসম্ভবঃ।
ফলপ্রদোভবেদ্বৃক্ষইত্থমাশাক্রমোমতঃ॥

২য় বর্ষ।] মাঘ, ১৩১৩। [১ম সংখ্যা।

স্তুতিবাদ।

গ্রন্থারম্ভের পূর্ব্বে, মঙ্গলাচরণ ও দেবতাদিগের স্তুতিবাদ করিবার বিধি এদেশে চির প্রচলিত; সুতরাং তদনুবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বপ্রথমেই

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং
দেবীং সরস্বতীং চৈব ততোজয় মুদিরয়েৎ॥"

এই বিধানে, নরগণের আশ্রয় নারায়ণ এবং জ্ঞানপ্রদায়িণী দেবী সরস্বতীর সুপবিত্র নাম স্মরণ করত আমরা পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইলাম, দেবতাগণ আমাদের মঙ্গল করুন।

অলঙ্ঘ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া 'অঙ্কুরে'র ১ম বৎসরটী নিরাপদে বা স্বল্পাপদে অতিবাহিত হইয়া গেল। আমরা এই এক বৎসর মধ্যে নানারূপ আধি, ব্যাধি, আপদ, বিপদ প্রভৃতির মধ্যে অবস্থিত সত্বেও, কর্ত্তব্য পরিপালনে পরাঙ্মুখ না হইয়া, স্বদেশের ও স্বজন বন্ধু বান্ধবের হিতসংসাধনার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। ভগবৎ কৃপায় 'অঙ্কুর' এই অল্প সময়ের মধ্যে যে সর্ব্ব সাধারণের নিকট সমাদৃত হইয়াছে এবং আমরাও যে গ্রাহক অনুগ্রাহক প্রভৃতির কথঞ্চিৎ চিত্ত-রঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহাই আমাদিগের পরম সৌভাগ্যের বিষয়।

মাসিক পত্র পরিচালনা যে কিরূপ দুরূহ কার্য্য, তাহা বিজ্ঞ মাত্রেই পরিজ্ঞাত আছেন। সাধারণের সহানুভূতি এবং কৃপাকণাই, ইহার [illegible]

মূল। 'অঙ্কুরের' শুভাকাঙ্ক্ষী, পৃষ্ঠপোষক এবং সহৃদয় লেখক লেখিকা মহাশয়গণ, যাঁহারা নিস্বার্থভাবে এতাবৎ অঙ্কুরের মূলে কৃপাসলিল সেচনে জীবিত রাখিয়া, ইহাকে মহীরুহরূপে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া, স্ব স্ব মহত্ব প্রদর্শন করিতেছেন, সেই সকল মহোদয়ের নিকট আমরা চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ আছি। ভক্তি ও প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে অদ্য আমরা তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য প্রণাম ও নমস্কার করত আবার নূতন ব্রতে ব্রতী হইতেছি। পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও তাঁহারা আমাদিগকে নানা ভাবে উৎসাহিত করিয়া, মাতৃভূমির হিত সাধন করিবেন—এ ভরসা আমাদিগের বিলক্ষণ আছে। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম "অঙ্কুর" খানি আমরা আনন্দ চিত্তে গ্রাহক প্রভৃতির হস্তে অর্পণ করিয়া, আজি অপার আনন্দ লাভ করিলাম। ভগবান আমাদের এ আনন্দ স্থায়ী করুন।

বিনীত
শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।



বসন্ত বর্ণন।*

ঋতুপতি বসন্ত লভি কান্ত সম সুন্দরী
প্রকৃতি হিম বিষম ঋতু মুক্তা
প্রমদ ভর ফুল্লমুখ ফুল্ল নয়নাম্বুজ
প্রণয় হিম সলিলপরিষিক্তা।
নভঃ উপরি লক্ষ্য করি' পদ্ম নিজ বন্ধুরে
স্ফুটিত সরঃ উপরি সরনেত্র।
কমল মধু গন্ধ লভি' উদ্গমিল চঞ্চল
ভ্রমর কুল পতিত হল' তত্র।
রজনি কর রৌপ্য রুচি বীক্ষিকি কুমুদ্বতী
প্রমদ সর জল উপরি শান্তা।
বিহগ কুল নৃত্য করি সঙ্গি সহ ঘূর্ণিত
ভ্রমর পিক চুম্বিল নিজ কান্তা।
করিল কত ঝঙ্কৃতিহি পূর্ণ হৃদয় ছবি,
ভ্রমিল অলি লভিল ফুল গন্ধ

* জয়দেবের 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' ছন্দে লিখিত।

বিপুল ফুল গন্ধ বহি, গন্ধ বহ মন্দল
ধ্বনিল সব হইল মধু অন্ধ।
মৃদু-পবন-বিকম্পিত চ্যুত নব পল্লবে
স্ফুরিল প্রেমে মুকুল কুল কন্দ্র।
করিল মধু মত্ত হ'য়ে শব্দ পিক সংহতি
খলিত গতি নয়ন করি তাম্র।
বহিল মলয়াদ্রিভব গন্ধবহ বিমল
স্তিমিত হ'ল নভঃ-উপরি ইন্দু।
মৃদুলতর ফুল্ল ফুল বেরিত সুপল্লবে
ক্ষরিল কত অমিয় মধু বিন্দু।
যুবতী কুল কন্ত লই হাস্য করি রঙ্গিনী
ক্ষিপিল নিজ দয়িত বর গাত্রে।
পতি বদন চন্দ্র পুনঃ বাঁধি চির সঙ্গিনী
স্মিত বদন হইল দিন নেত্রে।

শ্রীজগদীশ্বরী দেবী।

নাদির শা।

প্রস্তাবনা।

গত দুই শত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষের মধ্যে যতগুলি বিপৎপাত হইয়াছে, ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শা কর্ত্তৃক দিল্লী আক্রমণ তাহাদের মধ্যে প্রধানতম, এবং ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে নাদির শার সেনাপতি আমেদ শা দুরাণী কর্ত্তৃক পানিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্রীয়দের পরাজয় দ্বিতীয় স্থানীয়। উভয়ের কেহই ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করেন নাই, কিন্তু উভয় কর্ত্তৃকই ভারতবর্ষের চূড়ান্ত অনিষ্ট হইয়া গিয়াছে। যদি উঁহারা এখানে রাজ্য স্থাপন করিতেন বা করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠা সকল সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ হইয়া যাইত।

পূর্ব্ব বৃত্তান্ত।

প্রাচীন পারসীকদিগের রাজ্য ধ্বংস হইয়া গেলে, প্রায় সার্দ্ধ আট শত বৎসর, পারস্য সম্পূর্ণ পরাধীন ছিল। ১৪৯৯ খৃষ্টাব্দে ইস্মেল নামক একজন

সৈয়দবংশীয় পারসীক মুসলমান কর্ত্তৃক পারস্য পুনরায় স্বাধীন হয়। ইনি সেখ সৈফু নামক একজন পবিত্র চরিত্র সাধুর বৃদ্ধ প্রপৌত্র ছিলেন; এজন্য ইস্মেলের বংশধরগণ সফাবী বংশীয় বলিয়া বিখ্যাত। হুমায়ুনের আশ্রয়দাতা সা তমাস্প এই বংশেরই রাজা। ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সা আব্বাস নামে এক ব্যক্তি বিশেষ প্রতিভার সহিত রাজ্য করিয়াছিলেন। তিনি সফাবীদিগের মধ্যে উজ্জ্বল রত্ন। ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে সফাবীদিগের গৌরব ক্ষুণ্ণ হইতে আরম্ভ হয়। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মর্দ্দিস্ খাঁর পুত্র মহমুদ শা কান্দাহারী সফাবীদিগের রাজধানী ইস্পাহান আক্রমণ করেন। এই নগরের লোক সংখ্যা তখন ছয় লক্ষ থাকিলেও তিনি পঞ্চাশ হাজার মাত্র সৈন্যের সাহায্যে সুলতান সব্বীর পুত্র রাজা হা হোসেন সব্বীকে বন্দী করেন। তিনি ও তৎপুত্র তমাস্প ব্যতীত ৭০ জন রাজবংশীয় পুরুষকে বিনষ্ট করিয়া মহমুদ শা তিন বৎসর কাল ইরাণে রাজত্ব করেন। ইস্পাহানের রাজবংশের এই দুর্দ্দশা এবং মহমুদ শার বিক্রম দেখিয়া নিমরোজের রাজা মহমুদ সিস্তানীর মনে বড় কষ্ট হইল, তিনিও খোরাসানে আসিয়া মেশহেদ অধিকার করিলেন। পারস্য এইরূপে দুইটি বিদেশীয় মহমুদের হস্তে বিভক্ত হইয়া রহিল।

১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে মহমুদ কান্দাহারীর মৃত্যু হয়। ইঁহার পিতৃব্য পুত্র আস্রফ খাঁ ইঁহার উত্তরাধিকারী হন। তুর্কীস্থানের বাদশাহ কিছু সৈন্য পাঠাইয়া সা হোসেনকে আফগানদিগের হস্ত হইতে ছাড়াইতে ইচ্ছা করেন। তাহাতে আস্রফ খাঁ সাহোসেনকে মারিয়া ফেলে। সা হোসেনের পুত্র তমাস্প, সিস্তানীর গোলযোগের পূর্ব্বেই ইস্পাহান হইতে পলায়ন করিয়া মাজিদারা নামক স্থানে ছিলেন। তাঁহার এই দুরবস্থার সময়ে নাদির কলমীবেগ্ নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে এই আবেদন করিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি পিতৃশত্রুকে বধ করুন। এই নাদিরের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই লুটপাঠ করাই কাজ ছিল, কিন্তু সর্দ্দারী ও বাদসাহী করিবার ইচ্ছা বরাবরই তিনি হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে নাদির ও তমাস্প উভয়ে মিলিত হইয়া মহমুদ সিস্তানীর সমস্ত রাজ্যই জিতিয়া লইলেন। উঁহাদের এই বিজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আস্রফ খাঁ অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং ইস্পাহান হইতে খোরাসানের দিকে যুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। অনেকবার যুদ্ধ হইল কিন্তু প্রত্যেক যুদ্ধে নাদিরের সাহায্যে তমাস্পের জয়লাভ হইয়াছিল। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে আস্রফ খাঁ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া আফগানিস্থানে পলায়ন করিলেন। ৭ বৎসর

২১ দিন পরে পারস্য পুনরায় সফাবী বংশের হস্তগত হইল এবং তমাস্প, 'সাহা তমাস্প দ্বিতীয়' এই উপাধি ধারণ করিয়া রাজা হইলেন।

১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে নাদির শা সা তমাস্পকে বন্দী করিয়া আপনি ইরাণের বাদসাহ হইলেন। তুর্কিস্থান ও আফগানিস্থানকে আপনার সমরকুশলতা দেখাইয়া নাদির যখন পারস্যে একাধিপত্য স্থাপন করিলেন, তখন উঁহাকে খাঁ বুজরুগ বলা হইত। নাদির শা সফাবী বাদসাহের মুদ্রা পরিবর্ত্তন করিয়া নিজ নামে মুদ্রা চালাইলেন, তাহার উপর পারস্য ভাষায় এই কথা লেখা হইয়াছিল যে "রাজ্য সম্বন্ধে যাহা পরিবর্ত্তন হইয়াছে সে সমস্তই শুভ।" নাদিরের ব্যবস্থা সচিব (উকীল) এর নাম তমাস্প খাঁ জালায়ের ছিল। এই উকীল নিজ মোহরের উপর এইরূপ লিখিয়াছিলেন, "যতদিন খাঁ বুজরুগ বাঁচিয়া আছেন ততদিন পর্য্যন্ত তমাস্প জগতের উকীল।"

ভারতাক্রমণ।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদিরের উচ্চাভিলাষী হৃদয়ে, ভারতবর্ষ জয় করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া উঠে। তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার ছল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন এবং দিল্লীর বাদসাহকে লিখিয়া পাঠাইলেন, "আমার রাজ্যের কয়েকজন লোক আপনার রাজ্যের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, আপনি উহাদিগকে ফিরাইয়া পাঠান।" এই সময় দিল্লীতে মহামতি আকবর শার এবং কূটবুদ্ধি অওরঙ্গজেবের সিংহাসনোপরি যিনি উপবিষ্ট ছিলেন তাঁহার প্রকৃতি সম্বন্ধে পাঠকদিগকে বলিয়া রাখা আবশ্যক। বাদসাহের নাম মহম্মদ শা। ইনি বৎসরের প্রায় ছয় মাস কাল কয়েকজন বন্ধু বান্ধব সঙ্গে নানা স্থানে ভ্রমণ অর্থাৎ আমোদ আহ্লাদ করিয়া বেড়াইতেন। ইহাঁর বিস্তর সময় যমুনার উপর নৌকাযানে অতীত হইত। চান্দেরীর মলমল (যাহা আমাদের ঢাকাই মলমলের ন্যায় প্রসিদ্ধ) মহম্মদ শার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি ইহারই তনজেব প্রস্তুত করিয়া গায়ে দিতেন। সংক্ষেপতঃ এই কথা বলিলেই চলিবে যে, ইনি বাঙ্গালা মহম্মদ শা নামে বিখ্যাত ছিলেন। যখন নাদির শার পত্র মহম্মদ শার নিকট পৌঁছিল তখন তিনি নৌকার উপর যমুনা বিহার করিতেছেন। তিনি পত্র খানি পড়িয়াই বলিলেন এই বে-মানে চিঠি (অর্থহীন পত্র) নির্ম্মল সুরার মধ্যে থাকুক। এই বলিয়া বোতলে রাখিয়া দিলেন। কেহ কেহ এরূপও বলেন যে মহম্মদ শা বলিয়াছিলেন যে আমি নাদির শাকে কি প্রকারে উত্তর দিব। তাহাকে বাদসাহ বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি না;

কারণ সে কোন বাদসাহের বংশধর নহে। আবার যদি বাদসাহ বলিয়া না লিখি তাহা হইলে সে দুঃখিত হইবে। অতএব এ পত্র যমুনার জলের মধ্যে নিক্ষেপ করাই ঠিক।

নাদির শা পত্রের উত্তর না পাইয়া বহু সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে আটক পার হইয়া পেশোয়ার লুণ্ঠন করিলেন। পেশোয়ার হইতে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইবার কালীন মহম্মদ শা ভয় পাইয়া নিজাম উলমুলক্‌কে অনেক অনুরোধ করিয়া দাক্ষিণাত্য হইতে আনাইলেন। নাদির দিল্লীর সুবার মধ্যে প্রবেশ করিলে মহম্মদ শা স্বীয় বন্ধু ও অমাত্যবর্গসহ দিল্লী হইতে বাহির হইয়া কর্ণালের জঙ্গলে যুদ্ধের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। ১১০০ হিজরী ১৪ই জিক্‌তা তারিখে (ইংরাজী ১৭৩৯) দুই দলে যুদ্ধ হয়। নবাব বুরহাম উলমুলক শাহাদত খাঁ কিছু অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করত আহত হইয়া বন্দী হইলেন এবং মন্ত্রী নবাব আমীরুল ওমরা খাঁ দৌরা এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নবাব মুজফ্‌ফর খাঁ, যুদ্ধে হত হইলেন। সুতরাং ভারতবর্ষীয় সৈন্যের পরাজয় হইল। প্রসঙ্গ ক্রমে বলা উচিত যে, জয়পুরের মহারাজা সবাই জয়সিংহ, মহম্মদশার সাহায্যার্থ কয়েক সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কিছুই ফল হয় নাই।

দ্বিতীয় দিন নাদির শা বন্দী বুরহান উল মুল্‌কের দ্বারা মহম্মদ শার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল যে, হিন্দুস্থানের বাদশাহ আসিয়া ইরাণের বাদসাহের সহিত সাক্ষাত করিবেন এবং জেতা যাহা কিছু উপঢৌকন চাহেন তাহাতে আপত্তি করিবেন না। নবাব নিজাম উলমুলক আসফজা, নাদির শাহের নিকট গিয়া এই কথা বার্ত্তা পাকা করিয়া আসিলে পরদিন মহম্মদ শা নাদির শাহের সহিত দেখা করিবার জন্য তাঁহার শিবিরে গমন করিলেন। নাদির শাহ শিবির হইতে বাহির হইয়া মহম্মদ শাহকে প্রত্যুদ্‌গমন করত উহাঁকে তাম্বুর ভিতরে লইয়া যাইয়া দুই জনে এক মস্‌নদের (আসন) উপর উপবিষ্ট হইলেন। পরস্পর শিষ্টাচারের পর নাদির শা বলিলেন, "যখন আপনি আমার নিকট চলিয়া আসিয়াছেন তখন, হে হিন্দুস্থানের বাদশাহ! আপনার মঙ্গল হউক। কিন্তু আমি যে সকল দ্রব্যাদি ও নগদ মুদ্রাদি চাহিব তাহাতে আপনার কোন প্রকার আপত্তি করা সঙ্গত নহে।"

কাহারো কাহারো মতে দরিয়ায়েনূর নামক হীরাও (Kohinoor) এই সময়েই নাদির শার হস্তগত হয়। তাঁহারা বলেন যে পাছে নাদির শাহ কিরীটস্থিত কোহিনূর দেখিতে পান এবং দেখিয়া তাহার প্রতি লোভ করেন

সেই ভয়েই মহম্মদ শা সূক্ষ্ম বস্ত্রের পাগড়ীর মধ্যে তাহা ঢাকা দিয়া রাখিয়াছিলেন। মহম্মদের অনুচরবর্গের মধ্যে কেহ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক এই কোহিনুর গোপন বৃত্তান্ত নাদির শাহকে বিদিত করেন। কর্ণালের যুদ্ধের পরে উভয় সম্রাটের পরস্পর সাক্ষাৎ হইবার প্রস্তাব হইলে, মোগল বংশাবতংস কোমল-কায় মহম্মদ শাহ চন্দেরির মলমলের তনজেব পরিধান করিয়া হীরক-জঠর-সুন্দর উষ্ণীষে মস্তক শোভিত করিয়া যখন দৃঢ় শরীর লৌহকিরীটধারী, মল্লপ্রধান নাদির শাহের সহিত মিলিত হইলেন, তখন নাদির প্রায় আধঘণ্টা কাল মহম্মদ শাহকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। পারস্যে পাগড়ী-বদল অত্যন্ত বন্ধুতার লক্ষণ ইহা জানাইয়া যতক্ষণ না মহম্মদকে তদ্বিষয়ে নাদির প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়াছিলেন, ততক্ষণ তাঁহাকে আপনার কঠোর আলিঙ্গন হইতে মুক্ত করেন নাই। নাদিরের আলিঙ্গনে, মস্তকে লৌহকিরীটের বোঝা ধারণে এবং সূর্য্যের উত্তাপ ও ঘর্ম্মে মহম্মদের যত কষ্ট হইয়াছিল এই বহুমূল্য হীরা যাওয়াতে তত কষ্ট হয় নাই। পরিহাসপটু কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে মহম্মদের গায়ে ফোস্কা পড়িয়াছিল। কোহিনূরের মূল্য এক কোটী টাকা অপেক্ষা অধিক এবং ওজন৩২ক্যারেট। এই হীরকখণ্ডকে পশ্চাতে এক সময়ে ত্যক্ত রাজ্য আফগান ভূপতি সা সুজা দেড় লক্ষ টাকাতে রণজিৎ সিংহকে বিক্রয় করেন। কোহিনূরের ইতিবৃত্ত একটী স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়। সেই জন্য ইহা এই স্থলে পরিত্যাগ করা গেল। কথিত আছে, নাদির শাহ মহম্মদকে কিছু ভোজন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু শত স্বাদযুক্ত সূপসমূহে অভ্যস্তজিহ্ব মহম্মদ, অভ্যাসানুরূপ ভোজ্য প্রাপ্ত হইবেন না ইহা বুঝিতে পারিয়া স্বীকৃত হন নাই। অগত্যা নাদির পকেট হইতে চাপাটী বাহির করিয়া স্বয়ংই চিবাইতে লাগিলেন এবং কহিলেন, "আমি এইরূপই খাইয়া থাকি।"

অতঃপর মহম্মদ শা, নাদির শাহের শিবির হইতে প্রত্যাগত হইয়া আপনার শিবিরে আসিলেন। পরদিন চিঠি পত্রেই কাটিয়া গেল। পরে নিজামকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া এই স্থির হইল যে, নাদির এক কোটি টাকা পাইয়া হিন্দুস্থান হইতে চলিয়া যাইবেন। এই সন্ধি পাকা হওয়াতে মহম্মদ শা সন্তুষ্ট হইয়া নিজামকে আমীর উলমুলক উপাধি দিলেন। বুরহান উল্‌মুলক, নিজাম উল্‌মুলকের এইরূপ অভ্যুদয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি নাদির শার নিকট বন্দী ছিলেন, সর্ব্বদাই তাঁহাকে নাদির শার নিকটে থাকিতে হইত; সুতরাং সুযোগ পাইয়া এক দিন নাদিরকে বলিলেন, "সাজেহানাবাদের (অর্থাৎ

দিল্লীর) ঐশ্বর্য্য আপনি অবগত নহেন। আপনি এক কোটি টাকাতে কেন সন্মত হইলেন? দিল্লীতে যাইলে নগদে ও আসবাবে প্রচুর সম্পত্তি আপনার হস্তগত হইবে।"

দিল্লী প্রবেশ।

নাদির শার মনে লোভ প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি আতিথ্যের ব্যপদেশে মহম্মদ সার সঙ্গে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন (৮ জিলহিজ্জা, ১১৫১ হিজরী, ৮ই মার্চ্চ, ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে), এবং তাঁহার সমস্ত পারসীক চমূকে যমুনার অপর পারে রাখিয়া গেলেন। বুরহান উলমূলক তাহার পর দিন মারা গেলেন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার শরীর পীড়িত ছিল, তাহার উপর কর্ণালের যুদ্ধে অনেক আঘাতও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আবার পূর্ব্বদিন সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দিল্লীর প্রাসাদে নাদিরের নিকট উপস্থিত থাকিতে হইয়াছিল। পরিশ্রম বশতঃ, বিশেষতঃ বয়ঃক্রমও ৯৬ বৎসর হওয়াতে বুরহানের শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

কিন্তু বুরহানের এই মৃত্যু সম্বন্ধে মহম্মদ কাশিম লিখিত ইবরত নামা নামক পুস্তকে লিখিত আছে, নাদির শা, বুরহান উলমূলক, নিজাম উলমুলক (আসফজা) ও এতামদ উদ্দোলাকে টাকা দিবার জন্য পীড়াপীড়ি করায় উহাঁরা বলেন যে, "আপনার প্রার্থনার অনুরূপ মূল্য দশ কোটি টাকা। এত অধিক টাকা শীঘ্র একত্র করা যাইতে পারে না। তবে শীঘ্র যতদূর সংগ্রহ হইতে পারে, সে বিষয়ে ত্রুটি করিব না।" নাদির শা ইহাতে বিরক্ত হইয়া বুরহানের মুখে নিষ্ঠীবন ত্যাগ এবং নিজাম ও এতামদের গালে চপেটাঘাত করিলেন। দরবার হইতে বাহিরে আসিয়া উক্ত তিন আমীর এইরূপ পরামর্শ করিলেন যে, যখন আমাদের আবরু রহিল না এবং আর থাকিবেও না, অধিকন্তু যখন এত অধিক টাকা সংগ্রহ করাও অসম্ভব, তখন প্রাণসংহারক বিষ খাইয়া আমাদের মরা উচিত। বুরহান ইহাতে সম্মত হইয়া বিষ খাইয়া মরেন। কিন্তু আসফজার বুদ্ধিতে বাঁচিয়া থাকাই প্রয়োজনীয় বোধ হইল। বুরহানের মৃত্যুবার্ত্তা প্রকাশিত হইলে তাঁহার ভ্রাতা সৈয়াদত খাঁর কবরের নিকট তাঁহাকে কবর দেওয়া হইল। যে সাঙ্কেতিক কথাতে বুরহানের মৃত্যুর তারিখ কবিগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে তাহা এই—"তারিখ শাহাদত নিমকহারাম যমুরদ—" ১১৫২। বুরহানের নাম সাহাদত ছিল।

নগরের অনেক ধনী সম্ভ্রান্ত লোক নাদিরকে এই কথা বলেন যে, যদি বাদশাহের সহিত এই নগরে আপনার যুদ্ধ ঘটে তাহা হইলে আমাদের বাসস্থান

সকল যাহাতে লুণ্ঠিত না হইতে পায়, এমন উপায় আপনাকে করিতে হইবে। আমরা প্রস্তাব করিতেছি যে, আপনি আমাদিগের প্রত্যেকের বাটীতে ২।৪ জন করিয়া পারসীক সৈন্য রক্ষা করুন। এবং নগর লুণ্ঠন কালে আপনার পারসীক সৈন্য দর্শনে লুণ্ঠনকারীরা যাহাতে আমাদিগের বাটী পরিত্যাগ করে, আপনি এইরূপ আদেশ দিন। নাদির তাহাতে সম্মত হইয়া, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের বাটী রক্ষার্থ প্রায় ৭০০ শত সংখ্যা সৈন্য রাখিলেন। কিন্তু নগরের মধ্যে এইরূপ বিদেশীয় সৈন্যের গর্ব্বযুক্ত সমাবেশ, নগরবাসিদিগের চিত্তকে বিদ্বেষবিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। দুষ্ট লোকেরা নানা প্রকার গুজব সৃষ্টি করিতে লাগিল। শুক্রবার রাত্রিকালে দিল্লীতে এরূপ গুজব উঠিল যে, মহম্মদ শা নাদির শাকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া গুপ্তভাবে তাঁহাকে হত্যা করত শরীর হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন। এই গুজবে উত্তেজিত হইয়া, সহরের লোক পারসীকদিগের শাসন-ভ্রূকুটির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশ্যে স্থির করিল যে, পারসীকদিগকে মারিয়া ফেলা যাউক। তাহারা যেরূপ ইতস্ততঃ সন্নিবেশিত ছিল তাহাতে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলা বিশেষ কঠিন কার্য্যও হয় নাই। পূর্ব্বদিনকার সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব প্রাসাদ রক্ষার্থ, স্থাপিত পারসীক সৈন্যগণকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা দূরে থাকুক, তাহার বিপরীত আচরণই করিয়াছিলেন। অনেকেই তাহাদিগকে গুণ্ডাগণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। নাদির শা প্রথমতঃ এই উন্মাদকর সংবাদে উন্মত্ত না হইয়া, যাহাতে তাঁহার নিজ সৈন্যের প্রতি দৌরাত্ম্য নিবারিত হয় তদ্বিষয়ে স্থিরচিত্তে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিবিধান চেষ্টা ব্যর্থ হইতে লাগিল। সমস্ত রাত্রি দৌরাত্ম্য হ্রাস না হইয়া ক্রমশঃই বৃদ্ধিশীল হইতেছিল। নাদির নিজে যে মৃত হন নাই, জীবিত আছেন, ইহা জানিলে যদি পারসীকবধ ব্যাপার প্রশমিত হইয়া যায়, এই আশায়, প্রত্যূষে অশ্বারোহণে অনুচরসহ রাজবর্ত্মে উপনীত হইলেন। তিনি প্রথমে যাহা দেখিলেন তাহা তাঁহার স্বদেশীয়দিগের মৃতদেহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। নগরবাসিরা তাঁহার উপর ছাদ হইতে প্রস্তরখণ্ড, তীর এবং গুলি চালাইতে লাগিল। তখন পর্য্যন্ত নাদির শার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই এবং দিল্লীর উপর জিঘাংসাবৃত্তিও উত্তেজিত হয় নাই। কিন্তু এমন সময়ে একজন, নাদিরকে লক্ষ্য করিয়া একটি গুলি পরিত্যাগ করে, সেই গুলি তাঁহার সমীপস্থ একজন সেনাপতিকে লাগিয়া তাহাকে ভূপাতিত করিল। তখন নাদির আর আপনাকে ধৈর্য্যের

শাসনে রাখিতে না পারিয়া, দিল্লী-দমনের জন্য সর্ব্বসংহার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

কতলেআম।

(সর্ব্বসংহার)

তখন নাদির জিঘাংসা বশবর্ত্তী হইয়া রোশন উদ্দৌলার মস্‌জিদে গেলেন। এই মস্‌জিদ অত্যন্ত পরিষ্কার এবং সুন্দর, এবং নীচে হইতে উপর পর্য্যন্ত সোনালি কাজ করা। এইজন্য ইহাকে সুন্‌হেরী মস্‌জিদও কহিত। নবাব রৌসন উদ্দৌলা মহম্মদ শার সময়েই ১১৩৮ হিজরীতে কাজীবারা মহল্লাতে ইহা স্থাপিত করেন। যমুনার অপর পার হইতে সমধিক সংখ্যক পারসীক চমূ আনাইয়া ঐ মস্‌জিদের উপর হইতে নাদির শা কত্‌লে আমের হুকুম দেন। সৈন্যগণকে এই বলিয়া দিলেন যে, যাহারই শরীরে হিন্দুস্থানের পোষাক দেখিবে সে হিন্দুই হউক আর মুসলমানই হউক তাহাকে হত্যা করিবে এবং সহর লুণ্ঠন করিয়া বরবাদ করিবে। প্রায় চারি ঘণ্টাকাল অর্থাৎ বেলা ১০টা হইতে ২টা পর্য্যন্ত নাদির শার লোকেরা এই কার্য্যে নিযুক্ত ছিল এবং কুড়ি হাজারেরও অধিক মনুষ্য কাটা পড়িয়াছিল। নিষ্ঠুরতা, প্রতিহিংসা এবং জিঘাংসা যেন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দিল্লী নগরে বিচরণ করিতে লাগিল। কোন স্থানে গৃহদাহ, কোন স্থানে রক্তস্রোত এবং সর্ব্বস্থানে আর্ত্তনাদ দৃষ্ট এবং শ্রুত হইতে লাগিল। অগণ্য নগদ মাল ও জহরাত, ইরাণের সিপাহীগণের হস্তগত হইল। এই জন-হনন ব্যাপারে, নাদির শার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। সহরের উৎপাতকারি লোকগণ হইতেই এই বিপদের সৃষ্টি হইয়াছিল। শেখ সাদি বলিয়াছেন—"যদি কোন জাতির মধ্যে একজন অবিবেচনার কাজ করে, তাহা হইলে সেই জাতির বড়রও মান থাকে না, ছোটরও মান থাকে না।" দিবসের দেড় প্রহর বাকী থাকিতে, মহম্মদ শাহের সানুনয় প্রার্থনায়, নাদির শা কত্‌লে আম বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন। কথিত আছে, একজন মন্ত্রী আসিয়া দুই হস্ত রুমালের দ্বারা বদ্ধ করিয়া এই কথা বলিলেন—

"কসে নমান্দ কি দিগর বতেগেনাজ কুশী
মগর্ তো জিন্দা কুনী থল্‌করা ও বাজকুশী।"

ইহার অর্থ এই, এই পৃথিবীতে আর জীবিত মনুষ্য নাই যাহাকে তুমি তরবারির ধার দ্বারা আর মার। তবে, মনুষ্যদিগকে পুনরায় জীবিত হইতে দাও, অর্থাৎ

কিছুকাল অপেক্ষা কর যে আর কতকগুলি মনুষ্য জন্মগ্রহণ করুক, পরে তাহাদিগকে আবার মারিও। *

আরও প্রসিদ্ধি আছে যে, নাদির শা মুখে কত্‌লে আমের হুকুম দেন নাই। কোষ হইতে তরবারির চতুর্থাংশ মাত্র বাহির করিয়াছিলেন। ইহাই কত্‌লে-আমের সঙ্কেত। আবার যখন কত্‌লে আম বন্ধ করেন, তখন তরবারির নিষ্কাসিত অংশ কোষ মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করাইয়া দেন। ইহাই বন্ধ করার সঙ্কেত। নাদির এরূপ কড়া বাদশা ছিলেন যে, কত লে আম বন্ধের আজ্ঞা যেই মাত্র সহরের মধ্যে প্রচার হইয়া গেল, অমনি সৈন্যগণ সংহার ক্রিয়া হইতে বিরত হইল। এমন কি, যে সৈনিক কাহারও প্রাণবধার্থ অসি উত্তোলিত করিয়াছিল সে তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তোলিত অসি সংযত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সর্ব্বোচ্ছেদ ও গোলমাল বন্ধ হইয়া গেলে, মহম্মদ শাহের পূর্ব্ব মন্ত্রী কুমরুদ্দিন খাঁ দৌরার জামাতা সৈয়দ জা নিসার খাঁ এবং সা মমাজখাঁকে গলায় শাল জড়াইয়া নাদির শার সম্মুখে আনা হইলে, তাঁহাদেরও শিরশ্ছেদ করা হইল। ইহাঁদের অপরাধ এই যে, ইহাঁরা নাদিরকে শত্রুতার চক্ষে দেখিয়াছিলেন এবং ধনসম্পত্তি ও অন্তঃপুর রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বসংহারের সময়ে নাদিরের বহুসংখ্যক সৈন্য বধ করিয়াছিল। অতঃপর নাদির এই আদেশ দিলেন যে, যে সকল ধনবান্ ব্যক্তি এখনও জীবিত আছেন, তাঁহারা যেন আপন আপন সম্পত্তির অর্দ্ধেক ভাগ আনিয়া উপস্থিত করেন। নাদিরের লোকেরা, সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগকে পীড়ন, বন্ধন, ধাক্কা ও ধমকের দ্বারা ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। নাদিরের সিপাহীরা লুঠমারের দ্বারা দিল্লীকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। তারিখ"কুল মোগল বেহায়া=১১৫১"অথবা "দিল্লী খরাব শুদ=১১৫১ হিজরী।"

অসাধারণ উৎপীড়ন।

বাস্তবিক এ সময়ে যেন কত্‌লে আমের পরিবর্ত্তে কত্‌লেখাস আরম্ভ হইল। অর্থাৎ এককালীন সংহার বন্ধ হইয়া গেল বটে, কিন্তু ধিকি ধিকি জলন ও জ্বালাতন চলিতে লাগিল। অত্যাচার, ধনবান্ ব্যক্তি সকল হইতে

---

* এটি বোধ হয় কোন কবির কল্পিত কথা। কারণ কবিতাটি কোন প্রেমিকের লিখিত কবিতা। নাদির শাহের সময়ের পূর্ব্ব হইতেই উহা প্রচলিত ছিল। উহার প্রকৃত অর্থ এই—"তোমার হাবভাবযুক্ত রূপের তীক্ষ্ণ ধারে আর কেহ জীবিত নাই। মারাই যদি তোমার নিতান্ত ইচ্ছা হয় তবে একবার জীবিত কর তারপর মারিও।"

নামিয়া, নিম্ন রাজকর্ম্মচারী ও সাধারণ প্রজার উপর বিস্তৃত হইয়া পড়িল। নগরের তোরণ সকলে সৈন্য সমাবেশিত করিয়া রাখা হইল, যাহাতে প্রজাগণ পলাইতে না পারে। সকল প্রকারের পীড়ন এবং তাড়না দ্বারা প্রজাদিগের নিকট হইতে ধন দোহন করা হইতে লাগিল। অনেকেই নিঃস্বতা, শোক এবং উপবাস সহ্য করিতে না পারিয়া মরিতে লাগিল। অপর অনেকে যন্ত্রণা ও অপমানের তীব্রতা বশতঃ আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। একজন প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন যে, নিদ্রা ও শান্তি নগর পরিত্যাগ করিয়াছে, প্রত্যেক গৃহে ও প্রত্যেক প্রাসাদে কেবল যন্ত্রণার ক্রন্দন শ্রুতিগোচর হইতেছে। প্রথমে সমষ্টি ভাবে সংহার হইয়াছে, এখন ব্যষ্টিভাবে সংহার হইতেছে।

দিল্লী লুণ্ঠনের পরে বুরহান উলমুলকের সম্পত্তি লইবার জন্য নাদির শা নবাব সেরজঙ্গকে ফৈজাবাদে বুরহানের জামাতা আবল মনসুর খাঁর নিকট পাঠাইলেন। নাদিরের প্রেরিত লোক আসিতেছে শুনিয়াই, মনসুর খাঁ ফৈজাবাদ ছাড়িয়া পলাইবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু উহাঁর স্ত্রী, অর্থাৎ বুরহানের কন্যা বেগম বুজরুস্, স্বামীকে এই কথা বলিলেন যে "এক কোটি কিংবা দুই কোটি টাকার জন্য তুমি কেন পলায়ন করিবে? এ টাকা আমি আমার নিজের জায়গীর হইতেই দিব, কিন্তু নাদিরের নিকট হইতে উল্ মুল্ক পদবী লওয়া চাই। ইহা না লইয়া টাকা দিও না।" তাহাই হইল। মনসুর দুই কোটি টাকা দেওয়াতে উজীরের পদ ও খিল্লত প্রাপ্ত হইলেন।

দিল্লী হইতে সংগৃহীত নগদ টাকা, সোনা ও জহরতের অলঙ্কার, রূপার বাসন, আসবাব সমস্তই নাদির সঙ্গে লইয়া যান। ইহার মধ্যে শাজাহান কর্ত্তৃক এক কোটি টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত ময়ূরাসনও (তক্তে তায়ুস) ছিল। চন্দনের উপর জড়াও কাজ করা সিংহাসনটিও ছিল। উহার মূল্য জানা নাই। দরিয়ায় নুর=কোহিনূরএর কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ইহার মূল্য এক কোটি টাকা অপেক্ষাও অধিক। সংক্ষেপতঃ নাদির শা নগদে ও জিনিষে প্রায় ৮০ কোটি টাকার সম্পত্তি হিন্দুস্থান হইতে লইয়া যান।

প্রত্যাবর্ত্তন।

নাদির যখন বুঝিলেন যে বিপুল সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হইয়াছে, যতদূর আদায় করা যায় তাহা করা হইয়াছে, তখন উৎপীড়ন কার্য্য কিঞ্চিৎ শিথিল

করিয়া দিলেন। শাজাহানাবাদে (দিল্লীতে) অবস্থিতি কালে, তিনি নিজ রাজধানীতে এই আদেশ প্রচার করিয়া পাঠান :—

যেন অতঃপর সিক্কার উপর হইতে প্রাচীন পারস্য রাজদিগের প্রচলিত লিপি উঠাইয়া তৎপরিবর্ত্তে "জগতের বাদশাহ নাদিরশাহ ঈশ্বরানুগৃহীত ও সকল রাজার উপর রাজা" এইরূপ লিপি মুদ্রাঙ্কিত হয়। কোন কোন সিক্কার উপর লেখা হইয়াছিল "মহম্মদের ভৃত্য মোহর ও মুকুটের শোভাদাতা, ন্যায় ও বিচারের বিস্তারকর্ত্তা. ইরাণ ভূমির নাদির।" শীলমোহরের উপর লেখা হইয়াছিল "জগতে ধন ও ধর্ম্মের উপর নিয়ামক কেহই ছিল না; জগদীশ্বর এইজন্য নাদিরকে উক্ত পদে অভিষিক্ত করিয়াছেন।"

দিল্লী নগরের রক্তারক্তির কিছুদিন পরে মহম্মদ শার ইচ্ছানুসারে নাদির শা সুলতান ইয়েজদা বক্সের (অওরঙ্গজেবের কনিষ্ঠ পুত্র মোরাদ বক্সের পুত্র) কন্যার সঙ্গে আপনার পুত্র নসিরউল্লা মীরজার বিবাহ দিলেন। নাদির জীবিত থাকিতেই এই বিবাহে তৈমুর মীর্জ্জা নামক পুত্র হয়। দিল্লীর যথেষ্ট দুর্গতি বিধান করিয়া, নাদির এক্ষণে মহম্মদ শাকে পুনরায় সিংহাসনোপরি বসাইয়া, আমীর ও ওমরাহদিগকে এই কথা বলিলেন যে "যদি তোমরা ইঁহার আজ্ঞা অবহেলা কর, তাহা হইলে আমার মুষ্টিতে তোমাদিগকে নিষ্পেষিত হইতে হইবে।" ১৮ই মহরম ১১৫২ হিজরীতে নাদির শা সাজেহানাবাদ ত্যাগ করিয়া ইরাণে চলিয়া গেলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে তাঁহার দিল্লীতে অবস্থান ১ মাস ১০ দিন মাত্র হইয়াছিল। যাইবার কালে তিনি অপরিমেয় ধনসম্পত্তি ব্যতীত, বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব এবং উষ্ট্র এবং বহুশত শিল্পী এবং কারিগর আপনার সমভিব্যাহারে লইয়া যান। যাহারা আপন আপন প্রিয়জন-বর্গকে নাদিরের সৈন্যগণের হস্তে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইতে দেখিয়াছে, তাহারাই এক্ষণে সেই নাদিরের সঙ্গে তাঁহারই রাজ্যে জন্মের মত জন্মভূমি দর্শনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া গহন প্রবাসে প্রেরিত হইল।

উপসংহার।

বয়ান ওয়াকা পুস্তকে আছে যে, হিন্দুস্থান হইতে ফিরিয়া গিয়া নাদির শেষ বয়সে অত্যন্ত নিঃশঙ্ক, ক্রোধী ও অত্যাচারী হইয়াছিলেন। সামান্য দোষে মানুষের চক্ষু উৎপাটন করিতেন। অনেকের প্রাণদণ্ড বিধানও করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার উৎপীড়নের এতদূর বাড়াবাড়ি হইয়া উঠে

যে, ১১৬০ হিজরীতে জমাদিয়ল আব্বল মাসের ১৭ই তারিখে মেশহেদ নগর হইতে তিন দিনের পথ দূরে, কোঁচু নামক স্থানে ভ্রাতুষ্পুত্র আলিকুলীখাঁর উপদেশানুসারে নাদিরের ভৃত্যেরা বন্দুক, চপেটাঘাত, তরবারি ও ছুরির দ্বারা উঁহার প্রাণসংহার করে এবং উঁহার মস্তক হইতে বাদশাহীর অহঙ্কার এবং সর্দ্দারীর প্রমত্ততা রক্তধারার সহিত বিদূরিত করে। নাদিরের ছিন্ন মস্তক আলিকুলী খাঁর নিকটে প্রেরিত হইলে, তিনি মৃত্যুর নয় দিন পরে মৃতদেহ কোঁচু হইতে মেশহেদে আনয়ন করান এবং মৃত্যুর পনর দিন পরে নাদির নিজের জন্য যে কবর প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার মৃতদেহ নিহিত করান। কথিত আছে যে, এই কবর নির্ম্মিত হইবার পর নাদিরের জীবদ্দশাতেই একজন লিপিচতুর ইহার উপর এইরূপ লিখিয়া যান যে "এই বিশ্ব মধ্যে তোমার দ্বিতীয় নাই, মনুষ্যেরা তোমার অত্যাচারে পূর্ণ হইয়াছে, কিন্তু তোমার এই স্থান খালি আছে।" লোকে ইহা পড়িয়া অত্যন্ত হাস্য করে, কিন্তু পাছে ইহা নাদিরের কর্ণগোচর হয়, না জানি, তাহাতে কত লোকেরই প্রাণ যাইবে এই ভাবিয়া সকলে উহা মুছিয়া দিয়াছিল।

নাদিরের চরিত্র সম্বন্ধে অনেকগুলি গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। কয়েকটী গল্প নিম্নে প্রদত্ত হইল।

জনশ্রুতি।

১। কোন সময়ে নাদিরের নিকট এক কর্ম্মকার বাইশখানি ক্ষুর প্রস্তুত করিয়া নাদিরকে দেখাইতে যায়। সে সময়ে নাদিরের নিকট অনেকগুলি ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। নাদির এক একখানি ক্ষুর লইয়া এক একটী লোকের গলা কাটিয়া ধার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ভাগ্যক্রমে সে সময়ে মুন্সী মেহদী হুসেন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইনি নাদিরের একজন মন্ত্রী ও জীবন চরিত্র লেখক ছিলেন। পুস্তক খানির নাম 'দুররে নাদিরা'। এই মন্ত্রী অত্যন্ত বিচক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহা না হইলে করালকবল নাদিরের সমক্ষে কোনক্রমে প্রজা রক্ষা ও ন্যায়রক্ষা করিয়া চলা সোজা কথা নহে। তাঁহার উপাধি 'মুন্সী' হওয়া, অতি সঙ্গত কথাই বটে। সম্প্রতি ক্ষুর পরীক্ষায় যখন দুই তিন জনের গলা কাটা হইয়া গেল, তখন মুন্সী মেহদী করযোড়ে এই কথা বলিলেন, প্রভো! সকল গুলির ধার একই প্রকার। তখন নাদির নিরস্ত হইলেন। এই গল্পটি নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় ও অবিশ্বাস্য হইলেও এ প্রবন্ধে ইহা সন্নিবিষ্ট করিবার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল ইহাই বুঝান যে, নাদিরের

অত্যাচার নিশ্চয়ই অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাই এইরূপ গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। ঐতিহাসিকেরা নাদিরের মৃত্যু তারিখ এইরূপ অর্থে লিখিয়াছেন— "নরকে যাও, তোমার পিতা ও পিতামহের সহিত. = ১১৬০।"

২। মহম্মদ শার সভাতে একজন হিন্দু কবি ছিলেন। একদিন নাদির তাহাকে পরিহাস ভাবে জিজ্ঞাসা করেন—"চোঁ জনে হিন্দু বা মুসলমান শবদ্ হম্‌কিনার" কবি পাদপূরণ দ্বারা উত্তর করিলেন—

"বচ্চে নাদির শবদ্ শাহে আলি তবার" ইহার অনুবাদ এইরূপ :—

প্রশ্ন। "মুসলমানে ভজে যদি হিন্দুর রমণী"

উত্তর। নাদির তনয় হয় শুন নৃপমণি। নাদির শব্দের অর্থ দুর্লভ বা ক্ষণজন্মা। আবার নাদির শাকেও বুঝাইল। দ্বিতীয় অর্থে নাদির শাকে "দো আঁসলা" বলিয়া গালি দেওয়া হইল। নাদির তাহা বুঝিলেন, কিন্তু কবিকে কিছু না বলিয়া অপিচ পুরস্কার দিয়া মহম্মদ শাকে বলিলেন যে, আমি কাহারও এরূপ ধৃষ্টতা ক্ষমা করি নাই, কিন্তু এই কবির ধৃষ্টতাকে ক্ষমা করিতে বাধ্য হইলাম।

৩। নাদির দিল্লী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার কালে মহম্মদ শাহের নিকট তিনটি গুণবান্ লোক প্রার্থনা করিলে মহম্মদ শা একটি বাই (নর্ত্তকী পচ্‌লুনা নামক একজন ভাঁড় এবং উলবী নামক প্রসিদ্ধ হাকিমকে নাদিরের সমভিব্যাহারে যাইবার জন্য মনোনীত করেন। সংহারপটু নাদিরের সহিত যাইতে ভীত হইলেও মহম্মদ শাহের নির্ব্বন্ধে অবশেষে যাইতে সম্মত হইয়া নাদিরের নিকট হইতে যাহাতে চলিয়া আসিতে পারেন ক্রমাগত তাহার উপায় উদ্ভাবনে সকলেই সচেষ্ট রহিলেন। পারস্য যাইবার পথেই কোন স্থানে নাদির দরবার করিয়া ঐ নর্ত্তকীর নৃত্য দর্শন করিলেন এবং পরিতুষ্ট হইয়া তাহার প্রার্থিত পুরস্কার তাহাকে দিতে প্রস্তুত হইলেন। বাইজী দিল্লী ফিরিয়া যাইবার অনুমতি মাত্র প্রার্থনা করিল। "এই নর্ত্তকী এখনও দিল্লীর মায়া ভুলিতে পারে নাই" এই বলিয়া নাদির তাহাকে বিদায় দিলেন।

তখন পচ্‌লুনা ভাঁড় পারস্যাধিপতিকে এই নিবেদন করিল যে, যখন বাই চলিয়া গেল তখন পচ্‌লুনা থাকিয়া কি করিবে (কারণ বায়ুরোগের ঔষধ পঞ্চ-লবণ) নাদির হাস্য করিয়া পচ্‌লুনাকেও যাইতে দিলেন। কেবল হাকিম উলবী মাত্র নাদিরের সঙ্গে রহিলেন। কিন্তু তিনিও এই অব্যবস্থ চিত্ত বাদশাহের নিকট হইতে কি প্রকারে পলায়ন করিবেন তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। একদিন নাদিরকে বলিলেন যে, আমাকে রাখা আপনার কোন ক্রমে উচিত

নহে, কারণ আমার এত প্রকার ঔষধ জানা আছে যে তাহার কোনটির ব্যবহারে আমি আপনার প্রাণবধ করিলেও কেহই জানিতে পারিবে না। এরূপ ব্যক্তিকে বিশ্বাস করা আপনার উচিত নহে। নাদির বলিলেন, আমার নিকটও অনেক হাকিম আছেন, তাঁহাদের বিদ্যাবত্তা অতিক্রম করিয়া আপনি কি এমন প্রক্রিয়া করিতে পারেন যাহাতে আমার প্রাণবধ হইতে পারে? তাহাতে উলবী কহেন যে, আপনার হাকিমেরা কোন কাজেরই নহে। মৎকথিত এই উপায়ের দ্বারা আপনি পরীক্ষা লউন। আমি একটি ঔষধ প্রস্তুত করাইতে চাহি, তাহা আমি খাইতেছি, আপনিও খান এবং প্রাণদণ্ডার্হ কোন আসামীও খাউক। চল্লিশ দিনের পরে দেখিবেন যে ঐ আসামীর মৃত্যু হইয়াছে এবং আমরা বেশ ভাল আছি। আমি নিজে ঔষধ স্পর্শ করিতেও চাহি না, আপনার হাকিমেরাই উহা প্রস্তুত করুন, আমি তাঁহাদিগকে উপকরণ মাত্র বলিয়া দিব। অবশ্য আমাদের তিন জনের ঔষধ সেবনে মাত্রায় কিঞ্চিৎ ভিন্নতা থাকিবে। নাদির তাহাই করাইলেন এবং চল্লিশ দিন পরে উলবীর কথিত মত ফল দৃষ্ট হইল।

আর একবার নাদির শার কোষ্ঠবদ্ধের পীড়া হয়। উলবী খাঁর নিকট ঔষধ চাহাতে তিনি একটি প্রলেপ হস্তে লাগাইয়া দিলেন। তাহাতেই নাদিরের বাহ্যের বেগ হইল। নাদির পাইখানায় গেলেন এবং পাইখানায় যতবার জল শৌচ করেন ততবারই বাহ্যের বেগ হয়। তখন পাইখানা হইতে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "ও হাকিমজী আমার দাস্ত থামে না যে"। "প্রলেপ ধুইয়া ফেলুন"। নাদির উলবীর এই উপদেশানুসারে যেমন কার্য্য করিলেন, অমনি বাহ্যের বেগ আসা বন্ধ হইয়া গেল। নাদির উলবীর উপর নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার চিরেপ্সিত পূর্ণ করিলেন অর্থাৎ হিন্দুস্থান প্রতিগমনে আজ্ঞা দিলেন।

৪। দিল্লীতে অবস্থান কালে একদিন পানপাত্রবাহক চা প্রস্তুত করিয়া একত্র উপবিষ্ট নাদির শা ও মহম্মদ শা উভয়েরই নিকট আনিল, কিন্তু কাহাকে অগ্রে দিবে কিছুই স্থির করিতে পারিল না, কারণ নাদিরকে অগ্রে দিলে পাছে নাদির এ রকম মনে করেন যে, দেখ এই ভৃত্য কি অসার; আমি দুই দিনের জন্য দিল্লী জয় করিয়াছি বলিয়া এ আপনার চিরকালের প্রভুকে অনাদর করিল। আবার যদি মহম্মদ শাকে প্রথমে চা দেওয়া হয় তাহা হইলে হয়ত নাদির অপমান বোধ করিয়া গলাই কাটিয়া ফেলিবেন। ভৃত্য কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া পিয়ালা গুলি উজীরের নিকট রাখিল। উজীর পুরাতন প্রভুরও অপমান না হয় আর নাদিরেরও অপমান না হয়, এইরূপ একটী

কৌশল করিলেন। মহম্মদ শাহের হস্তে পিয়ালা দিয়া নাদিরকে এই কথা কহিলেন যে "আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির নিকটে চা পাত্র সমর্পণ করিবার উপযুক্ত, আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি হইতে পারে না। হিন্দুস্থানের বাদশাহই আপনাকে চা পান করাইবার উপযুক্ত পাত্র।"

৫। যখন ইয়েজদা খাঁর কন্যার সহিত নাদিরের পুত্রের বিবাহ হয়, তখন সম্প্রদানকালে মন্ত্রবক্তা, ইয়েজদার পিতা মুরাদ বক্স, তৎপিতা অওরঙ্গজেব, তৎপিতা শাজেহান, তৎপিতা জাহাঙ্গীর, তৎপিতা আকবর, তৎপিতা হুমায়ুঁ, তৎপিতা বাবর ইত্যাদি বহুদূর পর্য্যন্ত নৃপগণের উল্লেখ করিল, কিন্তু নাদিরের পুত্রের বেলায় নাদিরের নাম পর্য্যন্ত করিয়াই থামিতে হইল। কারণ নাদিরের পিতৃপুরুষকে ত কেহই জানে না। তখন নাদির বলিলেন, বল না, 'ইব্‌নেতেগ্' অর্থাৎ তৎপিতা তরবারি।

৬। নাদিরের প্রকৃতি বুঝাইবার জন্য আরও দুই তিনটি গল্প বলা যাইতেছে, তবে সেগুলি ভারতে সংঘটিত নহে। মুন্‌সী মেহদী একখানি পুস্তক রচনা করিয়া নাদির এবং তাঁহার সভ্যগণকে শুনান। পুস্তকখানি নিতান্ত কঠিন ভাষায় রচিত ছিল। নাদির নিশ্চয়ই তাহার বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারেন নাই। বরং সভ্যদের মধ্যে অনেকে বুঝিয়াছিল। কিন্তু নাদির শা মেহদীকে কহিলেন, "আমি ত তোমার পুস্তক বুঝিলাম, যাহাতে ইহাঁরা সকলে বুঝিতে পারেন এরূপভাবে লিখিও।" এই গল্পটিতে নাদিরের বুদ্ধিমত্তার অভিমান লক্ষিত হইতেছে।

৭। এক সময়ে রাজধানী ইস্পাহান ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে অত্যন্ত মক্ষিকার উপদ্রব হয়। নাদির হাকিম উলবীকে কহেন, মক্ষিকা নিবারণের কোন ঔষধ করুন। উলবী মহা বিপদে পড়িলেন। দেশব্যাপী মক্ষিকা কি প্রকারে নিবারণ করিবেন! অবশেষে তিনি এই হুকুম দেওয়াইলেন যে, প্রত্যেক সিপাহীকে প্রতিদিন এক তোলা করিয়া মক্ষিকার মৃতদেহ দেখাইতে হইবে। এইরূপ করিতে করিতে শীঘ্রই মক্ষিকাকুল নির্ম্মূল হইয়া গেল।

৮। কোন সময়ে পাঁচ হাজার কাটা কাণ শুকাইবার ভার এক সিপাহীর উপর পড়িয়াছিল। হঠাৎ একটি কাণ চীলে লইয়া গেল। নাদির-ভীত সিপাহী আপনার একটি কাণ কাটিয়া সংখ্যা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিল।

৯। কথিত আছে যে, কোন সময়ে কতকগুলি সার্থবাহ, এক বিজন

প্রান্তর মধ্যে দস্যু কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয়। তাহারা বিপন্ন হইয়া নিকটবর্ত্তী নগরে বিচারকের নিকট আপনাদের বিপদ্‌বার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিয়া লুণ্ঠিতধন উদ্ধার বিষয়ে চেষ্টা করিতে আবেদন করিল। বিচারক দস্যু ধরিবার জন্য যে কোন উপায় করিতে লাগিলেন তাহা সমস্তই ব্যর্থ হইল। কোন অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। সার্থবাহগণ নাদির শাহের নিকট সমস্ত জানাইল। নাদির শা সার্থবাহদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তোমাদের যেখানে ধনরত্ন অপহৃত হইয়াছিল তাহার নিকটে কি কোনও প্রাণীর বাস ছিল না? তাহারা বলিল— 'না।' নাদির শা বলিলেন, ভাল করিয়া মনে করিয়া দেখ, সজীব কি নির্জ্জীব কিছুই কি তাহার নিকট ছিল না? তাহারা অনেকটা স্মরণ করিয়া বলিল, 'একটি বৃক্ষ মাত্র ছিল।' তখন নাদির শা বলিলেন 'সে বৃক্ষটি আমাকে দেখাইয়া দিতে পার?' তাহারা বলিল, 'পারি।' তখন নাদির শা পুলীশ কর্ম্মচারীদিগকে আদেশ করিলেন যে, প্রত্যহ ২৫ পঁচিশ ঘা করিয়া কোড়া যেন ঐ বৃক্ষের উপরে পড়ে। পুলীশ কর্ম্মচারিগণ ঠিক সেই রকম করিতে লাগিল। এক সপ্তাহ মধ্যেই দেখা গেল ঐ বৃক্ষ তলে সমস্ত লুণ্ঠিত সম্পত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। নাদিরের 'রোয়াব' (দবদবা) এমনই ছিল।

১০। কোন ব্যক্তি নাদিরকে দরখাস্ত লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে "তুমি যদি ঈশ্বর হও তাহা হইলে ঈশ্বরের মহিমা দেখাও; আর যদি পৈগম্বর হও তবে পৈগম্বরের গুণ সকল দেখাও"। নাদির কহিয়াছিলেন, "আমি পৈগম্বরও নহি, ঈশ্বরও নহি। আমি ঈশ্বরের ক্রোধ।"

শ্রীমেঘনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ।

প্রস্তর হইতে সীস নিষ্কাশন।

শিল্পবিষয়িণী আলোচনা অঙ্কুর পত্রিকার অন্যতম উদ্দেশ্য, তাই এই "প্রস্তর হইতে সীস নিষ্কাশন" নামধেয় প্রবন্ধ লিখিত ও প্রকাশিত হইল।

সোণা রূপা রাঙ্ ও সীসা প্রভৃতি তৈজস দ্রব্যের একটী সাধারণ নাম "লোহ"। এই লোহ আবার প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় "অশ্মপুত্র"। অশ্মের

পুত্র অর্থাৎ প্রস্তরের পুত্র। সোণা রূপা রাঙ্ ও সীসক প্রভৃতি পদার্থ, বিশেষ বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত প্রস্তর হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া প্রাচীনেরা ঐ সকলকে "অশ্মপুত্র" বলিতেন এবং একই অশ্মে ঐ চার প্রকার পদার্থের অবস্থান দেখিয়া তত্ত্বাবতের মধ্যে এইরূপ একটা পারস্পরীণ সম্বন্ধ নির্দ্দেশ করিতেন। যথা—

"সুবর্ণস্য মলং রৌপ্যং রৌপ্যস্যাপি মলং ত্রপুঃ।
জ্ঞেয়ং ত্রপুমলং সীসং সীসস্যাপি মলং মলম্॥"

কোন কোন পাথরে কেবল লৌহই পাওয়া যায়, অন্য ধাতু পাওয়া যায় না। পাহাড়ীরা এই শ্রেণীর পাথরকে "লৌহের পাথর" বলিয়া পরিচয় দেয়। আবার এমন এক শ্রেণীর পাথর আছে, যাহাতে প্রচুর পরিমাণে সীসা ও অল্প পরিমাণে রূপা ও সোণা পাওয়া গিয়া থাকে। এই শ্রেণীর পাথর "সীসার পাথর" এই আখ্যায় প্রসিদ্ধ। আমাদের এই প্রবন্ধ সেই সীসার পাথর সম্বন্ধীয় বিধানসমূহ বর্ণন করিবে, অন্য কোন প্রস্তরের কথা বলিবে না।

সীসার পাথর।

পূর্ব্বে ভারতবাসীরা যে উপায়ে সীসার পাথর চিনিত, যে বিধানে সে সকল সংগ্রহ করিত এবং যে প্রক্রিয়ায় সে সকল হইতে সীসা নিষ্কাশন করিত, সে উপায়, সে বিধান ও সে প্রক্রিয়া জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরাজের বর্ণনায় জানা যায়। অগ্রে সেই পুরাতন উপায়, বিধান ও প্রক্রিয়া বর্ণন করা যাউক, পশ্চাৎ তদুৎকর্ষে যাহা হইয়াছে তাহা বর্ণন করা যাইবে।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সেনাবিভাগের অধ্যক্ষ ডিক্‌সন্ সাহেব নিম্নলিখিত বিবরণটী প্রকাশ করেন। সেই বিবরণীতে তিনি বলিয়াছেন, আজ্‌মির প্রদেশের নিকটস্থ পর্ব্বতশ্রেণীর ১০০ হইতে ৩৫০ ফিট্ উর্দ্ধতার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে সীসকের খনি আছে, সেই সকল খনিতে সীসকের প্রস্তরসমূহ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া এই সকল খনিতে সীসক নিষ্কাশনের কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। বোধ হয়, অনায়াসে খনি খনন করিবার প্রথা এদেশের লোকদিগের জানা ছিল না। থাকিলেও ইহারা সে প্রকারে কার্য্য করিতে যত্নবান্ হইত না। যেন তেন প্রকারেণ খনি হইতে সীসকের প্রস্তর উত্তোলন করিয়া সীস নিষ্কাশনের কার্য্য চালাইত। পূর্ব্ব কথিত পর্ব্বতস্থ খনিতে ৩ হইতে ৬ ইঞ্চ পর্য্যন্ত পুরু সীসক বিশিষ্ট প্রস্তরের

স্তর সচরাচর পাওয়া যাইত। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অত্যুজ্জ্বল কণিকা দেখিয়া ঐ স্থানের লোকেরা খনির অস্তিত্ব ও প্রস্তরের সীসবিশিষ্টতা অনায়াসে উপলব্ধি করিতে পারিত। তৎকালে যে সকল সীসায় পাথর পাওয়া যাইত, সে সকলের কতক অতিশয়িত উজ্জ্বল, কতক কাল, কতক বহুছিদ্রবিশিষ্ট এবং কতক বা প্রগাঢ় রক্তবর্ণ। সাহেব বলেন, খনির স্থানীয় মৃত্তিকার গুণানুসারে এই সকল সীসার পাথরের বর্ণের তারতম্য হয়। অন্যে বলেন, বর্ণের ইতর বিশেষের কারণ সংযোগিক প্রক্রিয়া। অর্থাৎ স্বাভাবিক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই বর্ণের ইতরবিশেষ সংঘটন হয়। এই সীসক প্রস্তরগুলিই গেলিনা বলিয়া অভিহিত হয়। (সংস্কৃত ভাষা অনুসন্ধান করিলে এই সীসক প্রস্তরের "গণ্ডূপদ" নাম পাওয়া যায়। সীসকের নাম গণ্ডূপদভব, সীসক প্রস্তরের নাম গণ্ডূপদ।)

তৎকালে বারুদের সাহায্যে প্রস্তর ফাটান হইত না। সামান্য গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে কাষ্ঠ ও অগ্নিসংযোগ করা হইত এবং তদ্দ্বারা প্রস্তর ফাটান হইত। স্পষ্টই বুঝা যায়, তৎকালের লোকেরা প্রস্তর ফাটাইয়া অতি সামান্য ফলের আশা করিত। খনি খনন করিবার বিশেষ বিশেষ যন্ত্রও তৎকালে ছিল না। কেবল কয়েক প্রকার হাতুড়ি, বাঁটালি, এবং কয়েক প্রকার গাঁইৎ মাত্র ব্যবহৃত হইত।

খনি খননকারীরা প্রাতঃকালে কার্য্যারম্ভ করিয়া দিবসের অধিকাংশই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। কতকগুলি লোক পুরুষানুক্রমে এই কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। ইহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় ইহারা অতি উচ্চহারে সুদ দিয়া টাকা কর্জ্জ করিত এবং কিছুকাল পরে এই দিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ায় ভালরূপে কার্য্য চালাইবার জন্য খননকারীদিগকে বিনা সুদে টাকা কর্জ্জ দেওয়া আরব্ধ হয়। গবর্ণমেণ্টের এই অনুগ্রহে খনি খননকারীরা দুরন্ত মাহাজনদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিল। এই প্রদেশে প্রতি বৎসর যে সকল সীসা প্রস্তুত হইত, তাহার পরিমাণ প্রায় ৪৫০ হন্দর।

সীস প্রস্তুত করিবার তাৎকালিক উপায়।

খনি হইতে প্রাগুক্ত লক্ষণাক্রান্ত গণ্ডূপদ বা গেলিনা প্রস্তর উত্তোলন করিয়া, যতদিন না উত্তমরূপ শুষ্ক হয় ততদিন তাহা গাদা

করিয়া ফেলিয়া রাখা হইত। উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে সে সকল মুদ্গরের দ্বারা পিটিয়া গুঁড়া করা হইত। সেই গুঁড়া ঝুড়িতে সংগ্রহ করিয়া স্রোতের জলে উত্তমরূপে ধৌত করা হইত। এই ধৌতকরণ একটু কৌশলসাপেক্ষ। প্রস্তর অপেক্ষা সীসকের অংশ অধিক ভার বলিয়া ধৌত করিবার সময় সীসকের অংশ ক্রমে নীচে যায় ও প্রস্তরের অংশ উপরে জমাইৎ হয়। এবং ক্রমে সীস প্রস্তর হইতে সীসার ভাগ পৃথক্কৃত হয়, পুনর্ব্বার তাহা ধৌত করা হয়। ২০ হইতে ৩০ বার ধৌত করার পর সীসকের অংশ সকল লইয়া সমান ওজনের গোময়সহ মিশ্রিত করতঃ তাহা পায়রার ডিমের মত ছোট ছোট গুলি পাকাইয়া সে সকল পুনঃ শুষ্ক করা হয়। গুলি সকল উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে ১১ ইঞ্চ পরিধিবিশিষ্ট খাড়া চুল্লীতে স্থাপন করতঃ চুল্লীর নীচে কয়লার আগুন করিয়া তাহাতে হাপরের দ্বারা বাতাস দেওয়া হইত। এই সকল চুল্লীর নীচে গর্ত্ত থাকে, সেই সকল গর্ত্তে সীসক সকল গলিয়া আসিয়া একযোগ বা জমাইৎ হইতে থাকে। প্রাচীনকালে এইরূপে এতদ্দেশে সীস প্রস্তুত হইত। এই পদ্ধতি অবলম্বনকারীরা সীস প্রস্তর হইতে শতকরা ৪০ হইতে ৫০ ভাগ পর্য্যন্ত সীস প্রাপ্ত হইত। বর্ত্তমান কালে সীস প্রস্তুত করণের জন্য বিশিষ্ট উপায় সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা ফলও বিশিষ্ট প্রকারে লব্ধ হইতেছে। বর্ত্তমান উপায়ের বা সীস প্রস্তুত পদ্ধতির বিস্তৃত বিবরণ এইরূপ—

অনেক প্রকার সীসার পাথর আছে, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দুই প্রকার প্রায় সকল দেশে কিছু অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১ গেলিনা—অপর সেরসাইট। ভূগর্ত্তস্থ অগ্নির উত্তাপে গন্ধক ও সীসা সর্ব্বাবয়বে মিশ্রিত হইয়া গেলিনা প্রস্তর উৎপন্ন হয়, ইহা পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। ইংলণ্ডে ডাক্তার পার্সি, (Percy) গন্ধক ও সীসা গলাইয়া এক প্রকার বিশিষ্ট নিয়মে উক্ত দ্রব পদার্থ শীতল করতঃ গেলিনাসদৃশ পদার্থ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহা দেখিতে অতিশয় উজ্জ্বল, রং কালো ও খুব ভারি। খুব ছোট এক টুক্‌রা গেলিনা হাতে করিলেই উহার সমধিক ভারবত্তা উপলব্ধ হয়। গেলিনার ভার জল অপেক্ষা ৮৷৯ গুণ অধিক।

স্বাভাবিক গেলিনা প্রায় খাঁটী হয় না। ইহার সহিত আর্সেনিক, য়্যাণ্টিমণি, তামা, রূপা এবং কোন কোন গেলিনায় অতি সামান্য পরিমাণের সুবর্ণ মিশ্রিত থাকে। সীসার যত প্রকার খনিজ প্রস্তর আছে, তন্মধ্যে

এই গেলিনা প্রস্তরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় ও ইহাতেই সীসার ভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকে। ভাল গেলিনাতে শতকরা ৮৬-৬ ভাগ সীসা থাকে, গন্ধক ১৩-৪ ভাগ থাকে।

ভূগর্ত্তস্থ কন্দরে ও কখন কখন স্তরে ইহা পাওয়া যায়। কন্দরে যাহা থাকে তাহার পরিমাণ তত অধিক নহে। পরন্তু যদি ইহার স্তর পাওয়া যায় তাহা হইলে ইহা অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়।

গেলিনার সহিত প্রায়ই রৌপ্য মিশ্রিত থাকে। রৌপ্যের খনিজ প্রস্তর আর্জ্জেণ্টাইট, পলিবাইট ও ফ্যালার্ণ প্রায়ই গেলিনার সহিত মিশ্রিত থাকে বলিয়া উহা হইতে রূপা পাওয়া যায়। উক্ত রৌপ্য প্রস্তরের ১টী বা দুইটী অথবা সব কয়েকটী কোন কোন গেলিনায় মিশ্রিত হইয়া থাকে। রৌপ্য বিহীন গেলিনা স্বভাবতঃ অতি বিরল। গেলিনায় শত করা ১ আউন্স হইতে ৩০ আউন্স পর্য্যন্ত রূপা পাওয়া গিয়াছে।

গেলিনার দানা ঔজ্জ্বল্যযুক্ত ত্রিকোণ ও ছয়কোণ বিশিষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, ইহার দানা সরু হইলে বেশী রূপা থাকে, আর মোটা হইলে রূপার অংশ কম হয়। কিন্তু ইদানীং নানা প্রকার নমুনা পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, ঐ উক্তি প্রবাদ মাত্র, ঠিক্ নহে। কারণ, ব্রোকণহিল নামক স্থানে মোটা দানার গেলিনায় আশাতীত পরিমাণে রূপা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সীসায় সেরসাইট্ প্রস্তর।

অঙ্গারযান ও সীসা মিশ্রিত হইয়া এই সেরসাইট্ প্রস্তর উৎপন্ন হয়। গেলিনা পাথর বহুকাল অনাবৃত অবস্থায় রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে পড়িয়া থাকিলে ভূবায়ুস্থিত অঙ্গারযান অল্পে অল্পে ইহার সহিত মিশ্রিত হইতে থাকে। তাহাতে তাহার চক্চকে কাল রং নষ্ট হইয়া যায় ও তাহাতে চাক্চিক্যবিহীন এক প্রকার শাদা রং আবির্ভূত হয়। এই নূতন পদার্থের নাম সেরসাইট্। সেই সেরসাইট্ পাথর অনেক পরিমাণে পাওয়া যায়, পরন্তু গেলিনা যত পাওয়া যায় তত নহে। খাঁটী হইলে ইহাতে ৭৭-৫ ভাগ সীসা থাকে, কিন্তু প্রায় খাঁটী হয় না। খাঁটী না হওয়ায় ইহাতে ৬৪।৬৫ ভাগের অধিক সীসা পাওয়া যায় না। ইহারও সহিত রূপা মিশ্রিত থাকে। গেলিনা ও সেরসাইট্ ব্যতীত আরও অনেক প্রকার সীসার পাথর আছে, পরন্তু সে সকলে অধিক পরিমাণ সীসা পাওয়া যায় না, সেজন্য সে সকল পাথর অব্যবহার্য্য বিধায় উল্লেখের বা বর্ণনার অযোগ্য।

পাথর হইতে সীস নিষ্কাশন প্রণালী।

উক্ত খনিজ প্রস্তর হইতে সীস নিষ্কাশন করিতে হইলে সচরাচর ৩ প্রকার ফারনেশ্ অর্থাৎ চুলা ব্যবহার করিতে হয়। ১ নং রেভারবারেটরী ফারনেশ, ২ নং স্কচহার্ম ও ৩ নং কিউপোলা ফারনেশ্ অথবা খাড়া ফারনেশ্।

রেভারবারেটরী ফারনেশ্ নানাপ্রকার হইয়া থাকে।

রেভারবারেটরী ফারনেশ্ যে প্রকারে চালাইতে হয় তাহা বলা যাইতেছে।

এই ফারনেশ্ চালাইতে হইলে খাঁটী গেলিনা সঞ্চয় করা আবশ্যক। কেননা গেলিনার সহিত অল্প বিস্তর পাথর মিশ্রিত থাকে। শতকরা ৫ ভাগ পাথর থাকিলে ১ নং রেভারবারেটরী ফারনেশে চলিতে পারে; কিন্তু যদি উহায় অধিক পাথর থাকে তাহা হইলে উক্ত ফারনেশ উহার কিছুই করিতে পারে না। এই ক্ষেত্রে ধুইবার কল আবশ্যক। গেলিনা, প্রস্তর হইতে অনেক ভার; সেজন্য উপযুক্ত প্রক্রিয়ায় ধুইবার সময় গেলিনা ভাগ ভারাধিক্য বশতঃ নীচে চলিয়া যায় এবং পাথর সকল উপরে উঠিয়া পড়ে। এই গেলিনা ও পাথর উভয় বিভাগকেই পৃথক্ সংগ্রহ করিতে হয়। কারণ ধুইবার সময় উক্ত পাথরের সহিত হালকা রূপার পাথর ও গেলিনার গুঁড়া অনেক চলিয়া যায়। পরে সেই গেলিনায় ও পাথরের নমুনা লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক। এই গেলিনায় যদি শতকরা ৫ ভাগ পাথর পাওয়া যায় অথবা তদপেক্ষা কম পাথর পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা ১ নং ফারনেশের উপযুক্ত মনে করিতে হইবে। যদি তদপেক্ষা অধিক পাথর দেখা যায়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার ধৌতীক্রিয়ার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ধৌতীক্রিয়ার পর পুনর্ব্বার নমুনা লইয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। সে পরীক্ষায় যদি বেশী সীসা থাকা স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে সেই সকল সীসপ্রস্তর কিউপোলা ফারনেশের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া স্বতন্ত্র গাদায় স্থাপন করিবেক।

ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতা অল্প হইলে গেলিনা ও পাথর না ধুইয়া ১ নং রেভারবারেটরি ফারনেশে গালাইতে পারা যায়। ইহাতে শতকরা ৩০।৩৫ ভাগ পাথরবিশিষ্ট গেলিনা অনায়াসে গালান যাইতে পারে। এই ব্যবস্থায়, পাথর নষ্ট করিয়া সীসা প্রস্তুত করিতে উপযুক্ত পরিমাণ লোহা ও চুণ সংযোগ পূর্ব্বক গরম করিলে সীসা ও তদুপরি পাথর লৌহ ও চুণ মিশ্রিত এক প্রকার মলিন পদার্থ প্রস্তুত হয়। ইংরাজ এই ময়লাকে Refuge সংজ্ঞায়

অভিহিত করে। কিন্তু এই ফারনেশে উপযুক্ত পরিমাণ লোহা ও চূণ ব্যবহার না করিলে ইহার তলদেশ অচিরাৎ ভগ্ন হইয়া যাইবে। ইহাতে যে ময়লা প্রস্তুত হয় তাহাতে প্রায় শতকরা ২০।৩০ ভাগ সীসা থাকে ও লোহা ব্যবহার ও কিউপোলার ন্যায় আঁচ না লাগায় কিঞ্চিৎ রূপাও ময়লার সহিত থাকে। অতএব, যাহাদের ব্যয় সহ্য করার ক্ষমতা থাকে, তাহাদের পক্ষে কিউপোলা নির্ম্মাণপূর্ব্বক সীস প্রস্তুত করা সুবিধাজনক।

বিশেষ প্রক্রিয়া।

১। প্রথমে অল্প আঁচে গেলিনা সকল গরম করা অর্থাৎ ভর্জ্জিত করা। এই কার্য্যকে কুলীরা "গন্ধক উড়ান" বলে।

২। তৎপরে ফারনেশের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ ও লৌহসংযুক্ত করিয়া তীব্র আঁচ দেওয়া।

৩। কেবল লৌহ সংযোগে অতিশয় উত্তাপ প্রয়োগ করা।

প্রথম প্রক্রিয়ায় কার্য্য করিতে হইলে অতি উৎকৃষ্ট গেলিনা আবশ্যক হইবে, যাহাতে পাথরের ভাগ শতকরা ৫ ভাগের অধিক নাই। ফারনেশ লাল থাকিবে অথচ গেলিনা গলিবে না, এই অবস্থায় গেলিনাগুলিকে দুই ঘণ্টাকাল ভাজিতে হইবে। তাহাতে ধীরে ধীরে গন্ধক উড়িয়া যাইবে ও বায়ুস্থিত অক্‌সিজেন বা অম্লযান ঐ গেলিনাস্থিত সীসা আশ্রয় করিবে। এই অবস্থায় গলিয়া চাপ বাঁধিলে বুঝিতে হইবে প্রক্রিয়া প্রয়োগ ভাল হয় নাই এবং এই প্রথম প্রক্রিয়া ভাল না হইলেও পরবর্ত্তী প্রক্রিয়াও ভাল হইবে না। সুতরাং সীসাও বেশী পাওয়া যাইবে না।

উত্তমরূপ ভাজা হইলে ২ ঘণ্টা পরে চুলা উত্তমরূপ পরিস্কার করিয়া, সমস্ত গেলিনা অগ্নির নিকট আনিয়া স্থাপন করিবেক। পরে ফারনেশের সমস্ত জানালা দরজা বন্ধ করিয়া কয়লা মারিয়া তীব্রভাবে উত্তপ্ত করিবেক। অর্দ্ধ ঘণ্টা তদ্রূপ উত্তাপ প্রয়োগের পর পুনর্ব্বার সমস্ত দরজা খুলিয়া দিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টাতক্ বায়ু সঞ্চরণ দ্বারা শীতল করতঃ পুনর্ব্বার অর্দ্ধ ঘণ্টা উত্তাপ প্রয়োগ করিবেক। পুনর্ব্বার অর্দ্ধ ঘণ্টা বায়ু প্রবিষ্ট করিয়া অপেক্ষাকৃত শীতল করিতে হইবে। অতঃপর সমস্ত জানালা দরজা কর্দ্দমলিপ্ত করতঃ যতদুর সম্ভব ততদুর প্রাবল্যে উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হইবে। এই উত্তাপে সমস্ত গেলিনা জলবৎ তরল হইয়া ফারনেশের গভীর অংশে নামিয়া আসিয়া

জড় হইবে। যখন দেখিবে যে, সমস্ত গেলিনা নিম্নে আসিয়াছে, তখন পূর্ব্বরুদ্ধ সমস্ত জানালা দরজা খুলিয়া দিয়া অল্প অল্প গুঁড়া চুণ ঐ তরল পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। ইহাতে চূণের সহিত সীসার ময়লা গাঢ় হইয়া আসিবে, পরে সেই ময়লা উপযুক্ত যন্ত্রের দ্বারা ঠেলিয়া অগ্নির নিকটে গাদা করিতে হইবে। যখন দেখা যাইবে যে, চুণ সংযোগে আর কিছুই উঠিতেছে না, সমস্তই তরল হইয়া গিয়াছে, তখন সীসা বাহির করিবার স্থান হইতে লৌহদণ্ড আস্তে আস্তে বাহির করিয়া লইতে হইবে। লৌহদণ্ড বাহির হইতে না হইতেই অগ্নিবৎ সীসা অতি বেগে বাহির হইয়া বহিঃস্থিত কটাহ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিবে। যখন দেখা যাইবে যে, আর সীসা নাই তখন পূর্ব্বকথিত লৌহদণ্ড দিয়া ফারনেশ বন্ধ করিতে হইবে। তৎপরে কিয়ৎ পরিমাণ শ্লিথি পাথরের কয়লা উক্ত কটাহে নিক্ষেপ করতঃ কটাহস্থিত সীসা ও কয়লা যতদূর মিশ্রিত হওয়া সুসম্ভব ততদূর মিশ্রিত করিতে হইবে। ঐরূপ করিলে সীসায় এক প্রকার সর পড়িয়া আসিবে। যদি এই সর নরম থাকে তবে বেশী কয়লা সংযোগ করা আবশ্যক। বেশী কয়লা সংযোগ করিয়া মিলাইতে মিলাইতে উক্ত নরম সর ভাঙ্গিয়া গিয়া গুঁড়ার আকার ধারণ করিবে। এই ধূলিবৎ গুঁড়া পদার্থ ও সেই কয়লা সীসা হইতে বড় বড় ঝাজরার দ্বারা উঠাইয়া লইতে হয় ও ঐ সকল গুঁড়া এক স্থানে গাদা করিয়া রাখিতে হয়। যখন সমস্ত গুঁড়া ও কয়লা উঠিয়া আইসে তখন ছাঁচ আনিয়া তাহাতে বড় বড় হাতার দ্বারা সীসা উত্তোলিত করতঃ ঢালিতে হয়। ছাঁচ শীতল হইলে সীসা সকল জমিয়া ইষ্টকের আকার ধারণ করে। বর্ণিত প্রকারে দুইবার সীসা প্রস্তুত করা হইলে কটাহ হইতে উদ্ধৃত সেই ধূলিবৎ পদার্থ ফারনেশ মধ্যে নিক্ষেপ করিতে হইবে ও যন্ত্রযোগে যতদূর সম্ভব ফারনেশের ভিতরের মাল ও উক্ত ধূলা মিশাইতে হইবে। এখন একটু নাড়াচাড়া করিলেই সীসা উৎপন্ন হইবে। যতক্ষণ সীসা বাহির হইবে ততক্ষণ তাহা করিতে হইবে, তৎপরে সমস্ত দরজা মৃত্তিকার দ্বারা বন্ধ করতঃ পুনর্ব্বার তীব্র উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হইবে। দুই চারবার ঐরূপ করিয়া যখন দেখিবে যে, আর সীসা বাহির হইতেছে না, তখন ফারনেশের মধ্য হইতে ময়লা বাহির করিয়া বাহিরে দেখিতে হইবে; ফারনেশ ভালরূপ শীতল হইলে পুনর্ব্বার গেলিনা ভাজা প্রভৃতি কার্য্য পর পর নিয়মে চালাইলে পুনর্ব্বার সীসা পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয় উপায়েও সীস প্রস্তুত করা হয়, পরন্তু প্রথমোক্ত উপায়ের সহিত দ্বিতীয় উপায়ের অধিক পার্থক্য নাই। গেলিনা ভাজা প্রভৃতি সমস্তই সমান। প্রথম উপায়ে যতদূর সীস প্রস্তুত হয় হউক, তৎপরে লৌহসংযুক্ত করিয়া উত্তাপ প্রদান কর, তাহা হইলে সীসা যতদূর বাহির হইবার ততদূর বাহির হইবে।

তৃতীয় উপায়ের উল্লেখ করা হইয়াছে বটে; পরন্তু বর্ত্তমান কালে ঐ উপায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। কারণ, গন্ধক না উড়াইয়া সীসা বাহির করা নিতান্ত ব্যয়সাধ্য ও কষ্টকর হয়। সুতরাং লাভও অল্প হয়।

উৎকৃষ্ট পাথুরিয়া কয়লার চাপ্ হইলে সকল কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হয়, কেবল গন্ধক উড়াইবার সময় কোক্ কয়লা ব্যবহার করা উচিত।

কিউপোলা বা খাড়া ফারনেশে শতকরা ৩০।৩৫ ভাগ প্রস্তর মিশ্রিত গেলিনা, লোহের খনিজ প্রস্তর, ও চূণের খনিজ প্রস্তর সংযোগে কোক্ কয়লা দিয়া জ্বালাইলে সীসা প্রস্তুত হয়। বড় বড় ফারনেশে প্রত্যহ ২৭০০ মোন পর্য্যন্ত মাল জ্বালান হইতে পারে।

রৌপ্য নিষ্কাশন প্রণালী।

রৌপ্য মিশ্রিত সীসা হইতে রৌপ্য নিষ্কাশন করিতে হইলেও তাহাকে গলাইতে হইবে। রৌপ্য দ্রব করিতে ৯০০ ডিগ্রী উত্তাপের প্রয়োজন হয় পরন্তু সীসা ৬০০ ডিগ্রী উত্তাপে গলে। সীসা ৬০০ ডিগ্রীর কিছু কম উত্তাপ বিশিষ্ট হইলে জমিয়া আসিতে থাকে ও রূপাও ঠিক্ ঐরূপ ৯০০ ডিগ্রীর কিছু কম উত্তাপবিশিষ্ট হইলে জমিতে থাকে। বিলাতের প্যাটিসন নামক জনৈক সাহেব পরীক্ষা করিতে করিতে নিম্নলিখিত পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ইনি বলেন, ১০।১২টী বড় বড় কটাহ সারি সারি রাখিতে হয়, তন্মধ্যে একটীতে রূপা মিশ্রিত সীসা জ্বালাইতে হইবে। সীসা ধীরে ধীরে শীতল হইতে আরব্ধ হইয়া দানা বাঁধিয়া জমিতে থাকিবে। সেই সকল দানা বড় ঝাজরার দ্বারা তুলিয়া পরবর্ত্তী কটাহে রাখিবে। কিঞ্চিৎ রূপাও ঐ দানার সহিত চলিয়া যাইবে বটে, পরন্তু পুনর্ব্বার গালাইয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় কার্য্য করিলে সীসা একদিকে ও রূপা একদিকে চলিয়া যাইবে। সীসাসকল উঠাইয়া লইলে সেই সকল কটাহে যে সামান্য সীসার ভাগ অবশেষিত থাকে তাহাতেও অল্প বিস্তর রূপা থাকিয়া যায়। পরন্তু অভিহিত প্রক্রিয়া বারকতক প্রয়োগ করিলেই একদিকে প্রায় খাঁটী সীসা বেশী পরিমাণ ও

অপরদিকে অধিক রৌপ্য মিশ্রিত অল্প পরিমাণ সীসা স্থিত হইবে। উক্ত খাঁটী সীসা হইতে নল ও চাদর প্রস্তুত হইয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। অপর প্রান্তস্থিত অল্প পরিমাণ সীসা (যাহাতে অনেক রূপা থাকে) হইতে পুনর্ব্বার রূপা বাহির করা হইয়া থাকে।

গবাশ্বাদির অস্থিভস্ম দ্বারা মূছী প্রস্তুত করিয়া তাহা অগ্ন্যুত্তাপে রক্তবর্ণ করিয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত অধিক রৌপ্য মিশ্রিত সীসা অল্প অল্প করিয়া চাপাইতে হয় এবং বায়ুপ্রয়োগ যন্ত্রের দ্বারা তদুপরি অল্প অল্প বায়ু প্রেরণ করিতে হয়। এই সীসা ক্রমে ভূবায়ুস্থিত অক্‌সিজেন বা অম্লযান আশ্রয় করিবে। এই অম্লজান মিশ্রিত সীসা আস্তে আস্তে ঢালিয়া ফেলিয়া পুনর্ব্বার নূতন সীসা দিতে হয় এবং জাত অম্লজানের সহিত মিশ্রিত করিয়া ঢালিতে হয়। যতদূর সম্ভব অম্লজান মিশ্রিত সীসা ঢালা হইলে বাকি সীসা মূছীতে রাখিলে তাহা অম্লজানের সহিত মিশিয়া ক্রমে মূছীর গাত্রে আশ্রয় করিবে, এবং রূপা উপরে পড়িয়া থাকিবে। এই প্রকারের প্রস্তুত রূপা কিছু ভঙ্গপ্রবণ হয় বলিয়া উহার সহিত শতকরা ৫ ভাগ তামা মিশ্রিত করতঃ প্রস্তুতকারীরা তাহা বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। অপিচ, অম্লজান মিশ্রিত সীসা কয়লা সংযোগে ফারনেশে উত্তপ্ত করিলে তাহা অতি সহজে সীসায় পরিণত হইয়া যায়। ইহাতেও কিছু রূপা থাকিয়া যায় বলিয়া প্রস্তুতকারীরা প্যাটীসন সাহেবের আবিষ্কৃত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিয়া রূপা বাহির করণানন্তর রূপা ও সীসা পৃথক্‌রূপে বাজারে প্রেরণ করে।*

রত্নমালা।

(২৯)

বিরক্তঃ পরদারাসু নিস্পৃহঃ পরবস্তুষু।
দম্ভ মাৎসর্য্যহীনো যস্তেন লোকত্রয়ং জিতম্‌॥

ভাবার্থ—পর-দারে পর-দ্রব্যে নাহি প্রলোভন,
দম্ভ আর মাৎসর্য্য বিহীন যে জন;
ত্রিলোক বিজয়ী হন সেই মহাশয়,
শাস্ত্রের বচন ইহা—নাহিক সংশয়।

---

* নলিনচন্দ্র মিত্র নামধেয় জনৈক সীসার কারখানার প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট হইতে এই সকল বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

(৩০)

সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা॥

ভাবার্থ—গৃহ-কার্য্যে দক্ষা অতি,
পতিপ্রাণা পুত্রবতী
পতিব্রতা রমণী যে জন;
প্রকৃত পত্নীই তিনি,
নারীকুল-শিরোমণি
সীমন্তিনী কুলের ভূষণ।

(৩১)

অতিথিঃ পূজিতো যেন বিশ্বঞ্চ তেন পূজিতম্।
অতিথির্যস্য তুষ্টো হি তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্॥

ভাবার্থ—অতিথি পরম পূজ্য; পূজিলে তাহায়,
সারা বিশ্ব পূজনের ফল লাভ হয়।
অতিথি সম্প্রীত হ'লে স্বয়ং নারায়ণ
পরম সন্তুষ্ট হন—শাস্ত্রের বচন।

(৩২)

নবং বস্ত্রং নবং ছত্রং নব্যা স্ত্রী নূতনং গৃহম্।
সর্ব্বত্র নূতনং শস্তং সেবকান্নং পুরাতনম্॥

ভাবার্থ—নব্যানারী নবগৃহ ছত্র ও বসন
সর্ব্বত্র উত্তম সর্ব্বে; প্রশস্ত নূতন।
কেবল তণ্ডুল আর সেবক যে জন
হয় অতি হিতকারী হ'লে পুরাতন॥

(৩৩)

অশীতাস্তরবো মাঘে ফাল্গুনে পশুপক্ষিণৌ।
চৈত্রে জলচরাঃ সর্ব্বে বৈশাখে নরবানরৌ॥

ভাবার্থ—শীতে পায় ত্রাণ, মাঘে, পাদপনিকর;
ফাল্গুনেতে পশু পক্ষী; চৈত্রে জলচর।

আসিলে মাধব মাস, শীতে অতঃপর
পায় পরিত্রাণ যত নর ও বানর॥

(৩৪)

নামুত্র চ সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতি।
ন পত্নী তনয়ো জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলম্॥

ভাবার্থ—পিতা মাতা পত্নী পুত্র আর জ্ঞাতিজন
সহায় কেহই পরকালের না হন।
একমাত্র ধর্ম্ম যেই সুখের কারণ
পরলোকে সহায় ও সহচর হন॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ।

সৌন্দর্য্য।

"These are thy Glorious works, Parent of good,
Almighty! Thine this Universal frame,
Thus wondrous fair, Thyself how wondrous then?
Unspeakable—"

—*Milton's Paradise Lost.*

প্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা বুঝিতে পারি যে, সেই জগৎস্রষ্টার কি অনুপম সৌন্দর্য্য। সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ের সুন্দর অংশ লইয়া, এই অসীম বিশ্ব-সৌন্দর্য্যে দশদিক পূর্ণ হইয়া আছে। মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, তাঁহার রূপ ও সৌন্দর্য্য পাইয়াই এত সুন্দর। ঐ যে বিবিধ বর্ণের, ক্ষুদ্র সুন্দর প্রজাপতিটী উড়িতেছে, উহার ক্ষুদ্র শরীরে, ক্ষুদ্র প্রাণে, কত সৌন্দর্য্য, কত সুষমা। দিগন্তব্যাপী আকাশের কোলে কত রঙ্গে কত বর্ণে খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি নানা আকৃতি ধারণ করিয়া, সৌন্দর্য্যময়ের অনন্ত সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিতেছে। এই যে উন্নত গিরিরাজ সদর্পে শিরোন্নত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ইহাকে দেখিলে মনে হয়, বুঝি মহাযোগি মহেশ্বর মহাযোগে মগ্ন হইয়া সেই মহাপুরুষের ধ্যান করিতেছেন। এই ক্ষুদ্রকায়া স্রোতস্বিনীগুলি মৃদু মন্দ মন্থর প্রবাহিতা হইয়া বসুধা মাতার ক্রোড়ে কেমন শোভা পাইতেছে! প্রতিদিনই উষার উদয়ে এই জগৎ অভাবনীয় কোমল-মধুর সৌন্দর্য্য ধারণ করে,

সে সময়ে কত কোমল-কলি ফুটিয়া উঠে। কত পাখীই গানে জগৎ মাতাইয়া তুলে। সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ের বিকাস যেন সর্ব্ব বস্তুতেই প্রতিভাত হইতে থাকে। তখনই মনে হয়—

ভুবন মোহিত করি গাইছ বিপিনে কারে।
বল কে সে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিছ যাঁরে॥
কমল নয়ন মেলি কার পানে চেয়ে আছ।
কার তরে ঝরিতেছে প্রেম অশ্রু নিরমল॥

বিশ্বের সৌন্দর্য্য দেখিয়া, সেই সৌন্দর্য্যময়ের চরণে প্রাণ ছুটিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হয়। যাঁহার সুষমা পাইয়া, এই বিশ্ব-সংসার এত সুন্দর হইয়াছে, আমরা, ভক্তি গদ চিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করি। এই যে ফুলটি ফুটিয়াছে, এটি কাহার সুষমায় গঠিত? এই যে পিক-কাকলি কূজিত হইতেছে, এ কাহার মধুস্বর পাইয়া? এই বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত পতঙ্গগুলি কাহার চিত্রবিচিত্র সৌন্দর্য্যে নির্ম্মিত? ইহাতে হৃদয় একই উত্তর দেয় যে, এ সকলই সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ের অনন্ত শোভনা প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য্য; যিনি জগতে এ সকল সৌন্দর্য্য উপভোগ না করিলেন, তাঁহার জন্মই বৃথা। সেই পরম সৌন্দর্য্যময় মহাপুরুষ আমাদের জন্য জগতে কত সৌন্দর্য্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। পুষ্পের বর্ণ সৌন্দর্য্যে, বিহগে, তরুলতার নয়ন মুগ্ধকর হিল্লোলে, সুখস্পর্শ সমীরণে আমরা কত মাধুরীই না উপভোগ করি। তবে, আমরা অন্ধ; তাই সেই সৌন্দর্য্যময়,যিনি অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার,তাঁহাকে বুঝিতে পারি না। তিনি অসীম এবং সসীম। তিনি স্বগুণ ও নির্গুণ। তাঁহার সহিত এই সৌন্দর্য্যময় জগত যে চির সংলিপ্ত এবং সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতির সহিত পুরুষের যে অভেদ সংযোগ, তাহা আমরা দেখিয়াও দেখিতে পাই না। তিনি সর্ব্বত্রই নিত্য জাগ্রত রহিয়াছেন।

এই জন্যই গীতাকার বলিয়াছেন—

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখম্,
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমাল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।

হে সৌন্দর্য্যময়! জড় জগতে ও জীবজগতে, তোমার কত রূপের বিকাশই দেখিতে পাই। তুমি আদিত্য রূপে উদিত হইয়া, জগৎকে আলোক প্রদান করিতেছ। নিশার সুনীল আকাশে সুধাকর রূপে উদিত হইয়া কৌমুদীরূপে সুধা-ধারা বর্ষণ করিয়া, জীব-হৃদয়ে শান্তি দিতেছ। বায়ুরূপে জীবদেহে থাকিয়া শ্বাস,প্রশ্বাস বহিতেছ ও সমীরণ রূপে প্রবহমান হইয়া জীব-দেহের শ্রান্তি ক্লান্তি

দূর করিতেছ, এবং স্রোতস্বিনীতে তোয়ঃরূপে অবতীর্ণ হইয়া জগৎকে রক্ষা করিতেছ। তোমার বিকাশ যে সর্ব্ব বস্তুতেই, তোমার চিদাংশ যে সর্ব্বব্যাপী, তাহা আমরা বুঝিয়াও বুঝি না।

তুমি কার্য্যের কারণ, আধারের আধেয়; ভ্রান্তিবশে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না; আর কেই বা তোমার স্বরূপ অবগত হইতে পারে? আমরা যাহা ইচ্ছা করি, যাহা কামনা করি, তুমি পূর্ণ না করিলে তাহা কিরূপে পূর্ণ হইতে পারে।

গীতা বলিয়াছেন,—

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ণ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥

আমরা তাহা না বুঝিয়া, নিজ কর্ত্তৃত্বের অভিমান করিয়া থাকি এবং সেই কর্ত্তৃত্বের প্রসারণ করিতে প্রয়াস পাই। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যময় যে সর্ব্ব কার্য্যের প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তক, আর আমরা কেবল সাক্ষী মাত্র, ইহা আদৌ আমাদের বোধগম্য হয় না। তিনি যে অন্তর্জগতে, বহির্জগতে, মনোজগতে, জীবজগতে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিতেছেন তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না। তিনি, প্রকৃতিপুরুষ রূপে সংমিলিত হইয়া এই বিশ্ব রচনা করিতেছেন। ইনিই সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করিতেছেন, বিষ্ণুরূপে পালন করিতেছেন ও শিবরূপে সংহার করিতেছেন। সত্য শৌচ তপঃ দম আর্জ্জব দয়া প্রীতি ভক্তি স্নেহ মমতা সকলই তাঁহা হইতে উদ্ভূত। সকল ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য এবং সকল বস্তুতে আংশিকভাবে বিরাজিত; প্রতি বস্তুতেই তাঁহারই চিদ্ অণু বিদ্যমান। জগতে, পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র কন্যা পত্নী প্রভৃতি সংসারের যাবদীয় বন্ধন এবং মুক্তি সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সম্পাদিত হইতেছে। সুতরাং সকলই তিনি; আমরা তাঁহারই ইচ্ছায় পরিচালিত হইতেছি, আমাদের কোন কর্ত্তৃত্ব অভিমান থাকিতে পারে না।

চৈতন্য চরিতামৃতে লেখা আছে—

আপন ইচ্ছায় জীব শতকর্ম্ম করে।
কৃষ্ণ ইচ্ছা বিনে তার একটি না স্ফুরে।

গীতাও বলিয়াছেন—

অহংহি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেবচঃ

সেই সৌন্দর্য্যময় ব্রহ্মই স্বপ্রকাশ। তাঁহার অসীম শক্তির ও ক্ষমতার ইয়ত্বা

করে কাহার সাধ্য। তিনি আনন্দাংশে হ্লাদিনী শক্তি, সদংশে সন্ধিনী ও চিদাংশে সম্বিৎশক্তি। তাঁহার চিৎশক্তি বা পরাশক্তিই প্রকাশময়ী। মায়া অবিদ্যাশক্তি, মোহ বা জড়তা; তাহার দৈবীশক্তিই সংস্কার। তিনি অব্যক্ত হইলেও তাঁহার শক্তির একাংশ সর্ব্ববিশ্ব চরাচরে পরিব্যক্ত; আমরা মোহ বশতঃ, ভ্রমবশতঃ দেহে আত্মবুদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব জন্মাইয়া, নিজের কর্ত্তৃত্ব অভিমান করিতেছি, কিন্তু সেই নিখিল জগতের সৌন্দর্য্যময়ের কৃপা ব্যতীত আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির অনুমাত্র বিকাশ হয় না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে বর্ণিত আছে,—আমরা যন্ত্র তিনি যন্ত্রী, আমরা গাড়ী তিনি ইঞ্জীনিয়ার, আমাদের নেতা চালক সকলই তিনি, মানব জীবনে যত বৃত্তি দিয়াছেন, সে সকল বৃত্তির উৎকর্ষ অপকর্ষ, তাঁহার দয়ায়ই সাধিত হইতেছে। তিনি আমাদের পিতার পিতা, মাতার মাতা, গুরুর গুরু, তিনি এই অনন্ত বিশ্বের আধারভূত। অতএব আইস, আমরা সেই সৌন্দর্য্যময় হরির চরণ বন্দনা করিয়া, ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করি, আর বলি,—

গতির্ভর্ত্তা প্রভুসাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ং।

শ্রীমতী "নীতি-কবিতা" রচয়িত্রী।

ছলনা।

লীলাময় হরি! একি লীলা তব,
আমি যে পারি না বুঝিতে;
জীবনের দিন হয়ে এল ক্ষীণ
তোমায় খুঁজিতে খুঁজিতে!
নব নব পথে বৃথা ফিরিলাম,
নব নব গাথা বৃথা রচিলাম,
নব নব কলি বৃথা চয়িলাম
যতনে তোমায় পূজিতে!
তিলেকের তরে আজীবন ধরে
যদি বা নারিনু বুঝিতে!

দিলে কত সুখ, দিলে কত হাসি,
সকল জীবন ভরিয়া—
যশঃ মান ভবে বিকায়ে নীরবে
তুলিলে 'মানুষ' করিয়া!
যাহা চাহি নাই তাহা পাইলাম,
যাহা ভাবি নাই তাহা সাধিলাম,
সোণা-করা ঘাটে তরী বাঁধিলাম,
অকূল সাগর তরিয়া!
তুমি দিলে সব হরষ গৌরব
নিজে গেলে শুধু সরিয়া!

একি গো দারুণ ছলনার জালে
আমায় ফেলিলে ঘেরিয়া—
আলোক মাঝার নিবিড় আঁধার,
কাঁদে মন আজি হেরিয়া!
আমার সকল বুকের ভিতরে
অস্ফুরণ-তৃষা মরিছে গুমরে,
নিমেষে নিমেষে কেবা হা হা করে
আশা-সাধ সব বেড়িয়া!
নিখিল সংসার ঢাকিল আঁধার
তোমা ওগো নাহি হেরিয়া!

আমারে কি হরি এই মত করি'
চিরদিন শুধু ছলিবে—
মিলন-আকুল জীবন-মুকুল
অকাতরে পদে দলিবে!
এ দারুণ খেলা ভেঙে দাও আজ,
সুখের স্বপনে হান তব বাজ,
তুমি এস শুধু হৃদি-অধিরাজ,
গোপন মরম খুলিবে!
এই মত করি আমারে হে হরি,
কত কাল বল ছলিবে!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

মক্কাতীর্থ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিত অংশের পর।)

তৃতীয় স্তবক।

'তারিখে আস্‌মায়ী' নামক ইতিহাসের সুনিপুণ গ্রন্থকার আরবের বর্ব্বর যুগের যে সমস্ত রোম-হর্ষণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে মহা-বিক্রান্ত কোরেশ বংশের নৃশংস-বৃত্ততার চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। উন্মার্গ-চারী কোরেশ বংশীয়েরা দীর্ঘকাল হইতে আপনাদের পর্ব্বত ও মরুময় রাজত্বে, সিংহের ন্যায় রুদ্রমূর্ত্তিতে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন কোন জাতি তাঁহাদিগকে যুদ্ধে বা কৌশলে করায়ত্ত করিতে সমর্থ হয় নাই। যৎকালে দুরাত্মা রোমীয় খৃষ্টান-গণের দুরাচরণে য়িহুদী জাতি স্বরাজ্য পেলাষ্টাইন্ পরিত্যাগ করিয়া, আরবের প্রসাদ-ভিখারী হয়েন,সেই সময়ে খৃষ্টানেরা আরবের অপ্রতিহত তেজোবিক্রম মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিল। তজ্জন্য কিয়দ্দিন পরে খৃষ্টীয় ধর্ম্মাচার্য্য চতুর-চূড়ামণি সেণ্টপল, বাণিজ্য ও ধর্ম্ম-প্রচারার্থ, আরবে প্রবিষ্ট হয়েন; কিন্তু সে বার তাঁহাকে বিফল মনোরথ হইতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। কালক্রমে ঔপনিবেশিক খৃষ্টান-গণ ও য়িহুদীরা অনেকেশ্বর-বাদের প্রশ্রয় দিয়া পৌত্তলিকতায় ও ভ্রমান্ধতায় আরবকে অবনতির অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

কঠোর-হৃদয় কোরেশ জাতি সাধারণতঃ পৈশাচিক শোণিতোৎসবের পক্ষপাতী ছিল। তাহারা হিজরী সনের শতাধিক বৎসর পূর্ব্ব হইতে, দশম হিজরী পর্য্যন্ত বহু-বর্ষ-ব্যাপী মহা মহা যুদ্ধে আত্মদ্রোহিতার নারকীয় অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহাদের তাৎকালিক অশান্তি-উৎপাদিকা সামাজিক রীতিনীতির ভবিতব্যতা স্মৃতিপথে আবির্ভূত হইলে আতঙ্কে কাহার না প্রাণ শিহরিয়া উঠে ? স্ত্রী-পুরুষের জঘন্য স্বেচ্ছাচারিতা, নরহত্যা, পৈশাচী দাস ব্যবসায় এবং সুরাপ্রিয়তাদিতে সকলেই শয়তান-চরিত্র হইয়াছিল। যদি কোরেশ বংশের অন্ততঃ ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দেও হজরত জন্ম পরিগ্রহ না করিতেন, যদি আরবের মরুবক্ষঃ হইতে একেশ্বর-বাদিতার অমৃতায়মান 'কলেমা' প্রতিধ্বনিত না হইত, যদি হেজাজের অভ্রভেদী গিরি শৃঙ্গে সাম্য ও মৈত্রীর বৈজয়িক পতাকা শান্তির বাতাসে ক্রীড়া না করিত, তবে মতয়র্-রবের অস্তিত্ব এত দিন রণভূমির শোণিত-কর্দ্দমে বিলুপ্ত হইয়া যাইত, সন্দেহ নাই।

শৈশবকালে হজরতের মাতৃ পিতৃ বিয়োগ হওয়ায়, তিনি পিতামহ আব্দল মত্তলব ও তৎপরে পিতৃব্য আবুতালেবের আনুকূল্যে প্রতিপালিত হন। আবুতালেব, মক্কা মধ্যে একজন সম্পত্তিশালী বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি হজরতকে পরম স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, হজরত পিতৃব্যের সহিত সর্ব্বদা নানা স্থানে বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্য গমনাগমন করিতেন। তৎকালে তাঁহার অলোকসামান্য গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া প্রতিবাসি কোরেশগণ তাঁহাকে 'আমিন' অর্থাৎ সত্যব্রত বলিয়া সমাদর-সম্ভাষণ করিত। অতঃপর, স্বর্গীয় আবুহালার বিধবা পত্নী সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভবা ক্ষমতাবতী খদিজাদেবী হজরতের মহা চরিত্রৈশ্বর্য্যে আকৃষ্টা হইয়া, তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। তখন হজরতের বয়স পঞ্চ বিংশতি বর্ষ হইয়াছিল। এই বিবাহে হজরত বিলক্ষণ ধনশালী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সাংসারিক সমারোহে আদৌ পদার্পণ করেন নাই, তিনি অনশন-ক্লিষ্ট ভিখারীর ন্যায় যৎসামান্য খোরমারসাদি আহার্য্য এবং তৃণরচিত শয্যা পরিগ্রহ দ্বারা, হৃদয়ে পরম শান্তি-সুখ অনুভব করিতেন। চত্বারিংশৎ বৎসর বয়সে 'প্রেরিতত্ব' লাভ করিয়া তিনি আধ্যাত্মিকতায় অভূতপূর্ব্ব হৃদয়বল প্রাপ্ত হয়েন। সেই সময়ে সাধ্বী খদিজা দেবীই সর্ব্বপ্রথমে এস্লামের পবিত্র মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

হজরত সর্ব্বজনসমক্ষে ক্রমান্বয়ে আপনাকে 'প্রেরিত পুরুষ' বলিয়া প্রকাশ করিলে, মক্কায় মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। পৌত্তলিকতার মোহমূলক

বৃথাধর্ম্মাভিমানে সাধারণতঃ কোরেশগণ কায়মনোবাক্যে তাঁহার বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইল। হজরত স্বজাতির দারুণ অত্যাচারে নিরুদ্যম হইলেন না ; ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক, সমভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি যেমন অভিনব এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারে তৎপর ছিলেন, বর্ব্বর আরবেরাও পুরাতনের মায়া পরিত্যাগে তেমনই অসম্মত ছিল। তিনি স্থির-বিক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; এ দিকে কাফেরগণও আত্মমর্য্যাদা-রক্ষণে উন্মত্ত-বীর্য্য হইল। উভয়ে স্ব স্ব শক্তিপ্রভাবে উভয়কে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করিতেছিল। হজরত এস্‌লামের তীব্রালোকে সত্য পথ প্রদর্শন করিতেছিলেন। কাফেরগণও অল্পাধিক পরিমাণে স্বীয় পৈতৃক ধর্ম্ম বিশ্বাসে সন্দিহান হইয়া, ইতস্ততঃ চাহিতেছিল। এককালে আরবে সাদ্দাদ্, সমুদ, নমরুদ প্রভৃতির দুর্দ্দম রাজশক্তি তদানীন্তন নবাবির্ভূত নবীবৃন্দের বীর্য্যাগ্নির বিস্ফুরণে তিরোহিত হইয়াছিল! এসলাম-শক্তির অনিবার্য্যবেগে এ সময়ে অধিকাংশ যুবকের হৃদয়স্থিত অন্ধ বিশ্বাসের মগ্ন-আসন রেণু রেণু হইয়া উগ্র দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সহিত উড়িয়া যাইতে লাগিল। এস্‌লামের পবিত্র ছায়া সংস্পর্শে ক্রমে ক্রমে মোর্ত্তজা, হাম্‌জা, ফারুক, গণি ও বেলাল প্রভৃতির আত্মশক্তির রমণীয়তা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহারা এস্‌লামের আশ্রিত হইলে, তাঁহাদের মৌলিক চিন্তা ও গবেষণা নূতন ধর্ম্ম নীতি বহন করিয়া সর্ব্বত্র বিচ্ছুরিত হইয়া পড়িল। তাহাতে আরবের ধর্ম্ম নৈতিক ইতিহাসের রূপান্তর সাধনের দ্বার খুলিয়া গেল।

প্রাচীনেরা ইহা দেখিয়া শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইল। অবশেষে সকলে জিঘাংসা বৃত্তির অনুসরণ করিল। যে নিষ্ঠুর জাতি অপত্যবিনাশে আনন্দিত, অসংখ্য ঈশ্বরের মন যোগাইতে যাহাদের বিবেক শত সহস্রধা বিভক্ত, যাহারা জীব প্রীতি দীনতা ও তিতিক্ষাদির ধার ধারে না, যাহাদের কুটিল নেত্রে নরকাগ্নি পরিস্ফুট, সেই অসভ্য জাতির নীতিহীন ধর্ম্মোন্মত্ততার সমক্ষে অবস্থিতি করা, হজরত ন্যায়সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না। তিনি ৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই তারিখে গুপ্তভাবে সবান্ধবে মদিনায় যাত্রা করিলেন।

ঈশ্বর কৃপায় তাঁহারা সসম্ভ্রমে মদিনায় পরিগৃহীত হইয়াছিলেন। মধ্যে কতিপয় অপরিণামদর্শী য়িহুদী ও পৌত্তলিক, তাঁহাদের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল বটে, কিন্তু মদিনার প্রধানেরা এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করায়, তাহা প্রশমিত হইয়া গিয়াছিল। এ দিকে প্রতিহিংসাপরায়ণ আবুসোফিয়ান প্রভৃতি মক্কার জ্যেষ্ঠ পাণ্ডারা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সসৈন্যে মদিনাভিমুখে

ধাবিত হইয়াছিল। অনন্তর অহোদ ও খায়বর প্রভৃতি স্থানে উভয় পক্ষে কয়েকটী ঘোরতর যুদ্ধ হইয়া গেল ; কিন্তু কাফেরগণ নূতন শক্তির শোণিত প্রপাতে স্নাত হইতে না পারিয়া আপনাদের প্রাচীন বিশ্বাসের কিছুই ধরিয়া রাখিতে পারগ হইল না। তাহারা যতদূর আগাইয়া ছিল, তাহা শুধু স্বধর্ম্মের মায়ায় মাত্র। অল্পকাল মধ্যে সকলেই এস্‌লামের গলগ্রহ হইয়া পড়িল। মক্কায় সত্যের অমৃতস্রোতঃ নির্ম্মল বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। শুভ সময়ে আরবে জ্ঞানযুগের অবতারণা হইল। আপামর সকলেই কোরাণের বিচিত্র শিক্ষায় পার্থিব অমরতা সাধনের দুর্গম পথে অচিন্তিতপূর্ব্ব আনন্দোৎসাহ সহকারে ছুটিয়া চলিল।

অনন্তর ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জুন, হজরত ৬৩ বৎসর বয়সে মদিনা হইতে পরলোক যাত্রা করেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ, মুহূর্ত্ত মধ্যে, সকল স্থান নিদারুণ শোকোচ্ছ্বাসে উদ্বেল করিয়া তুলিল। অসংখ্য ভক্ত, বাস্প-ভারাক্রান্ত নয়নে জন্মের মত তাঁহার মুখখানি দর্শন করিতে সমাগত হইতে লাগিল। আস্‌হাব ও পৌরবর্গ তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যাপৃত হইতে লাগিলেন। এই ভীষণ ক্ষণে মগিরা-বেন-সায়াবা সকিফাস্থিত আন্‌সার-বৃন্দের মহা দুরভিসন্ধি আস্‌হাবগণ সমক্ষে পরিব্যক্ত করিলেন। সকলেই শুনিলেন, আন্‌সারগণ সায়াদ-বেন্-আবাদাকে এস্‌লামের রাজপাটে বরণ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছেন। তৎক্ষণাৎ প্রধান প্রধান আস্‌হাবগণ কৌশলে তাঁহাদের পাপাভিসন্ধির প্রতিবিঘ্ন সম্পাদনে সকিফা যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সকিফায় উপস্থিত হইয়া আন্‌সারদিগকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং তাহাদিগকে নিরপেক্ষভাবে খলিফা নির্ব্বাচনে বাধ্য করিলেন। সেইকালে আন্‌সারগণ অনেক বাদানুবাদের পরে মহাত্মা আবুবকর সিদ্দিককে (রাজিঃ) খলিফাপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। অনন্তর সকলে মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক হজরতকে সমাধিস্থ করিলেন।

হজরত আলী মোর্ত্তজা।

হজরত এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার কালে সর্ব্বাগ্রে পূজনীয়া খদিজাবিবিকে সত্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। অতঃপর তাঁহার পিতৃব্য-পুত্র বীর পুরুষ মহাত্মা আলির (রাজিঃ) হৃদয়ে এস্‌লাম ধর্ম্মানুরাগ উত্তেজিত হয়। তিনি এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম প্রচারে অমানুষিক আত্মত্যাগ ও অমায়িকতা দেখাইয়া-ছিলেন। ন্যায়তঃ তিনিই এস্‌লামীয় সিংহাসনের প্রকৃত অধিকারী ছিলেন।

প্রাচীন 'আয়িনী' নামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, মহাত্মা সিদ্দিক সিংহাসনারোহণ করিলে কুটিল প্রকৃতি আবুসোফিয়ান, মহাবীর মোর্ত্তজাকে তাঁহার জীবননাশের পরামর্শ প্রদান করে, কিন্তু তাহাতে তিনি অতিশয় ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি এস্‌লাম সাম্রাজ্যের চতুর্থ খলিফা; তাঁহার শাসনকাল ৫ বৎসর ৬ মাস। একদা তিনি কুফার মস্‌জেদে প্রাভাতিক উপাসনায় সমাবিষ্ট ছিলেন, সেই সময়ে পিশাচ প্রকৃতি আব্‌দর রহমান সুতীক্ষ্ণ কৃপাণাঘাতে তাঁহার বধ সাধন করে।

হজরত আবুবকর সিদ্দিক।

আন্‌সারগণ মহাত্মা সিদ্দিকে খলিফা নির্ব্বাচন করিলে ধর্ম্মাত্মা ফারুক তাঁহার কর ধারণ করিয়া প্রথম অধীনতা স্বীকার করেন। মহাত্মা সিদ্দিক হজরতের জন্মগ্রহণের দুই বৎসর পরে ভূমিষ্ঠ হয়েন। তাঁহার প্রকৃত নাম আব্‌দল আতীক। কিন্তু তিনি আবুবকর অর্থাৎ 'বকরের পিতা' এই সম্পর্কগত নামেই পরিচিত ছিলেন। পরিণত বয়স্কদিগের মধ্যে প্রথমে তিনিই এস্‌লামের অনুগত হয়েন। 'তাজ-কেরাতল-কেরাম' নামক সুবিখ্যাত ইতিহাসে তাঁহার শাসন সময়ের বিশৃঙ্খলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মক্কা, মদিনা ও তায়েফ প্রভৃতি কতিপয় নগরীতে তাঁহার আধিপত্য ছিল। তাঁহার রাজত্ব কাল ২ বৎসর ৩ মাস মাত্র।

হজরত ওমর ফারুক।

পাপাশয় আবুলুলুর অস্ত্রাঘাতে আহত হইয়া, মহাত্মা ওমরফারুক (রাজিঃ) মুমূর্ষু অবস্থায় অতীব উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করিতেছিলেন। তদ্দৃষ্টে তাঁহার পুত্র আব্‌দল্লা দীনভাবে তাঁহাকে বলিলেন, "পিতঃ! এরূপ গভীর অশান্তি প্রকাশ করিতেছেন কেন? আপনি ত হজরতের মহামন্ত্র সাধনার্থ হৃদয়-শোণিত দানে পশ্চাৎপদ ছিলেন না! সংগ্রামে বীরত্ব এবং তদনুসঙ্গিক ন্যায় ও নিষ্ঠার অনুরক্ত ছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে আপনি মনস্তত্ত্ব বিশারদ এবং অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণ নিবারণেও ত অদ্বিতীয় ছিলেন, তবে বৃথা চলচ্চিত্ত হইতেছেন কেন? নিশ্চিন্ত থাকুন।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন,—"বৎস! আমার জীবন ত্রিবিধ অধ্যায়ে সমাপ্ত-প্রায়। আত্মিক জীবনের (রুহানি জেন্দেগানী) পরিণতি কি, জানি না। প্রথমতঃ হজরতকে শবে পরিণত করিতে বীভৎসরূপে অস্ত্র চালনা করিয়াছি; দ্বিতীয়তঃ এতাদৃশী পাশববৃত্তির অবসানে তাঁহার আজ্ঞাবহ ও বন্ধুরূপে পরিগণিত হইয়াছি; তৃতীয়তঃ তাঁহার মরলীলা অবসিত

হইলে, এস্লামের প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্তির জন্য ভীষণ সংগ্রামে কতই না নরশোণিতে এই দশ বৎসর তিন মাস পর্য্যন্ত ধরিত্রী রঞ্জিত করিয়াছি! বৎস! এই সব চিন্তাই আমার হৃৎস্পৃক্ যন্ত্রণার মূলীভূত কারণ।"

মহাত্মা এব্নে ওমর।

মহামতি জাবের বলিতেন যে, এব্নে ওমরের ন্যায় তপঃপ্রভাব সম্পন্ন, সংসারবিরাগী, স্বাধীনচেতা ও ধর্ম্মগত-প্রাণ ব্যক্তি আমাদের মধ্যে আর কেহই নাই। মহাত্মা এব্নে ওমর তাঁহার পিতার সঙ্গে বাল্যকালেই এস্লামে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

হজরত ওস্মান গণি।

মহাত্মা ওস্মান গণি (রাজিঃ) হজরতকে বিনাশ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলে, তাঁহার সাদী নাম্নী এক বিদুষী আত্মীয়া তাঁহাকে এসলামের শ্রেষ্ঠতার বিষয় জ্ঞাপন করেন। তৎপরে তিনি মহাত্মা আবুবকরের (রাজিঃ) নিকট সবিশেষ বর্ণন করিয়া এস্লাম ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়েন এবং এস্লাম প্রচারের জন্য হজরতের অনুবর্ত্তী হয়েন। তিনি ১১ বৎসর ৬ মাস পর্য্যন্ত মোহাম্মদীয় সিংহাসন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

মহাত্মা আব্বাস।

এমনাধিপতি দুর্ব্বৃত্ত আব্‌রাহার মক্কা আক্রমণের পূর্ব্বে, পরম নিষ্ঠাবান আব্বাস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মোসল্মান হইবার পূর্ব্বে কাবামন্দিরের তত্ত্বাবধায়ক এবং কোরেশীয় দলপতি ছিলেন। মক্কায় এস্লামধর্ম্ম আবির্ভূত হইলে, তাহাতে প্রথমেই তাঁহার প্রতীতি জন্মিয়া ছিল; কিন্তু স্বজাতির নির্য্যাতন ভয়ে তখন সে ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। অতঃপর এস্লামের বিজয়কালে তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হজরতের মতানুবর্ত্তী হয়েন এবং ৮২ জন দাসকে স্বাধীনতা প্রদান করেন। তাঁহার দ্বারা এস্লাম ধর্ম্মপ্রচারের অনেক সুবিধা হইয়াছিল।

মহাত্মা হাম্জা।

মহানুভব হাম্জা হজরতের পিতৃব্য ছিলেন। একদা তিনি মৃগয়ার জন্য স্থানান্তরিত হয়েন। ঘটনা ক্রমে সেইদিন দানব প্রকৃতি আবুজেহল হজরতের প্রতি অমানুষী অত্যাচার করে। তৎপরে পবিত্রচেতা হাম্জা তদ্বিবরণ অবগত হইয়া মহা ক্রোধে আবুজেহলকে শরবিদ্ধ করেন এবং স্বয়ং এস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন। তিনি ধর্ম্মের জন্য অহুদের যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

এইরূপে কি মক্কাবাসী, কি দূরদেশবাসী, সকলেই এস্‌লামের প্রসাদ-প্রত্যাশী হইয়া হজরতের চরণে আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলেন। য়িহুদী জাতীয় সলামের পুত্র আব্দুল্লা এবং রোমীয় ও আফ্রিকায় অনেক খ্রীষ্টান পুরুষ বান্ধবে মক্কায় আগমন-পূর্ব্বক এস্লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারিখে মারব প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার বিচিত্র জীবনীর বিবরণ বিশদভাবে পরিবর্ণিত আছে। (ক্রমশঃ।)

সেখ আহাম্মদ সোবাহান।

সাধ।

(১)

বিশাল আকাশে, অতীব উল্লাসে,
নিয়ত নিরখি যাঁ'রে ;
নিকুঞ্জ-নিলয়ে, কুসুম-হৃদয়ে,
নেহারি সতত তাঁ'রে।
চন্দ্র চন্দ্রিকায়, গ্রহ তারাদলে,
তাঁহাকে দেখিতে পাই ;
অরণ্যে আরামে, পাদপ লতায়,
নিরখি নিখিল ঠাঁই।
তীব্র মরুমাঝে, নদ নদী-নীরে,
অচল, জঙ্গল, হ্রদে,
হেরি অহরহ, বিদ্যমান তিনি
কুবলয় কোকনদে।
শ্মশানে সৈকতে, কান্তারে প্রান্তরে,
খাল বিল সরোবরে,
নিরখি বিস্ময়ে, বিমুগ্ধ অন্তরে,
সদা প্রাণ চাহে যাঁ'রে।
অনন্ত বিমানে, বিশাল ধরায়,
পদার্থ নিবহে যিনি
স্থিত পূর্ণভাবে, দিবা বিভাবরী,
কে কহিবে কে বা তিনি ?
নাহিক আকার; নিত্য নিরাকার ;
বিকার রহিত জন ;
ভক্ত ব্রাত-তরে, বহু মূর্ত্তিধারী
স্বকীয় স্বভাবে হন।

মীমাংসা অতীত স্বরূপ তাঁহার
জ্ঞান-অগোচর যাহা ;
আদি মধ্য অন্ত রহিত পুরুষ,
শুনি বেদাগমে তাহা।
বান্ধব, সুহৃদ, সখা, মিত্র অরি
নাহি কেহ কোথা' তাঁর ;
কিন্তু অনুক্ষণ. সুখ শান্তি দাতা,
বিশ্বে তিনি সবাকার।
চাহে প্রাণ সদা, মিলিতে তাঁহায় ;
তিনি যে জীবের গতি।
প্রাণি নিকরের সুখের কারণ ;
কৃপাসিন্ধু বিশ্বপতি।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে, সৃষ্টি সমাবায়
সে মোহন-রূপ-ছায়া ;
নিত্য নিরঞ্জন. সৃষ্টির অতীত—
প্রপঞ্চ তাঁহার মায়া।
জানিলে শাশ্বতে, ঘুচে মায়া মোহ ;
পাপ পুণ্য নাহি রয় ;
কু-বর্গ ত্রিতাপ, ধ্বংস হয় মূলে
যে তাঁ'র শরণ লয়।

(২)

ভক্তি-শতদলে, প্রেম পূত নীরে,
পূজি' হৃদে প্রেমময়,
মিলিব অন্তিমে, পদ-প্রান্তে তাঁ'র ;
'সাধ' যেন পূর্ণ হয়।

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

ভ্রম সংশোধন।

দীর্ঘনিদ্রা ও যোগ

(২)

১ম বর্ষের ৪৫১ পৃষ্ঠা, ৩ পংক্তি, "দীর্ঘ" শব্দের পর "নিদ্রারই ক্ষণিক"-যোগ হইবে।

ঐ পৃষ্ঠা, ৪ পংক্তি, "নিদ্রারই ক্ষণিক" উঠিয়া যাইবে।

ঐ পৃষ্ঠা, ৫ পংক্তি, "পূর্ব্ববর্ত্তী" শব্দের অগ্রে "জাগ্রত অবস্থার"-যোগ হইবে।

ঐ পৃষ্ঠা, ২১ এবং ২২ পংক্তি, "মর্ম্ম" শব্দকে "কর্ম্ম" পড়িতে হইবে।

অঙ্কুর।

বীজাদঙ্কুরনিষ্পত্তিরঙ্কুরাদ্বৃক্ষসম্ভবঃ।
ফলপ্রদোভবেদ্বৃক্ষইত্থমাশাক্রমোমতঃ॥

২য় বর্ষ। ফাল্গুন, ১৩১৩। [২য় সংখ্যা।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান।

(৪)

ইতঃপূর্ব্বে আমরা সাধারণ ভাবে স্পেন্‌সারের মতের সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, তাঁহার দর্শনের ভিত্তি অত্যন্ত কাঁচা জমির উপর স্থাপিত। এখন আমরা তাঁহার দুই চারিটি বিশেষ বিশেষ মত পরীক্ষা করিয়া দেখাইব যে, এই ভূমির উপর স্থাপিত তাঁহার দর্শনমন্দির কত ক্ষণভঙ্গুর।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, স্পেন্‌সার জগদতীত এক মহাশক্তির অস্তিত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু এই শক্তিকে তিনি কোনও রূপেই জ্ঞানের বিষয় বলিতে প্রস্তুত নহেন। এই মধ্যপথ অবলম্বন করাতে তাঁহার যে কিরূপ গুরুতর ভ্রান্তি-সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার নিজের লেখা হইতেই তৎসম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। তিনি এক জায়গায় বলিতেছেন, "There is an infinite and eternal energy from which every thing proceeds". কেহ কি স্পেন্‌সারের মুখে তদ্‌বর্ণিত মহাশক্তির এই পরিচয় পাইয়া আর তাঁহাকে অজ্ঞেয়বাদী বলিয়া মনে করিতে পারেন ? একজন বিশ্বাসী ভক্ত কি এক নিশ্বাসে তাঁহার ইষ্টদেবতার উপর ইহা অপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্য আরোপ করেন? তিনি অনাদি ও অনন্ত, তিনি শক্তিস্বরূপ, তাঁহা হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। আর বেশী কিছু চাই না। স্পেন্‌সারের অজ্ঞেয়তাবাদ বিনাশে ও তাঁহাকে জ্ঞেয়বাদী প্রমাণ করিতে ইহাই প্রচুর। ঋষিও তো ব্রহ্মসত্তা সম্বন্ধে ঐ

কথাই বলিতেছেন। তিনি বলেন সংস্কৃতে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে", "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্", আর স্পেন্সার বলেন ইংরাজীতে—"There is an infinite and eternal energy from which every thing proceeds*,এই যা তফাৎ, নতুবা অন্য কোনই বিভিন্নতা নাই। বরং আমাদের ভয় হয়, এইরূপ সাদৃশ্য দেখিয়া কোন Orientalist কোন্ দিন বলিয়া ফেলিবেন যে, উপনিষদের ঋষি স্পেন্সারের নিকট হইতে ঐ ভাব গ্রহণ করিয়াছেন! কেননা, ঋষির "প্রাণ" স্পেন্সারের "Energy"র অনুবাদ ছাড়া আর কি? এবং ঋষির নিঃসৃতম্ স্পেন্সারের proceed ছাড়া আর কিছুই নহে!! অজ্ঞেয়বাদী স্পেন্সারের শক্তির জ্ঞান এইখানেই শেষ হয় নাই। তিনি আরও বলিতেছেন, "The power manifested throughout the Universe distinguished as material, is the same power which in ourselves wells up under the form of consciousness." জানিনা, অজ্ঞেয়তাবাদ এই উক্তির কোন্ স্থানে বাস করে। তিনিই আমাদের মধ্যে জ্ঞানরূপে আবির্ভূত হইতেছেন। "প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী" উপনিষদের ঋষিও এই কথাই বলিতেছেন। তাঁহার মুখে যদি আমরা না শুনিতাম যে তিনি অজ্ঞেয়তাবাদী, "ব্রহ্মকে জানা যায় না" একথা যদি স্থানান্তরে তাঁহার মুখ দিয়া না বাহির হইত, তবে আমরা স্পেন্সারকে কখনই অজ্ঞেয়তাবাদী বলিতে পারিতাম না। স্পেন্সারের এ উক্তিগুলি আমাদের নিকট অন্ধের হাতে আলোর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। যে চক্ষু খুলিবে না তাহার আলোর কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। তাহার আলোতে অন্যেরা পথ দেখিবে বটে, কিন্তু অন্ধ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে। স্পেন্সার এ তিমির আশ্রয় করিলেন কেন? আমরা তাঁহার মতের যতদূর সমালোচনা করিয়াছি, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, তিনি যদি "ব্রহ্মকে জানা যায় না" এই চিরপোষিত ভ্রান্তিটা পরিত্যাগ করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন তবে ব্রহ্মবাদী হইয়া যান। কিন্তু তিনি এতদূর আসিয়াও ব্রহ্মজ্ঞানের শীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না। কেন? সাকারবাদী হিন্দু যেমন "নিরাকারের ধ্যান হয় না" এই ভ্রান্তির বশবর্ত্তিতা বশতঃ পৈত্রিক সম্পদ ব্রহ্মজ্ঞানরূপ অমৃত রস হইতে বঞ্চিত হইয়া পৌত্তলিকতাতে নিমজ্জিত হইয়াছেন, স্পেন্সারও তেমনি "অসীমের জ্ঞান সম্ভব নয়" এই দার্শনিক কুসংস্কারের প্ররোচনায় ব্রহ্মজ্ঞানের উচ্চ অধিকার হইতে আপনাকে বঞ্চিত

করিয়াছেন। সুতরাং দর্শনালোচনা করিতে যাইয়া তিনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় পণ্ডশ্রম মাত্র হইয়াছে। এই পণ্ডশ্রম দেখিয়া মনে বড় ক্ষোভ হয়, তাই ঋষির কথার পুনরুক্তি করিতে ইচ্ছা হয়—
"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।"

যাহা হউক, এই যে মহাশক্তি, যাহা হইতে সমস্ত জগৎ উদ্ভূত হইয়াছে এবং যিনি আমাদের জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, সেই মহাশক্তির জ্ঞান আমরা কিরূপে লাভ করিলাম? স্পেন্‌সার এখানেও বৈদান্তিক ঋষির সঙ্গে একমত হইয়া বলিতেছেন, "আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের ভিত্তি।" তিনি বলেন—
"We are disabled from conceiving mechanical force in itself under a form different from mechanical force as ordinarily presented to consciousness. The axiom—"Action and reaction are equal and opposite," applied as it is not only to the actions of objects on one another, but to our actions on them, implies a conception of the two forces as equivalent, both in quantity and nature; seeing that we can not conceive a relation of equality between magnitudes that are not connatural………"Why, then, can we not represent to ourselves the force with which a body resists an effort to move it, as a something quite unlike the feeling of muscular tension which constitutes the effort? There are all-sufficient reasons………There exists no alternative mode of representing this force to consciousness—no other experience, or combination of experiences, by which we can figure it to our minds………To frame a conception of force in the non-ego different from, the conception we have of force in the ego is utterly beyond our power."

এই স্থানে পণ্ডিতপ্রবরকে একটী প্রশ্ন করিতেছি—আমরা জগতের সংস্পর্শে আসিয়া যে মহাশক্তির পরিচয় পাই তাহা চিৎশক্তি, না (যদি জড়শক্তি বলিয়া কিছু থাকে) জড়শক্তি? আমরা আত্মার (ego) মধ্যে যে শক্তির পরিচয় পাই, তাহা তো আত্মশক্তি, ইচ্ছাশক্তি। আমরা আত্মার যে শক্তির পরিচয় পাই, তদতিরিক্ত অন্য কোনও শক্তির ধারণা যদি আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ

অসম্ভব হয়, তবে জগতে যে মহাশক্তি আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, তিনি চিৎশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারেন না। কিন্তু আদি-কারণ জ্ঞানরূপ কি না, এই মহাশক্তি জ্ঞানযুক্তা কি না, সে সম্বন্ধে স্পেন্সার স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলিতেছেন না। তিনি স্পষ্ট স্বীকার করুন আর নাই করুন—"To frame a conception of force in the non-ego different from the conception we have of the force in the ego is utterly beyond our power". এই স্বীকারোক্তিতে তিনি নিজ হস্তেই স্বীয় অজ্ঞেয়তাবাদ বৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। এখন আর আদিকারণে শক্তি আরোপ করিয়া, জ্ঞান আরোপ না করিলে চলিবে না। আমরা আমাদের মধ্যে যে শক্তির পরিচয় পাই, তাহা আত্মাতিরিক্ত কোনও বস্তু নহে। সুতরাং কোনও বস্তুতে এতদনুরূপ শক্তি আরোপ করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে আত্মবস্তু বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, নতুবা উপরোক্ত উক্তির কোনই সার্থকতা থাকিবে না। আত্মজ্ঞানই যে সকল জ্ঞানের ভিত্তি, স্পেন্সার তাহা বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াও একটী দার্শনিক কুসংস্কারের প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব বশতঃ ইহার পরিণতি ও শুভফল লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। অজ্ঞেয়তাবাদী পণ্ডিতদিগের ভ্রান্তির সর্ব্ব প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা কথার কাটাকাটির উপর যতটা মনোযোগ দেন, আসল বস্তুটীর (reality) উপর তত মনোযোগ দেন না। এক নৈয়ায়িক পণ্ডিত রাত্রিকালে খট্টার উপর শুইয়া "তৈলাধার ভাণ্ড কি ভাণ্ডাধার তৈল" এই জাতীয় কোনও গুরুতর মীমাংসায় অভিনিবিষ্ট ছিলেন, এমন সময়ে ঘরে মানুষের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তিনি প্রশ্ন করিলেন "ঘরে কে" ? পণ্ডিতের প্রকৃতি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ চোর উত্তর করিল, "আজ্ঞে ঠাকুর, কেউ না, আপনি ঘুমান।" তখন পণ্ডিত মহাশয় "তাই তো, ঘরে কেউ নাই, তবুও আমি পদশব্দ শুনিবার ভুল করিলাম কেন" এই কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন। অজ্ঞেয়তাবাদী পণ্ডিতদিগের চিন্তার প্রণালী কতকটা এই শ্রেণীর ; কেন না, যখন জ্ঞেয়বাদ খণ্ডনের চিন্তাটা তাঁহা-দের মনের উপর খাড়া না থাকে—যখন শব্দ অপেক্ষা বস্তুর দিকে দৃষ্টি বেশী থাকে, তখন তাঁহারা এমন অনেক কথা বলেন যাহা অজ্ঞেয়তাবাদের সঙ্গে মিলে না। আমরা এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত স্পেন্সার হইতে দিয়াছি। আরও একটী দিতেছি। পণ্ডিতপ্রবর তাঁহার Biologyতে বলিয়াছেন—"What-

ever amount of power an organism expresses in any shape is the correlate and equivalent of a power that was taken into it from without" তাই যদি হয় তবে জগৎ কারণে জ্ঞান না থাকিলে জগতে জ্ঞান আসিল কোথা হইতে? বাস্তবিক স্পেন্সার যখন জ্ঞেয় জগতের কথা বলেন তখন তিনি একজন অতি উপাদেয় গুরু, কিন্তু অজ্ঞেয় জগতের বিষয় বলিতে যাইয়াই তিনি সব গুলিয়ে ফেলেন।

আমরা যতটুকু আলোচনা করিলাম, তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হইতেছে যে, অতি অল্লায়াসেই স্পেন্সারের মতকে ব্রহ্মবাদে পরিণত করা যাইতে পারে। সে মতকে আমরা কিরূপে অজ্ঞেয়তাবাদ বলিব, যে মত স্বীকার করে যে, আদিকারণ শক্তিস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ, অনাদি ও অনন্ত, তাঁহা হইতেই সমস্ত বিশ্ব উৎপন্ন হইতেছে এবং তিনিই আমাদের জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইতেছেন? ব্রহ্মবাদিগণ ব্রহ্মের দার্শনিক স্বরূপ সম্বন্ধে এতদতিরিক্ত আর বেশী কিছুই নির্দ্দেশ করিতে পারেন না।

স্পেন্সার দর্শনের অসঙ্গতি দোষ এইখানেই শেষ হয় নাই, শ্রাদ্ধ আরও অনেকদূর পর্য্যন্ত গড়াইয়াছে। স্পেন্সার এই অজ্ঞেয়শক্তির প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণের ব্যবস্থা করিয়া মনে করিয়াছেন যে, ইহাতে তাঁহার অজ্ঞেয়তা-বাদ এবং মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবৃত্তির চরিতার্থতা এই দুই কুলই রক্ষা পাইতেছে; কিন্তু সে চেষ্টা নিষ্ফল। কোনও অজ্ঞেয় বস্তুর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা সম্ভব নহে। অবশ্য, ধর্ম্মপ্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্য উপাস্য বস্তুকে কিয়ৎপরিমাণে অন্ধকারাবৃত থাকিতে হয়, কিন্তু তাঁহার পক্ষে একান্ত অজ্ঞেয় হইলে চলিবে না। আমার বর্ত্তমান জ্ঞান তাঁহাকে আয়ত্ত করিতেছে না, এই পর্য্যন্ত। কিন্তু তাঁহাকে আমার জ্ঞানের সঙ্গে সমভাবাপন্ন (allied) হইতে হইবে, নতুবা তাঁহার এই অনায়ত্তীকরণীয়তাও আমার মধ্যে কোন ধর্ম্মভাব উৎপন্ন করিতে সক্ষম হইবে না। সুতরাং মানবের যে ধর্ম্মভাব উপাস্য বস্তুতে প্রযুজ্য, তাহা কোনও অজ্ঞেয় বস্তুতে অর্পিত হইতে পারে না। যিনি আমা অপেক্ষা উচ্চ, যিনি আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারই অনুধ্যানে আমার মধ্যে শ্রদ্ধা ভক্তি ভয় ও বিস্ময়ের উদ্রেক হইতে পারে। যিনি অজ্ঞেয়, তিনি আমা অপেক্ষা উচ্চ কি নীচ, শ্রেষ্ঠ কি নিকৃষ্ট, তাহাই জানা হয় নাই, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে কোন ভাবই সম্ভব নহে, ধর্ম্মভাব তো দূরের কথা। বস্তুদ্বয়ের মধ্যে উচ্চ নীচ, শ্রেষ্ঠ

নিকৃষ্টের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইলে, উভয়কে সমপ্রকৃতিবিশিষ্ট (connatural) হইতে হইবে, নতুবা উভয়ের মধ্যে কোনও সম্বন্ধই স্থিরীকৃত হইতে পারে না। এক হাত ও এক মনের মধ্যে এরূপ কোন সম্বন্ধই নাই। কিন্তু এক মন ও পাঁচ মনের মধ্যে আছে। যদি অজ্ঞেয় বস্তুর ধ্যানে ভক্তি-শ্রদ্ধার উদ্রেক করিতে চাও, তবে ধ্যাতা ও ধ্যেয়ের মধ্যে উচ্চ নীচের সম্বন্ধ নির্দ্দেশ কর, এবং তাহা করিতে গেলেই যখন উভয়কে সমভাবাপন্ন হইতে হইবে, তখন উপাস্য আর অজ্ঞেয় থাকিতে পারেন না। সুতরাং স্পেন্‌সারের অজ্ঞেয় উপাস্য—"কাঁঠালের আমসত্ত্ব" বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। বিশেষতঃ, যে মানবের সমগ্র জীবনটা জ্ঞানের বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেই মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু ধর্ম্মভাবকে অজ্ঞানতার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে যাওয়ার ন্যায় অসঙ্গত ব্যাপার আর কি হইতে পারে?

যাহা হউক, স্পেন্সারের দর্শন আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, তাঁহার অজ্ঞেয়তাবাদে অজ্ঞেয় বস্তু অনাদি, অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী; শক্তি-স্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহা হইতেই সমস্ত জগৎ উদ্ভূত হইতেছে এবং তিনিই আমাদের মধ্যে জ্ঞানরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। আমরা আরও পাইতেছি যে, এই যে শক্তি, তাহা আমাদের আত্মশক্তি হইতে ভিন্ন-প্রকৃতি সম্পন্ন হইতে পারেন না। সুতরাং স্পেন্সার দর্শনের পরিণতি অধ্যাত্মবাদের (idealism) উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবাদে। কিন্তু তিনি অধ্যাত্ম-বাদ স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার মনে একটী ভয় আছে, যে তাহা হইলে ক্রমবিকাশবাদ (evolution theory) টিকিতে পারে না। তিনি বলিতেছেন—"Should the idealist be right, the doctrine of Evolution is a dream." আমি যখন স্পেন্সারের এই উক্তিটী প্রথম পাঠ করি, তখন একটু মুস্কিলে পতিত হইয়াছিলাম। ।আমি অধ্যাত্মবাদ ও ক্রম-বিকাশবাদ দুইই বিশ্বাস করিতাম। মনে করিতাম, দুটি মতে কোনও অসামঞ্জস্য নাই, অথবা এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই মনে উদয় হয় নাই। কিন্তু স্পেন্‌সার বলিয়া দিলেন, একটা সত্য হইলে, অন্যটা নিশ্চয়ই কল্পনা মাত্র। তখন মনে একটা বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল; কিন্তু শীঘ্রই একজন মহাজ্ঞানী আমাকে এই মানসিক অশান্তি হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন, ইনি স্বর্গীয় মহাত্মা T. H. Green. তাঁহার উপদেশে বুঝিলাম যে, স্পেন্‌সার এক মহাভ্রান্তিতে পতিত হইয়াছেন। প্রকৃত অধ্যাত্ম-

বাদের (idealism) সঙ্গে ক্রমবিকাশবাদের (evolution) কোনই বিরোধ নাই। স্পেন্‌সারের অধ্যাত্মবাদের দৌড়, বার্কলি (Berkeley) হিউম (Hume) এবং ক্যাণ্টের (Kant) Trancendental Æsthetic পর্য্যন্ত। তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে দেখা যায় সে গুলিও তিনি বিশেষ-ভাবে তলাইয়া আলোচনা করেন নাই। সুতরাং সাধারণের মধ্যে অধ্যাত্ম-বাদ (idealism) সম্বন্ধে যে ভ্রান্তি দেখা যায়, তাঁহার মনেও সেই ভ্রান্তি সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাই, তিনি অধ্যাত্মবাদের (idealism) নামে ভয় পাইয়াছেন। তিনি অধ্যাত্মবাদের ঘাড়ে "জগৎটা আমাদের ব্যক্তিগত মনের ক্রিয়া"—এই ভ্রান্তমত আরোপ করিয়া ক্রমবিকাশবাদ সংরক্ষণে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। "কাণ নিল চিলে" শুনিয়া চিলের পশ্চাতেই ছুটিয়াছেন, কাণে হাত দিয়া দেখা হয় নাই, বাস্তবিক চিলে কাণ নিয়াছে কি না। বস্তুতঃ প্রকৃত অধ্যাত্মবাদের সঙ্গে ক্রমবিকাশবাদের কোনই অসামঞ্জস্য নাই, বরং স্পেন্‌সার ব্যাখ্যাত ক্রমবিকাশবাদের সঙ্গে বিশেষ মিলই রহিয়াছে। স্পেন্‌সার তাঁহার ক্রমবিকাশবাদের ব্যাখ্যায় বলেন যে, মানবের মধ্যে যে সমস্ত উচ্চ আধ্যাত্মিক বৃত্তি সকল বিকশিত হইয়াছে, তাহা ক্রমবিকাশের ফল। ধীরে ধীরে বংশপরম্পরায় তাহা বিকশিত হইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই,—আমার মনোবৃত্তি ধীরে ধীরে আমারই মনে বিকশিত হইতে পারে, বংশপরম্পরায় বিকশিত হইবে কিরূপে? স্পেন্‌সার উত্তর দিবেন, শরীরের মধ্য দিয়া। শরীর তো বহিরাবরণ মাত্র। শরীরের উন্নতির ব্যাখ্যায় মনোবৃত্তির ব্যাখ্যা হয় না। আমার কোনও ব্যক্তিগত (individual) মনোবৃত্তির উন্নতি কখনই আমার মনের বাহিরে হওয়া সম্ভব নহে। অন্য একজনের মানসিক উন্নতি আমার উন্নতির পূর্ব্বভাগ হইতে পারে না। এখানে আত্মার একত্বের ব্যাখ্যার উপর সকল মীমাংসা নির্ভর করিতেছে। যদি আমার কোনও মনোবৃত্তি বংশ-পরম্পরায় উন্নত হইয়া থাকে, তবে আমাকে বংশপরম্পরার সঙ্গে সংযুক্ত করিবার জন্য এক পরমাত্মা স্বীকার করিতে হইবে, যিনি আমার ও পূর্ব্ববর্ত্তী সকলের আত্মারূপে প্রকাশ পাইতেছেন, নতুবা বংশপরম্পরার মনোবৃত্তি বিকাশের কোনই সম্ভাবনা নাই। প্রকৃত অধ্যাত্মবাদ এই পরমাত্মারই নির্দ্দেশ করিতেছেন। সুতরাং অধ্যাত্মবাদ ব্যতীত ক্রমবিকাশের

ব্যাখ্যাই হইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে, ক্রমবিকাশবাদের সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের কোনই বিরোধ নাই; বরং তাহারা গভীর বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ। এখন স্পষ্টই দেখা যাইতেছে স্পেন্‌সার যে বলিয়াছেন,—"Should the idealist be right, the doctrine of Evolution is a dream," তাহা যথার্থ নহে, বরং এই কথাই ঠিক "The doctrine of Evolution is true because the idealist is right". আমাদের আলোচনায় এই কথাই দূরীভূত হইল যে, স্পেন্‌সারের মতকে বিশেষভাবে নিংড়াইয়া উহার সার বাহির করিলে, উহা অধ্যাত্মবাদে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মবাদে পরিণত হইবে।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

রত্নমালা।

(৩৫)

চিতা চিন্তাদ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী।
চিতা দহতি নির্জীবং চিন্তা প্রাণসমং বপুঃ॥

ভাবার্থ—চিতা ও চিন্তার মধ্যে চিন্তাই প্রবল।
দহে মৃত জনে চিতা;
কিন্তু, জীবিতের—চিন্তা—
দগ্ধ করে প্রাণসম বপুঃ অবিরল॥

(৩৬)

বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥

ভাবার্থ—বিদ্বত্ব নৃপত্ব কভু নহে তুল্য রূপ।
বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্য; নিজ দেশে ভূপ॥

(৩৭)

আজগাম যদা লক্ষ্মীর্নারিকেল ফলাম্বুবৎ।
নির্জ্জগাম যদা লক্ষ্মীর্গজভুক্ত কপিত্থবৎ॥

ভাবার্থ—কমলার আগমন,
হয় যথা নারিকেলে নীরের সঞ্চার।
আর, তাঁ'র পলায়ন,
গজ-ভুক্ত কথ্‌বেল হয় যে প্রকার॥

(৩৮)

বিদ্যয়া তপসা বাপি দানেন বিনয়েন চ।
পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্য লক্ষণম্‌॥

ভাবার্থ—বিদ্যা, তপঃ, দান, যশঃ, সুপুত্র, বিনয়,
আর আছে যে জনার সলিল আশয়;
ধন্য তিনি ধরাধামে,—ধার্ম্মিক সুজন;
প্রকাশে এ সবে তাঁ'র পুণ্যের লক্ষণ।

(৩৯)

যস্য ভার্য্যা গুণজ্ঞা চ ভর্ত্তারমনুগামিনী।
অল্পাল্পেন তু সন্তুষ্টা সা প্রিয়া ন প্রিয়া প্রিয়া॥

ভাবার্থ—ভর্ত্তার অনুগামিনী,
সন্তুষ্টা, গুণগ্রাহিণী,
যেই নারী তাহাকেই প্রিয়া কহা যায়।
ইহা ভিন্ন অন্যে প্রিয়া,
কহে যদি সম্বোধিয়া
কেহ, তবে তাহা মাত্র মোহ-ছলনায়॥

(৪০)

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে।
দর্দ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্‌॥

ভাবার্থ—প্রাবৃটে নীরবে পিক রহে অবিরত।
ভেক যথা বক্তা তথা মৌনই সঙ্গত॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ।

স্বদেশী বৈদ্যক ও বনৌষধি।

আর্য্য-ঋষিগণ প্রণীত বৈদ্যক গ্রন্থ হিন্দুদিগের চির আদৃত। দেশকাল পাত্র অনুসারে যে সকল দ্রব্যাদি ভারতবাসিগণের স্বাস্থ্যপ্রদ—যদ্দ্বারা অক্ষুণ্ণভাবে ধর্ম্মার্থ সাধন হয়, বৈদ্যক শাস্ত্রে, সেই সকলের সম্যক আলোচনা করা হইয়াছে। পরন্তু আমাদের ঔদাস্য দোষে, সে সকলের উৎকর্ষতা সাধনে পরাঙ্মুখ থাকায়, সেই সকল আত্মধনে আমরা বঞ্চিত হইতেছি। বিদেশীয় শিক্ষা, আচার প্রভৃতির বশবর্ত্তী হইয়া আমাদের স্বদেশী মহারত্ন হারাইতে বসিয়াছি; খাদ্যাখাদ্য দ্রব্যাদ্রব্য প্রভৃতির বিচার না করিয়া যদৃচ্ছা গ্রহণ করিয়া থাকি সুতরাং তদ্দ্বারা যে আমাদের স্বাস্থ্য ও ধর্ম্মের কতদূর বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি, সামান্য চিন্তা করিলে তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। আমাদের হৃদয়ের বল, মনের প্রফুল্লতা, শরীরের প্রধান চালক ওজ নামক বিশিষ্ট শক্তি, এই সকলের হ্রাসের প্রধান কারণই আমাদের সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের বহির্ভূত কার্য্য। বাগভটাচার্য্য এ বিষয়ের বহুল বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশজাত দ্রব্যাদি আমাদিগের খাদ্য ও ঔষধি উভয়রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যে যে ঋতুতে যে সকল দ্রব্যাদি আমাদিগের স্বাস্থ্যের উপযোগী, সেই ঋতুতেই সেই সকল দ্রব্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং সেই সকলের অপব্যবহারে যে আমাদের স্বাস্থ্যের অকল্যাণ সাধিত হইবে তদ্বিষয়ে আর বিচিত্রতা কি?

পূর্ব্বে ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুগণ যে সুস্থ শরীর ও দীর্ঘ জীবন লাভ করিতেন, স্বদেশজাত আহার্য্য বস্তুই তাহার প্রধান কারণ। ঐ সকল বস্তু কেবল যে আহার্য্যরূপেই ব্যবহৃত হইত তাহা নহে, পরন্তু ঔষধিরূপেও ব্যবহৃত হইত। আমরা যে সকল বনস্পতি ও উদ্ভিজ্জ দ্রব্য নিত্য ব্যবহার করিয়া থাকি, তৎসমুদায় যে ঔষধিরূপেও ব্যবহৃত হয় এবং সে সকল যে আমাদের স্বাস্থ্যের কত হিতকর, তদ্বিষয়ে অদ্য আমরা যথাসাধ্য দেখাইতে চেষ্টা করিব। নিম্নে কয়েকটী উদ্ধৃত করিলাম।

কুষ্মাণ্ড ঃ—প্রচলিত কথায় কুমড়া বলে। এই লতা ও ফল ভারতের সর্ব্বত্র, জাপান ও যবদ্বীপে উৎপন্ন হয়। ইহা আমাদিগের নিত্য ব্যবহার্য্য তরকারী মধ্যে পরিগণিত। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ মধ্যে ইহার অশেষ প্রকার গুণ বর্ণিত হইয়াছে, সংক্ষেপতঃ তৎসমুদায়ের কিঞ্চিৎ এস্থলে উল্লেখিত

হইল। ইহা মধুর রস বিশিষ্ট, শুক্রবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক ওজস্কর, বাতঘ্ন, পরন্তু শ্লেষ্মা জনক। কচি কুমড়া পিত্ত নাশক। পক্ক কুমড়া ঈষদ্ ক্ষার গুণ যুক্ত, অগ্নিবর্দ্ধক, লঘু এবং রক্ত পিত্ত নাশক।

রাজনির্ঘণ্টুকারের মতেঃ—

মূত্রাঘাতহরং প্রমেহ মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীঘ্নং
বিন্মূত্রগ্লপনং, শুক্রবৃদ্ধিকরং, তৃষ্ণাহরং
জীর্ণাঙ্গ পুষ্টিকরং স্বাদু অরোচকহরং বল্যং পিত্তঘ্নঞ্চ।

মনুষ্যদেহে রক্ত সঞ্চারের ইহার বিশেষ ক্ষমতা আছে, অধিকন্তু, রক্ত পরিষ্কারক বলিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে ইহা প্রশংসিত। Brig : Surg : Thornton সাহেবের মতে পক্ক কুষ্মাণ্ডের নিষ্পিষ্ট রস বিরেচক, এবং পারদ দোষে দূষিত রক্তের পরম হিতকর; ফুসফুসের প্রদাহ ও ক্ষয় কাসের ইহা অমোঘ মহৌষধ। কুমড়ার রস ঈষদ্ ক্ষার বিশিষ্ট, পরন্তু বায়ু রোগের উপশমকারী। শাঙ্গধর বলেন ইহার রস, গুড়ের রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে মদ্যপানোন্মত্ততা বিদূরিত হয়। (১) কুমড়ার শাকও পরম রুচিকর, পিত্তনাশক, গুরু এবং কফ বিনাশক। কুমড়ার মোরব্বা অতীব পুষ্টিকর খাদ্য, রোগীদিগের সহজ পাচ্য, পিত্ত প্রশমনকারী; অর্শ, অজীর্ণ ও ক্ষয় রোগের পরম উপকারক এবং সুপথ্য। কবিরাজগণ, মাষকলাই বাটিয়া নির্জ্জল কুমড়ার সহিত অপরাপর ঔষধ মিশ্রিত করত, রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া এক প্রকার বড়ী প্রস্তুত করেন, ইহা পরম রুচিকর, বায়ু নাশক এবং রক্ত পিত্তের উপকারী।

এতদ্ব্যতীত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে রক্তপিত্ত রোগে, কুষ্মাণ্ডখণ্ড, বাসাকুষ্মাণ্ডখণ্ড, অম্লপিত্ত রোগে, খণ্ডামলকী, উন্মাদ অপস্মর রোগে কুষ্মাণ্ড ঘৃত প্রভৃতি কুষ্মাণ্ড ব্যবহৃত ঔষধ উল্লেখিত হইয়াছে। ঘৃতের ১৮ গুণ কুষ্মাণ্ডের রস জ্যৈষ্টমধুর কল্ক দ্বারা সাধিত হইয়া থাকে।

কারবেল্ল (সুষবী) ঃ—প্রচলিত কথায় ইহাকে করেলা বলে; ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র. চীন, মালব ও আফ্রিকা প্রদেশে এই লতা ও ফল বহুল পরিমাণে জন্মে। করেলা গৃহস্থগণের তরকারীরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহার গুণ, তিক্ত অগ্নিদীপক, পিত্তহারক, রুচিকারক এবং কফঘ্ন। রক্তের পীড়া

(১) "কুষ্মাণ্ডকস্য স্বরসো গুড়েন সংযোজিতঃ
কুষ্ঠকোদ্রব সঞ্জাতং মদং পানাদ্ব্যপোহতি"।

ও পাণ্ডু রোগের নাশক। বিশেষতঃ শীতবীর্য্য, ভেদক, লঘু, জ্বর, অবাতল, পাণ্ডু, প্রমেহ ও কৃমি নাশক। (২) ইহার আর এক প্রকার জাতি আছে, তাহাকে উচ্ছে বলে। উভয়ই প্রায় সম জাতীয়, সুতরাং ব্যবহারে গুণের কোন বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। আয়ুর্ব্বেদ মতে ইহার তাজা পাতার রস, জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া, মাত্রানুসারে পান করিলে কৃমি নষ্ট হয়। ইহা মৃদু বিরেচক। কুষ্ঠ বা সাংঘাতিক ক্ষতে ইহার লতা, শুষ্ক এবং চূর্ণ করিয়া বাহ্যিক প্রয়োগ করিলে পীড়ার উপশম হয়। ইহা জ্বরঘ্ন, গোলমরিচের সহিত ইহার পত্র পেষণ করিয়া ব্যবহার করিলে জ্বর বিনষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত চক্রদত্তে লিখিত আছে যে,

"সুষবী পত্র নির্য্যাসং হরিদ্রা চূর্ণ সংযুতং
রোমন্তী জ্বর বিস্ফোট মসুরী শান্তয়ে পিবেৎ ॥"

করেলা পত্রের নির্য্যাস হরিদ্রা চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, জ্বর, বিস্ফোট, হাম ও বসন্ত রোগের উপশম হইয়া থাকে। করেলার সমগ্র লতা, দারুচিনি, পিপূল, তণ্ডুল এবং জঙ্গলী বাদামের তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে, নানা প্রকার চর্ম্ম রোগ, খোস পাঁচড়া আরোগ্য হয়। ডাক্তার টমশন বলেন যে, বাধকের পীড়ায়, অথবা শরীরের রক্ত বিকৃত বা শূন্য হইলে, চা খড়ির সহিত ইহার রস সেবন পরম হিতকর।

পটোল ঃ—ইহাও আমাদের স্বদেশজাত বিশেষ উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য। ইহার লতাকে পল্‌তা কহে। এতদুভয়ই আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য উপকারী তরকারী। পটোল সুস্বাদু, রুচিকারক, স্নিগ্ধ, অগ্নি ও শুক্রবর্দ্ধক এবং বায়ু পিত্ত ও কফের প্রশমনকারী। পটোলের ঝোল—পল্‌তার ক্বাথ রোগীদিগের পরম হিতকর এবং বলকারক। পল্‌তা খাদ্য বিষয়ে যেমন রোচক ও উপকারী, ঔষধি বিষয়ে তেমনি গুণকারী।

"পটোল পত্রং পিত্তঘ্নং দীপনম্পাচনং লঘু।
স্নিগ্ধং বৃষ্যং তথোষ্ণঞ্চ জ্বর কাস কৃমি প্রণুৎ ॥" (ভাঃ প্রঃ)

পলতার রস, তিক্ত, পাকাশয়ের বিশেষ উপকারী পরন্তু মৃদু বিরেচক। জ্বরাদি, কিম্বা হস্ত পদাদি দাহে অথবা বমি হইলে, ধনের সহিত পল্‌তা সিদ্ধ করিয়া,

(২) "কারবেল্লং হিমং ভেদি লঘু তিক্তমবাতলম্।
জ্বরপিত্তকফাস্রঘ্নং পাণ্ডুমেহ কৃমিন্ হরেৎ ॥" (ভাঃ প্রঃ)

তাহার কাথ সেবন করিলে উক্ত পীড়াদির উপশম হয়। চক্রদত্তে পটোলাদি-কাথ বিষয়ে উল্লেখিত হইয়াছে যে,

"পটোলং চন্দনং মূর্ব্বা তিক্তা পাঠামৃতাগণঃ
পিত্ত শ্লেষ্মারুচিচ্ছর্দ্দি জ্বর কণ্ডু বিষাপহ"।

পটলের রস চন্দন মূর্ব্বা, নিমুখোর রস, কট্‌কী ও গুলঞ্চ, এই সকল প্রত্যেক দুই তোলা পরিমাণে ভাগ করিয়া, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধ পোয়া শেষ নামাইয়া, দিবসে দুইবার মাত্র সেবনে ত্রিদোষ, কণ্ডু এবং বিষজ্বর আরোগ্য হয়। অপিচ ইহা রুচিকর। ইহার অপর গুণ, রক্ত শোধক ও যকৃত পীড়া নাশক। বহু পুরাতন পীড়ায়, বা বিস্ফোট জ্বরে পল্‌তা, চিরেতা, মুস্তকা, (মূতা) নিমছাল, পর্পটী, গুলঞ্চ, বাসকছাল এবং খদির, উক্ত প্রকারে প্রস্তুত করিয়া নিয়মিতরূপে ব্যবহারে পীড়ার উপশম হইয়া, শরীরে বল সঞ্চার করিয়া থাকে।

"পটোলামৃত ভূনিম্ব বাসকারিষ্ট পর্পটৈঃ
খদিরাব্দ যুতৈ ক্বাথো বিস্ফোটার্ত্তি জ্বরাপহঃ"।

ভাব প্রকাশে ইহার অপর আর একটী গুণ দৃষ্ট হয় যে, ইহার তাজা পত্রের নির্য্যাসে মস্তকের টাক দূর করে এবং তদ্দ্বারা নব কেশের উদ্গম হয়।

এতদ্দ্বারা বিশেষরূপে বুঝা যাইতেছে যে, এই লতা, তাহার ফল, পত্র, মূলাদি আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে বিশেষ উপকারী। সুশ্রুত সংহিতায় এতদ্ সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা দৃষ্ট হয়। (৩)

"পটোল পত্রং পিত্তঘ্নং নাড়ী তস্য কফাপহা
ফলং তস্য ত্রিদোষঘ্নং, মূলং তস্য বিরেচনং ॥"

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

রমা।

নবম পরিচ্ছেদ।

পিতা-পুত্রে।

প্রাতঃকাল—সুন্দরীর সীমন্তে সিন্দূরের ন্যায় পূর্ব্বদিক রক্তিমরাগে রঞ্জিত।

---

(৩) Indian medical Reportএ এতদ্ সম্বন্ধে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। (*Vide* Nov. 1896 2nd issue.)

শীতল প্রাতঃসমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। জগৎ এখন সুপ্ত; কচিৎ কোন তরুর উপরে পক্ষীর কূজনশব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। প্রকৃতি-দেবীর এই অভিনব বিনোদভাব দর্শন করিয়া বৃক্ষ সকল শিশির পতনচ্ছলে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছে। ফুটন্ত কুসুম সকল হাস্য মুখে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য ব্যস্ত হইতেছে; জীবের জীবন-প্রভাতের ন্যায় প্রাতঃকালে প্রকৃতি-সতীর এই বাল্যজীবনও অতীব রমণীয় এবং প্রীতিপ্রদ; এ সময় ভাবুক, বনদেবীর অপার সুষমা সন্দর্শনে বিমোহিত হইয়া, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের প্রেমরসে আপ্লুত হয়। সংসারচক্রে নিষ্পেষিত নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তির তাপদগ্ধ হৃদয়ও এ সময় সুশীতল হইয়া সুখানন্দ অনুভব করে।

ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর সকল সময়েই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ধর্ম্ম ছাড়া, হিন্দু কোন কর্ম্মই করিতে পারে না,—তাই তাহাদের ধর্ম্মের সহিত এত মাখামাখি ভাব। প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অবধি পুনরায় যতক্ষণ না নিদ্রাভিভূত হয়,—ততক্ষণ তাহাদের প্রত্যেক কাজেই ধর্ম্মের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইয়া থাকে। শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবার সময়, তাহারা ভগবানের নামোচ্চারণ করিয়া তবে ভূমিতে পাদস্পর্শ করে। মনোমোহন প্রত্যহই অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতেন; অন্যান্য দিনের ন্যায় আজও তিনি—

"প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ং।
আপদঃ তস্য নস্যন্তি তমো সূর্য্যোদয়ে যথা॥"

ইত্যাদি নানাবিধ দেবদেবীর পূতনাম রসনায় উচ্চারণ করিতে করিতে বাহিরে আসিলেন এবং প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া পাঠাভ্যাসে রত হইলেন।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে যেরূপ শিক্ষার প্রচলন ছিল, তাহা এদেশবাসীর স্বভাবের অনুরূপ;—তাই তখনকার শিক্ষায় এদেশীয় বালক-বালিকাদের স্বভাব চরিত্র অতি কমনীয় হইত। এখনকার শিক্ষার কিন্তু সেরূপ কমনীয় ভাবটুকু আর নাই। বালক বালিকাদের চরিত্রও যেন আর সেরূপ পবিত্র-ভাবে গঠিত হয় না। এখন ইংরাজ বাহাদুরের কৃপায় স্কুল কলেজের অভাব নাই, শিক্ষার অভাব নাই, শিক্ষার্থীরও অভাব নাই। বিকৃতমস্তিষ্ক হিন্দু আপন ব্যবসা ভুলিয়া, পিতৃ পিতামহের ক্রিয়া-কলাপে জলাঞ্জলি দিয়া, বিজাতীয়

শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে লাগিলেন; তাহাদের ক্রিয়া কলাপ, আচার ব্যবহার সমস্ত অনুকরণ করিতে লাগিলেন; হিন্দুভাব পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে যাদৃচ্ছিক ভাবে আপনাকে পরিচালিত করিলেন; কুশিক্ষার দোষে যাহা কিছু সমাজ ও স্বধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য তৎসমস্তই আসিয়া জুটিল। এখন পরম পূজনীয় পিতৃদেব নিকটে আসিলে বা তাঁহাকে প্রণাম করিবার আবশ্যক হইলে, আর সহজে প্রণাম করিতে পারেন না; যে পরমারাধ্যা জননীর কৃপায় এ জগতে তাঁহার অস্তিত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে, সে জননীকে এখন দৃক্‌পাতও করেন না। এই ত শিক্ষা! আর এই ত তাহার পরিণাম। এই শিক্ষা সকলের হেতুভূত হইয়াই ত হিন্দুর সাত্ত্বিক প্রকৃতি বিকৃত হইতেছে; আর এই জন্যই ত আমাদের সমাজে এত বিভ্রাট সংঘটিত হইতেছে।

মনোমোহন এরূপ শিক্ষায় শিক্ষিত হন নাই; তাঁহার মস্তিষ্কও কোনরূপ বিকৃত হয় নাই, তজ্জন্য স্বভাবের কোনরূপ ব্যতিক্রমও ঘটে নাই। তিনি প্রতিদিন প্রাতে পিতামাতার চরণ বন্দনা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না, ইহা তাঁহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল। মনোমোহন নিত্য-ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন করিয়া একান্তমনে অধ্যয়ন কার্য্যে রত হইয়াছেন। এমন সময় বিষ্ণুরাম তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতাকে আসিতে দেখিয়া, মনোমোহন পাঠবন্ধ করিলেন এবং তিনি কি আদেশ করেন, তাহাই শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

মৃত দিগম্বর বাবুর ভগ্নী,—ভবানীর কথামত কল্য রজনীযোগে মনোমোহনের বিবাহ সংক্রান্ত কথা বিজয়াকে বলিয়াছিলেন। বিজয়া স্বামীর কথা শুনিয়া, যারপরনাই আহ্লাদিত হইলেন। অচিরে পুত্রবধূর মুখাবলোকন করিয়া জন্ম সার্থক করিতে পারিবেন, ইহা অপেক্ষা বিজয়ার অধিক আনন্দ আর কি হইতে পারে? রমার ন্যায় সুশীলা কন্যা যে তাঁহাদের পুত্রবধূ হইবে, ইহা ভাবিয়া পতি-পত্নী উভয়েই সুখী হইয়াছেন; এক্ষণে কেবলমাত্র পুত্রের মত সাপেক্ষ।

মনোমোহন যে তাঁহাদের কথায় অবহেলা করিবেন না, তাহা তাঁহারা জানিতেন; তথাপি কথায় কথায় একবার তাহার মত গ্রহণ করা উচিত বিবেচনা করিয়া বিষ্ণুরাম প্রাতঃকালে পুত্রের নিকট আসিয়া বলিলেন, "মনোমোহন! তোমার গর্ভধারিণীর শরীর ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়া আসিতেছে, সে আজ কয়েকদিন ধরিয়া তোমার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে; ভবানী

ও দুর্গাবতী, রমার সহিত তোমার বিবাহ দিবার জন্য আমাকে বড়ই অনুরোধ করিতেছে; তাহাদের এই দুঃসময়ে যদি এই অনুরোধ রক্ষা না করি, তাহাদের মনঃকষ্টের সীমা থাকিবে না। এই জন্য কল্য আমি তাহাদিগকে এক প্রকার মতই দিয়াছি।”

পিতার বাক্য শ্রবণ করিয়া মনোমোহনের বদন লজ্জায় আনত হইল; কোন কথাই বলিতে পারিলেন না। বিষ্ণুরামও “মৌনং সম্মতি লক্ষণং” মনে করিয়া তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। পিতা চলিয়া যাইলে, তিনি পুনরায় নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

পূর্ব্বে কন্যা বিক্রয় প্রথা সমাজে বিশেষরূপে প্রচলিত ছিল। এখন তাহার পরিবর্ত্তে পুত্র বিক্রয় আরম্ভ হইয়াছে। একটী পুত্র হইলে এবং তাহার উপর সে যদি আবার কিছু লেখা পড়া শিখিল এবং সচ্চরিত্র হইল, তাহা হইলে ত আর কথাই নাই। ক্রেতা আসিতেছে; আর পুত্রের পিতা ক্রমশঃ মূল্য বৃদ্ধি করিতেছেন। পুত্র বিক্রয় আমাদের সমাজে এখন ব্যবসার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; এইজন্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে কন্যার বিবাহে সময়ে সময়ে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়।

মনোমোহনের পিতা জানিতেন, কুটুম্বের ধনে কেহ কখন বড়মানুষ হয় না। স্ত্রীভাগ্যে ধন; যদি পাত্রীটী সুলক্ষণা হয়, তাহা হইলে ধন ত আপনা হইতেই হইবে; কুটুম্ব পীড়ন করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ করিবার আবশ্যক কি? যদিও তাঁহার পুত্র মনোমোহন আদর্শ চরিত্র, গুণবান ও নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তথাপি তিনি অর্থের জন্য রমার জননীকে কোনরূপ পীড়ন করিলেন না; বিশেষতঃ রমার পিতার সহিত বন্ধুতার জন্য এবং সম্প্রতি তাহাদের সময় অতি মন্দ বলিয়া তাহারা যাহা বলিলেন, তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। সুতরাং বিবাহের কথাবার্ত্তা সহজেই স্থির হইয়া গেল। অতঃপর মনোমোহন ও রমার সুখের মিলনের এবং বিবাহের কিরূপ আয়োজন হইতেছে তাহা একবার দেখা যাউক।

দশম পরিচ্ছেদ।

শুভ বিবাহ।

রমার বিবাহের সমস্ত ঠিক হইয়া গিয়াছে। দুর্গাবতী ও ভবানীর সকল দুর্ভাবনার অন্ত হইয়াছে; তাঁহারা মনোমোহনের ন্যায় যাবতীয় সদ্‌গুণের

আধারভূত পাত্রে রমা-সম্প্রদান করিবে বলিয়া আনন্দে আপ্লুত হইয়াছেন। হায়! এই আনন্দের দিনে, প্রাণের একমাত্র কন্যা রমার এই বিবাহ সময় যদি দিগম্বর বাবু জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার আনন্দ আরও কত গুণে বর্দ্ধিত হইত—এই বিবাহে যে কত সমারোহ হইত, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। কিন্তু আজ দিগম্বর বাবু বিহনে, তাঁহার প্রাণের কন্যা রমার বিবাহ নিতান্ত দরিদ্র-কন্যার ন্যায় সম্পাদিত হইতেছে দেখিয়া শুধু ব্রাহ্মণী ও তাঁহার ভগ্নীর বলিয়া নয়, গ্রামস্থ সকলেই রমার এই হীনভাবে বিবাহের জন্য দুঃখিত হইল।

আজ রমার বিবাহ; প্রাতঃকাল হইতেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অবস্থানুসারে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল; কিন্তু এ বিবাহে বিশেষ কিছু দেখিবার বা শুনিবার নাই, ইহা অতি সামান্য ভাবে সম্পন্ন হইতেছে; এজন্য আমাদেরও ইহার কিছু বর্ণনা করিবার নাই। তবে, যতই কৃপণতা সহকারে হিন্দুর বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হউক না কেন, হিন্দুর বিবাহের তুল্য আমোদ—এমন সুনিয়ম-প্রণালী আর কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত নাই। একটী অজ্ঞাতকুলশীলা বালিকা, তাঁহার পিতামাতার সকল সম্বন্ধ হইতে বিচ্যুতা হইয়া সম্পূর্ণরূপে অপরের হইবে। ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী যেমন সাগরে মিলিতা হইয়া উভয়ে একভাব ধারণ করে, বালিকা-রূপিণী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীও তেমনি স্বামী-সাগরে মিলিতা হইয়া এক হইয়া যায়, তাহাদের উভয়ের কিছুমাত্র পার্থক্য থাকে না—যেন দুইটীতে একই পদার্থ। তাই বলিতেছিলাম, হিন্দুর বিবাহের তুল্য পবিত্রভাব আর কোন জাতির বিবাহে নাই। এরূপ পবিত্র প্রণয়বন্ধন আর কোন জাতির মধ্যে সম্ভবে না। আমাদের সকলই গিয়াছে, সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে, আমরা নিজের দোষে বঞ্চিত হইয়াছি বটে, তথাপি এখনও যাহা আছে, তাহা সর্ব্ববিষয়ে সকল জাতির অনুকরণীয় ইহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

ক্রমে ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল; বসন্তকালের মধুর সান্ধ্য-সমীরণ মৃদু মৃদু প্রবাহিত হইতে লাগিল। জগতে ভাল লোকের ভালই হয়—তাহার শত্রু কোথাও নাই। রমার ন্যায় সুশীলা বালিকার বিবাহে এবং মনোমোহনের ন্যায় আদর্শ চরিত্র, সাধুপ্রকৃতি যুবকের বিবাহে কাহার না আনন্দ হইবে? কে না এই শুভকর্ম্মে যোগদান করিবে!

মৃত দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী ও বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের বাটী উভয়ের মধ্যে তাদৃশ দূরত্ব নাই; কেবল একটী সামান্য পল্লীমাত্র ব্যবধান। আজ সন্ধ্যাকালে বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতেও লোকজনের অভাব নাই; মনোমোহনের স্বভাবগুণে সকলেই তাঁহার শুভ-বিবাহে আনন্দ প্রকাশ করিতে আসিয়াছে।

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া বিবাহের শুভলগ্ন সমুপস্থিত হইল। প্রাতঃকাল হইতেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে আত্মীয় কুটুম্বের সমাবেশ হইয়াছে; বিবাহ-আসরও যথাসাধ্য সুন্দররূপে সজ্জিত হইয়াছে; নানাবিধ কারুকার্য্যবিশিষ্ট চন্দ্রাতপ তলে বিচিত্র বসন ভূষণে সুসজ্জিত সভাস্থলে, নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকগণ বসিয়া সভার শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বহিঃপ্রাঙ্গণ অনেক দিবস হইতে জনশূন্য কান্তারের ন্যায় পতিত ছিল, আজ যেন তাহা নক্ষত্র পরিশোভিত নির্ম্মল আকাশের ন্যায় শোভনীয় হইল।

সন্ধ্যার পর বর আসিয়া সভায় সমাসীন হইল। দিগম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুরাতন কর্ম্মচারী রাধানাথ, আজ বড়ই ব্যস্ত; বিষ্ণুরাম, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও তদংশে ন্যূন নহেন; উভয় পক্ষের সুবন্দোবস্তের ভার তাঁহারই উপর ন্যস্ত হইয়াছে—কাজেই তিনি মহাব্যস্ত।

ক্রমে শুভলগ্ন উত্তীর্ণ হইয়া যায় দেখিয়া পুরোহিত মহাশয় আসর হইতে বর তুলিয়া লইয়া গেলেন। নারীমুখে মঙ্গলসূচক হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। দুর্গাবতী নিজে কন্যা সম্প্রদান করিবেন, কিন্তু বিষাদিনী কি এ সুখের দিনে চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারেন? মৃত পতির পবিত্র মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়কন্দরে সমুদিত হইয়া, তাঁহাকে নেত্রনীরে ভাসাইতেছে। তিনি মনে করিতেছেন, হা নাথ! তুমি জীবিত থাকিলে, আজ আমাদের কি সুখের দিন হইত। এরূপে তিনি নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। অপর স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে সান্ত্বনাচ্ছলে কত কথা বলিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার প্রাণের দুহিতার ও জামাতার অকল্যাণ হইবে শুনিয়া তিনি ধৈর্য্য-ধারণ করিলেন এবং কঠিনতা আশ্রয় করিয়া শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

স্ত্রী-আচার শেষ হইয়া গেল। পাত্র ও পাত্রীর শুভদৃষ্টি করান হইল (তাহাদের মধ্যে এরূপ শুভদৃষ্টি অনেকবার হইয়া গিয়াছে)

সমাগত ব্যক্তিমাত্রেই এই শুভ মিলনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন; সকলেই বলিতে লাগিলেন, এরূপ শুভ-সংঘটন আর কোথাও হয় নাই; যেন সাক্ষাৎ রমা, রমাকান্তের সহিত মিলিতা হইয়া নয়নের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিবাহের তুল্য আমোদ আর নাই; পিতৃহীনা দুঃখিনী রমার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি আজ আনন্দে পরিপূর্ণ; তিনি বিবাহের উপযুক্ত বসন ভূষণে ভূষিতা হইয়া শিশির বিধৌত কমলের ন্যায় শোভা ধারণ করিতে লাগিলেন। হিন্দুশাস্ত্রের নিয়মানুসারে বর ও কন্যা নানাবিধ প্রতিজ্ঞা-পাশে আবদ্ধ হইয়া উভয়ে উভয়ের পাণিপীড়ন করিলেন। নির্ম্মল সলিলা ক্ষুদ্র নদী আজ প্রশান্তসাগরে মিলিত হইল। এই অপূর্ব্ব মিলন দেখিয়া সকলেই স্বর্গীয় মিলন বলিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। সুবর্ণ-লতিকা যেন রসালে বিজড়িত হইল; আজ হইতে আমাদের পবিত্র হৃদয় মনোমোহন, সাধ্বী সতী রমার সহিত একসূত্রে গ্রথিত হইয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। এখন হইতেই তাঁহাদের মানবজীবনের প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ হইল।

শুভবিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চির-প্রচলিত নিয়মানুসারে বর ও কন্যাকে শ্যামসুন্দরের মন্দিরে রজনী যাপন করিতে হইবে বলিয়া, উদ্যানস্থিত শ্যামসুন্দরের মন্দিরে নবদম্পতীকে লইয়া যাওয়া হইল।

সকল শুভ-কার্য্যের পর হিন্দুর শাস্ত্র অনুসারে ব্রাহ্মণ ভোজন না করাইলে কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না—এইজন্য সমাগত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর জন্য আহারের ব্যবস্থা হইল; পরে অন্যান্য জাতির ভোজন-কার্য্য সমাধা হইয়া গেল। কোলাহল পরিপূর্ণ বিবাহ-বাটী এক্ষণে নীরব ভাব ধারণ করিল।

রজনী প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত, এখন আর কাহার সাড়াশব্দ নাই। সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া সকলেই সুখে নিদ্রা যাইতেছে। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যান-বাটীতে নবীন প্রণয়ীযুগল নিদ্রায় অচেতন। রাধানাথ,পল্লীস্থ একজন চাকর ও গ্রামের কয়েকজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তথায় ছিল। তাহারাও, রাত্রি অধিক হওয়ায় নিদ্রাভিভূত। গৃহের বাতায়ন, দরজা প্রভৃতি সমস্তই উন্মুক্ত; এমন সময় কদাকার মলিন বসন পরিহিত দস্যুর ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট এক ব্যক্তি সকলকে নিদ্রিত দেখিয়া, ধীরে ধীরে, যে গৃহে

মনোমোহনও রমা সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন,সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া, রমার হস্ত হইতে তাহার জননী-প্রদত্ত বহুমূল্য বলয় ও পদাভরণ খুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। এই সকল অলঙ্কার রমার জননীর, সুতরাং অনেক বড়, রমার অঙ্গের উপযুক্ত নয়, কাজেই দুর্বৃত্ত তাহা গাত্র হইতে উন্মোচন করিবার সময় নিদ্রাভিভূতা বালিকা কিছুই জানিতে পারিল না, চোর অনায়াসেই তাহা অপহরণ করিয়া প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রাতঃকালে সকলেই রমার গাত্র হইতে গহনা অদৃশ্যের কথা জানিতে পারিয়া সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। কে চুরি করিয়াছে, কেহ দেখে নাই—পুলিসে জানান হইল. পুলিস চোরের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পাঠক! অবগত আছেন যে, আমাদের মনোমোহনের বাল্যবন্ধু প্রবোধকুমার এক্ষণে ডিটেক্টিভের কার্য্য করিতেছেন, তিনিও ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন—তাহাব এ কার্য্যে বেশ সুযশ হইয়াছিল, কিন্তু তিনিও এই আশ্চর্য্য চুবির বিষয় অবগত হইয়া বিস্মিত হইলেন, মনে করিলেন,—এ নিশ্চয়ই কোনও সন্ধানী চোব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যাহা হউক, সুখে দুঃখে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া. গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। দুর্গাবতী ও ভবানীর যাবতীয় দুর্ভাবনার শেষ হইল।

ক্রমশঃ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

স্থবির।

(১)

আজিকে অচল চঞ্চল পদ
আজিকে অসাড় পাণি,
[illegible] যদি দূরে সরে যায়
[illegible]ইতে পারে না টানি।
ঝরে পড়ে গেছে তার সাথীদল,
সেই হেথা একা রয়েছে কেবল
শেষ হেমন্তে সেফালি গুচ্ছ
মলিন কুসুমখানি।
আজিকে অচল. চঞ্চল পদ
আজিকে অসাড় পাণি।

(২)

উৎসব কবে ফুরায়েছে তার
জীবন আঁধার করি,

পূজা শেষে পূজা-দালানের মত—
হৃদিখানা আছে পড়ি।
কোথা কালি কোথা ভস্মের দাগ
শুষ্ক কুসুম সিঁদুরের রাগ
প্রতিমা বিহীন শূন্য আসন
স্মৃতিটুকু আছে ধরি,
উৎসব কবে ফুরায়েছে তার
জীবন আঁধার করি।

(৩)

ফুলে ভরা চারু ময়ুর পঙ্‌খী
বুকে লয়ে দীপ রাশি
মাতায়ে দুকূল দেয়ালির রাতে
গিয়াছিল যাহা ভাসি;
আজ সব দীপ নিভে গেছে তার
আছে শুধু ধূম পোড়া সলিতার,
আঁধার তরণী লেগেছে আজিকে
আঁধার ঘাটেতে আসি,
নাই শোভা নাই ফুল আভরণ
নাহি আর দীপরাশি।

(৪)

আছে বুড়া আহা ভাঙা দেউলের
পাষাণ মূরতি মত,
শঙ্খটীর ধ্বনি আরতির আলো
দেখিতে পায় না সে ত।
গহন বিপিন ভবন আঁধার
কোথায় নৈবেদ্য কোথা ফুলভার
সেবা শুশ্রূষা যেন পূজারির
অর্ঘ্য প্রদান দ্রুত।
আছে বুড়া আহা ভাঙা দেউলের
পাষাণ মুরতি মত।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ।

বঙ্গসংসারে হিন্দু রমণীর স্থান।

স্ত্রীলোককে সংসারে চারি মূর্ত্তিতে দেখা যায়। কন্যা, ভগিনী, পত্নী ও জননী। কন্যা এবং ভগ্নী বঙ্গসংসারে একরূপ অতিথি মাত্র। একাদশ বা দ্বাদশ বর্ষেই বিবাহিতা হইয়া সাধারণতঃ স্ত্রীলোকেরা স্বামিগৃহে গমন করিয়া থাকে। তারপর কচিৎ ক্রিয়াকর্ম্মে অতিথির মত—কুটুম্বের মত পিতৃ-গৃহে ফিরিয়া আসে, সুতরাং পত্নী ও জননীর স্থান নির্ণীত হইলেই বঙ্গসংসারে স্ত্রীলোকের যে স্থান কোথায়, সহজেই নির্দ্ধারিত হইতে পারে। পত্নী ও জননীর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য কিছুই দেখা যায় না।

হিন্দুমহিলার পূর্ণ পরিণতি মাতৃত্বে, সুতরাং যে স্ত্রীলোক পত্নী ও জননী এ

তুই নহেন, হিন্দুর দৃষ্টিতে তিনি অপূর্ণা অপরিণতা ও দুর্ভাগ্যবতী। অতএব সন্তানবতী জননীকে রমণীর পূর্ণ প্রতিনিধি ধরিয়া লইয়া তাহাদের বহু ব্যাপার সম্বন্ধ এবং কর্ত্তব্যাদির আলোচনা দ্বারা স্ত্রীলোকের অধিকার নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিতে পারি।

হিন্দু রমণী, হিন্দু গৃহস্থাশ্রমের কেন্দ্রস্বরূপ। বঙ্গসংসারে সমস্ত পরিবার-বর্গকে একতাসূত্রে বন্ধন করিয়া রাখে। যাহাতে বাদ বিসম্বাদ ও সংসারের অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতা না হয়, তাহাই ধর্ম্মপরায়ণা হিন্দুরমণীর লক্ষ্য।

বঙ্গগৃহের সমস্ত পরিবারবর্গকে একত্র বাঁধিয়া রাখিতে, তাহাদের গৃহস্থাশ্রমে আকৃষ্ট রাখিতে রমণীই মাধ্যাকর্ষিণী শক্তিস্বরূপা। সামান্য জীব হইতে পূজনীয় গুরুজনবর্গ সকলেই রমণীর স্নেহ যত্ন ভালবাসা ও ভক্তির পাত্র। এবং এই স্থূল শরীরের পোষণ হইতে আধ্যাত্মিক উন্নতি পর্য্যন্ত সকলই রমণীর সহায় সাপেক্ষ। যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতার অবসর, যেখানে বিবাদের আয়োজন, যেখানে বন্ধন অপেক্ষা বিচ্ছেদের কারণ সেখানে স্ত্রীলোকের স্থান নাই। যেখানে যদৃচ্ছা আমোদ প্রমোদ. যেখানে অন্নের গ্রাস লইয়া কাড়াকাড়ি, যেখানে বৈষয়িক বিবাদ সেখানে স্ত্রীলোকের স্থান নাই। হিন্দুরমণীর কার্য্য পরিবারদিগের একতা বন্ধন দৃঢ় করা, সংসারকে শান্তির নিকেতন করা।

বঙ্গসংসারে রমণীই লক্ষ্মী, গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী, তবে যে সকল বিষয়ে ক্ষমতা পাইলে স্ত্রীলোকদিগের উক্ত ঐক্যকারিণী ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়, সে সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের অধিকার নাই। ১। স্বাধীনতা, ২। যৌবনবিবাহ, ৩। বাহিরের আমোদ প্রমোদে যোগদান, ৪। জীবিকা-অর্জ্জন।

এই সকল বিষয়ে স্ত্রীলোকদিগের অনধিকার। বঙ্গসংসারে স্ত্রীলোকদিগের পৃথক অস্তিত্ব নাই. কিন্তু সমস্ত সংসারের স্ত্রীলোকই অবলম্বন দণ্ডস্বরূপ। স্ত্রীলোক পরিবারবর্গের অস্তিত্বের সহ নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ ভাবে মিলাইয়া দেয়, নিজের সুখ দুঃখের পৃথক দাবি রাখে না।

(১) কন্যা—বঙ্গগৃহে কন্যার মত মমতাময়ী আর নাই। কন্যা পিতামাতার আদরের ধন। পিতামাতা কন্যাকে প্রাণপণ যত্নসহকারে লালনপালন করিয়া, শিক্ষাদান করিয়া দশম বা একাদশ বর্ষে বিবাহ দিয়া থাকেন। কন্যা যাহাতে সুপাত্রে পড়ে ও সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তির গৃহে পড়ে, পিতামাতা সে বিষয় সবিশেষ চেষ্টা করেন। দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বৎসরে তাহাদের স্বামিগৃহে পাঠাইতে হয়। কন্যাসন্তান পিতামাতার গচ্ছিত-ধন মাত্র। বিবাহের পর

তাহাদের উপর পিতামাতার আর অধিকার থাকে না, কদাচ কখন কন্যা পিতৃ গৃহে অতিথির মত—কুটুম্বের মত আসিয়া থাকে।

কাজে কাজেই পিতামাতার ভাগ্যে কন্যা-দর্শন দুর্লভ হইয়া থাকে, সুতরাং কন্যা পিতৃগৃহে আসিয়া সকলের নিকট স্নেহময়ী মমতাময়ী। কন্যা পিতামাতার নিকটে যে কয়দিন থাকে প্রাণপণে তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করে ও পিত্রালয়ে আসিয়া পিতামাতার স্নেহমমতায়, ভাই ভগিনীদের ভালবাসায়, এককালে মগ্ন হইয়া যায়। পিতৃ গৃহের সকল বস্তুই তাহার নূতন মনে হয়। সকল বস্তুই আনন্দদায়ী। পিতৃ গৃহের উদ্যানের তরুলতাটি পর্য্যন্ত তাহার বড় যত্নের ও আদরের। ছোট ছোট ভাই ভগ্নী ও শৈশব ক্রীড়ার সঙ্গিনীকে পাইয়া তাহার আনন্দের সীমা থাকে না। পিতৃ গৃহের দাস দাসীরাও তাহার ভাল-বাসার জিনিষ। যে কন্যা মুহূর্ত্তমাত্র মাতার অঞ্চল ছাড়িয়া থাকিতে চাহে না, সেও আবার শ্বশুরবাড়ী গিয়া শ্বশুর শাশুড়ী ননন্দার মতানুবর্ত্তিনী হইয়া সুন্দররূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে।

(২) ভগিনী—বঙ্গগৃহে ভগিনীস্নেহ বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সহোদরা চিরদিন ভ্রাতার হিতাকাঙ্ক্ষিনী। ভ্রাতাকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া ভ্রাতাকে সুন্দর বস্তু দান করিয়া ভ্রাতাকে সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া ভগিনীর অতুল সুখ, ভ্রাতার সুখেই ভগিনীর আহ্লাদ। ভ্রাতা ভগ্নীর পবিত্র ভালবাসায় বঙ্গসংসার স্বর্গ। হিন্দু ভগিনীগণ কার্ত্তিকমাসে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে ভ্রাতার দীর্ঘজীবন ও কল্যাণ কামনায় ভ্রাতৃললাটে তিলক দান করিয়া থাকেন। ভ্রাতাকে স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করাইয়া থাকেন ও নববস্ত্র পুষ্প মাল্যাদি দ্বারা সজ্জিত করেন। ভ্রাতাও অগ্রজা ভগ্নিকে পূজা করেন, অনুজা ভগ্নীকে আশীর্ব্বাদ করেন। ভ্রাতার গৃহে আসিয়া, ভগ্নী অতি সমাদরে অতি আনন্দে দিনযাপন করেন। ভ্রাতৃজায়া ভ্রাতৃপুত্রী ভ্রাতৃপুত্র লইয়া আনন্দে সময় কাটাইয়া থাকেন। সধবা ভগ্নীও ভ্রাতৃগৃহে অতিথি মাত্র, কিন্তু বিধবা ভগ্নী ভ্রাতৃগৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীস্বরূপিনী। হিন্দু বিধবা হিন্দু সংসারে দেবীর ন্যায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়া জগতের নিকট বন্দ্যনীয়। হিন্দু বিধবা ভগ্নীর ভোগলালসা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, বিলাস বাসনা নাই। ভ্রাতাকে উপাদেয় বস্তু আহার করাইয়াই তাহার পরিতৃপ্তি। ভ্রাতৃজায়ার কেশবিন্যাস করিয়া তাহাকে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়াই তাহার অপরিসীম সুখ। ভ্রাতার

শিশুপুত্র কন্যাগুলি লালনপালন করিয়াই তাহার অতুল সন্তোষ; ভ্রাতৃপুত্রী ভ্রাতৃপুত্রই ক্রীড়ার সাথী বাল্যের সঙ্গী, ভ্রাতৃবধূর সুখ ঐশ্বর্য্যেই ননন্দার স্বর্গসুখ হিন্দু বিধবার মত, এমন আত্মত্যাগ করিতে জগতে আর কে আছে? তাহার স্বার্থ পরার্থে মিলিত।

(৩) পত্নী—হিন্দুসংসারে পত্নীত্বে ও মাতৃত্বে বিশেষ পার্থক্য নাই। সন্তানবতী হইলেই রমণী পত্নীত্বের ঐশ্বর্য্যে ও মাতৃত্বের অতুল মহিমায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়। আহারে বিহারে শয়নে ভোজনে গৃহধর্ম্মে ও আধ্যাত্মিক কার্য্যে পত্নীই পতির সহায়।

পত্নী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। পত্নী, পতিকে দেবতার ন্যায় সেবা করেন। রোগে শোকে সম্পদে বিপদে সুখে দুঃখে ছায়ার ন্যায় অনুগামিনী।

হিন্দুপত্নীর পত্নীত্ব। বাল্যে যৌবনে প্রৌঢ়ে বার্দ্ধক্যে চিরদিন সমভাবে পতির উপর স্থাপিত। পতিরও পত্নী প্রবাসের চিন্তা, স্বাস্থ্যের সুখ, সম্পদের শোভা, অর্জ্জনের লক্ষ্মী। পতিরও পত্নীময়তা প্রতিপদে প্রত্যেক কার্য্যেই পরিলক্ষিত হয়।

হিন্দুগৃহের পবিত্র স্বর্গীয় দাম্পত্য প্রেমের চিত্র কবি তাঁহার অতুলনীয় চিত্রে অঙ্কিত করিয়া দেখাইয়াছেন। রামচন্দ্রের, সীতাদেবীর প্রতি কি প্রগাঢ় প্রেম, রামচন্দ্র সীতাদেবীকে লক্ষ্য করিয়া কি বলিতেছেন—

গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তীর্নয়নয়ো
রসাবস্থা বপুষিবহুল চন্দনরসঃ।

হিন্দুগৃহের আশৈশব দাম্পত্য প্রেমের চিত্র কি মধুর হৃদয়গ্রাহী। পতি, পত্নীকে দেবীর ন্যায় সম্মান করেন। পত্নী বিয়োগে "গৃহশূন্য" হইয়াছে বলিয়া থাকেন। স্ত্রীয়ঃশ্রীয়শ্চগেহেষু। স্ত্রীরাই গৃহের শ্রী ও লক্ষ্মী-স্বরূপা। পতির বিত্ত সম্পত্তিতে স্ত্রী সম্পূর্ণ অধিকারিণী। ভর্ত্তৃগৃহে জায়া সর্ব্ববিষয়েই কর্ত্রী। সংসারে স্ত্রীই প্রকৃতিরূপা শক্তিময়ী, সেই শক্তির শক্তিতে সংসার পরিচালিত। হিন্দুরমণীরও পতিই আরাধ্য দেবতা, পতিসেবাই রমণীর ধর্ম্ম, পতি ধনী হউন নির্ধন হউন, বিদ্বান হউন বা মূর্খ হউন, কুরূপ হউন বা রূপবান হউন স্ত্রীজীবনের স্বামীই সর্ব্বস্ব। হিন্দু পতিপত্নী, চিরজীবনের জন্য যে দাম্পত্য-বন্ধনে আবদ্ধ হয়েন, জীবনান্ত না হইলে তাহা বিচ্ছিন্ন হয় না। পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে রমণীগণ পতির মৃত্যুতে তাঁহার সহমরণে গমন করিতেন।

আধুনিক রমণীদিগের পতিভক্তির হ্রাস হইয়াছে। সে পবিত্র নিঃস্বার্থ প্রেম এখন স্বার্থপূর্ণ হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার বলে দাম্পত্য প্রেমের সে দেব-ভাব সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

(৪) জননী—বঙ্গরমণীর পূর্ণ পরিণতি মাতৃত্বে। যে রমণী সন্তানের জননী নহেন, হিন্দুর দৃষ্টিতে তিনি অসম্পূর্ণা—মাতৃত্বেই রমণীর পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। সন্তানপালনের কঠোর দায়িত্ব ঈশ্বর মাতৃহস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন। সদাচারিণী ধার্ম্মিকা মাতা হইতে সৎপুত্রেরই উদ্ভব হয়। মাতাই সংসারের মূল ভিত্তিস্বরূপ।

রমণী যে দিন হইতে জননী হইলেন সেই দিন হইতেই তাঁহার মাতৃত্বের দেব ভাবে হৃদয় পূর্ণ হইল। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর হইতেই মাতার দৃষ্টি সন্তানের প্রতি স্থাপিত। মাতৃচক্ষুঃ সন্তানের কায়িক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলের উপর নিত্য জাগ্রত। মাতাই সন্তানের পালয়িত্রী, রক্ষয়িত্রী ও শিক্ষাদাত্রী। মাতাই সন্তানের শারীরিক স্বাস্থ্যের, মানসিক উন্নতির ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলের মূল। সন্তান, আশৈশব জননী-স্নেহেই পালিত, মাতৃস্তন দুগ্ধেই পোষিত ও জননীর রক্তেই বর্দ্ধিত। সন্তানের শিরায় শিরায়, অস্থিতে অস্থিতে জননীর রক্তই প্রবহমান। কর্ম্মক্ষেত্রে, ধর্ম্মক্ষেত্রে, বৈষয়িক কার্য্যে মাতা-ই সন্তানের পথপ্রদর্শিকা। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই সনাতন বাক্য চিরপ্রচলিত। সন্তান কিসে চরিত্রবান হইবে, বিদ্বান হইবে, ধার্ম্মিক হইবে, ধর্ম্মপরায়ণ হইবে—মাতার চেষ্টা, মাতার উদ্যম, মাতার যত্ন, সর্ব্বদা সেই বিষয়ে ব্যাপৃত। ইহাই মাতার মাতৃত্ব। বঙ্গগৃহের সকল জননীই স্বহস্তে সন্তান পালন করিয়া থাকেন। সন্তানের মলমূত্র স্বহস্তেই পরিষ্কার করেন। শিশু পীড়িত হইলে জননীর আহার নিদ্রা বন্ধ হয়। প্রসূতি সন্তানের জন্য স্নানে, আহারে, বিহারে সততই সংযতা থাকেন। সন্তানের কল্যাণ কামনায় বার-ব্রত, অনশন, উপবাস করেন। বঙ্গরমণীদিগের অতিরিক্ত পুত্রবৎসলতায় বরং অনেক সময় সন্তানের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের অন্তরায় হইয়া উঠে।

যে জাতির মধ্যে যুধিষ্টির, ভীম, অর্জ্জুন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা অসীম মাতৃভক্তির উদাহরণ স্বরূপ, মাতৃআজ্ঞায় পঞ্চ ভ্রাতায়, এক স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন, কুন্তী সমা জগৎবিখ্যাত জননী যে জাতির ছিল, সে জাতি দুর্ভাগ্যক্রমে এক্ষণে জননীর মর্য্যাদা ভুলিয়াছেন। এক্ষণে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকে জননীর সে কর্ত্তৃত্ব ও সে মর্য্যাদার লোপ পাইয়াছে। এখন পত্নীই সংসারের সর্ব্বস্ব, তাহাদের বাক্যই বেদবাক্য. ইহাই এখনকার কৃতবিদ্য সন্তানগণ

মনে করিয়া থাকেন। পত্নী আসিলে মাতা আর কেহই নহেন। আহারে, বিহারে, শয়নে, ভোজনে পত্নীই সর্ব্বময়ী। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে, জননী বিদ্যমানে তিনিই সংসারের কর্ত্রী, গৃহিণী, জননী, ও সর্ব্বময়ী ছিলেন। এক্ষণে পুত্রের নিকট বৃত্তি স্বরূপ জননী কিছু কিছু পাইয়া থাকেন। মাতৃভক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া বঙ্গ সমাজের এত অধঃপতন ঘটিয়াছে।

এক্ষণে বঙ্গসংসারে রমণীর স্থান নির্দ্দেশ করিতে হইলে তাঁহাদের কি কি অধিকার তাহার আলোচনা করা প্রয়োজন। নিম্নে সেই বিষয় যথা সম্ভব বিশদ ভাবে আলোচিত হইল। বঙ্গসংসারের কার্য্যাবলি সাধারণতঃ চারি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

(১) গার্হস্থ্য ব্যাপার।—রন্ধনাদি আহার্য্য প্রস্তুত, রোগীচর্য্যা, শুশ্রূষা, বিপদ-আপদ, গৃহের অধিবাসীদিগের সুখ সচ্ছন্দতা।

(২) সামাজিক ব্যাপার।—অন্নপ্রাশন, বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়া-কর্ম্ম, শিক্ষা, পোষাক পরিচ্ছদ, শিল্পকার্য্য।

(৩) বৈষয়িক ব্যাপার।—সংসারে আয় ব্যয়, সম্পত্তি, লাভালাভ, মোকর্দ্দমা।

(৪) আধ্যাত্মিক ব্যাপার।—দান, অতিথি সেবা, পূজাপর্ব্ব, দেবসেবা, দেব-আরাধনা।

(১) গার্হস্থ্য ব্যাপার। বঙ্গগৃহের গার্হস্থ্য ব্যাপার বৃহৎ। বঙ্গ রমণীরা বাল্যকাল হইতেই গৃহকার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়া থাকেন। শিক্ষা-গুণে রমণীগণ অল্প বয়স হইতেই গৃহকার্য্যে সুপটু হয়েন। গৃহস্থের রমণীরা সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। গৃহ-সংস্কার, নদী বা কূপ হইতে জল আনয়ন, পাক-কার্য্য, সন্তান পালন, ইত্যাদি সাংসারিক কার্য্য বহু রমণীকেই স্বহস্তে করিতে হয়। এতদ্বিষয়ে রমণীগণ বিশেষ কার্য্যক্ষম।

বঙ্গ পিতামাতারা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাংসারিক কার্য্যের ভার বাল্যকাল হইতে কন্যাদিগের উপর ন্যস্ত করেন, যাহাতে তাহারা উন্নত বয়সে উত্তমা ও সুদক্ষা গৃহিণী হইতে পারে। পাক-কার্য্যে বঙ্গ রমণীরা প্রায়শঃ সকলেই সুনিপুণা। অধিকাংশ গৃহিণীগণ, কন্যাগণ স্বহস্তে পাক করিয়া পরিবারবর্গের আহার প্রস্তুত করিয়া থাকেন। গৃহে জলযোগের ব্যবস্থাও করিতে হয়। আহার্য্য বস্তু গুলি যাহাতে সুস্বাদু, সুন্দর ও সুপাচ্য হয় সে বিষয়ে

বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। বিবাহে বা অন্নপ্রাশনে বা অন্য কোন কার্য্য উপলক্ষে, সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের বাটীতে প্রায়ই বিরাট ভোজ হইয়া থাকে, সে সময় গৃহিণী-গণই স্বহস্তে পাক করিয়া শত শত লোককে অন্নদান করিয়া থাকেন। পাক-কার্য্য বঙ্গ রমণীদিগের প্রধান কার্য্য। বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা পূর্ব্বতন সময়ের রমণীগণ পাককার্য্যে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। নবীনাগণ অপেক্ষা প্রাচীনাগণ শ্রমসহিষ্ণু ছিলেন। এখনকার রমণীরা অনেকেই স্বাস্থ্যহীনা ও পরিশ্রমে অপটু।

বঙ্গসংসারে স্ত্রীলোকের আর একটী কার্য্য রোগীচর্য্যা ও শুশ্রূষা। রোগ যন্ত্রণায় কাতর হইয়াও রোগী যখন স্ত্রী ভগিনী বা কন্যাকে নিজ পার্শ্ববর্ত্তিনী দেখে, তখন তাহার রোগক্লিষ্ট মুখেও হাসির রেখা ফুটিয়া উঠে। এখানে রমণীর অক্ষুণ্ণ অধিকার। পুরুষ, ডাক্তার ডাকিয়া, ঔষধ আনিয়াই আপনাকে সাধারণতঃ কর্ত্তব্যমুক্ত মনে করে। শুশ্রূষার ভার রমণীর উপর। পত্নী বা জননী রোগীর রোগ-শয্যার পার্শ্বে অবিচলিত ভাবে বসিয়া, কিসে রোগী প্রফুল্লিত থাকিবে, কিসে ব্যাধি যন্ত্রণা ভুলিবে, কিসে সুস্থ হইবে ইহাই তাঁহাদের চেষ্টা। স্বহস্তে নানাপ্রকার রুচিকর লঘু পথ্য প্রস্তুত করিয়া রোগীকে পত্নী বা জননী যখন সস্নেহে আহার দিয়া থাকেন, তখন রোগীর চির বিষাদ মাখা মুখেও ক্ষণেকের জন্য প্রফুল্লতা দেখা দেয়। মাতার হস্তের সেবা বা কন্যা ভগ্নী ও পত্নীর হস্তের সেবা যেমন শান্তিদান করে, এমন আর কিছুতেই করে না। স্বামীর সেবা, পুত্রের শুশ্রূষা বা পিতামাতার পরিচর্য্যার ভার অন্য ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করিয়া বঙ্গ রমণী কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না।

এ জগতে দুঃখের মুখ দেখেন নাই এমন ব্যক্তি বিরল। সংসারে দুঃখে, বিপদে রমণীই সান্ত্বনা-দাত্রী। অন্যের অশ্রুতে অশ্রু মিশাইতে, অপ-রের দুঃখে সহানুভূতি করিতে, অন্যের বিপদে বুক পাতিয়া দিতে রমণী-হৃদয়ই সমর্থ। ঈশ্বর রমণী-হৃদয়কে স্নেহ, কোমলতা, দয়ার আধার করিয়া গঠিত করিয়াছেন। রমণী ধৈর্য্যশীলা; অকাতরে বুক পাতিয়া তাহারা সমস্ত দুঃখ ক্লেশই সহ্য করে। হিন্দুরমণীর ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু, জগতে আর নাই। তাহারা পাষাণের মত অবিচল থাকিয়া, শত শত শোক দুঃখ বিপদের ঝঞ্ঝাবাত, অশনি বক্ষে রাখিয়া, নয়নের জল নয়নে চাপিয়া, সংসার সংগ্রামে যুঝিতে থাকে।

গৃহস্থের অবস্থা অনুসারে একরূপ অসন বসনই সকলেই পাইয়া থাকেন।

কর্ত্তার বা কর্ত্রীর মতানুবর্ত্তি হইয়া সকলেই চলে। গৃহিণী বা গৃহ-কর্ত্রীর উপর সমস্ত পরিবারবর্গের সুখ সচ্ছন্দতা নির্ভর করে। গৃহিণী, পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের তত্ত্বাবধারণ করেন। তাহাদের আহারাদির, তাহাদের স্বাস্থ্যাদির, তাহাদের অভাব, ক্লেশ সকল বিষয়েই দৃষ্টি রাখেন। হিন্দু গৃহিণী নিজ অস্তিত্বের সহ পরিবারবর্গের অস্তিত্ব মিলাইয়া দেন। যাহাতে সংসারের সমস্ত পরিবার একতাসূত্রে আবদ্ধ থাকে, গৃহিণীর তাহাই চেষ্টা—তাহাই লক্ষ্য। গৃহপালিত পশু পক্ষী হইতে সমস্ত পরিবারবর্গের আহারাদি সমাপ্ত হইলে, গৃহিণী আহার করিয়া থাকেন। অতএব দেখা গেল, গার্হস্থ্য ব্যাপারে রমণীই সর্ব্বময়ী। এখানে পুরুষের অধিকার অতি সংকীর্ণ।

এইবার সামাজিক ব্যাপারে রমণীর স্থান কোথায়, আমরা তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

(২) সামাজিক ব্যাপার।—বঙ্গ গৃহের কন্যারা. বাল্যে গ্রাম্য পাঠশালায় বা. বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থে প্রেরিত হয়। বালকদিগের মত তাহারা শিক্ষার দীর্ঘ অবসর পায় না, তথাপি তাহারা ২।৪ বৎসর শিক্ষা করিয়া নিজের মাতৃভাষা একরূপ আয়ত্ত করিয়া লয়। তাহাতে, তাহারা সাংসারিক আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিতে পারে এবং পিতা, মাতা, স্বামী, পুত্র, আত্মীয় স্বজনকে প্রয়োজন মত পত্রাদি লিখিতে পারে। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য তাহাদের লেখা পড়া শিখিতে হয় না। বঙ্গীয় স্ত্রী-সমাজের মধ্যে অনেকে কবি আছেন, তাঁহারা সুন্দর সুন্দর হৃদয়গ্রাহী কবিতা ও পুস্তকাদি লিখিতে পারেন। মাসিক পত্রে ও সাপ্তাহিক পত্রেও অনেক লেখিকা আছেন। বর্ত্তমান স্ত্রী-সমাজে কেহ কেহ উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, স্ত্রী-অধ্যাপকের ও স্ত্রী-চিকিৎসকের কার্য্য করিতেছেন। বর্ত্তমান রমণী-সমাজ, শিক্ষা বিষয়ে, অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছেন ও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বিষয়ে মার্জ্জিত রুচি হইয়াছেন। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে, বঙ্গ রমণীরা সর্ব্ববিষয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, এমন আশা করা যায়। কিন্তু প্রাচীন স্ত্রী-সমাজ বর্ত্তমান স্ত্রী-সমাজ হইতে অন্যান্য বিষয়ে যে শ্রেষ্ঠ ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহারা নিরক্ষরা হইলেও তাঁহাদের সাংসারিক কার্য্যতৎপরতা, সর্ব্ব কার্য্যে অভিজ্ঞতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চগুণ বিশিষ্টা ছিলেন। তাঁহাদের মত পরোপকারিণী, উদার-হৃদয়া, দয়াবতী এখনকার মহিলা-সমাজে বিরল। আধুনিক স্ত্রী-সমাজ দিন দিন অনুদার চিত্ত

ও সংকীর্ণমনা হইতেছে এবং রমণীগণ নিতান্ত আত্মসুখপরায়ণা হইতেছে।

বঙ্গ-সমাজে রমণীদিগের কোনকালেই স্বাবলম্বন বা স্বাধীনতা নাই। মনুসংহিতায় লেখা আছে (নঃস্ত্রীস্বাতন্ত্রমর্হতি) বঙ্গ রমণীর বাল্যে পিতা, যৌবনে ভর্ত্তা, বার্দ্ধক্যে পুত্রই অবলম্বন স্বরূপ হইয়া থাকে। চিরদিনই তাহারা স্বামী, পুত্র, শ্বশুরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকেন। স্বেচ্ছামত অবাধে গমনাগমন, সকল পুরুষের সহিত আলাপ করা, হিন্দু স্ত্রীনীতির বিরুদ্ধ। স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছাচারিতা হিন্দুসমাজে ঘৃণিত। বিবাহস্থলে বা অন্যান্য কার্য্যে রমণীরা নিমন্ত্রিতা হইয়া নিমন্ত্রণে যোগদান করিয়া থাকেন, কিন্তু অন্তঃপুরের বাহিরে তাহাদের গতিবিধি নিষিদ্ধ।

আজকাল রমণীরা কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করিতেছেন বটে, কিন্তু এখনও সে স্বাতন্ত্র্য সামাজিক ব্যাপারে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই।

বঙ্গ রমণীদিগের সাধারণতঃ পোষাক পরিচ্ছদের আড়ম্বর নাই, সচরাচর স্বল্প মূল্যের বস্তুই তাঁহাদের পরিধেয় হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে শীত বাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহারা গাত্রে জামা দিয়া থাকেন ও সাল আলোয়ান চাদর ব্যবহার করিয়া থাকেন। দেবপূজার ক্রিয়া কার্য্যে তাঁহারা পট্ট বস্ত্র, তসর, গরদ, চেলি ব্যবহার করেন এবং নিমন্ত্রণস্থলে, বিবাহস্থলে অবস্থা অনুরূপ বারাণসী রেশমি ঢাকাই প্রভৃতি বহু মূল্যের বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। বঙ্গ রমণীকুলের অলঙ্কারপ্রিয়তা প্রায় সকলেরই আছে। যাঁহার যেমন অবস্থা, তিনি তদনুরূপ স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরা, মুক্তার অলঙ্কার পরিয়া থাকেন। পদের অলঙ্কার ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণ ভূষণ ব্যবহৃত হয়। নিতান্ত দরিদ্রা হইলেও তাহার দু একখানি স্বর্ণালঙ্কার থাকে। রমণীদিগের অত্যন্ত অলঙ্কারপ্রিয়তা দোষাবহ বটে। কিন্তু গৃহিণীদিগের অলঙ্কারপ্রিয়তায় সময়ে সময়ে গৃহস্থের উপকার হয়। দুই দশ খানি স্বর্ণালঙ্কার থাকিলে, গৃহস্থ আপদে বিপদে তাহা বিক্রয় করিয়া বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। বঙ্গরমণীরা সাংসারিক ব্যয় সঙ্কোচ করিয়া দুই চারি খানি অলঙ্কার প্রস্তুত করেন, তাহাতে গৃহস্থের, সময় বিশেষে উপকার হয়। এজন্য অলঙ্কারপ্রিয়তা রমণীদিগের এককালে নিন্দনীয় নহে। কিন্তু প্রাচীন কালের মহিলারা যে অলঙ্কার পরিতেন, তাহা সাদাসিধা নিটোল; তাহাতে গৃহস্থের সঞ্চয় ও অর্থ রক্ষা হইত। এখন সকল দ্রব্যই বাহ্য চাকচিক্যশালী হইয়াছে। রমণীগণ বিলাসিনী হইয়া স্বর্ণকারকে চতুর্গুণ

মজুরি দিয়া যে সকল অলঙ্কার প্রস্তত করাইতেছেন, তাহাতে পাইন দিয়া সোনা মাটী করিতেছে ও মজুরিও দ্বিগুণ লইতেছে, তথাপি বর্ত্তমান মহিলা-সমাজের চৈতন্য হয় না।

প্রাচীন রমণী সমাজের সহিত বর্ত্তমান রমণী সমাজের তুলনা করিলে যুগান্তর বোধ হয়। প্রাচীনারা বিদ্যাবতী না হইয়া যে সকল গুণে অলঙ্কৃতা ছিলেন, নবীনারা বিদুষী হইয়া ও মার্জ্জিত রুচি হইয়াও তাঁহাদের তুল্য হইতে পারেন নাই। পাশ্চাত্য রুচি অনুসারে ভোগ বিলাসের বস্তু যতই আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই আমাদের স্ত্রী সমাজের নৈতিক অবনতি ঘটিতেছে। প্রাচীনদিগের যদিও শারীরিক বেশভূষার এত আড়ম্বর—এত পারিপাট্য ছিল না, তথাপি মানসিক সদবৃত্তির উন্নতিতে তাঁহারা যথেষ্ট যত্নবতী ছিলেন। রন্ধনাদি ব্যতীত অনেক গৃহস্থ রমণী কিছু কিছু প্রয়োজনীয় শিল্প কার্য্য করিতেন। প্রাচীন শিল্পকলায় বঙ্গ মহিলারা অনেকেই সুনিপুণা। কলিকাতা অঞ্চলের রমণীদিগের অপেক্ষা পূর্ব্ব বঙ্গের রমণীরা শিল্পকলা বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী, স্বদেশী শিল্পে অনেকের পটুত্ব আছে। ঢাকা অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা সুন্দর সুন্দর ঢাকাই পাড় ও ঢাকাই ফুল তুলিতে পারেন। সামান্য সামান্য বস্তুতেও তাহাদের অনেক শিল্প-নৈপুণ্য দেখা যায়। পল্লিগ্রাম নিবাসি রমণীগণ, সূক্ষ্ম শিল্পে অধিকতর দক্ষা। নদীয়া জেলায় শান্তিপুর অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা সুন্দর ফুল বস্ত্রের উপর তুলিয়া থাকেন ও অনেক পাটয়ারি কাজ, ডাকের কাজ, কড়ীর খেলনা ইত্যাদি প্রস্তত করেন। কেহ কেহ পুষ্প মাল্যাদি অতি সুচারু গ্রথিত করিতে পারেন। আধুনিক রমণীদিগের শিল্পকলা অপেক্ষা প্রাচীন শিল্পকলার নিপুণতা ছিল। রঙ্গপুর জেলায় মহিলারা গুটীকার্য্যে অতি পটু, শুচনী কাঁথা সে স্থানের অতি মনোহর। ইদানীং যে সকল রমণীগণ শিল্পবিদ্যা আলোচনা করেন, তাহার মধ্যে রেশম পশমের কাজ, উলের, কার্পেটের কাজ, জুতা মোজা টুপি গলাবন্দই বেশী প্রস্তত করিয়া থাকেন, কিন্তু এ সকল দ্রব্য আমাদের নিত্য প্রয়োজনে আসে না। সর্ব্বাপেক্ষা সূচীকার্য্যই গৃহস্থের অতি প্রয়োজনীয়।

বঙ্গ রমণীদিগের মধ্যে অনেকেই বিছানার চাদর, বালিসের ওয়াড়, মশারি, লেপের খোল ইত্যাদি প্রস্তত করিয়া থাকেন ও ছেলেদের জামা, ফ্রকও কেহ কেহ তৈয়ার করেন। সূচী কার্য্যের বিস্তৃতি আমাদের মহিলা সমাজে যত অধিক বাড়ে ততই মঙ্গল।

(৩) বৈষয়িক ব্যাপার—বঙ্গরমণীদিগের চির অবরোধ প্রথা অনুসারে তাঁহারা প্রকাশ্য রাজপথে বা রাজসভায় বা বিচারালয়ে উপস্থিত হয়েন না। কোন বৈষয়িক ব্যাপারে স্ত্রীলোকের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। যাঁহারা স্বামিপুত্রের অভাবে শ্বশুরের বা স্বামীর বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়েন, তাঁহাদিগের সমস্ত বৈষয়িক কার্য্যের ভার তাহাদের প্রতিনিধি দ্বারা হইয়া থাকে।

যে স্থানে স্ত্রীলোক বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী, সেস্থানে তাঁহার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, তত্ত্বাবধারণের জন্য নায়েব গোমস্তা থাকে। সম্পত্তি অধিকারিণীর প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া, তাঁহারাই সমস্ত কার্য্য ভার গ্রহণ করে।

সাধারণ সাংসারিক দ্রব্যাদি সম্বন্ধে অধিকাংশ স্থলেই স্বামী, স্ত্রীর উপর নির্ভর করিয়া থাকেন। কোন বিশেষ কাজকর্ম্ম উপস্থিত হইলে পরামর্শ করিয়া কাজ করিতে হয়। এ সকল হিসাবপত্র গৃহিনীই রাখেন। স্বামীকে তাহার জন্য প্রায় কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না।

(৪) আধ্যাত্মিক ব্যাপার।—হিন্দু-গৃহে বারমাস ক্রিয়া কর্ম্ম হইয়া থাকে। হিন্দুরমণীর আধ্যাত্মিক ব্যাপার সামান্য নহে। হিন্দুগৃহের দান, ব্রত, অতিথিসেবা প্রভৃতি কার্য্য একমাত্র রমণীর কর্ত্তৃত্বেই পরিচালিত হইয়া থাকে। তাঁহারা দান ব্রতকে জগতের শ্রেষ্ঠ ব্রত মনে করেন। যাহা দান করেন, তাহা স্বাত্বিক ভাবেই করিয়া থাকেন। প্রতিদান পাইবার জন্য নহে। দীন, দুঃখী, অন্ধ, খঞ্জ, ব্যাধিগ্রস্ত আতুরকেই দান করা হয়। হিন্দুরমণী-দিগের দানশীলতা প্রসিদ্ধ। কত স্থানে জমীদারের স্ত্রী ও ভূম্যধিকারিণীরা দেবালয়, অতিথিশালা, গঙ্গার ঘাট বহু অর্থে নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া থাকেন। তদভিন্ন তীর্থাদি গমন করিয়া তাঁহারা অকাতরে দান করেন।

বৈশাখ মাস হিন্দুদিগের পবিত্র মাস। তাঁহারা এই মাসে নানা ব্রতাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, এবং সুশীতল জল ও মিষ্টান্ন দান করেন। কেহ কেহ নিয়ম পূর্ব্বক এক মাস কাল, এক একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া থাকেন। কেহ বা রাস্তার ধারে পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইয়া জলছত্র স্থাপন করেন। তদ্ব্যতীত দোল দুর্গোৎসব পূজা পর্ব্বে, শ্রাদ্ধাদিকার্য্যে কাঙ্গালি ভোজনে, তাহাদের বস্ত্র ও পয়সাদি যথেষ্ট দান করা হয়। হিন্দুগৃহে অতিথি সেবা পরম ধর্ম্ম। "সর্ব্বদেব ময়োতিথি"। অতিথি উচ্চ হউন বা নীচ হউন, হিন্দু গৃহে অতিথি সৎকার সমাদরে হইয়া থাকে। যাহার যেমন অবস্থা, সাধ্যমত অতিথিকে যথোচিত

সম্মান করিয়া, আদর অভ্যর্থনা করিয়া, পরিতোষরূপে ভোজন করাইয়া থাকেন। অতিথি উপস্থিত হইলে গৃহে যাহা কিছু উপাদেয় বস্তু থাকে, অগ্রে অতিথিকে ভোজন করাইয়া পশ্চাৎ গৃহস্থ ভোজন করিয়া থাকেন। অতিথি সৎকার হিন্দুদিগের কর্ত্তব্যকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। যেহেতু

"অতিথির্পূজিতো যেন বিশ্বঞ্চ তেন পূজিতম্।
অতিথি যস্য তুষ্টো হি তস্য তুষ্টো হরি স্বয়ম্॥"

হিন্দু গৃহস্থের গৃহে দেবতা বা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় দেবতার পূজা, ভোগ, আরতি হইয়া থাকে। গৃহে রমণীগণই দেবতার কার্য্যগুলি অতি পবিত্রভাবে করিয়া থাকেন। হিন্দুগৃহে অষ্টম বা নবম-বর্ষীয়া বালিকাদিগকে দেব-কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। বালিকারা প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া, পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া, দেবপূজার পুষ্প চয়ন করে। দেবতার জন্য পুষ্প মাল্যাদি গ্রথিত করে। দেব পূজার উপকরণ, পুষ্প, চন্দন সজ্জিত করে। সময় সময় তাহাদের জনক জননীর অনুকরণে তাঁহাদের সহ ব্রত, উপবাস, এবং সংযমও করিয়া থাকে।

বৈশাখ মাসে, কার্ত্তিক মাসে, মাঘ মাসে, রমণীদিগের নানাব্রত, পর্ব্ব হয়। বালিকারা শিবপূজা ও ছোট ছোট ব্রতাদি করে। ঐ সকল মাসে হিন্দুগৃহে কেহ কেহ পুরাণ, ভাগবতগীতা, মহাভারত আদি পাঠ দিয়া থাকেন। যাঁহাদের গৃহে বিগ্রহ আছেন, তাঁহারা গৃহের সমস্ত আহার্য্য বস্তু দেবতাকে নিবেদন না করিয়া গ্রহণ করেন না। যে সময় যে ফল মূল নূতন উঠিয়া থাকে সে সকল দ্রব্য দেবতাকে না দিয়া হিন্দুরমণী কখনই গ্রহণ করেন না। প্রাতে ও সন্ধ্যায় রমণীগণ দেব গৃহে দীপ দান করেন, ধূপ, ধুনা, গন্ধ, দ্রব্যে দেবগৃহ সুরভিত করেন। প্রত্যহ দেবতার পূজা অর্চ্চনা করেন, দেবতাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করেন। বর্ষীয়সী মহিলারা, পূজা, জপ, দেবআরাধনায় অর্দ্ধেক সময় অতিবাহিত করেন। তীর্থাদিগমনে হিন্দুরমণীর বাধা নাই ; তাঁহারা ইচ্ছামত স্বামী পুত্রাদি অভিভাবকদিগের সহিত বহুদূর তীর্থাদি ভ্রমণ করিয়া থাকেন। আধুনিক রমণীদিগের অপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের রমণীরা ধর্ম্মানুরাগিণী দেবসেবাপরায়ণা ও ভগবৎ ভক্তিমতী ছিলেন। বর্ত্তমান স্ত্রী সমাজে ধর্ম্ম বন্ধনের শিথিলতা দেখা যায়। হিন্দু বিধবা ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়াই জীবন কাটাইতেন। দেব গৃহ সংস্কার, দেবতা পূজার আয়োজন, দেবতার ভোগ প্রস্তুত ইত্যাদি লইয়া দেব-কার্য্যেই জীবন উৎসর্গ করিতেন।

হিন্দু-গৃহে, সময় সময় হরিনাম সংকীর্ত্তন, রামায়ণ ও পুরাণ গান হইত। সুতরাং আধ্যাত্মিক ব্যাপারেও রমণীর পূর্ণ অধিকার। এমন কি, রমণী অভাবে অধিকাংশ আধ্যাত্মিক কর্ম্মই সুসম্পন্ন হইত না। আমাদের সমাজ ধর্ম্মের উপর স্থাপিত, তাই সমাজ বন্ধনের মূলীভূত কারণ ধর্ম্ম। গার্হস্থ্য ধর্ম্মে, গৃহীর একমাত্র সহযোগী রমণী। সদ্গুণ সম্পন্না হিন্দু রমণী গৃহের লক্ষ্মী, যে গৃহে এই সকল রমণী আদৃতা হয়, সকল দেবতা তথায় বিরাজ করেন।

এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে, বঙ্গসমাজে রমণীর স্থান কোথায়। স্পষ্টতঃ বলিতে হইলে, এই বিশ্ব জগতে মাধ্যাকর্ষণের যে স্থান, বঙ্গ সংসারে রমণীরও সেই স্থান, অথবা যেখানে সুখ, দুঃখ, মোহ, মুক্তি, শোক, শান্তি, সংসার, স্বর্গ সমভাবাপন্ন, দেবগণ যথায় নিত্য বিরাজিত, সেই পবিত্র স্থানেই হিন্দু রমণীর এক মাত্র স্থান।

শ্রীমতী "নীতি-কবিতা" রচয়িত্রী।

উপভোগ।

থাক তুমি ওইখানে—ওই দূরে বসি',
নড়িও না একটুকু, নাহি কয়ো কথা—
প্রাচীরে সংলগ্ন ওই চিত্রপট যথা
নীরব নিস্পন্দ হয়ে বিরাজে উলসি'!

বসন্তের মৃদু মন্দ মলয় মধুর
মাথার কাপড়খানি দিক্ ফেলাইয়া;
চেয়ো না তুলিতে পুনঃ—খেলুক্ নাচিয়া
কপোলে-চিবুকে তব ললিত চিকুর!

স্থির অচঞ্চল ভাবে—কমল নয়ন
রাখ তুলি' মোর এই ম্লান মুখ পানে;
ওই স্মিত হাসিটুকু ও ফুল্ল বয়ানে
ফুটাইয়ে রাখ চির-পরাণ-মোহন।

রেখো না এখন মনে কোনও ভাবনা,
সঙ্কোচে খেদায়ে দূরে—দাও বিকাশিতে
উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য মহা—সারা শরীরেতে
দাও উথলিতে তব যৌবন-যমুনা!

সৌন্দর্য্যের উপাসক দীন ভক্ত আমি
আঁকি' লই চিত্তে ওই সুষমা মহান্;
আঁখি পথে প্রাণ ভরি করি আজি পান
অপার মাধুরী তব—ভুলি দিন-যামি!

ঘটিয়াছে আজি সখি, প্রথম সুযোগ
কত বরষের পরে—কত দূরতায়—
নাহি দিও কোনো বাধা; চকোরের প্রায়
না ছুঁয়ে চাঁদেরে সুধা করি উপভোগ!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত রায়।

দীর্ঘনিদ্রা * ও যোগ।

(৩)

উচ্চ ও নিম্ন, প্রায় সকল শ্রেণীর প্রাণী-ই দীর্ঘনিদ্রায় অল্পাধিক পরিমাণে অভিভূত হয়। পূর্ব্বে, জন্তুগণের প্রায় সকল শ্রেণীর কথাই আলোচিত হইয়াছে। তৎকালে উদ্ভিদগণের দীর্ঘনিদ্রার কথাও উল্লেখ করা হইয়াছিল, কিন্তু আলোচনা করা হয় নাই। এক্ষণে সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে।

জন্তুগণের ন্যায় উদ্ভিদগণেরও অচিহ্নিত † অবস্থাই অনুন্নত অবস্থা। চিহ্নিত অবস্থা উহার পরবর্ত্তী। আবার, একপত্র ‡ শ্রেণী হইতে দ্বি-পত্র § শ্রেণী সম্ভবতঃ অধিক উন্নত। নিম্নশ্রেণীস্থ দিগের জীবন-ব্যাপার জটিল নহে। তাহাদের কর্ম্ম অল্প এবং সহজ। আর, দীর্ঘ-নিদ্রাও তাহাদিগেরই অধিক। অচিহ্নিতগণের মধ্যে অনেকে শীত ঋতুতে, কেহ বা গ্রীষ্মকালে মৃতের ন্যায় হয়। চিহ্নিতগণের মধ্যেও ঋতু-ভেদে উহাদিগের জীবন-ব্যাপার স্তম্ভিত হয়। শীতকালে, কখন বা গ্রীষ্মকালে, কোন কোন উদ্ভিদের কাণ্ড শুকাইয়া যায়, কাহারও বা পত্র খসিয়া পড়ে, অন্যের ত্বক্ শুষ্ক হয়, বর্ণের উজ্জ্বলতা কমিয়া যায়, রস সঞ্চালনের বেগ মন্দ হয়, এবং আভ্যন্তরিক তাপও হ্রাস হয়। ইহা জন্তুগণের দীর্ঘনিদ্রার অনুরূপ ঘটনা। * যখন এইরূপ হয় তখনই উদ্ভিদের স্তম্ভনকাল। এইকালে কোন শ্রেণীর উদ্ভিদের সমস্তই শুকাইয়া মরিয়া যায়, কেবল মাটির নীচে যে ভাগ থাকে তাহাতেই রস সঞ্চিত হয়। স্তম্ভনঋতু অতীত হইলে এই ভাগ হইতেই পূর্ণাবয়ব উদ্ভিদ জাত হয়। বড় বৃক্ষ সকলের ডাল মরে না, কিন্তু পত্রের বৃন্ত মরিয়া যায়, এবং পত্রও বৃক্ষ হইতে খসিয়া পড়ে। কাণ্ডের ও শাখার ত্বকে রস কমিয়া যায়, তাহা শুষ্ক ও বিবর্ণ হয়। এ সকলই দীর্ঘ-নিদ্রার ফল। উদ্ভিদের যখন এই অবস্থা, তখনই উহারা দীর্ঘ-নিদ্রিত। জন্তুগণেরও দীর্ঘ-নিদ্রার সময়ে এইরূপই হইয়া থাকে। সুতরাং সমস্ত জীবের মধ্যেই দীর্ঘ-নিদ্রার অবস্থা লক্ষিত হয়। এই সময়ে ইহাদিগের জীবচৈতন্য যেন সুষুপ্ত অবস্থায় নিমগ্ন থাকে। ক্রমে কর্ম্ম যতই

---

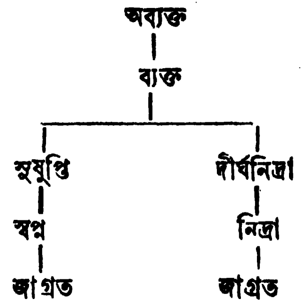
* Hibernation. † স্ত্রীপুংভেদচিহ্নরহিত।

‡ Monocotyledon. § Dicotyledon.

* Many plants die down in winter * * many trees shed their leaves. * * These phenomena in the vegetable world are regarded as analogous to those of hibernation in animals.

—*Ency. Brit. 9th Ed, Vol. 11 P. 789.*

আধিপত্য স্থাপন করে, জীবও ততই জাগ্রত হয়। এস্থলে পূর্ব্বের সেই চিত্র স্মরণ করিতে হয়। চিত্রের বাম পার্শ্বে ব্রহ্ম-চৈতন্যের ত্রিভাব, এবং দক্ষিণ পার্শ্বে জীব-চৈতন্যের ত্রিভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদুভয় প্রকৃতপক্ষে একই। অব্যক্ত অবস্থার পর ব্যক্তাবস্থার প্রথম ভাগে কর্ম্মের প্রভাব অতীব কম; তখন চৈতন্যও সুষুপ্ত। জীবচৈতন্যের এই অবস্থা দীর্ঘ-নিদ্রা। তৎপর ক্রমে কর্ম্মের প্রভাব বৃদ্ধি হইতে হইতে উভয় পক্ষেই জাগ্রত অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।



কিন্তু মানব পর্য্যন্তও এই অবস্থা সম্যক প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দেবগণ অ-নিদ্র, কারণ তাঁহারা কর্ম্মময়। কিন্তু অনন্ত একই পদার্থ। কর্ম্ম অনন্ত হইলেও যাহা, সুষুপ্তি অনন্ত হইলেও তাহা; উভয়েরই ফল এক। সুষুপ্তি অনন্ত অর্থে, কর্ম্মের অত্যন্তাভাব; সুতরাং তুরীয় অবস্থা; যাহাকে অব্যক্ত বলিয়াছি। তবেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ক্রমে কর্ম্মের প্রভাব বশতঃ যেমন অব্যক্ত হইতে ব্যক্তাবস্থা; আর যেমন ব্যক্তাবস্থায় কর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হেতু সুষুপ্তি হইতে জাগ্রত অবস্থা, তেমন-ই জাগ্রত অবস্থাও পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হইলে, অর্থাৎ অনন্তস্ফূরণ প্রাপ্ত হইলে আবার অব্যক্ত অবস্থায় উপনীত হয়। এ গতি চক্রবৎ। যাহা হইতে উদ্ভব, আবার তাহাতেই বিলয়। অব্যক্ত হইতেই আরম্ভ, আবার অব্যক্তেই পরিণতি। মধ্যাবস্থায় কর্ম্ম, উহাই ব্যক্ত।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্ত মধ্যানি ভারত।
অব্যক্ত নিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা॥

এই কথাই স্পেন্সারের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, অননুভূত হইতে অনুভূত, এবং তাহা হইতে আবার অননুভূত *; এইরূপেই ব্রহ্মাণ্ড অভিব্যক্ত হয়। নিষ্ক্রিয়তা হইতে কর্ম্ম, আবার কর্ম্ম হইতেই নিষ্ক্রিয়তা; কারণ অনুভূতি কর্ম্মেরই ফল। সুতরাং যোগের সফলতাই নিষ্ক্রিয়তার পুনরানয়ন করা। এইহেতু চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ করা আবশ্যক। এইরূপে নিষ্ক্রিয়তা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেই ব্যক্ত অব্যক্তে লীন হইবে। এই নিমিত্ত ক্রমে শান্তি ও সমতা অবলম্বন করা বিধেয়। ইহাতে গত্যন্তর নাই।

শ্রীশশধর রায়।

* From the imperceptible to the perceptible and again from the perceptible to the imperceptible. —*First Principles 5th Ed. P.* 280.

হরিদ্রা।

(উদ্ধৃত)

হরিদ্রা শব্দের বাঙ্গালা নাম হলুদ। হিন্দুস্থানীরা ইহাকে হল্‌দী এবং ইংরাজেরা ইহাকে "টর্‌মারিক" (Turmeric) কহিয়া থাকেন। ভারত-বর্ষীয়দিগের প্রতিঘরে নানা কারণে ইহা নিত্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা অতীব প্রয়োজনীয় পদার্থ। পাক ক্রিয়ায়, শুভ উৎসবে, বিশেষতঃ বিবাহোপলক্ষে, রং প্রস্তুত করণে, ঔষধে এবং তদ্ভিন্ন বহুবিধ প্রয়োজনে হরিদ্রা ব্যবহৃত হয়। অনেক স্থানে স্ত্রীলোকেরা ইহা গাত্রে মাখে এবং ইউরোপ ও আমেরিকা দেশেও ইহার যথেষ্ট আবশ্যকতা আছে। খনা কহিয়াছেন—

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠেতে হলুদ রোও।
দাবা পাশা খেলা ফেলিয়া থোও॥
আষাঢ়ে শ্রাবণে নিড়ায়ে মাটি।
ভাদরে নিড়ায়ে করিবে আঁটি॥
অন্যথা নিয়মে পুঁতিবে হল্‌দি।
পৃথিবী বলেন তাতেই ফল দি॥

পণ্ডিতা খনার বচনানুসারে অদ্যাপি হলুদের চাষ এইরূপেই চলিয়া আসিতেছে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে ইহার জন্য মাটি নিড়াইয়া রাখা উচিত। সর্ব্বপ্রথমে ভূমির প্রকৃতি বুঝিয়া হরিদ্রার আবাদে মনোনিবেশ করা কর্ত্তব্য। যে প্রকার জমি হয়, হলুদও সেই প্রকার হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে স্থলে বালুকার প্রচুরতা দেখা যায় অথবা যেখানে এঁটেল মাটি থাকে সে স্থলে হলুদের চাষ ভালরূপে হইতে পারে না। যে মাটি কিছুদিনের "পতিত জমি" বলিয়া পরিচিত অথবা দুই এক বৎসরকাল পর্য্যন্ত যে ভূমিতে আর কোন দ্রব্যের চাষ হয় নাই সেই জমিতেই হলুদের আবাদ অতি সুন্দররূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে। যে ভূমিতে বন্যার আশঙ্কা থাকে অথবা যেখানে অধিক পরিমাণে জল জমিয়া থাকিবার সম্ভাবনা, সে জমিতে হরিদ্রার চাষ করা বিধেয় নহে। হলুদের চাষের ভূমি প্রায় দেড় হস্ত গভীর হওয়া আবশ্যক। মাটি যেন শক্ত না হয় এবং মাটিতে ইট, পাথর, কাঁকর বা ডেলা না থাকে। মাটিকে খুব আল্‌গা (সরল) করিয়া এবং মৃত্তিকাকে চারিদিকে সমপরিমাণে ছড়াইয়া দিয়া বৈশাখ মাসের শুভ দিনে কোদালির সহায়তায় পুনরায় মাটিকে কাটিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। মাটিকে গুঁড়া করিয়া

লইলে ভাল হয়। তদনন্তর এক এক হস্ত ব্যবধানে ছোট ছোট গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্ত বা "জুলি"র মধ্যে অর্দ্ধ হস্ত অন্তর এক একটী বীজ লাগাইয়া দিবে। বলা বাহুল্য, হরিদ্রার বীজফল হইতে উৎপন্ন হয় না, ইহার মূল বা গেঁড় লাগাইতে হয়। মূলকে অনেক স্থানে কৃষকেরা হলুদ-মুড়ো কহিয়া থাকে। সচরাচর দুই জাতীয় হরিদ্রা আবাদ এদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই প্রকারই উৎকৃষ্ট। ইহাদের একটির নাম বাঘনখা, অপরটির নাম দুর্গামেড়। অপরাপর প্রকারের হলুদ দেখা যায় কিন্তু তাহা ইহাদের তুলনায় নিকৃষ্ট। হলুদের চাষে বীজ নির্ব্বাচনের বহুদর্শীতা থাকা আবশ্যক; বীজ উৎকৃষ্ট হইলেই হরিদ্রাও উৎকৃষ্ট হয়। ভাল বীজ, ভাল জমি এবং ভাল যত্ন হইলে অতীব উৎকৃষ্ট হলুদ প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। ভাল হলুদে কৃষকের প্রায়ই লোকসান হয় না, কারণ ভাল হরিদ্রার নিত্য প্রয়োজন বশতঃ ইহার কাট্‌তিও যথেষ্ট পরিমাণে হইয়া থাকে। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র হরিদ্রার প্রয়োজন আছে। সুতরাং নানা দেশে হলুদের রপ্তানী হইয়া থাকে। এই কারণে হরিদ্রার চাষে প্রায়ই ক্ষতি হয় না এবং বাজারে হলুদ প্রায়ই অবিক্রী থাকে না। খণার মতে বৈশাখ মাসে প্রথম বৃষ্টির পরেই হলুদের চাষ করা কর্ত্তব্য। গোড়াগুলি পুঁতিবার পূর্ব্বে ধারাল ছুরি দ্বারা অগ্রভাগকে অল্প অল্প কাটিয়া দিলে ভাল হয়। পাণের ক্ষেত্রকে যেমন চাষারা বরুজ কহিয়া থাকে, হরিদ্রার ক্ষেত্রকে কৃষকেরা হলুদবাড়ী বলিয়া সম্বোধন করে।

হরিদ্রার গাছ বাহির হইতে দেখিলে তাহার নিড়ানী আরম্ভ করিয়া দেওয়া আবশ্যক। ঘাস বা কণ্টক জন্মাইতে দেওয়া উচিত নহে। মাটিকে সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। বৃষ্টির অব্যবহিত পরে হলুদবাড়ীর কার্য্য আরম্ভ করা বিধেয় নহে। জল শুকাইয়া গিয়া মাটি একটু সরস থাকিতে থাকিতে কার্য্য আরম্ভ করাই নিয়ম। আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত হলুদবাড়ীর কাজ অল্পে অল্পে চলে; পৌষ বা মাঘ মাসে গাছগুলি শুখাইতে আরম্ভ হইলেই এক একটী গাছকে মোড়ন দিয়া বাঁধিয়া দিবে। গাছ সতেজ হইলে মোড়ন না দিলেও ক্ষতি হয় না। গাছগুলি সুন্দররূপে শুষ্ক হইয়া গেলে গাছে আগুন লাগাইয়া দেওয়া উচিত; পাতাসমূহ দগ্ধ ও ভস্মাকারে পরিণত হইলে ঐ দগ্ধ ছাই উৎকৃষ্ট "সার" (Manure) বলিয়া গণ্য হয়। অধিক কি, জমিতে ঐ সার ছড়াইয়া দিলে, কিম্বা হলুদবাড়ীর ভূমিতে ধান্য

আজাইলে, জমির উর্ব্বরতা শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় এবং প্রচুর ধান্য জন্মে।

হলুদের জমিতে গোবর, ছাগলের নাদি, অস্থি চূর্ণ এবং ঘুঁটে বা ঘশির ছাই "সার" রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রতি বিঘা জমিতে, হরিদ্রার চাষে, ১২৫৲ টাকা হইতে ১৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত লাভ হইতে পারে।

হলুদ তুলিয়া তাহাতে অল্প পরিমাণে গোবর মাখাইয়া গরম জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। তদনন্তর রৌদ্রে উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া লওয়া আবশ্যক। শুষ্ক হইয়া গেলে একদিন বা দুই দিন ঢাকিয়া রাখিবে, তাহার পরে বিক্রয়ের জন্য বাজারে প্রেরণ করিতে হয়। পাঁচ ছয় বিঘা ভাল জমিতে, যত্নের ও সাবধানতার সহিত, যদি হরিদ্রার আবাদ করা যায়, তাহা হইলে একটী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরমসুখে ও স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হয়। সামান্য বেতনের গোলামী করা অপেক্ষা এরূপ কার্য্য কি মন্দ? হলুদের চাষে লাভ ভিন্ন ক্ষতির কথা প্রায়ই শুনা যায় না। পৃথিবীর নানা স্থানে হলুদের নিত্য ব্যবহার আছে।—"স্বদেশ"।

সাহিত্য-সমাচার।

১। নীতি-কবিতা। মাইনর স্কুল সমূহের ৪র্থ শ্রেণার পাঠ্যগ্রন্থ। ডিমাই ১২ পেজী দুই ফর্ম্মা। দ্বিতীয় সংস্করণ। ১৩০৬ সাল। মূল্য ৵০।

বাসবদত্তা. রসতরঙ্গিণী, এবং শিশুশিক্ষাদি শিশু-পাঠ্য গ্রন্থসমূহের রচয়িতা স্বনামধন্য সুকবি ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বিদুষী দৌহিত্রী শ্রীমতী "ভাব-প্রকাশ" রচয়িত্রী কর্ত্তৃক বিরচিত। এই কামিনী-কুল কমলিনী, স্কুল সমূহের ইনস্পেক্টার শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের সহধর্ম্মিণী। ইনি একে একে অনেক গুলীন, বালকগণের পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের যথেষ্ট পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। ইহার লেখনী এখনও পূর্ব্ববৎ সমভাবেই পরিচালিত হইতেছে। একাধারে পদ্য ও গদ্য লেখা সামান্য ক্ষমতার কার্য্য নহে। এই উভয় প্রকার রচনাতেই ইনি বিশেষ পারদর্শিনী। নিরন্তর গৃহকর্ম্মরতা অন্তঃপুর বাসিনী হিন্দুমহিলার পক্ষে এরূপ গ্রন্থাদি রচনা সামান্য গৌরবের কথা নহে। আলোচ্য পুস্তক খানিতে ঈশ্বর স্তোত্র, পিতা, মাতা, শিক্ষা, অহিংসা, ধর্ম্ম, ষড় ঋতুর বর্ণনা প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা আছে। ইহার প্রত্যেক প্রবন্ধই সরল, সরস,

সহজ ও সুমিষ্ট। এই পুস্তক পাঠে সুকুমারমতি বালকবালিকার যথেষ্ট উপকার হইবে, সন্দেহ নাই। আমরা প্রত্যেক বালকবালিকার সুকোমল করে এই ক্ষুদ্র নীতি পুস্তকখানি সংন্যস্ত দেখিতে বাসনা করি। এই পুস্তক খানি না পড়িলে, বালকবালিকাদিগের নীতিগ্রন্থপাঠ অসম্পূর্ণ থাকিবে। বালকবালিকা-দিগের পাঠ্য, নীতি পুস্তক সমূহের মধ্যে এই খানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। এই পুস্তক খানিতে যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত পদ্যপাঠ প্রথম ভাগের ছায়া পড়িয়াছে দেখা যায়।

২। **আদর্শ-গৃহিণী।** ডিমাই ১২ পেজী ৩ ফর্ম্মা, ৩৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ।০ চারি আনা। এখানিও পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকর্ত্রী কর্ত্তৃক বিরচিত। রচয়িত্রী মহাশয়া নিজে আদর্শ গৃহিণী না হইলে কখনই এরূপ পুস্তক লিখিয়া যশঃ-সুখ্যাতি অর্জ্জন করিতে সমর্থা হইতেন না। কিরূপ কার্য্য করিলে, কোন্ পথে চলিলে, কিরূপ সংযম করিতে পারিলে, আদর্শ গৃহিণী হইতে পারা যায়, তাহার কোন কথাই ইহাতে বাদ পড়ে নাই। সাংসারিক সকল কথাই ইহাতে লিখিত আছে, যাহা একান্ত প্রয়োজনীয়, শিক্ষনীয় ও অনুকরণীয়। এই পুস্তক খানিতে জানিবার ও শিখিবার অনেক বিষয় আছে। গৃহিণীকে সুশিক্ষা দিবার কোন বিষয়ই এই পুস্তকে বাদ পড়ে নাই। পুরুষের হাত দিয়া এরূপ পুস্তক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ভাবে কখনই প্রকাশিত হইতে পারে না। এই পুস্তক খানি প্রণয়ন করিয়া প্রণেত্রী ধন্যা হইয়াছেন। আমরা প্রত্যেক গৃহিণীকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। এবং প্রত্যেক 'কর্ত্তা'কেও কহিতেছি, যদি তিনি নিজ স্ত্রীকে সংসারে যথার্থ আদর্শ গৃহিণী করিতে অভিলাষ করেন, তাহা হইলে কাল বিলম্ব না করিয়া এই "আদর্শ-গৃহিণী"কে তাঁহার স্ত্রীর সঙ্গিনী করিয়া রাখুন। এই শ্রেণীর পুস্তক বঙ্গভাষায় অতি বিরল। পুস্তক খানির মূল্য ।০ আনা স্থলে, ডাক মাশুল সমেত ৵০ আনা করিলে লোকসান হয় বলিয়া বোধ হয় না।

৩। **আদর্শ-রমণী।** এখানিও "নীতি-কবিতা" রচয়িত্রী প্রণীত। ক্ষুদ্র গ্রন্থ—আকার ডিমাই ১২ পেজী ৪২ পৃষ্ঠা মূল্য ।০ চারি আনা। ইহাতে আদর্শ রমণী, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অহল্যাবাই ও রাণী ভবানী এই ছয়টী পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক রমণীর সংক্ষিপ্ত জীবনী (কবিতায়) পয়ার ছন্দে লিখিত হইয়াছে। জীবন কাহিনী গুলি অতি সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইলেও তাহা সুন্দর, সরল ও উপাদেয় হইয়াছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এই

আলোচ্য পুস্তকখানিতে বহুল ভ্রম প্রমাদাদি পরিলক্ষিত হয়। এই পুস্তকখানির ভাষাও তাদৃশী পরিশুদ্ধা নহে। পয়ারে যতি পতনেরও অসদ্ভাব নাই। দুই চারিটী উদ্ধৃত হইল—

১। শিরঃপীড়া ঘোরতর হইল উপস্থিত—(২০ পৃষ্ঠা)
২। বৃক্ষ হইতে নামি ত্বরা সাবিত্রীরে কয়—(২১ পৃষ্ঠা)
৩। কিছুই সত্য নহে মিথ্যা এ সংসারে—(২৩ পৃষ্ঠা)
৪। সাবিত্রী-বাক্যে ধর্ম্মের হয় অতি প্রীতি—(২৫ পৃষ্ঠা)
৫। সত্যবান হৈতে হউক শতেক কুমার—(২৫ পৃষ্ঠা)

এবং—উৎসর্গীকৃত, আমাত্ত, স্বপত্নী, অশ্রুজল, দিবানিশি, দুরান্তর, সলজ্জিত, সতীত্ব, স্বয়ংম্বর, পরাজয়নরপতি, কান্না-ছাড়া, জগতেতে, নিয়োজনে, অদ্যাপিও, পরদুঃখে সকাতর, প্রভৃতি অশুদ্ধ শব্দও বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। এই পুস্তকখানি ১৩০৫ সালে, ৫৪।২।১ নং গ্রে-ষ্ট্রীটস্থিত আর্য্য-যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহাতে ছাপার ভুল বিস্তর পরিলক্ষিত হয়। পুস্তকখানির উপাখ্যান অংশ উত্তম; রচনায়ও যথেষ্ট রস আছে; কিন্তু ছাপার ভুলে পুস্তকখানি মাটি হইয়া গিয়াছে। এই পুস্তকখানির সংশোধিত সংস্করণ দেখিতে ইচ্ছা করি। পুস্তকখানি পুনর্মুদ্রাঙ্কণের যোগ্য। ইহার চারি আনা মূল্য, অধিক বলিয়া বিবেচিত হয়।

৪। দ্রৌপদী। কাব্য-গ্রন্থ; আকার ডিমাই ১২ পেজী, ৩৬ পৃষ্ঠা মাত্র। মূল্য ৷৷০ আট আনা। এই ক্ষুদ্র কাব্য-গ্রন্থখানি রংপুর নিবাসী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের বিদুষী পত্নী শ্রীমতী জগদীশ্বরী দেবী প্রণীত। কবি ভারবি, তাঁহার কিরাতার্জ্জুনীয় গ্রন্থে যেরূপ ভাবে দ্রৌপদী-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহারই অনুকরণে এই কাব্যখানি লিখিত হইয়াছে। লেখিকার প্রয়াস সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। স্থল বিশেষে দ্রৌপদীর চরিত্র অতি উপাদেয় ও সুন্দর হইয়াছে। লেখিকা মহাশয়া কল্পনা-বলে তাঁহার দ্রৌপদীকে যে ভাবে আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। ইহাতে কিছু নূতনত্ব, মধুরত্ব ও অপূর্ব্বত্বও আছে। এই গ্রন্থ পাঠ করিবার কালে, স্থল বিশেষে উৎসাহিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিতে হয়। ইহার ভাষাও গভীর, গম্ভীর অথচ মাধুর্য্যগুণ বিশিষ্ট। তর্করত্ন মহাশয় একদিকে যেমন—ন্যায় শাস্ত্রে অদ্বিতীয়, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও অন্য দিকে অর্থাৎ কাব্যরচনায় সুনিপুণা। ইঁহার রচিত কবিতাদি প্রায়ই প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে। লেখিকার অপর কোন গ্রন্থ আছে কি না তাহা আমরা জানি না। না থাকিলেও এই একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকেই তাঁহার কীর্ত্তি বজায় থাকিবে। যতদিন বঙ্গ-ভাষার আদর থাকিবে, ততদিন "দ্রৌপদী" বঙ্গ-সমাজে দেদীপ্যমানা থাকিয়া, লেখিকার অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে।

পুস্তকখানির মূল্য ৷৷০ আট আনা স্থলে ৵০ দুই আনা ধার্য্য করিলেও লোকসান হয় বলিয়া বোধ হয় না।

অঙ্কুর।

বীজাদঙ্কুরনিষ্পত্তিরঙ্কুরাদ্বৃক্ষসম্ভবঃ।
ফলপ্রদোভবেদ্বৃক্ষইত্থমাশাক্রমোমতঃ॥

২য় বর্ষ।] চৈত্র, ১৩১৩। [৩য় সংখ্যা।

ভূস্বর্গ।

(১ম বর্ষের ১০১ পৃষ্ঠার পর।)

বর্ণিয়ো বলেন, আমি পাঁচ ছয় দিন এখানে ছিলাম। এই সময় সেণ্ড-ব্রেরীর এই অলৌকিক কাহিনীর কারণ অনুসন্ধান নিমিত্ত আমি সাধ্যানুসারে প্রয়াস পাই। যে পর্ব্বতের সানুদেশে এই নির্ঝর অবস্থিত, তাহার শিখরোপরি বহুকষ্টে আরোহণ করতঃ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত বিষয় আলোচনা ও পর্য্যালোচনা করি। পর্ব্বতটী উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত এবং অন্যান্য পর্ব্বত হইতে সম্পূর্ণ রূপে বিচ্ছিন্ন, তত্রাচ উহার অতি সন্নিকটেই অপরাপর পর্ব্বত বিদ্যমান, উহার আকৃতি অনেকটা গর্দ্দভের পৃষ্ঠের ন্যায় এবং উহার শিখর-দেশের প্রশস্ততা বড় জোর শত পদ পরিমিত। এই পর্ব্বতের সবুজ তৃণাচ্ছাদিত একটী অংশ পূর্ব্বাভি-মুখী; তত্রাচ বিপরীত দিকে অপরাপর পর্ব্বত থাকা হেতু, প্রাতঃকালে আট ঘটিকার পূর্ব্বে উহার উপর সূর্য্য-কিরণ পতিত হয় না। পশ্চিম দিকে যে অংশটা আছে, তাহা বৃক্ষ ও লতা গুল্মাদিতে পরিবেষ্টিত ও সমাচ্ছন্ন। এই সকল অবস্থা দেখিয়া আমি বুঝিতে পারি যে, সূর্য্যের উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধির জন্যই নির্ঝরের জলপাতের গতি হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সেণ্ড-ব্রেরী হইতে প্রত্যাগমন করতঃ আমরা 'আচিভেল' (Achiavel) অভিমুখে অগ্রসর হই। আচিভেল প্রাচীন কাশ্মীর-রাজগণের এবং সম্প্রতি মোগল সম্রাটগণের প্রমোদ গৃহ। এখানে একটী সুন্দর জলপ্রপাত আছে, তাহা হইতে

এই গৃহের এবং গৃহ-সন্নিহিত উদ্যানের চতুর্দ্দিকে শত ধারায় মনোরম ভাবে প্রভূত জল বিচ্ছুরিত হইয়া থাকে। নিঝর হইতে এতই বেগে ও পর্য্যাপ্ত রূপে জল নির্গত হয় যে, দেখিয়া একটী নদী বলিয়াই মনে হয়। উদ্যানটীও মনোহর, পরিভ্রমণের নানা রূপ অদ্ভুত বর্ত্ম রহিয়াছে, পথের চতুর্দ্দিকে নির্ঝরের জলকণা মৃদু ভাবে পড়িতেছে। এতদ্ব্যতীত,উহার মধ্যে পৃথক্ কতিপয় তড়াগ ও দীর্ঘিকাও আছে, তাহাতে নানা প্রকারের নানা বর্ণের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ মৎস্য ক্রীড়ারত। উদ্যানে আপেল, পেয়ারা, খেজুর, চেরী, এপ্রিকট্ প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বৃক্ষ ফলভারে অবনত শিরে কালযাপন করিতেছে। রাত্রিকালে যখন উজ্জ্বল দীপালোকে উদ্যান ও নিঝরটি আলোকিত হয়, তখনকার দৃশ্য কল্পনাতীত মনোহারী,—বর্ণনার অতীত।

আচিভেল হইতে কিয়দ্দূরে আর একটী রাজ-উদ্যান আছে, তাহাও আচিভেলের ন্যায়ই সুন্দর ও সুদৃশ্য। তবে, তাহার একটু বিশেষত্ব এই যে, উদ্যানস্থিত পুষ্করিণীতে যে সকল মৎস্য আছে, আহ্বান করিলে বা জলে রুটি ফেলিয়া দিলে উহারা আহ্বানকারীর নিকট জলের কিনারায় আসিয়া থাকে। উহাদের মধ্যে যেটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মৎস্য, সেইটীর নাসিকাতে একটী স্বর্ণাঙ্গুরীয় পরাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ঐ অঙ্গুরীয়কের উপর একটী লিপিও আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, ঔরঙ্গজেবের পিতামহ সম্রাট জাহাঙ্গীরের মহিষী নুর মহল মৎস্যের নাসিকায় ঐ অঙ্গুরীয়কটী বদ্ধ করিয়া দেন।

এই সময় বর্ণিয়োর তত্ত্বাবধারক সেনাপতি দানেসমন্ত খাঁ তাঁহাকে আর একটী আশ্চর্য্যকর ব্যাপার দেখিয়া আসিতে বলেন। সেনাপতি বলিয়াছিলেন যে, এই ঘটনা অবলোকন করিলে নিশ্চয়ই আপনি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ মোসলমান ধর্ম্ম আলিঙ্গন করিবেন। সেনাপতি বলেন,—"অনতিদূরে অবস্থিত বারমোলে (Baramoulay) নামক স্থানে গমন করুন। তথায় আমাদের একটী মস্জিদ্ ও এক পীরের একটী সমাধি আছে। দেখিতে পাইবেন, অদ্যাপি তথায় নানাস্থান হইতে অসংখ্য নরনারী রোগ-আরোগ্য কামনায় একত্রিত হইয়া থাকে। ঐ সকল অদ্ভুত উপায়ে আরোগ্যের কথা আপনি বিশ্বাস না করিলেও দেখিতে পাইবেন; কিন্তু একটী ঘটনা আপনাকে অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে। তথায় প্রকাণ্ড এক প্রস্তরখণ্ড আছে, অদ্ভুত শক্তিশালী ব্যক্তিও তাহা তিলমাত্র স্থানান্তরিত বা উত্তোলিত করিতে সমর্থ হয় না। একাদশ জন ব্যক্তি পীরের উপাসনা করণান্তর একাদশ অঙ্গুলীর সাহায্যে

অক্লেশে তৃণখণ্ডবৎ তাহা ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া থাকে,—তাহারা ইহাতে প্রস্তরের কোনো গুরুত্বই উপলব্ধি করিতে পারে না।” সেনাপতির বাক্য শ্রবণ করতঃ বর্ণিয়ো অশ্বারোহণে, ভৃত্য সমভিব্যাহারে, তৎস্থানাভিমুখে যাত্রা করেন। কথিত স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিতে পান যে, পীরের চতুর্দ্দিকে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়াইয়া আছে—ইহারা সকলেই পীড়িত। মস্‌জিদের পার্শ্বে পাকের ঘরে বড় বড় ডেগ্‌চিতে মাংস ও তণ্ডুল সিদ্ধ হইতেছে,—অনুমান হয় পীড়িতগণের আকর্ষণের ইহাই চুম্বক প্রস্তর। মস্‌জিদের অপর পার্শ্বে একটী উদ্যান এবং মোল্লাগণের বাসগৃহ,—উহারা তথায় অতি সুখস্বচ্ছন্দে পীরের অলৌকিক পবিত্রতার ছায়ায় থাকিয়া জীবনাতিবাহিত করে। তাহারা যেমন সুখে ও জাঁকজমকের সহিত জীবন অতিবাহিত করে, বাহিরের লোকদিগের—আগন্তুক পীড়িত ভক্তদের সম্মুখেও তেমনি জাঁকজমকের ও সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু ডাঃ বর্ণিয়োর দুর্ভাগ্য, সেদিন আর তাহারা কিছুই করিতে উদ্যত হয় না,—পীড়িত ভক্তরা হতাশ হইয়া বসিয়া আছে। আর সেই বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড—যাহা দেখিতে সাহেবের আগমন, তাহাও নিশ্চল ভাবে ধরণীর শান্ত বক্ষে পড়িয়া আছে। তৎসম্মুখে মোল্লাগণের দলের এগার জন লোক বসিয়া আছে। ইহারা প্রবঞ্চক, দর্শকগণকে দূরে দাঁড় করাইয়া, তাহাদের দিকে পশ্চাৎ করিয়া যে ভাবে প্রস্তর উত্তোলন করিয়া থাকে, তাহাতে দর্শকগণ দেখিতেই পায় না—হস্তের সাহায্যে কি অঙ্গুলীর সাহায্যে তাহা উত্তোলিত হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা হস্তের সাহায্যেই তাহা উত্তোলন করে, পরে বলিয়া থাকে—ঠিক যেন তৃণগাছির ন্যায় হাল্‌কা। এটা উহাদের বুজরুকি ও ভাঁড়ামি; বর্ণিয়ো তাহা ধরিতে পারেন। তত্রাচ তাঁহাকে ভয়ে ভয়ে অজ্ঞ মোল্লাদিগের নিকট ইহার পোষকতা করিতে ও অন্যান্য সকলের ন্যায় ‘কেরামৎ, কেরামৎ’ বলিয়া চীৎকার করিতে হয়। বর্ণিয়ো মোল্লাদিগকে একটী মুদ্রা দান করতঃ অতি নম্র ভাবে প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন যে, তাহাদের দশজনের সহিত একবার তাঁহাকে এই প্রস্তর উত্তোলন কার্য্যে নিযুক্ত করা হোক্। তাহাদিগকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া ফিরিঙ্গি-পুঙ্গব আর একটী মুদ্রা প্রদান করিয়া বলিলেন যে, এই অদ্ভুত কাণ্ডের সত্যতা বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। অতঃপর তাহাদের একজন তাঁহাকে স্বস্থান ছাড়িয়া দিল; তাহারা বোধ হয় ভাবিয়াছিল, সাহেব তাহাদিগকে সাহায্য না করিলেও তাহারা দশজনেই

উত্তোলন করিতে সমর্থ হইবে। পরে এই ভাবে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া দাঁড়াইল যে, সাহেব যেন তাহাদের প্রতারণার বিষয় কিছুই বুঝিতে না পারেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাহারা নিজেদের ভ্রম বুঝিতে পারিল; বর্ণিয়ো প্রস্তরের যে দিক্‌টা ধরিয়াছিলেন তাহা নীচু হইয়া পড়িল, কারণ কেবলমাত্র অঙ্গুলীর সাহায্যে তাহা ঠিক ভাবে রাখা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। অবশেষে সঙ্গী দশজনের ন্যায় বর্ণিয়োও হস্তের অপর অংশের সাহায্য গ্রহণ করেন এবং অতি কষ্টে তাহা উপরে উত্তোলন করেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন, তাহারা তৎপ্রতি রোষ কষায়িত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেছে, তখন তিনি অমঙ্গলের আশঙ্কা করতঃ 'কেরামৎ, কেরামৎ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং নিজের দেহকে প্রস্তরখণ্ডে পরিণত করার বিপদ হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় আর একটী মুদ্রা প্রদান করিলেন। তৎপর গোপনে সেই জনতা হইতে বহির্গত হইয়া পানাহার না করিয়াই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করতঃ পীর-দর্শন-সুখানুভব করিতে করিতে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিলেন।

প্রত্যাবর্ত্তন কালে তিনি একটী হ্রদ দেখিতে গমন করেন। বারমৌলের নিকট দিয়া যে নদী প্রবাহিত, সেই নদী ইহার মধ্য স্থান দিয়া প্রধাবিত হইতেছে। উহা মৎস্যে পরিপূর্ণ এবং পাতিহাঁস, বন্য মুর্‌গী ও অন্যান্য জলচর জন্তু সমাচ্ছন্ন। শীতকালে মোগল শাসনকর্ত্তারা এখানে শীকারে আসিতেন এবং আমোদ প্রমোদে মত্ত হইয়া অনেক দিবস কাটাইয়া যাইতেন। হ্রদের মধ্যে একটী তপস্বীর আশ্রম-উদ্যান ছিল; উহা জলের উপর ভাসমান বলিয়া লোকে তৎসম্বন্ধে নানা অলৌকিক কাহিনী প্রচার করিত। সন্ন্যাসী এই আশ্রম ত্যাগ করতঃ এক পদও অন্যত্র গমন করিতেন না। কাশ্মীরের এক স্বাধীন নরপতির সময়ে নাকি এই আশ্রম নির্ম্মিত হয়।

এই হ্রদ হইতে কিয়দ্দূরে একটী জল-প্রপাত আছে, তাহাতেও অতি আশ্চর্য্য রকমের ঘটনা অবলোকন করা যায়। অসংখ্য জলবিম্ব ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল,—বিম্ব নাড়িয়া দেখুন উহার মধ্যে সূক্ষ্ম বালুকণা। পরক্ষণেই জলবিম্ব জলে মিশিয়া গেল, জল স্থির হইল। আবার সেইরূপ বিম্ব ভাসিয়া উঠিল, কিন্তু এবার তাহাতে আর বালুকা মিশ্রিত নহে; তৎপর আবার জল স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে জলবিম্বের সহিত একবার বালুকণা ভাসিয়া উঠে, পর বারে নির্ম্মল সলিলরাশি বায়ুর সহিত ক্রীড়া করিতে থাকে। জনশ্রুতি এইরূপ যে, জলপ্রপাতের নিকট উপস্থিত হইয়া কোন প্রকার শব্দ করিলেই—এমন

কি কথা বলিলে বা মাটীতে পায়ের শব্দ হইলেই, ঐরূপ জলবিম্ব ভাসিয়া উঠে; প্রকৃতই তদ্রূপ দেখা যায়। কিন্তু অন্য সময় হয় কি না, তাহা জানা যায় না। অন্ততঃ যতক্ষণ লোক জন থাকে, ততক্ষণ ঐরূপই হইতে থাকে।

ইহার নিকটেই আর একটী পর্ব্বত ও হ্রদ আছে, তথায় গ্রীষ্মকালেও বরফ জমিয়া থাকে—দেখিতে ঠিক যেন বরফ-সমুদ্র। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বরফের চাপ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ইহার পর সেং-সাফেদ (শ্বেত-প্রস্তর) নামক একটী স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্ম কালটা ধরিয়া এখানে নানা জাতীয় পুষ্প প্রস্ফুটিত থাকে। এই স্থানের বিশেষত্ব এই যে, লোকজন যাইয়া যদি তথায় কোলাহল করে, তাহা হইলে এক পস্‌লা বৃষ্টি হইয়া যায়। প্রকৃতির মনোহর রাজ্যে কত আশ্চর্য্য ব্যাপারই না দেখিতে পাওয়া যায়। লোক-কোলাহলে বায়ু ঈষৎ সঞ্চালিত হইলেই সেংসাফেদে বারিবর্ষণ হয়। একবার সম্রাট শাজাহান এই স্থানে বিশেষ বিব্রত হন। এই স্থান অতিক্রম করার সময়, তাঁহার অনুচরগণের তুমুল কোলাহলে বায়ু সঞ্চালিত হইয়া মুষলধারে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। বৃষ্টির বেগে বিব্রত লোকজন যতই বেশি গোলযোগ করে, ততই তীব্রবেগে বারিবর্ষণ হয়। যাহা হোক্ সম্রাট বহুকষ্টে অনুচরগণসহ এই স্থান হইতে উত্তীর্ণ হন। কাশ্মীরের অলৌকিক রাজ্যে, এইরূপ কত যে অদ্ভুত ও মনোরম স্থান আছে, তাহা বর্ণনায় শেষ করা যায় না।

যে সকল কাশ্মীরী বণিক, সুন্দর পশমের অন্বেষণে প্রতিবৎসর পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে গমনাগমন করে, তাহাদের নিকট শুনিতে পাওয়া যায় যে, যে সকল পার্ব্বত্য স্থান কাশ্মীরের প্রত্যক্ষ অধীনে, সেই সকল স্থানের মধ্যে বেশ উর্ব্বরা ভূমি আছে। একটী স্থান আছে যেথান হইতে রাজ-কর-নিমিত্ত পশম ও চর্ম্ম গৃহীত হয়। এই পশম শাসনকর্ত্তার ব্যবহারের নিমিত্ত, দ্রব্যাদি প্রস্তুতে ব্যয়িত হয়। এখানকার রমণীগণ অসামান্যা সুন্দরী, পবিত্রচেতা ও পরিশ্রমী। কাশ্মীর হইতে কিছু ব্যবধানেও এরূপ স্থান আছে যে, যথাকার রাজকর পশম ও চর্ম্মের মূল্য হইতে পরিশোধিত হয় কিন্তু তথাকার ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি পূর্ব্বোক্তের অপেক্ষা কিছু কম। শেষোক্ত প্রদেশের মনোরম উপত্যকা সমূহে প্রচুর শস্য, ধান্য, আপেল, পেয়ারা, ফুটি প্রভৃতিও মদ্য প্রস্তুতের উপযোগী কিস্‌মিস উৎপন্ন হয়। কিন্তু তৎস্থানবাসিগণ মধ্যে মধ্যে রাজকর দিতে অস্বীকার করে, কারণ তথায় সৈন্য সমাগম কিছু কষ্টসাধ্য। তত্রাচ মধ্যে মধ্যে তাহাদিগকে শাসন করিতে সৈন্য প্রেরণ অবশ্যম্ভাবী হওয়ায়, রাজ-সৈন্য তথায়

গমন করে। পূর্ব্বোক্ত বণিকগণ আরও বলিয়া থাকেন যে, কাশ্মীর হইতে অধিক দূরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ যাহা এখন আর কাশ্মীরের বশ্যতা স্বীকার করে না, সেই সকল প্রদেশেও এইরূপ মনোরম স্থান আছে এবং শ্বেতকায় সুশ্রী লোক বাস করে। কিন্তু তাহারা কখনও দেশ হইতে অন্যত্র যাতায়াত করে না এবং ইহাদের অনেক স্থানেরই রাজা নাই। যত দূর দেখা যায় তাহাতে তাহারা যে বিশেষ কোনও ধর্ম্মাবলম্বী তাহাও বোধ হয় না; কেবল, তাহারা মৎস্য ভক্ষণ করে না,—যাহারা নিষেধ না মানে, তাহাদিগকে অপর লোকে অপবিত্র বলিয়া মনে করে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ডাঃ বর্ণিয়ো নিজের ভ্রমণ কাহিনীতে নানা আজগুবি গল্পের অবতারণা করিয়াছেন। কোন কোনটি এমনি বিদ্বেষপ্রসূত যে, তন্মধ্য হইতে সত্যের ক্ষীণ রেখাটুকুও বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। এইরূপ একটী গল্প এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিতে হইল। অবশ্য ইহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে গল্প বলা যায় না,—স্থানীয় আচার ব্যবহার মাত্র। কিন্তু তিনি যেরূপ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন, তাহাতে 'রটা' কথা বলিয়াই ধারণা হয়। যাহা হোক্ তিনি লিখিয়াছেন যে, কাশ্মীরে অবস্থান সময়ে আমাকে একটী প্রাচীন ব্যক্তি,—যিনি কাশ্মীরের প্রাচীন রাজপরিবারের এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন,—বলেন যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর যে সময়ে পূর্ব্বোক্ত রাজপরিবারের সংস্পৃষ্ট ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে অনুসন্ধানের কঠিন আজ্ঞা প্রচার করেন, সেই সময়ে তিনি (প্রাচীন ব্যক্তি) তিনজন ভৃত্য সমভিব্যাহারে পূর্ব্বোল্লিখিত গিরিশ্রেণী অতিক্রম করতঃ প্রাণভয়ে পলায়নপর হন,—কোথায় যাইবেন, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। যাইতে যাইতে পলাতক ব্যক্তি একটী সুন্দর রমণীয় গ্রামে উপনীত হন। গ্রামবাসিগণ সমাদরে তাহার অভ্যর্থনা করতঃ নানাদ্রব্য উপহার প্রদান করে। তৎপর সন্ধ্যা সমাগত হইলে, গ্রামবাসিগণ তাহাদের দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট একটী অবিবাহিতা যুবতী রমণীকে আগন্তুকের সকাশে লইয়া গিয়া প্রার্থনা করে যে, তিনি রাত্রিতে এই কুমারীর সহিত যেন বাস করেন; কারণ তাহাদের আন্তরিক কামনা, তাঁহার রক্ত হইতে উৎপন্ন একটী সন্তান প্রাপ্ত হয়। তৎপর, এই স্থান হইতে যাত্রা করিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে গমন করিলে, তথাকার অধিবাসিবৃন্দও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আগন্তুককে অভ্যর্থনা করিয়া উপহার প্রদান করিল। কিন্তু সন্ধ্যাকালীন ব্যবহার পূর্ব্বোক্তদের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহারা আগন্তুকের নিকট স্ব স্ব পত্নী লইয়া উপস্থিত হইল। প্রথমোক্ত

গ্রামবাসিদিগকে গালাগালি দিয়া ইহারা বলিল যে,—উহারা একেবারে পশু, কোন জ্ঞানই নাই। কারণ, কুমারীর গর্ভে যে পুত্র উৎপাদন হইবে, তাহা নিজের ঘরে থাকিবে না; যাহার সহিত তাহার বিবাহ হইবে সে-ই সে পুত্র লইয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের ন্যায় স্ব স্ব পত্নীর গর্ভে যদি আপনার রক্তে পুত্র উৎপাদন করাইতে পারিত, তবে সে পুত্র চিরদিন নিজেরই ঘর আলো করিয়া থাকিত।—এরূপ গল্প কি সহসা বিশ্বাস করা যায়?

ঔরঙ্গজেবের রাজ্যাভিষেকের কিয়দ্দিবস পূর্ব্ব হইতেই কাশ্মীর-রাজ্যের শেষ সীমা হইতে বিস্তৃত ক্ষুদ্র তিব্বত প্রদেশের রাজপরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। প্রত্যেকেই নিজের জন্য সিংহাসন দাবী করিতে থাকে। তন্মধ্যে একজন গোপনে কাশ্মীরের মোগল শাসনকর্ত্তার শরণাপন্ন হন তদ্ধেতু,—সম্রাট শাজাহান তাহার অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত বা নিহত করিয়া প্রার্থনাকারীকে সিংহাসনে বসাইতে শাসনকর্ত্তার প্রতি আদেশ করেন; তদ্বিনিময়ে তদ্রাজ্য হইতে সম্রাট্ প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ স্ফটিক, মৃগনাভি ও পশম প্রাপ্ত হইবেন স্থিরীকৃত হয়। মোগল সৈন্যের সাহায্যে এই দাবীদার গৃহ-শত্রুগণকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিতে ও সিংহাসনে আরোহণ করিতে সমর্থ হন। তৎপর প্রতিবৎসরই তিনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দ্রব্যাদি মোগল দরবারে প্রেরণ করিতেন। পরে ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলে, এই ক্ষুদ্র নরপতি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি লইয়া সম্রাট-দর্শনে আগমন করেন। সেই সময় সেনাপতি দানেসমন্ত খাঁ একদিন তাহাকে আহারের নিমন্ত্রণ করেন। আহারে বসিয়া রাজা নিজের রাজ্যের এইরূপ বিবরণ বর্ণনা করেন:—তাঁহার রাজ্যের পূর্ব্বদিক্ বৃহৎ তিব্বতের অধীন; রাজ্যের প্রশস্ততা প্রায় ৩০।৪০ লিগ। প্রকৃতই তথায় অল্প পরিমাণে স্ফটিক, কস্তুরী ও পশম পাওয়া যায়, অধিকাংশ স্থানই দরিদ্র; পূর্ব্বে শুনিতে পাওয়া গেলেও এখন কিন্তু দেখিতেছি—রাজ্যে একটীও স্বর্ণ-খনি নাই। স্থানবিশেষ অতি উপাদেয় ফলমূল বিশেষতঃ ফুটি (melons) উৎপন্ন হয়। তথায় শীত অত্যধিক এবং বড়ই ক্লেশকর; কারণ প্রভূত তুষার-পাত হইয়া থাকে। অধিকাংশ অধিবাসী—পূর্ব্বে যাহারা হিদেন ছিল,—এখন মোসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে; দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমার নিজের কথা বলা যাইতে পারে,—আমি মোস্লেমধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি। ইহারা 'শিয়া' সম্প্রদায়ভুক্ত—সমগ্র পারস্যের লোক এই সম্প্রদায়ের। বহু পূর্ব্বে কাশ্মীরাধিপতি

যেরূপ বৃহৎ তিব্বত অধিকার করিতে প্রয়াস পান, ১৭।১৮ বৎসর গত হইল সম্রাট্ শাজাহানও তদ্রূপ তাহা করায়ত্ব করিতে চেষ্টিত হন। সম্রাট-সৈন্যদল পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া ষোড়শ দিবস কঠিন পর্য্যটনের পর একটী গড় দেখিতে পায়, তাহারা তাহা আক্রমণ ও অধিকার করে। তথায় আর কিছু করিবার নাই দেখিয়া, সৈন্যদল তিব্বত-রাজধানী অভিমুখে, একটী প্রসিদ্ধ ও বেগ-শালি নদী উত্তীর্ণ হইয়া, অগ্রসর হইতে থাকে; সমগ্র রাজ্যে একটী ভীষণ বিভীষিকার ছায়া পতিত হয়। যুদ্ধযাত্রার ঋতু অতিবাহিত হইয়া যাওয়ায়, কাশ্মীরের মোগল শাসনকর্ত্তা, যিনি এই সৈন্যগণের অধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন,—বরফপাতের আশঙ্কা করিয়া আর অধিক অগ্রসর না হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যে গড়টি অধিকৃত হইয়াছিল, সেনাপতি তথায় এক ক্ষুদ্র সৈন্যদল রাখিয়া আইসেন। কিন্তু কি কারণে জানি না,—শত্রুর ভয়েই হোক্ বা রসদ সামগ্রীর অভাবেই হোক্, সেনাপতির প্রস্থানের কিয়দ্দিবস পরে তাহারাও গড় ত্যাগ করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করে। ইহাতেই পর বৎসর সেনাপতির পুনঃ প্রত্যাগমনের আশা নির্মূল হয়।

ঔরঙ্গজেব কাশ্মীরে অবস্থান ও যুদ্ধযাত্রার ভয় প্রদর্শন করিতে থাকায় এই বড় তিব্বতের রাজা, দেশের উৎপন্ন কতিপয় উৎকৃষ্ট দ্রব্য, যথা স্ফটিক, শ্বেত চামর (যাহা অলঙ্কার স্বরূপে হস্তীর কর্ণে বাঁধা হইত), কস্তুরী এবং যাসেন (১) (*Jachen*) নামক অতি বৃহৎ ও মূল্যবান এক প্রস্তর প্রভৃতি উপহার সহ শান্তি-সংস্থাপনের নিমিত্ত এক দূত প্রেরণ করেন। এই দূতের সঙ্গে ৩।৪ জন অশ্বারোহী, ১০।১২ জন লম্বা মনুষ্য—চীনদিগের ন্যায় মুখে ৩।৪ গাছি দাড়ি; ইহাদের মস্তকে লোহিত বর্ণের শিরস্ত্রাণ ছিল। ইহাদের মধ্যে ৪।৫ জনের সঙ্গে তরবারী ছিল, কিন্তু অবশিষ্ট সকলের—যাহারা দূতের পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া অগ্রসর হইত, তাহাদের হস্তে এমন কি একগাছি ছড়ি পর্য্যন্ত ছিল না। দূত, সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার প্রভুর পক্ষ হইতে প্রস্তাব করেন যে,—তাঁহারা রাজধানীতে মোসলমানদের উপাসনার নিমিত্ত একটী মস্জিদ নির্ম্মাণ করিতে দিবেন; তাহাদের রাজ্যে, এখন হইতে যে সব মুদ্রা

---

(১) "This *Jachen* is a blevish stone with white veins so hard that it is wrought with nothing else but the powder of diamond, highly esteemed in the Court of the Mogol. They make cups of it and other vessels, of which I have some richly wrought with threads of gold, of very curious workmanship."—F. Bernier. P. 394.

হইবে, তাহার একপার্শ্বে ঔরঙ্গজেবের প্রতিমূর্ত্তি মুদ্রিত হইবে এবং বৎসরে বৎসরে কিছু কিছু কর প্রদান করা যাইবে। ঔরঙ্গজেব বুঝিতেন যে, যাই তিনি কাশ্মীর ত্যাগ করিবেন, এই নরপতিও সেই মুহূর্ত্তে এই সন্ধির প্রতি বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিবে; কারণ ইতঃপূর্ব্বেও রাজা, সম্রাট শাজাহানের সহিত কয়েকবার সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হন, কিন্তু বেশী দিন সন্ধি-সর্ত্ত পালন করেন না।

ক্রমশঃ।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি।

এক সময়ে প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথির প্রতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর ভ্রূক্ষেপ ছিল না বলিলেই হয়। সেই অবসরে না জানি আমাদের কত অমূল্য গ্রন্থরাজি চিরতরে অনন্ত কাল-সাগরে বিলীন হইয়া গিয়াছে। এখন সেই ক্ষতিপূরণ করিবার কোন উপায় আর আমাদের নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস-লেখক সেই দুর্দ্দিন স্মরণ করিয়া চিরদিন হতাশের দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিবেন। যাহা হস্তচ্যুত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আক্ষেপ করা বৃথা। যাহা আজও আছে, তাহার পরিরক্ষণে যত্নবান হইলেই আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হয়। সকলেই জানেন, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ধাররূপ মহান্ সঙ্কল্প লইয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেই ব্রত যথাসাধ্য উদ্‌যাপন করিয়া আসিতেছে। 'সাহিত্য সভার'ও এ বিষয়ে আগ্রহ ও যত্ন আছে; তবে 'পরিষদের' সমান নহে বটে। এতদ্ভিন্ন ব্যক্তিগত চেষ্টার বলেও আজকাল এখানে সেখানে ২।৪ খানা প্রাচীন পুঁথির উদ্ধার না হইতেছে, এমন নয়। কিন্তু এ সকলই আবিষ্কৃত বাঙ্গালা পুঁথির সংখ্যা-তুলনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। যেরূপ ধীরে ধীরে এতৎকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে, তাহাতে আমাদের মত শত জনের জীবনকালেও পুঁথিগুলির উদ্ধার কার্য্য শেষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। অথচ পুঁথিগুলির দুর্দ্দশা এরূপ চরমে আসিয়া ঠেকিয়াছে যে, অনেক পুঁথিই অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে লোকলোচনের অগোচর হইয়া পড়িবে। সর্ব্বভুক্ কাল ও হব্যাশন এবং কীটরাজির কৃপায় বৎসর বৎসর কত প্রাচীন গ্রন্থ অগাধ কাল সাগরে মিশিয়া যাইতেছে, সে কথা ভাবিলে হৃদয় স্তম্ভিত হয়।

গিয়ার কড়ি দিয়া প্রাচীন পুঁথি মুদ্রাঙ্কিত ও প্রকাশিত করিতে পারেন, বাঙ্গালার সাহিত্যসেবীদিগের মধ্যে অত্যল্প লোকেরই সেরূপ ক্ষমতা আছে। তবে আমাদের কি কোন সহজ উপায় নাই? এক উপায় আছে। উহা কেবল সহজ নয়, অল্পব্যয়-সাধ্যও বটে এবং এক হিসাবে একবারেই ব্যয় সাধ্য নহে। বাঙ্গালায় এখন অসংখ্য সাময়িক পত্র প্রচারিত হইতেছে। সেই সকল পত্রিকায় নিয়মিতরূপে অল্পাধিক পরিমাণে প্রাচীন পুঁথি প্রকাশিত হইতে থাকিলে প্রাচীন গ্রন্থরাজির উদ্ধার-কার্য্য শেষ হইতে বড় বেশী দিন লাগে না; পক্ষান্তরে তাহাতে পাঠক বা প্রকাশক কাহারো কোন ক্ষতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। (লাভের কথা না-ই-বা ধরিলাম)। 'সাহিত্য পরিষৎ' এ বিষয়ে অগ্রণী হইলে সুফল লাভে সন্দেহ থাকে না। ভগবৎ-কৃপায় বাঙ্গালায় এখন প্রাচীন গ্রন্থ-সমালোচকের ও পাঠকের অভাব নাই। পত্রিকা-সম্পাদক ও পাঠক মহাশয়গণ আপনাদের জাতীয় সাহিত্যের খাতিরে একটু ত্যাগ স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইবেন, বোধ হয় না। আশা করি, 'পরিষৎ' ও পত্রিকা-সম্পাদক মহোদয়গণ আমাদের এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইতে পারে কি না, অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার ভাবিয়া দেখিবেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁথিগুলি পত্রিকা-কলেবরে ও বৃহৎ বৃহৎ পুঁথিগুলি 'পরিষদের' প্রবর্ত্তিত 'প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী'তে প্রকাশের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

এই সাধু উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া আমরা অনেকগুলি পুঁথি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রচারিত করিয়া তাহাদের স্থায়িত্ব বিধান করিয়াছি। সেই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া অদ্য 'অঙ্কুরে'ও প্রাচীন সাহিত্য-প্রচারে ব্রতী হইতেছি। ভরসা আছে, প্রাচীন ইতিহাস বিহীনা জন্মভূমির প্রাচীন সাহিত্যের উপকরণ-সংগ্রহ কল্পে এ অকৃতির এই ক্ষীণ চেষ্টা জন্য অন্যায় আব্দারে উদারহৃদয় ও স্বদেশ প্রেমিক পাঠকমণ্ডলী রুষ্ট হইবেন না। পাঠকবৃন্দকে অদ্য আমরা 'বৈষ্ণব বিধান' নামক একখানি সুপ্রাচীন গ্রন্থ উপহার দিতেছি।

১। বৈষ্ণব বিধান গ্রন্থ।

'বৈষ্ণব বিধান' একখানি ক্ষুদ্র বৈষ্ণব গ্রন্থ। ইহাতে বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোক সহ মোট পদ-সংখ্যা ৮০ মাত্র। আদ্যন্ত পয়ারে লিখিত। মোট ৫টি পত্রে ৯ পৃষ্ঠায় লেখা সমাপ্ত। দোভাঁজ করা কাগজের এক পৃষ্ঠে লেখা। ৪ × ১২½ ইঞ্চি পরিমাণ কাগজ। প্রথম পত্রটি

একটু ছিঁড়িয়া গিয়াছে। অক্ষরগুলি বড় বড় ও মুন্সীয়ানা ধরণের এবং কোন কোনটা কিছু বিচিত্রও বটে। 'র' পেটকাটা,'ড়' ও 'য়' বিন্দুহীন, 'উ' বা 'ঊ' 'ড' রূপে লিখিত। অনেক স্থলে 'ন' ও 'র' এর মধ্যে এবং 'ক' ও 'জ' এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। হস্তলিপি দেখিতে সুন্দর হইলেও পড়িতে কষ্ট হয়। অক্ষর-বৈচিত্র্য লেখনীযোগে বুঝান যায় না। ফটোগ্রাফ করিয়া লইতে পারিলেই এরূপ প্রাচীন হস্তলিপির উপযুক্ত সমাদর করা হয়; কিন্তু সাহিত্যসেবকদের সর্ব্বজন-বিদিত দারিদ্র্য এ বিষয়ে ঘোর পরিপন্থী বলিয়া তাহা ঘটিয়া উঠে কৈ?

মূল পাণ্ডুলিপিটি ১১৯০ সন ৬ই আশ্বিন তারিখে 'বন্দর আসন' নামক গ্রামে প্রস্তুত হইয়াছিল। সুতরাং উহার বয়স আজ ১২৩ বৎসর। পুরাতন বাঙ্গালা কাগজ বলিয়া তাম্রকূট পত্রের মত হইয়াও অদ্যাপি টিকিয়া আছে। চট্টগ্রামে 'বন্দর' নামক গ্রাম আছে কিন্তু 'বন্দর আসন' নামে কোন গ্রাম নাই। উক্ত গ্রাম কোথায়, আমরা নির্ণয় করিতে পারি নাই।

বলরাম দাস নামক কবি এই পুঁথির প্রণেতা। বৈষ্ণব সাহিত্যে 'বলরাম'-নামা অনেক কবির অস্তিত্ব সংবাদ পাওয়া যায়। সুতরাং ইনি কোন্ বলরাম দাস, নির্ণয় করা কঠিন। 'প্রেমবিলাস'-প্রণেতা বলরাম দাসের পিতার নাম আত্মারাম দাস ও মাতার নাম সৌদামিনী। তিনি শ্রীখণ্ডের কবিরাজ বংশীয় ও বৈদ্য জাতীয় কবি। তাঁহার অপর নাম নিত্যানন্দ দাস। প্রায় ৩৫০ বৎসর হয়, তিনি 'প্রেমবিলাস' রচনা করেন। আলোচ্যমান পুঁথির প্রতিলিপির বয়সই যখন ১২৩ বৎসর হইয়াছে দেখা যাইতেছে, তখন উহা যে আরও বহু পূর্ব্বের রচনা, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু ইহা যে প্রেমবিলাস রচয়িতা বলরাম দাসেরই রচিত, সে কথা নিশ্চিতরূপে কে বলিবে? ✓

প্রতিলিপিকারের দোষে পুঁথিখানির স্থানে স্থানে পাঠাশুদ্ধি আছে। বিশেষতঃ সংস্কৃত শ্লোকগুলি এত বিকৃতি প্রাপ্ত যে, তাহাদের ভাষা কিম্ভূত কিমা ধারণ করিয়াছে। প্রাচীন পুঁথির পাঠ-সংশোধন করিতে গেলে এরূপ পুঁথি প্রকাশের উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যর্থ হইয়া যায়। এজন্য আমরা পুঁথিখানি যথাসম্ভব অবিকল ভাবে প্রচারিত করিতে যত্নবান হইয়াছি। আশা করি, আমাদের প্রদর্শিত অসম্পূর্ণতা কালে অপর সমালোচকের হস্তে পড়িয়া সম্পূর্ণ নিরাকৃত হইবে। পাতা ছিঁড়িয়া যাওয়ায় বা অপর কারণে যেখানে

পাঠোদ্ধার করা যাইতে পারে নাই, সেখানে আমরা 'তারক' চিহ্ন স্থাপন করিয়াছি। সুখের বিষয়, ঐরূপ পরিত্যক্ত স্থান নিতান্তই কম। পুঁথিখানির ভাষা নিতান্তই সরল ও আড়ম্বরবিহীন। যাহা হউক, এতৎ সম্বন্ধে আর বেশী বাক্য ব্যয় না করিয়া আমরা নিম্নে পুঁথিখানি উদ্ধৃত করিতেছি। যথা :—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ * চন্দ্রায় নম ॥

বাঞ্ছাকল্পতরু * * এব চ ॥
পতিতারং পাবন ভো বৈষ্ণব নম ॥
আনন্দে বোলহ হরি ভজ ভগবান।
ঠাকুর বৈষ্ণব পায় মজাইয়া মন ॥
বৈষ্ণব ২ মোর করুণার সিন্ধু।
ইহলোক পরলোক, দোহো লোকের বন্ধু
বৈষ্ণব গোসাই আমার অপার মহিমা।
আপনে না পারেন প্রভু জাকে
দিতে সীমা ॥
বৈষ্ণব দেবতা আমার বৈষ্ণব ধ্যান।
বৈষ্ণব ঠাকুর মোর বৈষ্ণব প্রাণ ॥
বৈষ্ণবের পদধূলি লাগুক মোর অঙ্গে।
জনম জাউক মোর বৈষ্ণবের সঙ্গে ॥
বৈষ্ণবের অধরামৃত্তে পুরুক মোর দেহো
মোর বংসে বৈষ্ণব না নিন্দে কেহো ॥
বৈষ্ণব ভজরে ভাই বৈষ্ণব ভগবান।
বৈষ্ণব বিনে কেহো নাহি ধন প্রাণ ॥
বৈষ্ণব বিনে কৃষ্ণ না পারে দিতে।
বৈষ্ণব বিনে কেহো না পারেন রাখিতে
বৈষ্ণব বিনে কেহো সার নাহি আর।
বৈষ্ণব করিল দেখ জগত নিস্তার ॥
বৈষ্ণব জপ তপ বৈষ্ণব ধ্যান।
বৈষ্ণব বিনে ভাই না চিন্তির আন ॥
সংসারের গতি সার বৈষ্ণব ঠাকুর।
বৈষ্ণবের হইলুম মুঞি নাটের ১ কুকুর ॥
প্রেমাস্কুর ২ হইয়া জেবা করএ ক্রন্দন।
জর্ম্মে ২ হওম তার দাসীর নন্দন ॥
বৈষ্ণব জাহারে বলি কৃষ্ণ তাহার নাম।
জনম ২ গাই বৈষ্ণব গুণ নাম ॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিন এক দেহ।
জীব তম্নাইতে আর নাহি
জানে কেহ ॥
সমুখে আছেন গুরু গাহান (?)
সক্তি হইয়া।
সাধনের কৃপার উচ্ছ (উৎস ?)
করে ধরিয়া ॥
চরণ কমলে জত রহে ভক্তবৃন্দে।
অমায়া করুণাসক্তি ধরিয়া আনন্দে ॥
নিত্য সিদ্ধা তনু সক্তি ধরিয়া ভগবান।
প্রেষ্টেতে (পৃষ্টেতে ?) রহেন তেহো
হইয়া অদিষ্টান ॥
অগ্রে গুরু তবে ভক্ত তবে ভগবান।
তিনের মরম তিন জানয়ে সন্ধান ॥

১। অন্যান্য বহুল প্রাচীন পুঁথিতে 'নাছের কুকুর' পাঠ দেখা গিয়াছে।

২। 'প্রেমাস্কুর' পাঠ ঠিক কিনা, বলা যায় না। পুঁথিতে 'প্রেমঙ্কঃর' রূপে লিখিত দেখা যায়। শব্দটা 'প্রেমাতুর' নহে ত ?

হেন উপদেস জানে ঠাকুর বৈষ্ণবে।
বৈষ্ণব জানিলে তবে কৃষ্ণচন্দ্র লোভে
(সোভে ?) ॥ ২০
হেন বৈষ্ণব কেহো না করিয় হেলা।
কেবল সংসার-সিন্ধু-তরণের ভেলা[৩] ॥
যুগে ২ হম মুঞি বৈষ্ণবের দাস।
বৈষ্ণবের উচিষ্টে মোর হউক বিস্বাষ ॥
হেন বৈষ্ণব কেহো না কর অবজ্ঞান।
বৈষ্ণব রূপে দেখ আপনে ভগবান ॥
বিনয় করিয়া মাগোম বৈষ্ণব প্রসাদ।
বৈষ্ণবের পায় কভু মোর নহুক অপরাধ ॥
বৈষ্ণব ঠাকুর জারে নেহালে করুণে।
অনন্ত জনস্ঠার (?) কর্ম্ম হরে
সেই খনে ॥ ২৫
বৈষ্ণবের পদধূলি পড়ে গ্রিহে জার।
সপ্ত কুটি [৪] কুলের তার হয়েত উদ্ধার ॥
জার বংসে আসিয়া বৈষ্ণব জর্ম্ম ধরে।
বাহু নাড়া দিয়া তার পিতৃ ন্রিত্য
(নৃত্য) করে ॥
বৈষ্ণব উপায় মোর বৈষ্ণব উপায়।
বৈষ্ণব স্বরূপে কৃষ্ণ আপনে স্বহায় ॥
বিকাইয়া পদার বিন্দে রহে জার মন।
কুটি ৪ ইন্দ্র সমতুল নহে তার সম ॥
তিল অর্দ্ধে ভজিয়া কৃষ্ণ হয়ে উদাসিন।
সে জন ইন্দ্রের বড় পড়িয়া [৫] কপিন ॥ ৩০

বৈষ্ণবের অন্ন বেঞ্জন আকাড়ি [৬]
চাউলের ভাত।
তাহা খাইয়া তুষ্ট হএ প্রভু জগন্নাথ ॥
চারি বেদে লেখে শ্রীভাগবতে কয়।
বৈষ্ণব চরণে রাগ সর্ব্ব তির্থময় ॥
বৈষ্ণব গোঁসাই মোর অপার মহিমা।
জে ইহা নিন্দে তার পাপের নাহি সিমা ॥
জমালয় বৈসে সে জে রোৗরব নারকে।
নারদে জে দেখাএন প্রভু কৃপা পরতেকে

তথাহি সোল্লোক ॥

নিন্দা কুর্ব্বতি জা মুড়া (মূঢ়া) বৈষ্ণবানাং
মহাজনে।
সে পাপি নরকে ঘোরে জাবৎ চন্দ্র
দিবাকর ॥ ৩৫
চণ্ডাল জাতি জদি বৈষ্ণব হয়।
অভক্ত সন্ন্যাসি দ্বিজ তাহার সমতুল নয় ॥
বিসেষ বৈষ্ণব জদি হএত ব্রাহ্মণ।
গজ দন্তে মুনি [৭] বান্ধা কুসুম চন্দন ॥
মুনি দ্বিজ সাত্র [৮] ভেদ নাহি করে
বৈষ্ণবে।
বৈষ্ণববর্গ কার্য্য কৃষ্ণ গোত্র সভে ॥ (?)
তিন লোক হেলাএ পরিত্রাহি করি
বোলে।
যুদ্ধ (শুদ্ধ) বৈষ্ণব পায়ে সম্বন্ধ জাতি
কুলে ॥
মালা তিলক বালা আগে ধরি আছে।
মৈদ্ধে ভক্ত চলি জায় কৃষ্ণ তার পাছে ॥ ৪০

৩। পুঁথিতে 'ভেয়া' লেখা আছে।
৪। কুটি—কোটি।
৫। পড়িয়া—পরিয়া।
৬। আকাড়ি—যাহা ভালরূপে ঝাড়া হয় নাই।
৭। মুনি—মণি।
৮। সাত্র—শাস্ত্র।

জে মালা তিলক ধরে অশুর হএ বুদ্ধি।
মোর বংসে বৈষ্ণব না করুক অল্পবুদ্ধি ॥
জাতি বুদ্ধি জে করে ঠাকুর বৈষ্ণবে।
জমের য়ালএ ৯ গিয়া সেই পাপি লভে ॥
জে পাপি রাখএ প্রাণ বৈষ্ণবের ভেদ।
বিষ্টার ক্রিমির ১০ হইয়া রহে কহে
চারি বেদে ॥
বৈষ্ণব দেখিয়া জেবা না করে বিস্বাষ।
মোহা ঘোর নরকে হএ তার বাস ॥
বৈষ্ণব দেখিয়া জেহি করে সম্ভাসন।
প্রভু বোলেন সেহি জন মোর
প্রাণধন ॥৪৫
বৈষ্ণবের অবসেষ জে মুড়ে (মূঢ়)
না খায়।
কৃষ্ণের কোপানলে সে মুড় পড়য় ॥
জে মুড়ে দেখিয়া নিন্দে শ্রীমালা তিলক
ভূত প্রেত হয়ে গিয়া সর্ব্ব সাস্ত্রে লেখে ॥

তথাহি আদিপুরাণে

শ্রীভগবান উবাচ ।ঃঃ॥

মদভক্ত জনা দ্রষ্টা নিন্দি কুর্ব্বন্তি জে মুড়া
স্তেসাং সর্ব্বানি নশ্যন্তি সত্যং সত্যং
ধনঞ্জয় ॥ঃ॥

আমার বৈষ্ণব দেখি সুনি জেবা নিন্দে।
অর্জ্জুনেকে কহিলা প্রভু তার সর্ব্বান্দে ॥
জে মুড়ে বৈষ্ণব দেখি জাতি সোদায় ১১।
তামার সলা দিয়া চক্ষু ভাঙ্গে জমরায় ॥৫০

৯। য়ালএ—আলয়।
১০। ক্রিমির—কৃমি।
১১। সোদায়—সুধায় : জিজ্ঞাসা করে।

চণ্ডাল জনম নাহি নাহিক ব্রাহ্মণ।
জেই ভজে সেই হয়ে কৃষ্ণের প্রিয়জন ॥
ভজনের গুণে হয়ে কৃষ্ণের আমদি
(আমোদী)।
ইহাকে নিন্দেয়ে সে জে চণ্ডাল
বিরোদি ১২ ॥
অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হএ চণ্ডাল সমান।
ইহার প্রমাণ আছে নারদি পুরাণ ॥
চণ্ডালোপি মুনিশ্রেষ্ট হরিভক্তিপরায়ণ।
হরিভক্তি বিহিনঞ্চ দ্বিজপি সপচাধমা ॥
নিগম আগমে দেখ সাত্র (শাস্ত্র) পুরাণে
অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ চণ্ডাল সমানে ॥৫৫
মুনি হএ চণ্ডাল নারদিতে লেখে।
বিষ্ণুভক্ত চণ্ডাল হয় দ্বিজের অধিকে ॥

॥ঃঃ॥ তথাহি ॥ঃঃ॥

চণ্ডাল মৎধঃ ম্লেচ্ছ জাতি ভষ্ট দুরাচার।
পস্যতে সাধবো জত্র পবিত্রঞ্চ
ন সংসয় ॥ঃঃ॥

পদ্মপুরাণে লেখে ভক্ত যুদ্র নয়।
অভক্ত হইলে যুদ্র (শূদ্র) সর্ব্ব বন্দে হয় ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে ॥

ন যুদ্রা ভগবান ভক্তাস্তেপি ভাগবৎ।
উমা সর্ব্বন্দে যুতে যুদ্রা জেন ভক্তা
জনার্দ্দনে ॥
সাধুবার্ত্তা পাইয়া জদি নিকটে না জায়।
দ্বাদস বৎসর সাধে কৃষ্ণ নাহি পায় ॥৬০

১২ বিরোদি—বিরোধী।

নিজ মনে নাহি চিনে বৈষ্ণব ঠাকুর।
ব্রথা (বৃথা) জর্ম্ম ধরে সেই শ্রকাল ১৩
কুকুর॥

তথাহি শ্রীভাগবতে ॥ঃঃ॥

স্বনচ্ছ জথা ভাতি পণ্ডিতা ভক্তিবিবর্জ্জিতা
ন দংস স্রাবনে (?) সক্তা ন
গুদাচ্ছাদনেপি চ॥

অতি হীন জাতি জদি বৈষ্ণবের হএ।
শ্রীকৃষ্ণের করুণাপাত্র বলি সর্ব্বে লয়ে॥

তথাহি ॥ঃ॥

সগতঙ্গ নারসংগিতায় (?) স্লোক ॥ঃঃ॥
পিতৃ গোত্রে ন জা কন্ঢা স্বামি গোত্রে
ন গোত্রিকা।
শ্রীকৃষ্ণ ভজন মাত্রেন তত্র গোত্রে *
ভবেত॥

মহাকুল মুনি ভ্রষ্টা অভক্ত ব্রাহ্মণ।
বিষ্ণুভক্ত চণ্ডালে অন্ন করএ গ্রহণ॥৬৫
অভক্তের হাতের অন্ন কুকুরের বিষ্ঠা।
মত্রিকা সমান জল তার হাতের নিষ্ঠা॥

তথাহি কন্দর্পপুরাণে ॥ঃঃ॥

নাহং তিষ্টামি বৈকুণ্ঠে যুগিনাং রিদএ নচ
মদ্ ভক্তা চ জত্র গায়ান্তি তত্র তিষ্টামি
নারদ॥

অতএব সে পরমান্ন ভক্তের হাতের অন্ন
জল ছোয়াইলে হএ গঙ্গাজল সমান॥
চরণারবিন্দ পাইয়া দেখে অনুক্ষণ।
সাক্ষ্যাতে জানিব সেই স্বরন মনন॥

হেন বৈষ্ণব দাড়াইল জারে কাছে।
অনুগত হইয়া কৃষ্ণ থাকেন তার
পাছে॥৭০

তথাহি কৃষ্ণবাকং
গিতা অং (?) ॥ঃঃ॥

মদ্‌ভক্তা জত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব
ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তি জস্তুতিভিস্বহ॥

দিনে করে বৈষ্ণব জেবা * সেবায়।
ত্রিজগতের নাথ কৃষ্ণ ঘরে বসি পায়॥
বৈষ্ণব জাহার গ্রিহে ভুঞ্জে একবার।
তাহার গ্রিহে নাহি থাকে জমের
অধিকার॥
এক বৈষ্ণব সন্তুষ্ট করে জেই জন।
প্রভু বোলেন আমা হেন হএ তাহার মন
কবু ১৪ তুষ্ট নহি য়ামি সালগ্রাম সেবায়।
বৈষ্ণব সেবায় তুষ্ট চারি বেদে গায়॥৭৫॥
স্ত্রিপুত্র ধন জন সব পরিবার।
বৈষ্ণব চরণে ভজ হউক উদ্ধার॥
বৈষ্ণব তোসনে হরসিত কৃষ্ণচন্দ্র।
হেন প্রভু না চিনিলুম মুঞি মতিমন্দ॥
বৈষ্ণব গোঁসাঞি বিনে জদি জানো অন্য
ইহলোক পরলোক নহে তার ধন্য॥
বৈষ্ণবের ঘরে জদি ভক্ত জর্ম্ম করো।
তথাপি বিসই দুঃখ সহিতে পারো॥
বলরাম দাসে কহে এতেক বিচার।
বিসইয়ার ১৫ ঘরে জর্ম্ম নহে
জেন য়ার॥৮০

১৩। শ্রকাল—শৃগাল।

১৪। কবু—কভু; কখন।
১৫। বিসইয়ার—বিষয়ীর।

"ইতি বৈষ্ণব বিধন গ্রন্থ সংস্কপে (সংক্ষেপে) সমাপ্ত ॥ঃঃ॥
ইতি সন ১১৯০ তেরিখ ৬ আশ্বিন রোজ সনিবার
পীং কন্দর্পপাল পুত্র ভুবনপাল সাং বন্দর আসন॥"

পুঁথিখানি চট্টগ্রামের উদীয়মান সুসন্তান, অকালে স্বর্গগত বন্ধুবর শ্রীমন্নলিনীকান্ত সেন মহাশয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। উহা এখন রক্ষণার্থে 'পরিষদে' প্রেরিতব্য।

আবদুল করিম।

রত্নমালা।

(৪১)

রক্তা চ জবয়া মুক্তা জবা শুভ্রা ন মুক্তয়া।
ভবেৎ পরগুণগ্রাহী মহীয়ানেব নাপরঃ॥

ভাবার্থ—জবাকুসুমের, আরক্ত আভায়,
ধরে মুক্তা লোহিত বরণ।
কিন্তু নাহি হয়, শুক্তির প্রভায়,
শুভ্রবর্ণ জবা—কদাচন॥
স্পষ্ট বুঝা যায়, এ ভাব নিরখি'
মহতের যে বা আচরণ।
লয় পর-গুণ, মহৎ সুজন,
নারে অন্যে করিতে গ্রহণ॥

(৪২)

সৎসঙ্গঃ কেশবে ভক্তির্গঙ্গাম্ভসি নিমজ্জনম্।
অসারে খলু সংসারে ত্রীণি সারাণি ভাবয়েৎ॥

ভাবার্থ—সাধুসঙ্গ, কৃষ্ণে ভক্তি, গঙ্গানীরে স্নান।
অসার সংসারে এই তিন (বস্তু) সারবান॥

(৪৩)

ক্ষমা বশীকৃতির্লোকে ক্ষময়া কিং ন সাধ্যতে।
ক্ষমা খড়্গঃ করে যস্য কিং করিষ্যতি দুর্জ্জনঃ ॥

ভাবার্থ—সকলে ক্ষমার বশ, কিবা তাহে না হয় সাধন ;
ক্ষমা অসি করে যা'র, করে কিবা তাহারে দুর্জ্জন ?

(৪৪)

বরং কূপশতাদ্বাপী বরং বাপী শতাৎ ক্রতুঃ।
বরং ক্রতু শতাৎ পুত্রঃ সত্যং পুত্র শতাদ্বরম ॥

ভাবার্থ—শত শত কূপ-প্রতিষ্ঠা হইতে,
শ্রেষ্ঠ এক প্রতিষ্ঠা বাপীর।
শত শত বাপী-প্রতিষ্ঠা হইতে
এক যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ ; ইহা স্থির ॥
শত যজ্ঞ হ'তে, শ্রেষ্ঠ বলি' মানি
একমাত্র যেই সুসন্তান।
শত শত সুত হ'তে—স্থির জানি—
একমাত্র সত্য-ই প্রধান ॥

(৪৫)

অশ্বমেধ সহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধ সহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে ॥

ভাবার্থ—দশ শত অশ্বমেধ নহে এক সত্যের সমান।
তুলা দণ্ডে দুই ধারে,
তৌল কৈলে উভয়েরে,
গুরুভার হয় সত্য ;—জানা যায়—সত্যই প্রধান ॥

(৪৬)

ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা,
বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্।

১৩

ধর্ম্মঃ স নো যত্র ন সত্যমস্তি,
সত্যং ন তদ্ যচ্ছলমভ্যুপৈতি ॥

ভাবার্থ—সেই সভা সভা নহে নাহি বৃদ্ধ যথা।
সে বৃদ্ধ অবৃদ্ধ, যে না কহে ধর্ম্ম-কথা ॥
সেই ধর্ম্ম ধর্ম্ম নহে, নাহি সত্য যা'য়।
সে সত্য অসত্য, যদি ছল রহে তা'য় ॥

(৪৭)

ন হীদৃশং সম্বলং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।
দয়া মৈত্রী চ ভূতেষু দানঞ্চ মধুরা চ বাক্ ॥

ভাবার্থ—সম দয়া সর্ব্ব ভূতে,
মৈত্রী, দান, মধুর বচন।
ত্রিবিশ্বে এ চারি সম
সম্বল না হেরি কদাচন ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ।

বিধির খেলা।

(১)

চাল্‌তাপুরের মধ্যে মদন দাদাই যে একমাত্র বুদ্ধিমান্ এবং তিনিই যে 'একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি' রূপে গ্রামখানাকে উজ্জ্বল করিয়া বিরাজিত, ইহা গ্রামের বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতীর সুদৃঢ় বিশ্বাস। মদন দাদা নিজেও জানিতেন যে, তাঁহার মত মাথাওলা লোক গ্রামে—কেবল গ্রামে কেন, বুঝি সংসারেও নাই। তাই তিনি পরের মস্তকে কাঁঠাল ভাঙ্গিয়া তাহার সুরসাল কোষগুলি বাছিয়া বাছিয়া উদরসাৎ করিলেও কেহ তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি করে না, বরং অনেকেই ইচ্ছাপূর্ব্বক মাথা পাতিয়া দিয়া তাঁহাকে এই সুমধুর ফলভোগের সুযোগ প্রদান করে। আর তজ্জন্যই দাদা চাকরী, চাষবাস প্রভৃতি নীচজনোচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইয়াও কেবল এই বুদ্ধির ব্যবসায়ের লভ্যাংশ দ্বারা অনায়াসে সংসারযাত্রাটা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। পিতৃবিয়োগের

পর হইতেই স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি, একটী মাটীর দোয়াত এবং একটী কঞ্চির কলম লইয়া তিনি এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সে আজ কতদিনের কথা। তাহার পর কত শীত, কত গ্রীষ্ম, কত বর্ষা চলিয়া গিয়াছে, বর্ষচক্রের সহিত সংসারচক্রটীও বিঘূর্ণিত হইয়া কত নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে ও করিতেছে, তিনিও বিংশতি বর্ষীয় যুবক হইতে পঞ্চাশৎ বর্ষীয় প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের দলে পড়িয়াছেন, কিন্তু ব্যবসায় সমানভাবে চলিতেছে। বরং বয়োবৃদ্ধির সহিত অভিজ্ঞতা নামক মূলধনটা বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে উত্তরোত্তর উন্নত করিতেছে।

মদন দাদার পুরা নাম শ্রীযুক্ত মদনমোহন পাকড়াশী। কিন্তু গ্রামের বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই তাঁহাকে মদনদাদা বলিয়া ডাকিত। কেন ডাকিত, তাহা চাল্‌তাপুরের ইতিহাসে অনুল্লিখিত। পিতা পুত্রে এক সঙ্গে যখন তাঁহাকে দাদা সম্বোধন করিত, তখন সম্পর্কটা কিরূপ দাঁড়াইত, তাহা সম্বোধন-কারীদের বা দাদার আলোচনার বহির্ভূত ছিল। চাঁদামামার ন্যায় তিনি সকলেরই মদন দাদা। সুতরাং আমরাও তাঁহাকে এই নামেই অভিহিত করিব।

মদন দাদা যেমন মুসাবিদা করিয়া বন্ধকী কোবালা বা তমশুক লিখিতে পারিতেন, যেমন মামলা মোকদ্দমার কূটপরামর্শ দিতেন, এমন আর কেহ পারিত না। উভয় ভ্রাতা বা জ্ঞাতির মধ্যে বিবাদ বাধিলে দাদা তাহার মাঝে গিয়া পড়িতেন, এবং নিম্ন আদালত হইতে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ফিরিয়া যাহাতে বিবাদের একটা চিরনিষ্পত্তি হয়, তজ্জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। কাহারও সাক্ষীর প্রয়োজন হইলে দাদা আদালতে দাঁড়াইয়া হলপ্‌ করিয়া অনায়াসে অনর্গল সত্যবাক্য (!) উদ্গীরণ করিতেন। এ সকল তো সামান্য কাজ বা কাজের মধ্যেই গণ্য নয়। এ সকল ছাড়া আর একটা সুমহৎ কার্য্যে তাঁহার সবিশেষ পারদর্শিতা ছিল। অপরের স্বাক্ষরের অনুকরণ করিতে, নূতন দলিলকে পুরাতন করিয়া দিতে, আসলকে নকল এবং নকলকে আসল করিতে, সেকালের মোহরের অবিকল ছাপ তুলিতে তিনি সিদ্ধহস্ত। তা' খত লেখা হইতে শেষোক্ত মহৎ কাজটী পর্য্যন্ত দাদা কেবল পরোপকারের জন্যই করিতেন। কারণ তাঁহার হৃদয়টী কিছু অত্যধিক উদার এবং পরোপকার প্রবৃত্তিটী অত্যন্ত প্রবল। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেবল লোকের কাঁদাকাটা, অনুনয় বিনয়ের জন্য বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এই কাজগুলা করিতে হইত। দাদা বলিতেন, সংসারে আসিয়া যে পরোপকার না করে, সে তো

পশু। এত বুদ্ধির অধিকারী হইয়া দাদা কি সেই পশু-দল-ভুক্ত হইতে পারেন? বিপন্নের উপকার করিলে ঈশ্বরের নিকট হইতে পুরস্কার পাওয়া যায়। সুতরাং দাদা যে উপকৃত ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে সাক্ষাতে এবং অসাক্ষাতে কিঞ্চিৎ আর্থিক প্রত্যুপকার গ্রহণ করিতেন, তাহা ঈশ্বরের দান বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস। ঈশ্বর তো আর নিজে কিছু করেন না, মানুষই তাঁহার হাত পা।

সকলের নিকট বুদ্ধিমান্ প্রতিপন্ন হইলেও মদনদাদার একটা ক্ষোভ এই যে, গৃহিণী কিছুতেই তাঁহার বুদ্ধির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন না। অবিশ্বাসের একটা কারণও যে না ছিল এমন নহে। দাদা এতদিন ব্যবসায় চালাইয়াও তো সংসারটীকে বেশ সচ্ছল করিতে পারিলেন না, অর্থাৎ দুই চারিখানা ভারি ভারি অলঙ্কার গৃহিণীর গাত্রে উঠিয়া প্রতিবেশিনীগণের নিকট তাঁহার মর্য্যাদাটা একটু বাড়াইয়া দিল না। কথাটা অযৌক্তিক নহে। আর দাদাও যে এ বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন ছিলেন তাহাও নয় কিন্তু কিছুতেই কুলাইয়া উঠিত না। তিনি এত উপার্জ্জন করিতেন, কিন্তু এই পরোপকার-লব্ধ পয়সাটার এমনই গুণ যে, তাহা মুদীর দোকান ছাড়া আর কোথাও যাইতে চাহিত না। সুতরাং দাদাও চেষ্টা সত্ত্বেও গৃহিণীর নিকট আপনাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার সুযোগ পাইতেন না।

(২)

একে বর্ষার প্রভাত, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে, তাহার উপর শয্যাত্যাগের পূর্ব্বেই গৃহিণী মুখখানাকে ভার করিয়া বলিলেন, 'আজ চাল বাড়ন্ত'। সুতরাং মদনদাদা নির্জ্জন চণ্ডীমণ্ডপটীতে একা বসিয়া খুব অপ্রসন্ন মনেই তামাক টানিতেছিলেন। সময় পাইয়া হুঁকাটাও তেমন ডাকিতেছিল না, কলিকাটাও ধূমদানে যথেষ্ট কৃপণতা করিতেছিল, দেখিয়া শুনিয়া অগ্নিদেবও ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছিলেন। সুতরাং দাদার এতাদৃশ বিপন্ন অবস্থা দর্শনে কে না বলিবে, "ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি।"

"পাকড়াশী মহাশয়ের কি এই বাড়ী?"

মদনদাদা সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, এ দুর্দ্দিনেও ছাতা মাথায় দিয়া, জানু পর্য্যন্ত কাদা মাখিয়া পাদুকা হস্তে জামাযোড়া পরা দুইটী ভদ্রলোক তাঁহার ক্ষুদ্র বৈঠকখানার সম্মুখে দণ্ডায়মান। দাদা লোক চিনিতেন। সুতরাং যথেষ্ট সমাদরের সহিত লোক দুইটীকে বসাইলেন, এবং স্বহস্তে তামাক সাজিয়া খাওয়াইয়া বৃষ্টিসিক্ত অতিথিদ্বয়ের শ্রান্তি দূর করিলেন। তারপর কাজের

কথা। সে অনেক কথা, এবং সে কথার ভাষা যেমন জটিল, তেমনই অস্তের অশ্রাব্যস্বরে কথিত। সুতরাং আমরা তাহার বিস্তৃত বিবরণ দানে অক্ষম। তবে সেই দণ্ডদ্বয়ব্যাপী কথার শেষ ফল এই দাঁড়াইল যে, আগন্তুকদ্বয় গমন কালে একখান উইলের সহিত ত্রিশ কেতা দশটাকার নোট দাদার হাতে দিয়া গেলেন এবং বলিয়া 'গেলেন, ঠিক সাতদিন পরে আস্‌বো। দাদাও বলিলেন, বাকী টাকাটা আনিতে ভুলিবেন না।

আগন্তুকদ্বয় চলিয়া গেলেন। দাদাও স্মিতমুখে বাটীতে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন,—"অ গিন্নি, এদিকে এস।"

ইহার পর চারি পাঁচ দিনের মধ্যে মদনদাদাকে কেহ বড় একটা দেখিতে পাইল না। এ কয়দিন দাদার নির্জ্জনবাস। একটা নির্জ্জন ঘরে দ্বাররুদ্ধ করিয়া দাদা এ কয়দিন কাটাইলেন, সঙ্গীর মধ্যে রহিল কেবল দোয়াত, কলম, কাগজ প্রভৃতি। পাঁচদিনের পর দাদার নির্জ্জনবাস সমাপ্ত হইল। রামচন্দ্রের বনবাসের ফলে যেমন রাক্ষসবংশ ধ্বংস, পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের ফল যেমন উত্তরা, তেমনই মদনদাদারও এই নির্জ্জন বাসের ফলে হইল একখানা সুদীর্ঘ উইল। দাদা সেই উইলের একটা স্থান বারবার মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলেন। সে স্থানটায় এই কয়টা কথা লিখিত ছিল,—'আমার স্থাবর অস্থাবর, নগদ, কোম্পানীর কাগজ ইত্যাদি যাবতীয় সম্পত্তির মধ্যে আমার ভাগিনেয় শ্রীমান্ গৌরহরি রায় বাবাজীবন—যাহাকে আমি বাল্যকাল হইতে পুত্রতুল্য প্রতিপালন করিয়াছি তিনি ৸৵ বারো আনা, আর আমার দুই বর্ষ বয়স্ক নাবালক পৌত্র শ্রীমান্ সুধীরচন্দ্র চৌধুরী ৵১০ আড়াই আনা এবং আমার কন্যা শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরী ৴১০ দেড় আনা অংশ পাইবেন। আর অত্রস্থলে ইহাও প্রকাশ থাকে যে, আমার পৌত্র শ্রীমান্ সুধীরচন্দ্র চৌধুরী যে পর্য্যন্ত সাবালক না হয়, সে পর্য্যন্ত সম্পত্তিতে তাহার কোন অধিকার রহিবে না। এতাবৎ কাল আমার ভাগিনেয় শ্রীমান্ গৌরহরি রায়ই ঐ বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিবেন। পরে সাবালক হইলে আমার পৌত্র তাহার প্রাপ্য অংশ তাঁহার নিকট হইতে বুঝিয়া লইবে।'

উইলের মাথার দিকে একপাশে উইলকর্ত্তার স্বাক্ষর আছে, শ্রীত্রিলোচন চৌধুরী সাং চাঁদখালি।

ঠিক সাতদিনের পর পূর্ব্বপরিচিত ভদ্রলোক দুইটী আসিলেন, এবং দাদার পঞ্চদিবসব্যাপী পরিশ্রমের ফল স্বরূপ উইলখানা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

যাইবার সময় ৭০ কেতা দশ টাকার নোট দাদার হাতে দিয়া গেলেন। দাদা হাসিতে হাসিতে আপন মনে বলিলেন,—"বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য।"

দাদা তখন বুঝিতে পারেন নাই যে, উপরে বসিয়া আর একটা অনন্তব্যাপিনী বুদ্ধি, তাঁহার এই গর্ব্বস্ফীত বুদ্ধিটাকে পরাভূত এবং অপ্রতিভ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

তা' অত কথা বুঝিতে গেলে চলে না। সকল কথাই বুঝিয়া চলিতে গেলে কি আজ দাদার গৃহিণীর হস্তে ভারি দুই খান সোণার বালা এবং গলায় ঐ পাঁচনর ছড়াটা উঠিত? না তিনিই এত দিন পরে গৃহিণীর নিকট আপনাকে বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার সুযোগ পাইতেন?

(৩)

ইহার পর এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে। মদনদাদা সেই মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের কথা, সেই উইলের কথা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে কত দলিল, কত তমশুক, কত উইল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার হাত দিয়া কত মোকদ্দমা রুজু হইয়াছে, কত মোকদ্দমায় তিনি জয়লাভ করিয়াছেন, কত মোকদ্দমায় হারিয়াছেন। এত ঝঞ্ঝাটের মধ্যে সেই পুরাতন কথাটা কি মনে থাকে? তা' দাদার মনে না থাকিলেও ইহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ অলঙ্কার দুইটী থাকায় গৃহিণী কথাটা ভুলেন নাই; আর ভুলেন নাই একজন—যাঁহার বিশ্ব-ব্যাপিনী বুদ্ধি দাদার বুদ্ধিটাকে পরাজিত করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

কাল বৈশাখের দিন। কিন্তু হাকিম তো সে কথা বুঝেন না। তাই তিনি শেষ কাছারিতে মোকদ্দমা ধরিয়া দিন ফেলিয়া দিলেন। আদালত হইতে চাল্‌তাপুর চারি ক্রোশের কম নহে। কাজেই মোকদ্দমার তদ্বিরকারক মদনদাদা একবার পশ্চিম গগন-প্রান্তবিলম্বি সূর্য্যের দিকে, আর বার বায়ু কোণে উদীয়মান একখানা ছোট মেঘের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে চাহিতে চাহিতে দ্রুতপদে মাঠটা পার হইতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই সকাতর দৃষ্টিতে সূর্য্য বা মেঘের কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না। রক্তিম সূর্য্য দূর গ্রামপ্রান্তে গাছের আড়ালে লুকাইলেন; আর মেঘখানাও আপনার বিরাট কৃষ্ণকায় বিস্তার করিয়া গোধূলির আলো ঢাকিয়া ফেলিল। সময় পাইয়া একটা ঝড়ও পশ্চিম দিক্ হইতে বাহির হইল। দাদা তখন মাঠের মাঝখানে।

তারপর যেমন ঝড়, তেমনই বৃষ্টি, তেমনই শিলাপাত। এই ত্রিবিধ আধি-দৈবিক দুঃখ সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিয়া মদনদাদা একটা গ্রাম পাইলেন।

এবং বিদ্যুৎস্ফুরণের সঙ্গে দেখিলেন, সম্মুখে একখান ছোট খড়ো বাড়ী। দাদা বিনা বাক্যব্যয়ে একেবারে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া এ যাত্রার মত জীবনরক্ষার সহিত বুদ্ধির মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন।

(৪)

বাড়ীতে দুইটী স্ত্রীলোক, আর একটী তিন বৎসরের শিশু। স্ত্রীলোক দুইটীই বিধবা, একটী বৃদ্ধা অপরা যৌবনে প্রৌঢ়া। যাহা হউক, তাঁহারা এই দুর্য্যোগে বিপন্ন অতিথিটীকে আশ্রয় দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না; বরং যথেষ্ট সমাদরের সহিত আতিথ্য সৎকারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহাদের যত্নে ও শুশ্রূষায় মদনদাদা সুস্থ হইলেন। তারপর কিঞ্চিৎ জলযোগ সমাপনান্তে গৃহের দাবায় একটা প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া মোকদ্দমার কাগজপত্রাদি ভিজিয়া নষ্ট হইয়াছে কি না তাহাই দেখিতে লাগিলেন। একটু দূরে বসিয়া বৃদ্ধা মালা ঘুরাইতে থাকিলেন। প্রৌঢ়া রন্ধনশালায় গিয়া অতিথির আহারের উদ্যোগে ব্যাপৃত হইলেন। তখন ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে, আকাশে নক্ষত্র ফুটিয়াছে, নৈশবায়ু বৃষ্টিসিক্ত চাঁপা ফুলের গন্ধ মাখিয়া শান্ত শিষ্টের মত ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। রাত্রি প্রায় এক প্রহর।

চোখে চস্‌মা লাগাইয়া মদনদাদা এক এক খানা কাগজের ভাঁজ খুলিতেছিলেন, আর একবার তাহাতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই পাশে গুছাইয়া রাখিতেছিলেন। এমন সময় একটী তিন বৎসরের শিশু হেলিতে দুলিতে স্খলিত গতিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দাদা মুখ তুলিয়া শিশুর দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, দিব্য ছেলেটী, যেমন দুধে আলতার রং, তেমনই গোলগাল গড়ন, তেমনই আবার মুখখানি। মদনদাদা স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে শিশুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার বহুদিনের বিস্মৃত একটা কথা মনে পড়িল। কিছুদিন পূর্ব্বে এমনই একটী শিশু তাঁহার সংসারটীকে আলোকিত করিয়াছিল; এমনই রূপ, এমনই গড়ন, এমনই সুন্দর মুখখানি। কিন্তু হায়, তিনটী বৎসর মাত্র সংসারে থাকিয়াই সে সোণার শিশু কোন্ সোণার রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। দাদার অন্তস্তল বিদীর্ণ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বহির্গত হইল।

তাঁহার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া শিশুর একটু সাহস হইল। সে আর একপদ অগ্রসর হইয়া, পাছু পানে চাহিয়া আধ আধ স্বরে বলিল,—"মা, কে।"

মদনদাদা স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন,—"আমি—আমি তোমার দাদা, এস।"

শিশু বলিল,—"মা, দাদা ?"

বৃদ্ধা মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিলেন,—"হাঁ দাদা।"

শিশু, বিস্তৃত কাগজগুলির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আর একটু অগ্রসর হইল। মদনদাদা তাহাকে টানিয়া লইয়া কোলের উপর বসাইলেন, এবং তাহার ফুল্ল কুসুমগুচ্ছসদৃশ কোমল গণ্ডে স্নেহভরে চুম্বন করিলেন। শিশু ছোট ছোট দাঁত গুলি বাহির করিয়া হাসিয়া ফেলিল। মদনদাদা জিজ্ঞাসিলেন, —"তোমার নাম কি ?"

কাগজগুলির দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া শিশু বলিল,—"সুই।"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"সুধীর।"

নাম শুনিয়াই মদনদাদা যেন শিহরিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধা বলিলেন,—"আর বাবা, ওর আজ ভাবনা কি। রাজার ছেলে, রাজার নাতি, ওকে কি আজ এই কুঁড়ে ঘরে থাকতে হয় ? কি বল্‌বো, সবই কপাল।"

বৃদ্ধার একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ দাদার কাণে গেল। তিনি রুদ্ধ-শ্বাসে বলিলেন,—"কেন, হয়েছে কি ?"

বৃদ্ধা মালাটীকে গলায় পরিয়া বলিলেন,—"হবে আর কি, ভগবান সবই দিয়েছিলেন, কিন্তু মানুষে তা' ফাঁকি দিয়ে নিলে।"

ম। ফাঁকি ?

বৃ। ফাঁকি বৈকি বাবা। বুড়ো মরবার পরই শুন্‌লাম, নাতিকে বারো আনা বিষয় দিয়ে গেছে। এখন আবার শুন্‌ছি তা' নয়, আড়াই আনা। তাও এখন পাবে না। উইল জাল বাবা, উইল জাল।

মদনদাদা কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"এই কি চাঁদখালির ত্রিলোচন বাবুর—"

বৃ। হাঁ বাবা, তারই নাতি।

দাদার হৃদয়ে এককালে শত বৃশ্চিক দংশন করিল। তিনি অস্থির ভাবে বলিলেন,—"এ এখানে কেন ?"

বৃদ্ধা বলিলেন,—"ওর বাপ, বুড়োর অবাধ্য ছিল। তাই বুড়ো রাগ করে ছেলেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তা' সেই হ'তেই মেয়ে জামাই আমার এখানেই ছিল। তারপর—"

জামাতার মৃত্যু কথাটা বৃদ্ধা মুখে আনিতে পারিলেন না, তিনি নীরবে নয়ন মার্জ্জনা করিলেন। মদনদাদা সুধীরের মুখের দিকে চাহিলেন। সুধীর তাঁহার গলা জড়াইয়া বলিল,—"দাদা!"

দাদা তাহার গণ্ডে গাঢ় চুম্বন করিলেন। চুম্বনের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক বিন্দু তপ্ত অশ্রুও বুঝি গড়াইয়া পড়িল।

ম। উইল কি মঞ্জুর হয়ে গেছে?

বু। এখনও মঞ্জুর হয়নি, আদালতে দাখিল হয়েছে।

দাদা যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

(৫)

তা' তোমরা বিশ্বাস কর বা না কর, অদৃষ্ট বলিয়া একটা কিছু আছেই আছে। নতুবা সংসারের একটানা স্রোতে বাধা দেয় কে? কাহার প্রভাবে দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি হইল? কে বিল্বমঙ্গলকে প্রেমের পথ দেখাইয়া দিল? কে জগাই মাধাইকে উদ্ধার করিল? তুমি যতই অবিশ্বাসী হও, যতই যুক্তিতর্কের ফুৎকারে অদৃষ্টকে উড়াইয়া দাও, জগতের কার্য্যকারণ সূত্রের অলক্ষ্য আকর্ষণে একদিন তোমাকে অদৃষ্টের অধীনতা স্বীকার করিতেই হইবে; একদিন তোমাকে অদৃষ্টের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিতেই হইবে, অদৃষ্টের গতি অলঙ্ঘনীয়।

এই অদৃষ্টসূত্রের অলক্ষ্য আকর্ষণই আজি প্রভাতে মদনদাদাকে গৃহে যাইতে দিল না, আবার আদালতে টানিয়া লইয়া চলিল। সেখানকার কার্য্য শেষ করিয়া দাদা সন্ধ্যার সময় গৃহে ফিরিলেন। গৃহে আসিয়া শুনিলেন, কল্য রাত্রিতে তাঁহার গৃহে চুরি হইয়া গিয়াছে, গহনা পত্র, টাকা কড়ি সমস্তই অপহৃত হইয়াছে। দাদা মনে মনে বলিলেন, ঠিকই হইয়াছে।

তারপর মদনদাদা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পুরাতন অনাবশ্যক কাগজের বাক্সটা ঘাঁটিলেন। শেষে একখানা কাগজ চাদরে বাঁধিয়া রাখিয়া শয়ন করিলেন। প্রভাতে উঠিয়াই দাদা আবার আদালত অভিমুখে চলিলেন। যাইবার সময় গৃহিণীকে বলিয়া গেলেন,—"সাবধানে থাকিও।"

সে দিন জজ সাহেবের এজলাসে উইলের মোকদ্দমা উঠিয়াছে। ত্রিলোচন বাবুর ভাগিনেয় গৌরহরি বাবু পারিষদবর্গের সহিত আদালতে উপস্থিত আছেন। প্রমাণ প্রয়োগাদি দ্বারা পূর্ব্বেই উইল সত্য বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। টিফিন্ শেষে, জজ সাহেব উইলের সপক্ষে রায় লিখিতেছেন। সকলেই নীরবে সোৎসুক দৃষ্টিতে জজ সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া আছে।

সহসা আদালতে একটা গোল উঠিল! একটা লোক প্রহরীকে ঠেলিয়া দিয়া একেবারে জজ সাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইল, এবং হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল,—"সাহেব, সাহেব, ও উইল জাল।"

চারিদিকে একটা গোল উঠিল, জজসাহেব লেখনী ফেলিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। গৌরহরি বাবুর উকীল দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"হুজুর ও একটা পাগল।"

জজসাহেব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিলেন। আগন্তুক করযোড়ে বলিল,—"দোহাই হুজুর, আমি পাগল নই, ও উইল জাল।"

জজসাহেব সরকারী উকীলকে ইঙ্গিত করিলেন। উকীল বাবু বলিলেন,—"তোমার নাম কি?"

আ। আমার নাম মদনমোহন পাকড়াশী।

উ। তুমি বলিতেছ উইল জাল, কিন্তু ইহার প্রমাণ কি?

ম। প্রমাণ এই আসল উইল।

আগন্তুক মদনদাদা চাদরের ভিতর হইতে আসল উইল খানি বাহির করিয়া উকীলের হাতে দিলেন। গৌরহরি বাবু এতক্ষণ ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন, এক্ষণে ধীরে ধীরে পলায়নের উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু তাহা জজসাহেবের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না, তিনি নজরবন্দী হইলেন।

আসল উইলখানি জজসাহেবের হাতে দিয়া উকীল জিজ্ঞাসিলেন,—"কে উইল জাল করিল?"

অকম্পিত স্বরে মদনদাদা বলিলেন,—"আমি।"

উ। কেন এমন কাজ করেছিলে?

ম। পয়সার লোভে।

উ। এখন আবার প্রকাশ করিলে কেন?

ম। তা' আমি ঠিক জানি না। তবে বোধ হয় এ বিধির খেলা।

তারপর প্রমাণ দ্বারা গৌরহরি বাবুর উইল জাল সাব্যস্ত হইল। জজ সাহেব জালের অপরাধে গৌর বাবুকে এবং মদনদাদাকে ফৌজদারী সোপরদ্দ করিলেন।

বিচারে গৌরহরি বাবু সাত বৎসরের জন্য শ্রীঘরে প্রেরিত হইলেন। মদনদাদা জাল করিলেও অপরাধ স্বীকার করায় বিচারক কৃপা করিয়া তাঁহাকে তিন বৎসর কারাবাসের আদেশ দিলেন। প্রহরীবেষ্টিত হইয়া জেলে যাইতে যাইতে মদনদাদা, গৌরহরি বাবুকে বলিলেন, "মশায়, রাগ করবেন না। কি করবো, বিধাতার খেলার কাছে মানুষের বুদ্ধির খেলা কল্‌কে পায় না।"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মূলতত্ত্ব।

কে দেয় খুলিয়া, নিত্য—নিশা-শেষে
স্বর্গ-দ্বার——আসিতে উষার,
ল'য়ে নিজ সাথে, স্বর্গের সুষমা
সাজাইতে সুশান্ত ধরায়?
কে কহে অরুণে উষা-আগমনে
ফুটাইতে কমলেরে?
কে ডাকে মরালে, খেলিতে কৌতুকে
পদ্ম-দলে সরোবরে?
ফুটাইতে ফুলে, প্রদোষ উষায়
কে বা বলে সমীরণে?
ঘটকালী করি' কে দেয় মিলা'য়ে
ফুলে ফুলে অলিগণে?
বিহগ নিচয় কাহার ইচ্ছায়
গাহে সুধাসিক্ত গান?
অমিয় হিল্লোল উঠে যেই তানে
মুগ্ধ হয় মনঃ প্রাণ।
কাহার বিধানে মিলে চক্রবাক্
নিশা-শেষে পুনর্ব্বার
চক্রবাকী-সনে? মধুর মিলনে
যায় দূরে দুঃখ-ভার।
কে আনে কাননে মধুমক্ষিগণে,
লভিবারে পুষ্পসার?

প্রজাপতি ভ্রান্তে হরিষে ফুলরেণু
সুরঞ্জিতে পক্ষ তা'র?
কে ফুটায় কথা, কোমল শিশুর
কমনীয় সুবদনে?
কে কহে শিশুরে, পিয়িতে পীযূষ
মুখ দিয়া মাতৃস্তনে?
বীজ হ'তে বৃক্ষ, বৃক্ষ হ'তে বীজ,
হয় কা'র মহিমায়?
কে দেয় প্রবৃত্তি কর্ম্মে জীবগণে?
কেন জীব আসে যায়?
বড়ই দুজ্ঞে'য়, বিশ্বের ব্যাপার
জ্ঞান-অগোচর যাহা,
ক্ষুদ্র জ্ঞান-বলে, সামান্য সংস্কারে
কি বুঝিবে নরে তাহা!
বুঝিতে বিস্তর, করে যে বিস্তর
আয়াস,—এ ধরাধামে—
ভস্মে ঘৃতাহুতি দেয় সেই মূঢ়;
বুঝে ভ্রান্তি পরিণামে।
মাত্র 'মূল' জনে, জানা গেলে কিছু
যায় জানা বাকি আর।
তাই বলি মনঃ! জান' সেই জনে,
'মূল' যিনি সবাকার॥

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

কুমারসম্ভবে পার্ব্বতী।

পঞ্চম সর্গে কবি পার্ব্বতীর চিত্র যেরূপ পরিস্ফুট করিয়াছেন তাহা অতীব সুন্দর। মহাদেবের নিকট প্রত্যাখ্যাত হইয়া ভগ্নমনোরথা সতী মনে মনে নিজ সৌন্দর্য্যের নিন্দা করিয়া যৌবনের সফলতা প্রাপ্তির জন্য নিজ সুকুমার

তনুকে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত করিতে দৃঢ় সঙ্কল্পা হইলেন। তাঁহার মাতা মেনকা তাঁহাকে অশেষ প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু পার্ব্বতীর দৃঢ় সংকল্প বিশিষ্ট মন কিছুতেই বিচলিত হইল না, "পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ" অভিলষিত বিষয়ে স্থির নিশ্চয় রহিল। কবি, অতুলনীয় তুলিকায় পার্ব্বতীর তাপস-চিত্র অতি সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। সৌন্দর্য্যশালিনী যুবতীর পরিবর্ত্তে জটা বল্কলধারিণী মঞ্জুমেখলা শোভিতা, কাষায় বাস ধারিণী পবিত্রা তাপসীর কঠোর তপশ্চর্য্যা দর্শন করিয়া, ভাব-বিস্ময়ে বিমোহিত হইতে হয়। সেই নবযৌবন সম্পন্না সুন্দরী পার্ব্বতীর সেই বিলোল কটাক্ষ, ভ্রুভঙ্গি আর নাই, বিলাস চাঞ্চল্যময়ী, হাবভাবশালিনী যুবতীর সে চিত্র নাই, তিনি এক্ষণে আর পুষ্পাভরণা, বস্ত্রালঙ্কার বিভূষিতা রাজনন্দিনী নহেন, পরন্তু নিরাভরণা জটা বল্কলধারিণী মূর্ত্তিমতী তপস্বিনী। কঠোর সংকল্পা দৃঢ় তপস্যাপরায়ণা পার্ব্বতী, তপশ্চর্য্যা সময়ে, বৃক্ষ-পতিত পত্রাদি পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতেন না, এই জন্য পৌরাণিকেরা তাঁহার নাম অপর্ণা রাখিয়া ছিলেন। ভোগ বিলাস লালিতা নবযৌবনা লাবণ্য-বতী রাজনন্দিনী হইয়া তিনি যেরূপ মৃণালিকা পেলব সুকোমল তনুকে অবিচলিত ধৈর্য্য সহকারে, দুষ্কর তপশ্চর্য্যায় নিযুক্তা করিয়া তপস্যার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, ঋষিগণও তাঁহার ন্যায় সেরূপ কঠোর তপস্যা করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

কাব্যে, কাব্যাংশের নায়ক নায়িকার চরিত্র চিত্রন করিবার প্রধান লক্ষ্য চরিত্র গঠন। কবি, সে বিষয়েও সাবধানতার সহিত নিজের কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এস্থলে পুরুষরূপে দেবাদিদেব মহাদেব স্বয়ং নায়ক ও প্রকৃতি রূপা পরমেশ্বরী পার্ব্বতী নায়িকা। জগতের যাবতীয় গুণের শ্রেষ্ঠত্ব যে এই চিত্রে প্রতিপাদ্য থাকিবে তাহার আর বিচিত্রতা কি। জগতের সারভূতা অলোক-সামান্যা পার্ব্বতীর যেমন সৌন্দর্য্যে, তপস্যায়, পতিপরায়ণতায়, গুণগ্রামে কবি জগতের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেইরূপ জগত গুরু জগতের শিক্ষক মঙ্গলময় ত্রিগুণাতীত আদিদেব মহাদেবের চরিত্রেও অসামান্য ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, তপোবলের ও বীর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। ভাষার লালিত্যে, রচনার মাধুর্য্যে এই গ্রন্থ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। যেমন মহান চরিত্র তেমনই নিপুণ চিত্রকর। এই চিত্রের মধুর সরস ভাব, প্রেমের অস্ফুট মধুর ঝঙ্কার যেন ভ্রমর গুঞ্জনের ন্যায় হৃদয়ে মুখরিত হয়। পার্ব্বতীর দৃঢ় তপস্যায় দেবাদিদেব মহাদেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভগবান

চিরদিনই ভক্তের অধীন, তাই পার্ব্বতীর ভক্তিপূর্ণ তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মচারি-বেশে পার্ব্বতীর তপস্যাশ্রমে সমাগত।

"অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগলভ বাক্। জলন্নিব ব্রহ্ম ময়েন তেজসা।
বিবেশকশ্চিজ্জটিলস্তপোবনং। শরীর বদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা॥"

পার্ব্বতীর লোকবিমোহিনী সৌন্দর্য্য-ছটায় ত্রিলোক মোহিত হইত, এমন কি কামকান্তা রতিও পরাজয় মানিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সৌন্দর্য্যময়ী যুবতীর অসীম অধ্যবসায় যত্ন দৃঢ়তার সহ তপস্যায় নিরভরণা তপঃক্লশিতা তাপস মূর্ত্তিটী যেন পবিত্রতার জাজ্বল্যময়ী ছবি।

যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য এত ক্লেশ, এত একাগ্রতা, এত যত্ন, এক্ষণে তাঁহার সেই অভিলষিত মনোরথ সিদ্ধি হইবার পথ উন্মুক্ত হইল। বহু গুণশালিনী পার্ব্বতী অতিথি সৎকারে চিরদিনই ভক্তিমতী, এক্ষণে তেজঃপুঞ্জ নবীন ব্রহ্মচারীকে আগত দেখিয়া অতি যত্নে, বহু সমাদরে আতিথ্য সৎকার করিলেন। সমদর্শিতা-জ্ঞান যথেষ্ট থাকিলেও, এক এক ব্যক্তির দর্শনেই যেমন তাঁহার উপর ভক্তি গৌরব অধিকতর হয়, সেই মত নবীন ব্রহ্মচারিদর্শনেই তাঁহার প্রতি পার্ব্বতীর ভক্তি গৌরব যেন অধিকতর হইল। ব্রহ্মচারিবেশী মহাদেবও পার্ব্বতীর সহ কথাবার্ত্তার সম্ভাষণে পার্ব্বতীর মনোভাব সুস্পষ্টরূপে বুঝিয়া লইলেন।

চরিত্র চিত্রনে কবি পাছে পদস্খলিত হন, এজন্য অতি সাবধানে, সতর্কতা সহকারে মহাদেব ও পার্ব্বতীর চরিত্রে নিখুঁত ভাবে পবিত্রতা, নির্ম্মলতা রক্ষা করিবার জন্যই এ স্থানে প্রেমের বিকাশ প্রচ্ছন্নভাবে রাখিলেন। তথাপি কবির চিত্র-কৌশলে এই প্রচ্ছন্ন ভাবের মধ্যেও প্রেমের অস্ফুট মধুর বিকাশ যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। ব্রহ্মচারীও পার্ব্বতীর নিকটে আতিথ্য সৎকার লাভ করিয়া ক্ষণকাল যেন স্থির ভাবে বিশ্রাম করিতেছেন, এই ভাবেই রহিলেন ও কিয়ৎক্ষণ পরে পার্ব্বতীর প্রতি সরল মধুর দৃষ্টি সহকারে শিষ্টজনোচিত বাক্যে বলিতে লাগিলেন—

অপি ক্রিয়ার্থং সুলভং সমিৎ কুশং।
জলান্যপি স্নান বিধি ক্ষমানি তে॥
অপি স্ব শক্ত্যা তপসি প্রবর্ত্তসে।
শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্॥

কেমন! তোমার তপোনুষ্ঠান যোগ্য কুশ কাষ্ঠ গুলি এখানে পাওয়া যায় ত? এ স্থানের জলে তোমার স্নানাদি কার্য্য সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হয় ত? তুমি

অতিরিক্ত তপস্যায় শরীরকে কষ্ট দাও না ত? কেননা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, শরীরই ধর্ম্ম সাধনের প্রধান উপায়। মহাদেবের, পার্ব্বতীর প্রতি প্রত্যেক কথাতেই, যেন বন্ধুত্ব জড়িত। ব্রহ্মচারীর মধুর কোমল বাক্যে পার্ব্বতী মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইলেন, কিন্তু অপরিচিত অতিথি ব্রহ্মচারীকে স্পষ্টভাবে কিছু বলিলেন না। ব্রহ্মচারী তখন পুনরায় পার্ব্বতীর মনোভাব জানিবার জন্য উপর্য্যুপরি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। "হে পার্ব্বতী স্বর্গ-গঙ্গা সপ্তর্ষিগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া যেরূপ পবিত্র হইয়াছেন। তোমার পিতা হিমালয় সেই গঙ্গাবারি মস্তকে ধরিয়া যেমন পবিত্র হইয়াছেন, তোমার নির্ম্মল চরিত্র ততোধিক পবিত্রতা লাভ করিয়াছে। ধর্ম্মই যে মানবের ত্রিবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাহা তোমায় দেখিয়াই স্পষ্ট বোধ হইতেছে, কেননা, তোমার মত সুন্দরী বুদ্ধিমতী রমণী, অর্থ-ভোগ-স্পৃহা দূরে রাখিয়া ধর্ম্মের অনুসরণ করিতেছেন"। মহাদেবই যে পার্ব্বতীর একান্ত বাঞ্ছনীয়, পার্ব্বতী স্বমুখে তাহা স্বীকার করেন, তাহাই প্রভুর ইচ্ছা, এজন্য প্রকারান্তরে পুনঃ পুনঃ একথার অবতারণা করিতে উদ্যত। তিনি পার্ব্বতীকে উদ্দেশ করিয়া আবার বলিলেন, 'অয়ি অবনত-কলেবরে'! তুমি যখন আমাকে এত সমাদর করিতেছ তখন আর আমাকে তোমার পর ভাবা উচিত নয়, কারণ পণ্ডিতেরা বলেন যে, সাতটি কথা একত্রিত হইলে সাধু লোকের বন্ধুত্ব জন্মিয়া যায়। অতএব হে তাপসি! আমি ব্রাহ্মণ,তুমিত জান দ্বিজাতি স্বভাবতঃই চপল স্বভাব হইয়া থাকে; আশা করি আমার এ চপলতা তুমি ক্ষমা করিবে ও গোপনীয় না হইলে ইহার যথার্থ উত্তর দিয়া আমায় সুখী করিবে।"

এস্থলে দেবাদিদেব মহাদেব তরুণতাপসী পার্ব্বতীর গুণে ও তপস্যায় আকৃষ্ট হইয়াই তাঁহার হৃদয়ের কপাট উদ্ঘাটন করিয়া হৃদয় মন্দিরের দেবীটি যে কি, তাহাই জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে চারু-হাসিনি, স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মার অংশে তোমার জন্ম, তোমার ত্রিলোকবিমোহিনী সৌন্দর্য্য রূপ মাধুরী,বয়সেও তুমি নবীনা,বিশেষতঃ তুমি রাজনন্দিনী, বিষয় ভোগ-বিলাসও তোমার অপ্রাপ্য নহে; তবে, কি বাসনায় এই দুষ্কর তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছ? যে সকল ক্ষীণকটিশালিনী রমণী তেজস্বিনী হয় কোন অপ্রিয় ঘটনা হইলে তাহাদের এইরূপ প্রবৃত্তি হয় বটে, তোমার পক্ষে তাহাও অসম্ভব। তোমার যে সুন্দর মূর্ত্তি, শোক যে তোমাকে স্পর্শ করিয়াছে তাহা বোধ হয় না। তোমার পিতৃ গৃহে যে কোনরূপ অবমাননা প্রাপ্ত হইয়াছ তাহাও

অসম্ভব। অন্যে কেহ যে তোমার অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছে, তাহাও মনে লয় না। কেননা ফণিনীর মস্তকের মণি কে-ই বা অপহরণে সাহসী হইবে। তবে

কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে
ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধকশোভি বল্কলম্
যদ প্রদোষে স্ফুট চন্দ্র তারকা
বিভাবরী যদ্যারুনায় কল্পতে।

বল দেখি সন্ধ্যার সুনীল আকাশে চন্দ্র তারকা উদিত না হইয়া যদি সূর্য্যোদয় হয়, তাহা কি অসম্ভব হয় না? মহাদেব পার্ব্বতীর প্রতি নানা স্নেহসূচক বাক্যে তাঁহার হৃদয়ের ভাব অবগত হয়েন ইহারই বিশেষ চেষ্টা, তাই পুনঃরায় তিনি বলিলেন, "তবে কি তুমি উপযুক্ত স্বামী পাইবার জন্য তপস্যা করিতেছ"? 'স্বামী' নাম শুনিয়াই পার্ব্বতীর চিত্ত বিকল হইল, মনোভাব গোপন অসাধ্য হইল, তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল, লজ্জায় মুখ খানি আরক্তিম ভাব ধারণ করিল। তথাপি তিনি মৌনী রহিলেন। পার্ব্বতীর এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া মহাদেব আবার বলিলেন,"তাইত! স্বামী নাম শুনিয়াই তোমার দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। এখন বুঝিলাম যে স্বামীর জন্যই তোমার তপস্যা। কিন্তু তবু আমার সন্দেহ দূর হইতেছে না। যাহাকে তুমি প্রার্থনা কর এমন পুরুষ ত ত্রিজগতে দেখি না, আর এমন লোকই বা কে আছে যে তুমি প্রার্থনা করিয়াও তাহাকে পাইতেছ না।" তখন যদি কবি দেবাদিদেবের মূর্ত্তি ও মনের ভাবটি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিতেন তবে দেখিতে পাইতেন, তাঁহার প্রতি কথায় প্রেমের মধুর নিক্কণ বাজিতেছে, প্রতি ভাষাতেই প্রচ্ছন্ন প্রেমের অস্ফুট ঝঙ্কার দিতেছে।

ছলক্রমে শিব আবার বলিলেন, কি আশ্চর্য্য তোমার প্রিয়পাত্র কি এতই নিষ্ঠুর? তোমার এই সুকুমার শরীর দিবা ভাগের চন্দ্রকলার ন্যায় বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে, রৌদ্র তাপে দগ্ধ হইতেছে, তপঃক্লেশে ক্ষীণ ও কৃশ হইতেছে, ইহা দেখিয়াও কি তাঁহার মনে কষ্ট হয় না। এই মুনিব্রত ধারণে তুমি অতিশয় কৃশাঙ্গ হইয়াছ দেখিয়া তাঁহার দুঃখ হইতেছে না।

অবৈমি সৌভাগ্যমদেনবঞ্চিতং
তব প্রিয়ং যশ্চতুরাবলোকিনঃ

বুঝিলাম তোমার প্রিয় পাত্র অতি অহঙ্কারী, তাই আত্মগৌরবে প্রতারিত হইয়া আছে। অতএব হে গৌরি! এই দুঃসহ তপঃক্লেশ আর কত কাল সহ্য করিবে, আমিও এই ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে কিঞ্চিৎ তপস্যা সঞ্চয় করিয়াছি, না হয় তুমি

তাহার কিয়দংশ লইয়াই আপনার অভিষ্ট সিদ্ধ কর। এবং তোমার প্রিয় পাত্রটী কে, তাহা আমায় বল।

এতক্ষণ সুদীর্ঘ ভূমিকার পর মহাদেব পার্ব্বতীর মনের অবস্থাটি সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত হইলেন। ও ক্ষণকালের পরিচয়েই চির পরিচিতের ন্যায় সুহৃদ হইলেন, তাঁহার কথা গুলি যেন পার্ব্বতীর উপর স্নেহ ভালবাসা নিহিত। পার্ব্বতীও আর মনোভাব গোপন করিতে পারিলেন না, লজ্জাক্রমে প্রিয় জনের নাম উল্লেখও করিতে পারিলেন না, অগত্যা ব্রীড়াবনত বদনে পার্শ্ব-বর্ত্তিনী সখীর প্রতি কটাক্ষ ইঙ্গিত করিয়া অকপটে সখী মুখে সমস্তই কার্য্য করিলেন।

তখন পার্ব্বতীর সুচতুরা সখী ব্রহ্মচারীকে কহিলেন, হে ব্রাহ্মন্ আপনি যে বিষয় শুনিবার জন্য এত কৌতূহলী তাহা শুনুন। ইনি যাঁহাকে প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় এই সুন্দর সুকুমার শরীরকে তপোনুষ্ঠানে নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহার অভিলাষ উচ্চ। ইনি ইন্দ্র চন্দ্র, প্রভৃতি দিকপালগণের মধ্যে কাহাকেও বরণ করিতে ইচ্ছুক নহেন। যিনি কাম বিজয়ী, যিনি সৌন্দর্য্য রূপের বশীভূত নহেন, সেই দেবাদিদেব মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার বাঞ্ছা করেন। তাই তিনি জগৎ পতি শিবকে পতিরূপে পাইবার জন্য পিতৃ অনুমতি লইয়া, আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া এই তপোবনে তপস্যায় নিযুক্তা হইয়াছেন। সখী অকপটে ব্রহ্মচারীর সমক্ষে পার্ব্বতীর সকল অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। ব্রহ্মচারী আদ্যোপান্ত সকলই শুনিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখের আকৃতির কোন পরিবর্ত্তন হইল না, আনন্দ চিহ্নও কিছু দেখা গেল না। এ স্থানে প্রভু ছল পূর্ব্বক আত্ম গোপন রাখিবেন ইহাই তাঁহার ইচ্ছা।

বীর্য্যবান মহাদেব প্রিয়জনের এতাদৃশ কষ্ট দেখিয়াও, কিছুই বাহ্য প্রকাশ করিলেন না, কেবলমাত্র তপঃকৃশিতা ক্ষীণাপার্ব্বতীর বেতস বল্লরীর মত মূর্ত্তিটীর প্রতি ভ্রূভঙ্গি সহকারে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন! তোমার সখী যাহা বলিতেছেন তাহা কি সত্য? এই স্থানে কবি অসাধারণ পটুতায় দেবাদিদেব মহাদেবের চরিত্র যে অসীম ধৈর্য্যের আধার, তাহা দেখাইয়াছেন। প্রিয় জনের দুঃখ শ্রবণে মহাদেব পূর্ব্বের ন্যায় অচল অটল—অবিকৃত-ই রহিলেন। প্রেমানুরাগের কোন চিহ্নই দেখা গেল না। পার্ব্বতী মহাদেবের কথা শুনিয়াই লজ্জায় মুকুলিতাক্ষি হইলেন; তখন ক্ষণেকের পর লজ্জা নম্রবদনে

হস্তের অঙ্গুলি গুলি মুদ্রিত করিয়া স্ফটিকের জপমালা গাছটি হস্তের উপর রাখিয়া অনেক বিলম্বে অতি কষ্টে বলিলেন—

যথা শ্রুতং বেদবিদাংবর ত্বয়া
জনোঽয়মুচ্চৈঃ পদলঙ্ঘনোৎসুকঃ
তপঃকিলেদং তদবাপ্তিসাধনম্
মনোরথানামগতির্নবিদ্যতে।

তখন ব্রহ্মচারী বলিলেন যে, শিবকে আমি জানি; তিনি কদাচারী পুরুষ, তাঁহাকে পাইবার জন্য তোমার, আবার চেষ্টা! কিন্তু আমি এ বিষয়ে তোমার পক্ষপাতী নহি। এমন অসার বস্তুতে তোমার এত আগ্রহই বা কেন? যখন তোমার এই মৃণাল নিন্দিত হস্তে বিবাহের মাঙ্গল্য সূত্র পরাইয়া দিবে,যখন সর্পবেষ্টিত মহাদেবের হস্তে তোমার এই সুন্দর করকমল ধারণ করিবে তখন ইহার কি দুর্দ্দশা হইবে বল দেখি, তুমি আপনিই ভাবিয়া দেখ, বধূর কলহংস চিহ্নিত সুন্দর পট্ট বস্ত্রে, রক্ত রঞ্জিত হস্তীচর্ম্ম কি সুদৃশ শোভমান হয়? তোমার এই সুচারু চরণ যুগল যে চিরদিনই গৃহের পুষ্প বিন্যস্ত হর্ম্ম্যতলে বিচরণ করে। এক্ষণে কি সেই অলক্তকরাগ রঞ্জিত চরণ দুইখানি শ্মশান ভূমিতে বিচরণ করিবে? হরিচন্দন লেপিত তোমার বক্ষস্থল কি চিতাভস্ম-ধূলি সংলগ্ন হইবে? অতএব এ দুরভিসন্ধি হইতে মনকে নিবৃত্ত কর; তোমার মত সুলক্ষণা রমণীর তাদৃশ বরের সহিত বিবাহ হওয়া নিতান্ত অসঙ্গত।

ব্রহ্মচারী যখন শিবের নিন্দাবাদ আরম্ভ করিলেন তখন পার্ব্বতীর আর সহ্য হইল না, কেননা সতীর নিকট পতিনিন্দা বড়ই অপ্রিয়কর। শিবের বিরুদ্ধ বাক্য শ্রবণে কোপে পার্ব্বতীর অধরওষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। কুঞ্চিত ভ্রূবিক্ষেপশালিনী পার্ব্বতীর ভ্রূযুগ সঙ্কুচিত হইল, চক্ষুর প্রান্ত ভাগ আরক্ত ভাব ধারণ করিল, তিনি বক্র দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। রোষস্ফুরিতাধরা পার্ব্বতী ভাবী পতি মহাদেবের নিন্দাবাদ শুনিয়া বলিলেন, "শিব যে কি বস্তু তা তুমি জাননা, তাই এমন কথা বলিতেছ, সামান্য মূঢ় ব্যক্তিরাই মহাপুরুষদিগের কার্য্যের কারণ না বুঝিয়া মহাপুরুষের নিন্দা করে।"

অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাম্
ত্রিলোকনাথঃ পিতৃ সদ্মগোচরঃ
স ভীম রূপঃ শিব ইত্যুদীর্য্যতে
ন সন্তি যাথার্থ্যবিদঃ পিনাকিনঃ।

সকল সম্পত্তির উৎপত্তির স্থানই তিনি। তিনি শ্মশানবাসী সত্য কিন্তু ত্রিভুবনের অধীশ্বর। তাঁহার আকৃতিও ভয়ঙ্কর তথাপি তাঁহার নাম শিব।

বিভূষণোদ্ভাসি পিনদ্ধভোগি বা
গজাজিনালম্বি দুকূল ধারী বা
কপালি বা স্যাদথবেন্দু শেখরম্
ন বিশ্ব মুর্ত্তেরবধার্য্যতে বপূ।

এই স্থানে পার্ব্বতীর চিত্রে প্রেম গর্ব্ব বিস্ফুরিত হইতেছে। পতি পদই রমণীর জীবনের স্বর্গ। তাঁহার কথা গুলিতেই তাহা পরিব্যক্ত হইল। এই স্থানে পার্ব্বতী, রোষে ক্ষোভে আত্মহারা 'ফণিনীর মত সদর্পে বলিলেন, "তুমিত অধঃপথে গিয়াছ, শিবের নিন্দা করাই তোমার অভিপ্রায়। তবু শিবের একটী প্রশংসাও যে তোমার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট বলিতে হইবে; যিনি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির হেতু তাঁহার আবার জন্ম নিরূপণ কি?

অলং বিবাদেন যথা শ্রুতং ত্বয়া
তথাবিধ স্তবেদশেষমস্তু সঃ
মমাত্রভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং
নকামবৃত্তি বচনীয় মীক্ষতে।"

এ স্থলে পার্ব্বতীর ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিল, আর লজ্জা রাখিতে পারিলেন না, মুক্তকণ্ঠেই বলিলেন শিবের অশেষ দোষ থাকিলেও আমি তাঁহাতে অনুরক্ত। এই স্থানে পার্ব্বতীর প্রতি কথায় যেন তেজস্বিনী রমণীর গর্ব্ব ফুটিয়াছে। পার্ব্বতী গর্ব্ব বিস্ফুরিত নয়নে সখীকে বলিলেন, সখি বারণ কর, এই চপল ব্রাহ্মণের আবার অধরওষ্ঠ কাঁপিতেছে না জানি আবার কি বলিবে, মহতের যে শুধু নিন্দা করিলে পাপ হয় তাহা নহে, যে মহতের নিন্দা শুনে সেও পাপে লিপ্ত হয়। পরে কহিলেন :—

"ইতো গমিষ্যাম্যথবেতি বাদিনী
চচাল বালা স্তন ভিন্ন বল্কলা।"

এমন সময় দেবাদিদেব মহাদেব নিজ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া পার্ব্বতীর হস্ত ধারণ করিলেন, পার্ব্বতীও তাঁহাকে দেখিয়া প্রেমাপ্লুত হইয়া কাঁপিতে লাগিলেন, লজ্জায় তাঁহার গণ্ড অরুণ বর্ণ ধারণ করিল, ক্ষীণ শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, পলাইবার জন্য চরণ উত্তোলন করিলেন কিন্তু,

"মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেবসিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ॥"

শিব তখন সহাস্য বদনে বলিলেন,

"অদ্য প্রভৃত্যাবনতাঙ্গি ! তবাস্মিদাসঃ
ক্রীতস্তপোভিরিতি বাদিনী চন্দ্র মৌলী"

এই কথা শুনিয়া, পার্ব্বতী তপস্যা জনিত সকল কষ্ট ভুলিয়া গেলেন, কারণ যাহার জন্য ক্লেশ করা যায় তাহাকে পাইলে শরীর ও মন আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া উঠে।

কবির এই প্রেমের অভিব্যক্তি কি সুন্দর, কি মধুর ও মনোজ্ঞ হইয়াছে! যে প্রেমের প্রস্রবণ, কবি এতদিন রুদ্ধ রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে উপযুক্ত বিধায়, তাহা মোচন করিয়া দিলেন, প্রেমের পূর্ণ বিকাশ হইল। এই প্রেমে, পার্ব্বতীর ভক্তি, প্রীতি, প্রেম, আতিথ্য সমস্তই একত্রে মিলিত হইয়া, প্রেমের সার্থকথা সম্পাদন করিয়াছে। এই মহান্ চরিত্র অঙ্কণ দ্বারা কবি অমরত্ব লাভ করিয়া সাধারণের নিকট চির বন্দনীয় হইয়াছেন।

শ্রীমতী "নীতি-কবিতা" রচয়িত্রী।

আকবর সা (সানি)।

যে (দ্বিতীয়) সাহ আলমের নিকট হইতে লর্ড ক্লাইব বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করেন এবং যাঁহাকে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা মাত্র কর গ্রহণে স্বীকৃত করেন, ইতিহাস পাঠক মাত্রেই সেই হতভাগ্য দিল্লীশ্বরের বিষয় অবগত আছেন। মন্ত্রিপুত্র গোলাম কাদের কিরীচের দ্বারা ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহাঁর চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন করে। মহারাষ্ট্রীয়েরা কাদেরের হস্ত হইতে ইহাঁকে উদ্ধার করিয়া দারুণ দারিদ্র্য সমুদ্রে ডুবাইয়া রাখে। ১৮০৩ সালে লর্ড লেক ইহাঁকে মহারাষ্ট্রীয়দের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। ইনি ১৮০৬ সালে আপনার ক্লেশময় জীবন পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ইনি মৃত্যুর পূর্ব্বে গোলাম কাদেরের শোচনীয় পরিণাম দর্শন করিতে পাইয়াছিলেন। গোয়ালিয়রাধিপতি সিন্ধিয়া, প্রচুর যন্ত্রণা দানে গোলাম কাদেরকে হত করেন। এবং তাহার ছিন্ন মস্তক দিল্লীতে প্রেরণ করেন। উহা দৃষ্টিহীন বাদসাহের পদতলে পাতিত হইয়াছিল। সাহআলমের পর তৎপুত্র আকবর সাহ (দ্বিতীয়) দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৮৩৭ সালে মানবলীলা সংবরণ করেন। ইহাঁর রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য কোন বিষয়ই নাই। ইনি ব্রিটিশ সিংহের বৃত্তি (পেন্‌সন্)

ভোগী মাত্র ছিলেন। রাজক্ষমতা ইহাঁর হস্তে কিছুই ন্যস্ত ছিল না। তথাপি প্রাচীন তৈমুর বংশীয় মোগল ভূপতির বাহ্য সম্মানের অভাব ছিল না। আদব কায়দা সমস্তই বাদসাহের মত ছিল। দেশীয় রাজা ও নবাবেরা এখনও তাঁহার নিকট দস্ত বস্তা (হাত যোড়) দণ্ডায়মান থাকিত। এমন কি মেট্‌কাফ প্রভৃতি যে কমিশনরগণের একবার মাত্র লেখনী চালনে তিনি অবিলম্বেই সিংহাসনচ্যুত হইতে পারিতেন অথবা তাঁহার খোরাকী বন্ধ হইতে পারিত, তাঁহারাও বাদসাহের সম্মুখে দস্ত বস্তা খাড়া রহিতেন। বাঙ্গালা দেশে যেরূপ ভাবে পাঠশালার গুরু মহাশয়ের কাছে বালকেরা হাত জোড় করে এ সেরূপ হাত জোড় নহে। ইহার প্রণালী অন্যরূপ। বুকের নিকটে একটি হস্ত উপুড় করিয়া ধরিয়া তাহার উপর আর একটি হস্ত উপুড় করিয়া ধরিতে হয়। পেন্‌সন এবং ভূসম্পত্তি হইতে তাঁহার যে আয় ছিল, তাহাতে প্রায় ত্রিশ, চল্লিশ হাজার অধীনস্থ ব্যক্তি প্রতিপালিত হইত। পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রবর্ত্তিত ঠাটবাটের কিছুই পরিবর্ত্তন করিবার আবশ্যক হয় নাই।

আকবরের এই রাজ্যহীন রাজত্বের সময়ে একবার দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টি হইয়াছিল। দিল্লীর প্রজাগণ ও ওমরাহগণ তাঁহাকে বড়ই অনুরোধ করিতে লাগিল যে, আপনি নেমাজ ইস্তিক্কা (অর্থাৎ বারিবর্ষণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন। তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল পাছে তাঁহার প্রার্থনা ঈশ্বর কবুল না করেন। কিন্তু ক্রমেই অনুরোধের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। দিল্লীস্থ রাজা ও মহারাজগণ তাঁহাকে নেমাজ ইস্তিক্কার জন্য বড়ই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। দুরস্থ রাজা, মহারাজ ও নবাবগণ সাক্ষাৎ করিয়া অথবা পত্রের দ্বারা অনুরোধ করিতে লাগিলেন। জজ, কমিশনর প্রভৃতি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ নির্ব্বন্ধের সহিত তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের প্রজাগণ, যদিও এখন তাঁহারই সম্মুখে অন্য রাজার প্রজা হইয়াছে, তথাপি তাঁহার প্রজাবৎসল হৃদয়, প্রজার কষ্টে কাতর হইয়া উঠিল।

তিনি জশনের (খুসীর মজলিস) জন্য প্রস্তুত হইবার আজ্ঞা দিলেন। অমনই সমস্ত দিল্লী সহরে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা আকবরের জশন্ দেখিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইল। কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব সাজ সজ্জা লইয়া প্রস্তুত হইল। বৃটিশ অফিসারগণ সামরিক পরিচ্ছদে দণ্ডায়মান হইলেন। বাদসাহ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। দ্বিপ্রহর কাল; প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে ক্ষিতিতল ও দিক সমূহ প্রজ্বলিত হইতেছিল। জশন অগ্রসর

হইতে লাগিল। রাজা, নবাব, সুবাদার, জজ, কমিশনর, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ দন্তবস্তা ভাবে রাস্তার দুই পার্শ্ব দিয়া কাতার-বন্দ্ হইয়া গমন করিতে লাগিল। জশনের পশ্চাতে অযুত অযুত প্রজা ধাবমান হইতে লাগিলেন। ক্রমে জশন যথা সময়ে বেগমবাগে (যাহাকে এখন Queen's garden বলে) আসিয়া পৌঁছিল। অনাবৃত মস্তক, ঘর্ম্মসিক্ত কলেবর আকবর, কৃপা প্রার্থনা করিবার জন্য জানু পাতিয়া যুগ্মকরে ভূমিতে উপবেশন করিলেন। অবিশ্রান্ত রৌদ্র তাঁহার শরীরের উপর যেন তীক্ষ্ণধার ছুরিকার ন্যায় পড়িতে লাগিল। কিন্তু কাহার উপরে পড়িতেছে, বাদসাহ কি তাহা জানিতে পারিতেছেন? করুণাময় ঈশ্বরের চরণে লগ্নমনা হইয়া তিনি বাহ্য জ্ঞান হারা হইয়াছেন। তাঁহার দুই চক্ষু হইতে প্রবলবেগে সলিলধারা প্রবাহিত হইতেছে। অনুরক্ত ভৃত্যগণ উপবাসী বাদ্সাহের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল। কিন্তু তাহারা কাহাকে তাহাদের ব্যাকুলতা জানাইতেছে? পৃথিবীর সমস্ত বিষয় হইতে বাদসাহের হৃদয় এখন বিচ্ছিন্ন। সমস্ত বাদসাহের উপর যিনি বাদসাহ তাঁহারই ধ্যানে তিনি এখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য। দুই তিন ঘণ্টাকাল এই রূপেই অতিবাহিত হইয়া গেল। বাদসাহ অটল ও নিস্পন্দ। প্রজাগণ অতিশয় ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং সকলেই কতক্ষণে বাদসাহ এরূপ শরীরপাত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবেন তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু রাজর্ষি আকবরের হৃদয় অব্যাকুল। তিনি পরমেশ্বরের করুণারসে আপনাকে অভিষিক্ত মনে করিতেছেন। অথবা তিনি কি মনে করিতেছেন তিনিই জানেন। তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে দরবিগলিত অশ্রুজল প্রবলবেগে পতিত হইতেছে। মোগল রাজসিংহের এই দীনাবস্থায় দর্শকমণ্ডলীও অবিরল অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল।

প্রখর সূর্য্য-রশ্মি-জাল পরিব্যাপ্ত প্রাকৃতিক দৃশ্যের সহসা পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইল। হঠাৎ একখানি কাল মেঘ দেখা দিল। দেখিতে দেখিতে মেঘের উপর মেঘ, তাহার উপর মেঘ, ক্রমে নিবিড় নীল কাদম্বিনী সমস্ত গগন আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। প্রকৃতি দেবী তিমির বসন পরিধান করিলেন। ঘন ঘন তড়িচ্ছটা যেন সে বসন উন্মোচন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। পবন-সনে বারিধারা দেখা দিল। ক্রমে অজস্র বারিধারায় দর্শকমণ্ডলী পরিসিক্ত হইয়া গেল। চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহলধ্বনি উত্থিত হইল। ক্ষেত্রে, স্রোতের ন্যায় জল প্রবাহিত হইতে লাগিল। কে আর কোন্ জিনিষ সাম্‌লাইবে। সকলে দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিলেন। সকলের পায়ের গুল্‌ফ

পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল। বাদসাহ কি করিতেছেন দেখিবার জন্য সকলে উদ্‌গ্রীব হইতে লাগিল। নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় বাদসাহ সেই ভাবেই জানু পাতিয়া করযোড়ে ভূমিষ্ঠ, তাঁহার নেত্রজলের সহিত ঈশ্বর প্রেরিত জল মিলিত হইয়া ক্ষেত্রকে পবিত্র করিতে লাগিল। বাদসাহ তথাপি প্রত্যাবৃত্ত নহেন। এখনও তিনি অনন্তধামে ঈশ্বরের সন্নিকটেই আছেন।

বারি বর্ষণের জন্য প্রার্থনা সমাপ্ত হইয়া গেলে, চিরন্তন প্রথানুসারে বাদসাহ স্বয়ং স্বর্ণনির্ম্মিত লাঙ্গল ফলা গ্রহণ করিয়া একবার ভূমিকর্ষণ করিলেন। কৃষক পত্নী যেরূপ স্বামীর জন্য রুটী এবং অন্যান্য ভোজ্য দ্রব্য মাঠে লইয়া যায়, সেইরূপ এই উপলক্ষ্যে, বাদসাহের বেগম স্বামীর জন্য মাথায় করিয়া স্বহস্ত প্রস্তুত গ্রাম্য আহার্য্য দ্রব্য লইয়া আসিয়াছিলেন। এখন বাদসাহ সেই সকল আহার্য্য বস্তু ভক্ষণ করিলেন এবং জশন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। বলিলেন, আমি তখত্‌রাঁওয়াতে (যাহাকে বাঙ্গালায় তক্তা রামা বলে) যাইব। সুতরাং ফিরিবার সময় সকল বড় বড় লোক পদব্রজে যাইতে বাধ্য হইলেন। এবং এক কোমর জল ভাঙ্গিয়া রাজপ্রাসাদের নিকটস্থ হইলেন। যাঁহারা এই জশন দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ জীবিত আছেন কিনা, তাহা দিল্লীবাসীরা বলিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের পুত্র পৌত্রগণ পিতা ও পিতামহের নিকট যেরূপ শুনিয়াছেন, তাহাই লইয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইল। মূল কথা সকলের মুখেই এক প্রকার শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু শাখা প্রশাখা বিষয়ে কিঞ্চিৎ মতভেদ হইয়া গিয়াছে। মুন্সী বিহারীলাল বলিতেন যে, তৎকালীন লাটসাহেব আকবর সাহকে নমাজ ইস্তিকা পাঠ করিতে এই বলিয়া নিষেধ করিয়াছিলেন যে, যদ্যপি আপনি সফলতা লাভ না করেন, তাহা হইলে সাধারণের চক্ষে আপনাকে লজ্জিত হইতে হইবে। কিন্তু কথাটি অসার বলিয়া বোধ হয়। হয়ত কোন উচ্চ পদস্থ ইংরেজ বাক্যে তাঁহাকে ঐরূপ কিছু বলিয়া থাকিবে। জশন প্রত্যাবৃত্ত হইবার সময় সকলে পদব্রজে আসিয়াছিল। এ কথাও কাহার কাহারও মতে অমূলক।

দিল্লীবাসিগণ আকবর সা সানিকে ওয়লী (অর্থাৎ ঈশ্বরের কৃপাপাত্র) বলিয়া থাকেন। রাজাগিরি অনেকেই করিতে পারে, কিন্তু প্রজার জন্য না কাঁদিলে কি ঈশ্বর-কৃপার অধিকারী হইতে পারে? দিল্লীতে আকবর সা সানি যাহা দেখাইয়াছেন, তাহার তুলনা নাই। বর্ণিত বেগমবাগের দৃশ্যের ন্যায় দৃশ্য কেহ কখন কি দেখিয়াছ?

মর্দ্দানে খুদা ন খুদা বাশদ্
লেকিন জ্রে খুদা ন জুদা বাশদ্।

অর্থাৎ ঈশ্বরপরায়ণ মনুষ্য ঈশ্বর নহেন বটে, কিন্তু ঈশ্বর হইতে ভিন্নও নহেন।

শ্রীমেঘনাথ ভট্টাচার্য্য।

সমালোচনা।

অভিব্যক্তিবাদ।—শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি কর্ত্তৃক প্রণীত। দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ প্রভৃতি শব্দ যদ্রূপ পুরাতন ও প্রসিদ্ধ, এই অভিব্যক্তিবাদ শব্দটী সেরূপ পুরাতন ও প্রসিদ্ধ নহে। সেইজন্য পুস্তক-প্রণেতা তত্ত্বনিধি মহাশয় পুস্তকারম্ভে "অভিব্যক্তিবাদ কাহাকে বলে" এইরূপ উল্লেখে অভিব্যক্তিবাদ শব্দের অল্প একটু অর্থ ব্যাখ্যা বলিয়া দিয়াছেন। তাহাতেই আমরা বুঝিয়াছি, Theory of evolution এই ইংরাজি শব্দের অনুবাদে অভিব্যক্তিবাদ শব্দ সংকলিত বা সংগঠিত হইয়াছে। সুতরাং ইংরাজি Theory of evolution শব্দের যে অর্থ, তত্ত্বনিধি মহাশয়ের উচ্চারিত অভিব্যক্তিবাদ শব্দেরও সেই অর্থ। সর্ব্বাংশে সমান বা অবিকল অর্থ না হউক, অনেকটা কাছাকাছি অর্থ বটে। অতি সাবধানতার সহিত যুক্তিবিন্যাস সহকারে লিখিত হওয়ায় এই পুস্তক সাহিত্য-ভাণ্ডারের একটী উৎকৃষ্ট রত্ন বলিয়া গণ্য হইতে পারে। ইতর শ্রেণীর জীবজন্তু হইতে মনুষ্য জীবের উৎপত্তি হইয়াছে, এইরূপ একটী গুপ্ত তথ্য বর্ণন করা এই অভিনব অভিব্যক্তি-বাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এতন্মতে, বানরজাতীয় জীবেরাই বিদ্যমান মানবজাতির মূল বা পূর্ব্বপুরুষ।

উক্ত মত বা উক্ত প্রতিপাদ্য বিষয়টী তত্ত্বনিধি মহাশয়ের স্বোৎপ্রেক্ষিত নহে, এতদ্দেশীয় শাস্ত্রমতানুযায়ীও নহে। ইহা সেই সুপ্রসিদ্ধ ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত ডার্ব্বিন্ সাহেবের প্রতিষ্ঠাপিত বা প্রবর্ত্তিত অভিনব মত। এবং তত্ত্বনিধি মহাশয়ের প্রণীত এই অভিব্যক্তিবাদ নামধেয় পুস্তক সেই অভিনব মতের অনুবাদ। একেই ত স্বাধীনলিপি অপেক্ষা অনুবাদলিপি দুষ্কর, তাহাতে আবার বিজাতীয় ভাষার অনুবাদ! স্বভাষায় বিজাতীয় ভাষার অনুবাদ সমধিক দুষ্কর হইলেও তত্ত্বনিধি মহাশয় ডার্ব্বিন্ সাহেবের মতানুবাদে অকৃতকার্য্য হন নাই। বলা বাহুল্য যে, যে যে গুণে পুস্তকের শ্রেষ্ঠতা ও প্রশংসাবাদ প্রচয়গামী হয়, তত্ত্বনিধি মহাশয়ের অভিব্যক্তিবাদ পুস্তকে সে সমস্ত গুণই বিদ্যমান আছে। যিনি এরূপ প্রশস্ত পুস্তক প্রণয়ন করেন তিনি অবশ্যই জনসমাজের ধন্যবাদার্হ।

আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে প্রাচীন দলের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর লোক কোন নবাবিষ্কৃত বিষয় দেখিলে তাহার নূতনত্ব স্বীকার করিতে চাহেন না। করিলে যেন তাহাদের পূর্ব্বগৌরব থাকে না এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যেন বুদ্ধিমত্তায় কম হইয়া পড়েন। ইঁহারা বলেন, আমাদের রেলগাড়ী ছিল, বেলুন ছিল, কামান ছিল, ইত্যাদি। ডার্ব্বিন্ সাহেবের অভিব্যক্তিবাদ Theory of evolution এদেশে প্রচারিত হইলে ঐ শ্রেণীর লোকেরা অভিব্যক্তিবাদের সম্পূর্ণ নূতনত্ব স্বীকার না করিয়া, বলিয়া থাকেন, আমাদের শাস্ত্রের এতন্মতের মূলসূত্র বা বীজ

বিদ্যমান আছে। তন্নিদর্শনার্থ তাহার নিম্নলিখিত শাস্ত্রবচন পাঠ করিয়া আপনাদের পূর্ব্বগৌরবাভিমান চরিতার্থ করিয়া থাকেন। যথা—

"স ইমান্ লোকানসৃজত অম্ভোমরীচীর্ম্মরমাপোঽদোম্ভঃ পরেণ দিবং দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠা মন্তরীক্ষং মরীচয়ঃ পৃথিবীমরো যা অধস্তাৎ তা আপঃ। স ঐক্ষত ইমে নু লোকান লোকপালান্ নু সৃজৈ। সোঽদ্ভ্যএব পুরুষং সমুদ্ধৃত্য অমূর্চ্ছয়ৎ। তাভ্যো গামানয়ৎ তা অব্রুবন্ ন বৈ নোঽলমিতি। তাভ্যোঽশ্বমানয়ৎ তা অব্রুবন্ ন নোঽমলমিতি। তাভ্যঃ পুরুষমানয়ৎ। তা অব্রুবন্ সুকৃতং বতেতি।"

[ঐতরেয়ব্রাহ্মণম্।

"স্থাবরাদিষু কীটেষু পশুপক্ষিষু শৈলজে।
চতুরশীতিলক্ষং বৈ জন্ম চাপ্নোতি সোঽব্যয়ঃ॥
ততোলভেৎ পারশানি! মানুষীং দুর্লভাং তনুম্॥"

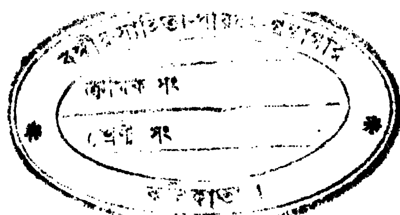
[নির্বাণতন্ত্রম্।

"স্থাবরাস্ত্রিংশলক্ষাশ্চ জলজা নবলক্ষকাঃ।
কৃমিজা দশলক্ষাশ্চ রুদ্রলক্ষাশ্চ পক্ষিণঃ॥
পশবো বিংশালক্ষাশ্চ চতুর্লক্ষাশ্চ মানবাঃ।
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে॥"

[কর্ম্মবিপাকঃ।

এতদ্ভিন্ন আর এক শ্রেণীর লোক আছেন তাঁহারা তার্কিক। ইহাঁরা এই অভিব্যক্তিবাদের সারবত্তা বা সম্বাদিত্ব স্বীকার করেন না। বলেন, আমরা অভিব্যক্তিবাদ নামক পুস্তক পড়িয়াছি,পড়িতে বেশ আমোদ লাগে,ভাষা ভাল,সাজান ভাল, সব ভাল, অথচ সমস্তই ভ্রান্তকল্পনার ক্রীড়া। পুস্তকের লিখিত যুক্তি, তর্ক, ভূগর্ত্তস্থ সাক্ষ্য, সমস্তই উভয়তোমুখী। অর্থাৎ ঐ সকল যেমন পর পর আরোহক্রমে অতি যৎসামান্য ইতর শ্রেণীর জীবজন্তু হইতে উৎকর্ষ-নিয়মের দ্বারা মানব জীবের অভিব্যক্তি প্রদর্শন করায়, তেমনি, উপরদিক্ থেকে দেখিলে, অর্থাৎ অবরোহক্রম অবলম্বন করিলে, অপকর্ষ নিয়মের দ্বারা অতি উচ্চ জীব মানব হইতে সমধিক নিম্ন জীবের জন্মপ্রকার প্রদর্শন করায়। যদি কোন চিন্তাশীল বুদ্ধিমান্ লোক "মানবের অপভ্রংশে বানর" এতন্নামধেয় পুস্তক লেখেন, তাহা হইলে তাঁহার কোনরূপ পৃথক্ অনুসন্ধানের শ্রম স্বীকার করিতে হয় না। ডার্ব্বিন্ সাহেবের শ্রম সমুদায়কে অবরোহক্রমে গ্রহণ করিলেই তাঁহার অভিপ্রেত পুস্তক সুসম্পন্ন হইতে পারে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যায়, অভিব্যক্তিবাদ ও তাহার তথ্য উপকথার ন্যায় শ্রুতিমধুর হইলেও সারতঃ উহা বিসম্বাদী অর্থাৎ মিথ্যা।

তার্কিক দলের এই উক্তি কতদূর সঙ্গত তাহা তার্কিকেরাই জানেন। পরন্তু আমরা অভিব্যক্তিবাদের প্রণালী সমূহ পাঠ করিয়া বিশেষ পরিতুষ্ট আছি এবং উহার সারবত্তাপক্ষেও সন্দিহান নহি।



অঙ্কুর।

বীজাদঙ্কুরনিষ্পত্তিরঙ্কুরাদ্বৃক্ষসম্ভবঃ
ফলপ্রদোভবেদ্বৃক্ষইত্থমাশাক্রমোমতঃ

২য় বর্ষ।] বৈশাখ, ১৩১৪। [৪র্থ সংখ্যা।

অবতার ও ইতিহাস।

মানবের চিদ্বৃত্তি জলের ন্যায় তরল; আবার ভাব-বায়ুর প্রতি হিল্লোলে উহা উৎক্ষিপ্ত ও উচ্ছ্বলিত হইয়া থাকে। এই জন্য, কি ব্যষ্টি ভাবে, কি সমষ্টি ভাবে, পরিচালক ভিন্ন মানব অথবা মানব সমাজ, সংসারে চলিতে পারা দূরে থাকুক, টিঁকিতেই পারে না। যিনি ভুবন সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি সর্ব্বোপরি নেতা, কিন্তু তিনি অতি মহান্—অতি উচ্চ,—মানবের সাধারণ জ্ঞান ততদূরে পৌঁছে না। কাজেই, মানবমণ্ডলী মধ্যে মানবীয় ধর্ম্মাক্রান্ত ঐশী শক্তির আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়। সৃষ্টি রক্ষাব্যপদেশেই এ প্রয়োজন; সুতরাং এই প্রয়োজনের উদ্যাপনই সৃষ্টির ইতিহাস।

মনের সহিত দেহের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের ন্যায়, অবতারের সহিত ইতিহাসের সম্বন্ধ অবিভিন্ন। অবতার কে? সাধুবৃত্তি সংরক্ষক, দুষ্কর্ম্মনাশক এবং ধর্ম্মসংস্থাপক যিনি, তিনিই অবতার। অতএব সকলের মূলে ধর্ম্মই "একমেবাদ্বিতীয়ং"।

"ধৃতিঃ ক্ষমাদমোস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধং দশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥"

কীর্ত্তি, বিজ্ঞান, বিদ্যা, আদর্শ, সংযম, মোক্ষ ও সত্য প্রকাশের ধারাবাহিক কাহিনীই ইতিহাস। এবং এই প্রকাশয়িতব্যের সমষ্টিই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম, ধর্ম্ম-সংস্থাপক—(বা সংস্কারক),—অবতার ও ইতিহাস এই তিনে পরস্পর আত্মা-

মজ্জা এবং দেহ। ইতিহাস ভাবস্বরূপে কাহিনী, প্রকৃতভাবে জগতের প্রকৃতি-পুঞ্জ। এই প্রকৃতিপুঞ্জ বা তাহার কোনও অংশ সংসারের গতি বিপর্য্যয়ে যখনই আলোড়িত হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম ও লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, তখনই তাহার রক্ষার নিমিত্ত অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে। নিখিল ক্ষত্রবিধ্বংসী কুরুযুদ্ধে তত্ত্বজিজ্ঞাসু পার্থের নিকট ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই সত্যই প্রকাশ করিয়াছিলেন।—

"যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

'হে ভারত! যখন যখনই ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তখনই আমি আবির্ভূত হই। সাধুবৃত্তি রক্ষার জন্য, দুষ্কর্ম্মনাশের জন্য, এবং ধর্ম্ম-স্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই।'

প্রকৃতিপুঞ্জের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মশাস্ত্রও এই অবতারবাদ, অবতার উপাসনা বা অবতারের প্রত্যাদেশ বাণীর সংগ্রহ। এই ধর্ম্মশাস্ত্রের সহিত ইতিহাস গুরুতর ভাবে সংশ্লিষ্ট। হিন্দুর বেদ, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত যেমন একদিকে ধর্ম্মশাস্ত্র, তেমনই, অপরপক্ষে ইঁহারা ভারতে আর্য্য-অনার্য্যের তুমুল সংঘর্ষ কালের দ্বাপরযুগস্পর্শী অতি আদিম যুগের আভাষবাহী জ্বলন্ত ইতিহাস। পরশুরাম অবতারে ভগবান বহুনৃপতিশাসিত ভারত, স্বীয় বিক্রমে বশীভূত করিয়া, সেই এককেন্দ্রীভূত সমষ্টিশক্তিরাজ্য কাশ্যপকে দান করিয়া ভারতেতি-হাসে একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনার সন্নিবেশ করিয়াছিলেন। আজি আমে-রিকার এবং জাপানের অভ্যুদয় দৃশ্যে জগতের ইতিহাস যে সুবর্ণোজ্জ্বল হইয়াছে,—ভারতে বহুযুগ পূর্ব্বে সে চেষ্টা হইয়াছিল। অত্যাচারী রাবণের দমন সাধন করিয়া শ্রীরামচন্দ্র ভারতে অটুট শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। দ্বাপরের অভিমানী অবিচারী কুরুনৃপতির শাসন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ যুগশেষে পাপ-পুণ্য তৌল করিয়া দেখাইয়াছিলেন। এক এক অবতারের লীলায় এক এক যুগের বিরাট ইতিহাস-কক্ষ পরিপূর্ণ। যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রখর জ্যোতিঃ-বলে হিন্দুভারত উন্নতির চরমশীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল, "অহিংসা"র শান্তি আদেশ জগতের দিকে দিকে প্রচার করিয়া, গৌতম বুদ্ধ যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম টলায়মান করিয়া তুলিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্যের বজ্রধ্বনি তাহার শক্তি ব্যাহত

না করিলে, ভারতকে আজ হয়ত তিব্বতীয় লামাগুরুর করুণা দৃষ্টির উপর নির্ভর করিতে হইত। কনৌজ গুর্জ্জর প্রদেশে ইতোমধ্যেই মহাবীর, পার্শ্বনাথ প্রমুখ জৈনসাধুগণের (জীনগণের) প্রত্যাদেশ অনুসরণ করিয়া শ্বেতাম্বর দিগম্বর সম্প্রদায়িগণ এক নূতন শাখা-ইতিহাসের পত্তন করিয়াছিলেন। জগতেতিহাসের প্রচার গুরু বুদ্ধের প্রত্যাদেশ জগতের সুদূর প্রদেশ সমূহে প্রভাসিত হইয়াছিল,—য়ুরোপখণ্ডে মূসার নীতি-বিজ্ঞান মধ্য হইতে উদার ত্রিনীতিতত্ত্ব (Trinity) লইয়া ইসা সেই প্রত্যাদেশ প্রচারে আবির্ভূত হইলেন। ইহার ফলে য়ুরোপখণ্ডে ইতিহাসের এক অভিনব স্তর উদ্ঘাটিত হইয়া গিয়াছিল। আজি এই প্রভায় জগতের ইতিহাস আলোকিত, কিন্তু সে আলোকে আর শান্তির অভয়দীপ্তি নাই, দারুণ দাহময় সর্ব্বগ্রাসী হুতভুকের মত সে আলোক বিকট বিভীষিকায়—সমগ্র জগতে—বিশেষত প্রাচ্য জগতে করাল লীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।

নেতাবিহীন, কেবল বিশ্বাসমাত্র সম্বল, উদ্ভ্রান্তচিত্ত আরবীয়েরা যখন আপন আপন সমাজসংহারক স্বরূপে পৈশাচিক খেলায় মাতিয়া উঠিয়াছিল, তখন উত্তপ্ত আরবা মরুভূমধ্য হইতে পরমেশ্বর প্রেরিত ("আল্লাহঃ রসুলল্লাহঃ") মহাবীর মোহাম্মদ (দঃ) এব্রাহামের (অঃ) ধর্ম্মজ্যোতিঃ সহস্র গুণে প্রকটিত করিয়া সে দুর্ণিবার পতন-স্রোতের গতি ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। আরবে সমাজ ধর্ম্ম সমস্তই দৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, ইহারই তেজ কয়েক শত বৎসর মধ্যে বঙ্গসিন্ধু হইতে চীনসীমা ও য়ুরোপ ভূমিতে আটলাণ্টিক-উপকূল পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করিয়াছিল। য়ুরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞান সভ্যতার কিরণ বিস্তার করিয়া, খৃষ্টীয় সংঘর্ষে কালে কালে এই তেজঃ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল;—রহিল ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সংক্ষিপ্ত সময় মধ্যে এক সুবিরাট অধ্যায়!

ওদিকে মহাত্মা মার্টিন লুথার যখন ঈশার অনুশাসনের পঙ্কোদ্ধারে য়ুরোপ আলোড়িত করিতেছিলেন,—বঙ্গের ভ্রষ্টতন্ত্রাচার কলুষিত সমুদ্রে বিরাট প্রেমের উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া শ্রীচৈতন্য নাম ও প্রেমাবতারে আবির্ভূত হইলেন। ভারতের ভাগ্যে এই প্রভা বড়ই সৌভাগ্য দেখিয়া উদিত হইয়াছিল, বড় দুর্ভাগ্যেই আবার নিস্তেজ হইয়া পড়িল। শ্রীচৈতন্য যে বিরাট প্রেমে হিন্দু মুসলমানাদি নির্ব্বিশেষে সমান উদারভাবে সকলকে এক আসনে আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহাতে যে মহতী আশা ভারতের বক্ষে উদ্রীক্ত হইয়াছিল,

ভারতের ভাগ্য ছিঁড়িয়া লইয়া সে আশা কু-আচারের অতল জলে নিমগ্ন হইয়া গেল। ভারতের সেই একদিন। মৃত নিৰ্জ্জীব ভারতের উদ্বোধনে এমন দিন আর আসিবে কি?

কেবল তাহারই জ্যোতিঃ-অংশে পেশোয়ারের মহাপ্রাণ সংস্পৃষ্ট হইয়া আর একবার অস্ত্রঝঞ্ঝনাসহ প্রেম ও কর্ম্মের যুগপৎ শক্তি লইয়া দৃপ্ত গর্ব্বে জাগিয়া উঠিয়াছিল,—প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য জগত যাহার ভ্রাতৃভাবে মুগ্ধ, বিক্রমে অতি মাত্র বিস্মিত ও চকিত হইয়া গিয়াছিল, আজ সে ধমনীতে তপ্ত শোণিত আর তেমন উত্তাল ভাবে বহে না। তাহার 'নূর' কোহিনুরের সঙ্গে সঙ্গে প্রতীচ্য জগতের অঙ্গীভূত 'হইয়া গিয়াছে।—ইতিহাসে রহিয়াছে "গুরুদরবার", আর আচারে রহিয়াছে পুরাকীর্ত্তি গাথা!

নিরীহ বঙ্গদেশে চৈতন্যের শক্তি, কর্ম্ম অপেক্ষা প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিল বেশী; সুতরাং সেই ক্ষেত্রে, রাজা রামমোহন দেশকালপাত্রানুযায়ী ব্যবস্থানুসারে যে শান্তকর্ম্মময় সংস্কার সাধন করিতে গেলেন, দুর্ভাগ্যবশতঃ কর্ম্মহীনতায়ই তাহা ক্রমশঃ বিলাসিতা ও বিশৃঙ্খলার পিচ্ছিল পথে ভ্রষ্টলক্ষ্য হইয়া সকল আশার পরিসমাপ্তি সাধন করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমকর্ম্মময় অবিরোধ জ্যোতিঃ যদি বিভাসিত হয়, অতল হইতে আশা গুচ্ছ আবার কোন দিন হয় তো তুলিলেও তুলিতে পারে।

হিন্দুর দশাবতারের মধ্যে সৃষ্টিবিজ্ঞান নিহিত। মৎস্যাবতারে কারণ বারি—সৃষ্টিময় অনন্ত অপার জলরাশি। কূর্ম্মরূপ ঈষৎ ভূমির আভাষজ্ঞাপক। বরাহ সদ্য ক্লেদপূর্ণ ভূমিসৃষ্টির জ্ঞাপক। নৃসিংহ আরণ্য ও অরণ্য জন্তু এবং ক্বচিৎ বনবাসী মানবের পরিচায়ক। বামন প্রথম উন্নত-ধী মানব। ইহাই প্রকৃতির সৃষ্টিবিষয়ক ক্রম পরিবর্ত্তন। দশমহাবিদ্যায়, কালী ঘোরা ভয়ঙ্করা-দিগ্বসনা রুধিরাপ্লুতা,—সৃষ্টির আদিম বিকাশের অবস্থা। তারা শান্ত, পার্শ্বে তিমিরবিনাশী অগ্নিকুণ্ড—জ্ঞানের আভা। ইহার পর ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী যুগের উন্নতাবস্থা। ছিন্নমস্তা ধূমাবতী খণ্ডপ্রলয়ের রূপক। বগলা পাপ-ঘাতিনী। কমলা শান্তি এবং ঐশ্বর্য্যশালিনী। ইহা জগতের সভ্যতার ক্রমবিকাশ।

সভ্যতার ক্রমবিকাশ। কিন্তু সভ্যতা কি? আর সভ্যতা কি ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র? উন্নতিই যদি সভ্যতা,—উন্নতিই তবে ইতিহাস। ইতিহাস ধর্ম্মে সংশ্লিষ্ট, সভ্যতা নহে কেন? সভ্যতা যেখানে ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া

সত্য প্রকটিত করিয়াছে, ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, সেখানে সভ্যতা দিন দিন উন্নতি লাভ করিয়াছে,—তাহার উন্নত গতি তখন অব্যাহত থাকিয়াছে। যখন সভ্যতা সভ্যতার নামে ধর্ম্মপথ উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বার্থ হিংসা এবং ব্যভিচারের পথে তাণ্ডব নৃত্যে মত্ত হইয়া সংসারের সৃষ্টি দাহন করিয়াছে, তখনই বিধাতার হস্তে, বজ্র, করাল ভৈরব স্বরে হুঙ্কার দিয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। আর্য্যের সমাজ—কি প্রাচ্যে কি প্রতীচ্যে সর্ব্বত্র এ সনাতন সত্য প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছে। হিন্দুর হিন্দুস্থান গেল, ইস্লামের বিরাট সাম্রাজ্য গেল, রোম গেল, গ্রীস গেল, ব্রিটন হইতে উইলিয়মের নরম্যান রাজ্য গেল,—সোডোমী এবং গোমোরার অভ্রংলিহ প্রাসাদ গেল। ধর্ম্মের গ্লানি করিয়া সভ্যতার ভাণ কবে স্বার্থরক্ষা করিতে পারিয়াছে?—ইহাই ইতিহাস—পংক্তিতে পংক্তিতে ঘোষণা করে—ইহাই অবতারের অনুশাসন বর্ণে বর্ণে শোনায়।

কালের নিমিষে নিমিষে সত্য রক্ষার জন্য ইতিহাস পরিবর্ত্তিত হইতেছে। যেখানে রক্ত বিন্দু ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছে,—তাহার পর পৃষ্ঠায় দেখিবে নূতন অধ্যায়। আমেরিকায় নূতন অধ্যায়, জাপানে নূতন অধ্যায়, রোমেও নবপর্য্যায়ের নূতন অধ্যায়। খৃষ্টাবতারের ইতিহাস হীরকাক্ষরে জ্বলিতেছে, বুদ্ধাবতারের ইতিহাস সুবর্ণাক্ষরে জ্বলিতেছে,—মোহাম্মদ, চৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণ, শঙ্কর—ইহাঁদের ইতিহাস কতদিন মসীলিপ্ত থাকিবে?—কালের তাড়নে রত্নমণি অঙ্গারত্ব পাইয়াছে,—অবতারেরা কৈ—'আত্মানং' সৃষ্টি করিলেন? হিন্দু প্রলয়ের দিনে ভীমমূর্ত্তি কল্কি অবতারের অপেক্ষা করিতেছেন, অনেকে সত্যযুগের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। সে দিন আসিতে কত গৌণ?

কিন্তু যাহা আপনি আসিতেছিল,—তাহার সান্নিকট্য আমরাই আপন কর্ম্ম ফলে পুনরায় দূরে প্রেরণ করিয়াছি। ধ্রুব একশক্তি সম্ভূত শক্তির প্রতি অবজ্ঞার হাসি হাসিতে আমরা কুণ্ঠিত হই না! সাম্প্রদায়িকভাবে উন্মত্ত, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া ঈশ্বরের রাজ্যে দুর্ব্ব্যবহার করিতেছি। সত্য ইতিহাস যাহা, তাহা সাম্প্রদায়িক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নহে। জগতের ইতিহাস মানবের ইতিহাস। অবতার, জগতেতিহাসের অঙ্গ। সুতরাং মানব জাতির হিসাবে সকল অবতার সমভাবে পূজ্য। নহিলে আপনি আপনার অবমাননা করা হয়। ইতিহাসের অবমাননা, অবতারের অবমাননা এবং ঈশ্বরের অবমাননা তুল্য কথা। ভিন্ন সম্প্রদায়ের একজন গুণশালী

মনুষ্যকে যদি সম্মান করিতে হয়, তবে জগতের ইতিহাস-অধ্যায় যাঁহাদের জ্যোতিকণার স্ফুলিঙ্গে উজ্জ্বল, সেই দেবাংশ অবতারের অসম্মান করা কি অপরিমেয় পাতক নহে? এক সাম্প্রদায়িক আচার ভিন্ন আত্মিক হিসাবে দেখিতে গেলে কোন মনুষ্যই অপর কোন মনুষ্যকে দ্বেষ করিতে পারে না। রাজা হউন, প্রজা হউন, ধনবান হউন, দীন হউন, কর্ত্তব্য সকলেরই চিরস্থির। তাহার ব্যভিচারেই অধর্ম্ম এবং বিনাশ নিশ্চয়। অবতার দ্বেষবৃত্তি শিক্ষা দেন না, অন্যায় ধ্বংস করিয়া সাম্যস্থাপনই তাঁহার বিধান। এই জন্য সকল অবতারের পূজা সকলের কর্ত্তব্য, তাহাতে জগতে সার্ব্বজনীন প্রীতির সঞ্চার হয়, ইতিহাস স্থির থাকে। আমরা ইচ্ছা করিয়া আপনাকে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডিতে আবদ্ধ করি, নহিলে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া জগতের প্রকৃত ইতিহাসকে জাতীয় ইতিহাস বলিতে পারিলে জাতীয় মস্তক সুবিরাট গর্ব্বে উন্নত হইত। এই জন্যই অবতারেরা বলিয়া গিয়াছেন,—সকলকে সমান কর। এ 'সমান করা' জোর করিয়া বা প্রলোভন দেখাইয়া কাহাকেও আচারচ্যুত করা নহে।—"সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য" অচ্যুতের আরাধনারূপ সমত্বই এই সাম্য। নতুবা, যে আচার চ্যুত হয়, এবং যে করায়, উভয় ব্যক্তিই অতুল পাপী। আবার সাম্যের স্থলে যাহারা ভেদনীতির প্রবর্ত্তন করে, তাহারা যে কি—তাহা বলা সুকঠিন।

আজ আমাদের ইতিহাসে অভয়বরদা জননীর পুর হইতে যে অবতার সম্ভবের আশ্বাসবাণী আসিয়াছে, সাম্য ভিন্ন ভেদনীতির যে এ প্রত্যাদেশে অবজ্ঞা আনিবে, তাহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এই অবতারের সম্মান করিতে যেন আমরা বিস্মৃত বা শিথিল প্রযত্ন না হই,—যেন প্রাণ ধন এবং সর্ব্বস্ব আমরা এই আহ্বানে প্রেমপূত অঞ্জলিরূপে ঢালিয়া দিতে পারি। অন্যথায় ইতিহাসের অধ্যায় পূর্ণ হইবে না। যে আশার অঙ্কুর অনন্ত বিরাট আশা মহীরুহের আভাষ লইয়া সৌরকিরণতলে মাথা তুলিয়াছে,—আমরা অযত্নে যেন তাহাকে অকালেই বিনষ্ট হইতে না দেই। তাহা হইলেই আমাদের অপূর্ণ ইতিহাস পূর্ণ হইবে। শত শত—কোটি কোটি জীবনের শোণিত নিষেকে এ অঙ্কুরকে সজীব রাখিতে হইবে। কর্ম্ম কর, মর্ম্মের কেন্দ্র হইতে ভগবানকে আকুল ভাবে ডাক, তীব্র যাতনা দূর হইবে, সেই আহ্বানে জীর্ণা মায়ের কোলে আবার অবতার আবির্ভূত হইবেন। বল,—

'আরো, সারা ব্যোম ভেদি' যাক ক্ষীণ তান
মহা ব্রহ্মপুরে,
জ্বলুক বিরাট আলো গগনের পটে
দিগন্তর ঘু'ড়ে,—
এক মূর্ত্তি মহাদ্যুতি হ'ক প্রকটিত
সেই জ্যোতিঃ-মাঝে
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মুশা
মোহাম্মদ সাজে!
মহামূর্ত্তি হেরি' যাক ধরণী-সন্তান
দ্বেষ হিংসা ভুলি',
একভাবে সারাবিশ্বে উঠুক জাগিয়া
কোটি হস্ত তুলি'!
দেখাও উন্মুক্ত করি' ভবিতব্য-চিত্র
ভাবী ইতিহাস,—
অরিনিসূদন ভীমা সন্তান সান্ত্বনা মূর্ত্তি
জননীরে করহ প্রকাশ।
স্বর্গ হ'তে ডাকি'বল — "বাঁধহ আশ্বাস,
কেন বিসর্জ্জন ?—"
আসুক ত্রিদিব হ'তে মহাশক্তি দ্রুত
করিয়া গর্জ্জন!
তা হলে তো মনে হয় আছে প্রাণ তবু,
আসিবে সে দিন,
অলক্ষ্যে জাগিবে ক্ষিতি মহা প্রাণতায়
উদ্যমে নবীন!
হিমাদ্রির তুঙ্গ শিরে হ'ক অবতার
বিজয়ী শঙ্কর,—
ভৈরব বিষাণ স্বরে জাগুক সন্তান
মূর্চ্ছা যা'ক, কুপুত্র বর্ব্বর!
সন্তানে অভয় দিয়া অসুর ত্রাসিতে কালী
বিশ্বকম্প ছাড়ুন হুঙ্কার,—

সে স্বরে লভুক বল দ্বিগুণ তনয়চয়,
ভস্ম হোক যত কুলাঙ্গার।
সে ভস্মে হউক সৃষ্ট ভীষণ নরক,—
মর্ত্ত্যে হউক অটল ত্রিদিব ;
সে ত্রিদিব-ইতিহাসে হক অবতীর্ণ
কোটি পূত কনক প্রদীপ। *

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

কৃষি।

কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্য, জগতের সকল জাতিই একবাক্যে স্বীকার করেন যে, ভারতীয় আর্য্যজাতি ও বেদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও প্রধান। সেই বেদে আর্য্যজাতি সম্বন্ধে কি জানিতে পারা যায়, তাহাই সর্ব্বাগ্রে আলোচ্য। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্তে জানা যায় যে ;—

"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ যদস্য তদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রঃ অজায়ত ॥১২॥"

অর্থাৎ—ইহার (ব্রহ্মার) মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু ক্ষত্রিয় হইল, উরুদ্বয় বৈশ্য হইল ও দুই চরণ হইতে শূদ্র জন্মিল।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ আর্য্য নামে অভিহিত হইলেন এবং শূদ্রগণই অনার্য্য ছিল। অথর্ব্ববেদের চতুর্থ কাণ্ডে অবগত হওয়া যায় যে ;—

"তয়াহং সর্ব্বংপশ্যামি যশ্চ শূদ্র উতার্য্যঃ।"

কাত্যায়ন সূত্রে জানা যায় যে ;—

"শূদ্রশ্চতুর্থোবর্ণঃ আর্য্যাস্ত্রৈবর্ণিকঃ।"

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনটী বর্ণ আর্য্য অর্থাৎ সভ্য এবং চতুর্থ বর্ণ শূদ্রই অনার্য্য অর্থাৎ অসভ্য।

ইতিহাস পাঠেও অবগত হওয়া যায় যে, যাঁহারা কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প কার্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন তাঁহারাই আর্য্য, আর যাহারা উক্ত কার্য্যত্রয় জানিত না তাহারাই অনার্য্য!

---

* 'প্রত্যাদেশ' বাক্য।

সকল বর্ণই, এক কর্ম্ম করিলে চলিতে পারে না বলিয়াই, আর্য্যঋষিগণ বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে কার্য্য-নির্দ্দেশ করিয়া দেন। মহর্ষি মনু বলেন :—

"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥৮৮
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ৷৮৯
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ ॥৯০
একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥৯১"

অর্থাৎ—অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ, এই ছয়টী কর্ম্ম ব্রাহ্মণগণের জন্য ; প্রজারঞ্জন, দান, যজ্ঞ, অধ্যায়ন, এবং ভোগাশক্তির পরিবর্জ্জন ক্ষত্রিয়দিগের জন্য ; পশুরক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্ম, বৈশ্যদিগের জন্য এবং উল্লিখিত বর্ণত্রয়ের সেবা করা শূদ্রগণের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিলেন।

উক্ত শ্লোকে জানা যায় যে, বৈশ্যগণই কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্য করিতেন, কিন্তু তাহা নহে—ব্রাহ্মণগণও কৃষি কার্য্যাদি করিতেন। বরাহমিহির বৃহৎ সংহিতায় কৃষি কর্ম্ম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে ;—

"ষট্‌কর্ম্মান্বিত ব্রাহ্মণগণ কৃষি বৃত্তি অবলম্বন করিবেন। অঙ্গহীন, ব্যাধিযুক্ত, দুর্ব্বল, ক্ষুধার্ত্ত, তৃষ্ণাযুক্ত ও শ্রান্ত বৃষ দ্বারা চাষ করিবেন না। রোগহীন, স্থিরাঙ্গ, সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত, শান্ত ও বলবান্ বৃষদ্বারা চাষ করিবেন। দিনের অর্দ্ধ পর্য্যন্ত চাষ প্রভৃতি কার্য্য করিবেন, পরে স্নান করিয়া আহারাদি করিবেন। কুৎসিত গরুদ্বারা কৃষি কার্য্য করিবে না। কৃষক বহু যত্ন করিয়া উৎকৃষ্ট গরু ও গোবৎস সংগ্রহ করিবে।"

"কৃষি পারাশর" নামক কৃষি শাস্ত্রে লিখিত আছে যে ;—

"সামান্য মানব হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলেরই সময়ে সময়ে অর্থাভাব হইতে পারে, অর্থের অভাব হইলে পরের নিকট প্রার্থনা হেতু লঘুতা স্বীকার করিতে হয়। যিনি কৃষিকর্ম্ম করেন, তাঁহার কখনও অভাব হয় না, অতএব তাঁহাকে কাহারও নিকট প্রার্থনা করিতে হয় না।..................জন্তু মাত্রেরই জীবন কৃষি, কৃষি না থাকিলে মুহূর্ত্তও জীবন থাকে না, মুনিগণ বলেন

কৃষিকর্ম্মে হিংসাদি দোষ থাকিলেও, অথিতি পূজা করিলে তাহা হইতে মুক্তিলাভ হয়।"

"স্বয়ং কৃষির রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, ভৃত্য কিংবা অন্য কাহাকেও রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রদান করিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবে না, কৃষি যথা নিয়মে রক্ষিত হইলে সুবর্ণ প্রসব করে; কিন্তু অবহেলা করিলে ঘোরতর দরিদ্রতা উপস্থিত হয়।"

"মাঘ মাসে গোময়-কুট ভক্তি পূর্ব্বক অর্চ্চনা করিয়া কোদাল দ্বারা উত্তোলন করিবে। পরে সমস্ত গোময় রৌদ্রে শুকাইয়া ভালরূপে চূর্ণ করিবে; ফাল্গুন মাসে ক্ষেত্রের প্রত্যেক আলিতে গর্ত্ত করিয়া স্থাপন করিবে। অনন্তর বীজ বপনকাল উপস্থিত হইলে গর্ত্ত হইতে ঐ সার উত্তোলন করিয়া ক্ষেত্রে দিবে। সার না দিলে ভাল শস্য জন্মে না।"

বৃষ ভাল না হইলে চাষ-কার্য্য ভাল হয় না, তদ্ধেতু গোশালায় গোমূত্র, গোবর, চাউলধোয়া জল, ফেন, মাছের জল, কর্পাস, অস্থি, তুষ, সম্মার্জ্জনী, মুসল, উচ্ছিষ্ট, ছাগী, শ্লেষ্মা, মুত্র, কর্দ্দম, ধূলি, প্রভৃতি যাহাতে না থাকে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য, নচেৎ গরুর বিনাশ হয়। রবি, মঙ্গল বা শনিবারে গোবর প্রদান করিলে অচিরেই গরু নষ্ট হয়। সায়ংকালে গো গৃহে প্রদীপ না দিলে লক্ষ্মী অসন্তুষ্টা হন ও পলায়ন করেন এবং গরু সকল উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে।

স্বাতী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, মৃগশিরা, মুলা, পুনর্বসু, পুষ্যা কিম্বা শ্রবণা নক্ষত্রে, শুক্র, সোম, বৃহস্পতি ও বুধবারে হল প্রসারণ প্রশস্ত। দশমী, একাদশী, দ্বিতীয়া, পঞ্চমী, ত্রয়োদশী তৃতীয়া ও সপ্তমী তিথি কৃষিকর্ম্মে প্রশস্তা। বৃষ, মীন, কন্যা, ধনু, বৃশ্চিক এই সকল লগ্ন কৃষিকর্ম্মে প্রশস্ত। কৃষ্ণবর্ণ, রক্তবর্ণ বা কৃষ্ণলোহিতবর্ণ বৃষই হলে প্রশস্ত।

মাঘ মাসই কর্ষণের প্রশস্তকাল, মাঘ মাসে মৃত্তিকা সুবর্ণের সমান, সহজেই চাষ করিতে পারা যায় এবং চতুর্গুণ শস্য হয়। ফাল্গুন মাসে কর্ষিলে রজত তুল্য, চৈত্র মাসে তাম্র তুল্য ফল হয়। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে কর্ষিলে খুব কম শস্য হয়।

বীজ বপন করিবার নিয়ম।

মাঘ বা ফাল্গুন মাসে বীজ সংগ্রহ করিয়া ভালরূপে রৌদ্রে শুকাইবে, তৎপরে নীহারে রাখিয়া দিবে। অনন্তর পুটক প্রস্তুত করিয়া বীজের নিধান শোধন

করিবে। বীজ নিধান মিশ্রিত হইলে ফলের হানি হয়। বীজ এক জাতীয় হইলে ভাল হয়, অতএব যত্ন পূর্ব্বক একরূপ বীজ সংগ্রহ করিবে। সুদৃঢ় পুটক প্রস্তুত করিয়া তাহাতেই বিনির্গত তৃণচ্ছেদন করিবে। তৃণচ্ছেদন না করিলে কৃষি তৃণ পূর্ণ হয়। উইএর টিপির নিকটে, গোশালায়, কিম্বা যে গৃহে বন্ধ্যা বা প্রসূতা স্ত্রীলোক বাস করে, সেই গৃহে কখনও বীজ রাখিবে না। উচ্ছিষ্ট মুখে, রজঃস্বলা, বন্ধ্যা বা গুর্বিনী স্ত্রীলোক বীজ স্পর্শ করিবে না। ঘৃত, তৈল, খোল, লবণ বা প্রদীপ ভ্রমবশেও বীজের উপরে রাখিবে না। বীজ ভাল হইলেই কৃষিকর্ম্মে আশানুরূপ ফল প্রদান করে। বীজের প্রতি ও বৃষের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

বৈশাখ মাসই বপনের শ্রেষ্ঠকাল, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মধ্যম; শ্রাবণ মাস অধমাধম। আষাঢ় মাসই রোপনের উত্তমকাল, শ্রাবণ মাস মধ্যম ও ভাদ্রমাস অতি নিকৃষ্ট কাল। শনি ও মঙ্গলবারে বীজ বপন করিলে ইন্দুরের ও পঙ্গপালের ভয় হয়। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের শেষ চারি দিনে বীজ বপন করিবে না।

"বপনং রোপণঞ্চৈব বীজং স্যাদুভয়াত্মকম্।
বপনং গদনির্ম্মুক্তং রোপণং সগদং বিদুঃ॥"
"হিমেন বারিণা সিক্তং বীজং শান্তমনাঃ শুচিঃ।
ইন্দ্রং চিত্তে সমাধায় স্বয়ং মুষ্টিত্রয়ং বপেৎ॥"

অর্থাৎ—বীজের বপন ও রোপণ দুইটী ক্রিয়া আছে। বীজের বপন করিলে আর কোনরূপ বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু রোপণ করিলে সম্ভাবনা আছে। যেদিন বীজ বপন করিতে হইবে, তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে হিম জলে অভাবে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে বীজ ভিজাইয়া রাখিতে হয়। পরদিন প্রাতে পবিত্র ও শান্তচিত্ত হইয়া মনে মনে ইন্দ্রকে চিন্তা করিয়া, স্বয়ং তিন মুষ্টি বপন করিবে। এইরূপে ধান্যের পুণ্যাহ সমাপন করিয়া হৃষ্ট চিত্তে পূর্ব্বমুখী হইয়া মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। মন্ত্র যথা ;—

"বসুধে-হেমগর্ভাসি বহুশস্যফলপ্রদে।
বসুপূজ্যে! নমস্তভ্যং বসুপূর্ণাস্তু মে কৃষিঃ॥
রোপয়িষ্যামি ধান্যানাং বৃক্ষ-বীজানি প্রাবৃষি।
সুস্থা ভবন্তু কৃষকা ধনধান্য সমৃদ্ধিভিঃ॥
বাসবো নিত্যবর্ষী স্যান্নিত্যবর্ষাস্তু তোয়দাঃ।
শস্যসম্পত্তয়ঃ সর্ব্বাঃ সফলাঃ সন্তু নীরুজঃ॥"

বসুধাকে নমস্কার করিয়া কৃষক গণকে ঘৃত, পায়স প্রভৃতি বহুবিধ উপহারে ভোজন করাইবে।

ধানের ব্যাধিনাশক মন্ত্র ;—

ওঁ সিদ্ধিঃ, গুরুপাদেভ্যো নমঃ। স্বস্তি হিমগিরিশিখরাৎ শঙ্খকুন্দেন্দুধবল-শিখরতটাৎ নন্দনবনসঙ্কাশাৎ পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্রাম-ভদ্রপাদা বিজয়িনঃ সমুদ্রতটাবস্থিত-নানাদেশাগত-বানরকোটিলক্ষাগ্রগণ্যং খরতরনখরাতিতীক্ষ্ণহস্তং উর্দ্ধলাঙ্গুলং লীলাগমনসমুদ্ধূতবাতবেগাবধূতপর্ব্বতশতং পরচক্রপ্রমথনং পবনসুতং শ্রীহনুমন্তমাজ্ঞাপয়ন্তি, অমুকগ্রামে অমুকগোত্রস্য শ্রীমতোঽমুকস্য অখণ্ড ক্ষেত্রে রাতা ভোম্মা উদা গান্ধিয়া ভোম্ভী গান্ধী দ্রোঢ়ী পাণ্ডবমুখী মহিষামুণ্ডী ধূলিশৃঙ্গা মণ্ডূকা ইত্যাদয়ঃ সর্ব্বে শস্যোপঘাতিনো যদি ত্বদীয় বচনেন ন ত্যজন্তি তদা তান্ বজ্রলাঙ্গুলেন তাড়য়িষ্যসীতি। ওম্ আং শ্রীঁ হ্রীং নমঃ।"

বেলের কাঁটা দিয়া কলার পাতায় উক্ত মন্ত্রটী ভক্তিভাবে লিখিবে। রবিবারে মুক্তকেশ হইয়া ক্ষেতের ঈশান কোণে শস্যের মঞ্জরীতে বন্ধন করিবে। এই অনুষ্ঠানে ধান্যের সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয়।

শুধু বৈশ্য কেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণও যে কৃষিকার্য্যে সফলতা লাভার্থে যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্ব্বক মন্ত্র-সাহায্যে মঙ্গল কামনা করিতেন, তাহাও নিম্নলিখিত মন্ত্রে স্পষ্ট জানিতে পারা যায়। ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ৫৭ সূক্তটী পঠনীয়,—

"ক্ষেত্রস্য পতিনা বয়ং হিতনেব জয়ামসি।
গামশ্বং পোষয়িত্বা স নো মৃলাতীদৃশে ॥১
ক্ষেত্রস্য পতে মধুমংতমূর্মিং ধেনুরিব পয়ো অস্মাসু ধুক্ষ্ব।
মধুশ্চতুং ঘৃতমিব সুপূতমৃতস্য নঃ পতয়ো মৃলয়ং তু ॥২
মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো মধুমন্নো ভবত্বং তরিক্ষং।
ক্ষেত্রস্যপতির্মধুমান্নো অস্ত্বরিষ্যং তো অন্বেনং চরেম ॥৩
শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাঙ্গলং।
শুনং বরত্রা বধ্যতাং শুনমষ্ট্রামুদিংগয় ॥৪
শুনাসীরাবিমাং বাচং জুষেথাং যদ্দিবি চক্রথুঃ পয়ঃ।
তেনে মামুপসিংচতং ॥৫
অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বংদামহে ত্বা।
যথা নঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি ॥৬

ইন্দ্র সীতাং নিগৃহ্লাতু তাং পূষানু যচ্ছতু।
সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাং ॥৭
শুনং নঃ ফালা বি কৃষংতু ভূমিং শুনং কীনাশা অভিযংতু বাহৈঃ।
শুনং পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা শুনমাস্মাসুধত্তং ॥৮

বঙ্গানুবাদ।

আমরা মিত্রস্বরূপ ক্ষেত্রপতির সহিত ক্ষেত্রজয় করিব। তিনি আমাদিগের গো ও অশ্বের পুষ্টিসাধন করুন; তিনি এই দান করিয়া, আমাদিগকে সুখ ভোগী করুন ॥১॥ হে ক্ষেত্রপতি! ধেনু যেরূপ দুগ্ধ দান করে, সেইমত মধুস্রাবী সুপূত ঘৃতের ন্যায় মাধুর্য্যোপেত এবং প্রচুর জল প্রদান কর। এই যজ্ঞের অধিপতিগণ আমাদিগকে সুখান্বিত করুন ॥২॥ ওষধি সমূহ (যবাদি) আমাদিগের নিমিত্ত মধুময় হউক। দ্যুলোক সমূহ, জনসমূহ ও অন্তরীক্ষ আমাদিগের জন্য মধুময় হউক এবং ক্ষেত্রপতি আমাদিগের জন্য মধু যুক্ত হউন। আমরা অহিংসিত হইয়া, তাঁহার অনুসরণ করিব ॥৩॥ বলীবর্দ্দসমূহ সুখে বহন করুক, নরগণ সুখে কার্য্য করুক, লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক, প্রগ্রহ সমূহ সুখে বদ্ধ হউক, এবং প্রতোদ সুখে প্রেরণ কর ॥৪॥ হে শুন! হে সীর! তোমরা আমাদিগের এই স্তোত্র গ্রহণ কর, তোমরা দ্যুলোকে যে জল সৃষ্টি করিয়াছ, তদ্দ্বারা এই পৃথিবীকে সিক্ত কর ॥৫॥ হে সৌভাগ্যশালিনী সীতে! তুমি (লাঙ্গল) অগ্রবর্ত্তিনী হও, আমরা তোমায় কামনা করিতেছি। তুমি আমাদিগকে সুন্দর ধন ও সুফল প্রদান কর ॥৬॥ ইন্দ্র, সীতাকে গ্রহণ করুন, পূষা তাঁহাকে পরিচালিত করুন। তিনি জলময়ী হইয়া বর্ষে বর্ষে শস্য দোহন করুন ॥৭॥ কাল সকল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক, রক্ষকগণ বলীবর্দ্দের সহিত সুখে গমন করুক। পর্জ্জন্য মধুর জলদ্বারা পৃথিবীকে সিক্ত করুন। হে শুন! হে সীর! আমাদিগকে সুখ প্রদান কর ॥৮॥

নিম্নলিখিত স্থক্তটী পাঠ করিলে কৃষি সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় অবগত হওয়া যায়,

উদ্বুধ্যধ্বং সমনসঃ সখায়ঃ সমগ্নিমিংধ্বংবহবঃ সনীলা।
দধিক্রামগ্নিমুষসংচ দেবীমিংদ্রাবতোঽবসে নিহ্বয়েবঃ ॥ ১
মংদ্রাকৃণুধ্বং ধিয় আতনুধ্বং নাবমরিত্রপরনীংকৃণুধ্বং।
ইষ্কৃণুধ্বমায়ুধারং কৃণুধ্বং প্রাংচং যজ্ঞং প্রণয়তা যথায়ঃ ॥ ২
যুনং সীরা বিযুগা তনুধ্বং কৃতে যোনৌ বপতেহ বীজং।
গিরা চ শ্রুষ্টিঃ সভরা অসন্নোনেদীয় ইৎসৃণ্যঃ পক্কমেয়াৎ ॥ ৩

সীর যুংজংতি কবয়ো যুগা বিতন্বতে পৃথক্।
ধীরা দেবেষু সুম্নয়া ॥ ৪
নিরাহাবান্ কৃণোতন সংবরত্রাদধাতন।
সিংচামহা অবতমুদ্রিণং বয়ং সুষেকমনুপক্ষিতং ॥ ৫
ইষ্কৃতাঁহাবমবতং সুবরত্রং সুষেচনং।
উদ্রিণং সিংচে অক্ষিতং ॥ ৬
প্রীণীতাশ্বান্‌হিতং জয়াথ স্বস্তিবাহং রথমিৎ কৃণুধ্বং।
দ্রোণাহাবমবতমশ্মচক্রমংসত্রকোশং সিংচতা নৃপাণং ॥ ৭
ব্রজং কৃণুধ্বং স হি বো নৃপাণো বর্ম সীব্যধ্বং বহুলা পৃথুনি।
পুরঃ কৃণুধ্বমায়সীর ঘৃষ্টা মা বঃ সুস্রোচ্চমসোদৃংহতাতং ॥ ৮
আ বো ধিয়ং যজ্ঞিয়াং বর্ত উতয়ে দেবা দেবীং যজতাং যজ্ঞিয়ামিহ।
সা নো দুহীয়দ্যবসেব গত্বী সহস্রধারা পয়সা মহী গোঃ ॥ ৯
আতুষিংচ হরিমীং দ্রোরুপস্থেবাসীভিস্তক্ষতাশ্মন্ময়ীভিঃ।
পরিষ্বজং দশ কক্ষ্যাভিরুভে ধুরৌ প্রতি বহ্নিং যুনক্তং ॥ ১০
উভেধুরৌ বহ্নিরাপিব্দমানোঽন্তর্যোনেব চরতি দ্বিজানিঃ।
বনস্পতিং বন আস্থাপয়ধ্বং নিষূ দধিধ্বমখনংত উৎসং ॥ ১১
কপৃন্নরঃ কপৃথমুদ্দধাতন চোদয়ত খুদত বাজসাতয়ে।
নিষ্টিগ্র্যঃ পুত্রমা চ্যাবয়োতয় ইংদ্রং সবাধ ইহ সোমপীতয়ে ॥ ১২”

বঙ্গানুবাদ।

হে সখাগণ! এক মন হইয়া জাগরিত হও, অনেকে এক স্থানবর্ত্তী হইয়া অগ্নিকে প্রজ্বলিত কর। দধিক্রা, উষাদেবী এবং ইন্দ্রকে রক্ষা কামনায় আহ্বান করিতেছি। ১। গম্ভীর স্বরে স্তব কর; অরিত্র সহযোগে পরপারে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এরূপ নৌকা প্রস্তুত কর, অস্ত্র সকল শাণিত ও শোভিত কর; হে সখাগণ! উৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর। ২। লাঙ্গলগুলি যোজনা কর; যুগগুলি বিস্তারিত কর; এই স্থানে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাতে বীজ বপন কর। আমাদিগের স্তবের সহিত আমাদিগের অন্ন পরিপূর্ণ হউক। স্থণিগুলি (কাস্তে) নিকটবর্ত্তী পক্ক শস্যে পতিত হউক। ৩। লাঙ্গলগুলি যোজিত হইতেছে; কর্ম্মকারগণ যুগ সমস্ত পৃথক করিতেছে; বুদ্ধিমানগণ সুন্দর স্তব পাঠ করিতেছেন। ৪। পশুদিগের জলপান-স্থান প্রস্তুত কর। বরত্রা

(চর্ম্মরজ্জু) যোজনা কর; এই উদ্রিক্ত অক্ষয় এবং সৌন্দর্য্যযুক্ত গর্ত্ত হইতে জল সেচন কর। ৫। পশুদিগের জলপান-স্থান প্রস্তুত হইয়াছে; এই উদ্রিক্ত অক্ষয় জলপূর্ণ গর্ত্তে সুন্দর চর্ম্মরজ্জু বিদ্যমান আছে, অক্লেশে জল সেচন করা যায়; ইহা হইতে জল সেচন কর। ৬। ঘোটকদিগকে পরিতৃপ্ত কর; ক্ষেত্রে সংস্থাপিত ধান্য গ্রহণ কর, নিরুপদ্রবে ধান্য বহন করিতে পারে এতাদৃশ রথ প্রস্তুত কর। এই জলপূর্ণ পশুদিগের পানীয় জলাধার একদ্রোণ প্রমাণ হইবে। ইহাতে প্রস্তর নির্ম্মিত চক্র আছে। আর মনুষ্যদিগের পানোপযোগী জলাধার স্কন্ধ পরিমিত হইবেক, ইহা জলপূর্ণ কর। ৭। গোষ্ঠ প্রস্তুত কর, সেই স্থানই মনুষ্যদিগের জলপান করিবার পক্ষে উপযুক্ত, বহুসংখ্যক স্থলকবচ সীবন কর; দৃঢ়তর লৌহময় পাত্র নিষ্কাসিত কর; চমস দৃঢ়ীকৃত কর, ইহা হইতে যেন জল পরিস্রুত না হয়। ৮। হে দেবগণ! তোমাদিগের ধ্যান আবৃত্তি করিতেছি, অভিপ্রায় যে, তোমরা রক্ষা কর। সেই ধ্যান যজ্ঞের উপযোগী, সেই ধ্যান তোমা-দিগকে যজ্ঞভাগ প্রদান করে। যেমন তৃণ ভোজন করিয়া, গাভী সহস্রধারায় দুগ্ধ দেয়, তদ্রূপ সেই ধ্যান যেন আমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করে। ৯। কাষ্ঠ-ময় পাত্রে সংস্থাপিত হরিদ্বর্ণ সোমরসে দুগ্ধ সেক কর। প্রস্তরময় কুঠার দ্বারা পাত্র প্রস্তুত কর। দশাঙ্গুলি দ্বারা পাত্রটী বেষ্টনপূর্ব্বক ধারণ কর। বহনকারী পশুকে রথের দুই ধুরাতে যোজিত কর। ১০। বহনকারী পশু রথের ধুরাদ্বয় শব্দায়মান করিয়া বিচরণ করিতেছে, যেন দুই ভার্য্যার স্বামী ক্রিয়া করিতেছে। কাষ্ঠ নির্ম্মিত শকটে ইহার কাষ্ঠময় আধারে আরোপণ কর, উত্তমরূপে সংস্থাপনকর, ইহার মূলদেশ যেন খনন করিও না অর্থাৎ শকট যেন আধারভ্রষ্ট না হয়। ১১। হে কর্ম্মাধ্যক্ষগণ! এই ইন্দ্রসুখদাতা, ইহাকে সুখময় সোমদান কর, অন্ন দিবার জন্য ইঁহাকে প্রেরণ কর, অনুরোধ কর। সেই ইন্দ্র, অদিতির পুত্র, তোমাদের সকলেরই সমান পীড়া-ভয়, অতএব রক্ষার জন্য তাঁহাকে এখানে আহ্বান কর। তিনি সোম-পান করিবেন। ১২।

ক্ষেত্রে বীজ বপন কালীন পঠিত অথর্ব্ববেদের ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ১৪২ সূক্তোক্ত মন্ত্রের, বাহুল্য ভয়ে বঙ্গানুবাদ মাত্র প্রদত্ত হইল,—

"হে শস্য! তোমার স্বশক্তিতে প্রচুর পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠ। প্রত্যেক বীজ হইতে বহির্গত হও। স্বর্গের বিদ্যুৎ তোমাকে ধ্বংস করিবে না।"

হে শস্যদেব! যখন আমরা তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এবং তুমি

তাহা শ্রবণ করিতেছ, তখন তুমি আকাশের ন্যায় সমুচ্চ হইয়া উঠ এবং সমুদ্র সম অসীম হও।

যাহারা তোমার সেবায় নিযুক্ত আছে, তাহারা প্রচুর পরিমাণে লাভবান্ হউক; তুমি নিজে প্রচুর পরিমাণে একত্রীভূত হও। যাহারা তোমাকে উপহার স্বরূপ দেয়, তাহাদিগের শস্য ভাণ্ডার অক্ষয় হউক, এবং যাহারা তোমাকে আহার করে, তাহারাও অবিনাশী হউক।"

শস্য নষ্টকারী কীটাদির উপদ্রব নিবারণার্থ এবং পশুপালনের জন্য প্রার্থনা:—

বঙ্গানুবাদ।

"হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা তার্দ এবং সমঙ্ক (পঙ্গপালাদি কীট) বিনাশ কর; তাহাদিগের মস্তক কাটিয়া ফেল এবং পঞ্জর চূর্ণ কর। এরূপে তাহাদিগের মুখ বন্ধ কর, যেন তাহারা যব আহার করিতে না পারে। তোমার শস্য সমূহকে বিপদ হইতে রক্ষা কর।"—অথর্ব্ববেদ, ৬।৫০।

"এই স্থান হইতে তিনজনে দূরে যাউক—বৃক, মনুষ্য ও ব্যাঘ্র। নদী সকলও দৃষ্টির দূরবর্ত্তিনী হউক, পবিত্র অশ্বত্থ বৃক্ষও দৃষ্টির দূরবর্ত্তী স্থানে বর্দ্ধিত হউক এবং দৃষ্টির বহির্ভূত প্রদেশে শত্রুগণ পলায়ন করুক। ১। ব্যাঘ্র যেন দূরবর্ত্তী পথ দিয়া চলে, এবং তস্করগণ যেন আরও দূরবর্ত্তী স্থান দিয়া যায়। বহুদূরস্থ পথে যেন সর্পগণ অবস্থান করে এবং অনিষ্ট কামনাকারিগণ যেন দূরে অবস্থান করে। ২। হে বৃক্! তোমার চক্ষু এবং দন্তপাটী আমরা চূর্ণ করিলাম এবং তোমার বিংশতি নখরও বিনষ্ট করিলাম। ৩। পশুদিগের শীর্ষস্থানীয় দন্ত বিশিষ্ট ব্যাঘ্রকে আমরা বিধ্বস্ত করিতেছি, তৎপরে তস্করগণ, পরে সর্পগণ, রাক্ষসগণ এবং নেকড়ে ব্যাঘ্রগণকে বিধ্বস্ত করিতেছি। ৪। যে তস্কর অদ্য আগমন করিবে, সে যেন চূর্ণ-বিচূর্ণদেহ লইয়া পলায়ন করে। যেখানকার পথ উচ্চ হইতে অধোগামী, সে তথায় গমন করুক, ইন্দ্র বজ্রদ্বারা তাহাকে সংহার করুন। ৫। বন্য হিংস্রক জন্তুগুলির দন্ত সমূহ অসাড় হউক, তাহাদিগের পঞ্জর চূর্ণ হউক, সর্প সকল দূরে যাউক এবং শস্য বিনাশকারী পশুগুলি পতিত হউক। ৬ যে দন্তপাটী রুদ্ধ হইয়াছে, তাহা আর খুলিতে পারিবে না; যে দন্ত পাটী খুলিয়াছে, তাহা আর রুদ্ধ করিতে পারিবে না। ইন্দ্র এবং সোম হইতে উদ্ভূত এই মন্ত্র অথর্ব্বার ব্যাঘ্র বিনাশক। ৭।—অথর্ব্ববেদ।৪।৩

অধুনা কৃষিকার্য্য নিম্নশ্রেণীর হস্তে অর্পিত হইলেও পুরাকালে কৃষিকার্য্য নিন্দনীয় ছিল না বলিয়াই আর্য্যগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ) অবমাননাজনক

বোধ করিতেন না। এখানে একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ এখন কৃষিকর্ম্ম করেন না কেন? মহর্ষি মনু বলেন,—

"বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবংস্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽপি বা।
হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ ॥৮৩
কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে সা বৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা।
ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠময়োমুখম্ ॥৮৪"

অর্থাৎ—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ (আপদকালে) বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইলে, হিংসাযুক্ত পরাধীন কৃষিকার্য্য যত্নপূর্ব্বক বর্জ্জন করিবে। অনেকে কৃষিকার্য্যকে সাধুকার্য্য বলিয়া মনে করেন; বাস্তবিক সেই বৃত্তি সজ্জন বিগর্হিত। কারণ তাহাতে লৌহমুখকাষ্ঠ, ভূমি ও ভূমিস্থ প্রাণীকে হনন করে।

উপসংহার।

কৃষিকার্য্য "সজ্জন বিগর্হিত" মনু কর্ত্তৃক এই আদেশ প্রচারিত হইলে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের সঙ্গে সঙ্গে বেদজ্ঞ বৈশ্যগণও কৃষিকার্য্য বর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কাজে কাজেই, উক্ত কার্য্য শূদ্রগণের হস্তেই পড়িল। শূদ্রগণ বেদমন্ত্র ব্যবহারে বঞ্চিত বলিয়াই বিনা মন্ত্র সাহায্যে কৃষিকার্য্য করিতে আরম্ভ করে। তদ্ধেতু শস্যও ভালরূপ জন্মিতেছে না. ভারতের অবস্থা ক্রমশঃ হীন হইয়া পড়িতেছে। শের সার আমলেও টাকায় আট মণ চাউল ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে টাকায় আট সের চাউল হইয়াছে। ইহার পরে বোধ হয় টাকায় এক তোলা চাউল হইবে। ইহার কারণ কি? ইহার উত্তরে বলিতে পারা যায় যে, এখন ভারতমাতার অন্নে শুধু ভারত নয়, বিদেশীয় অন্যান্য প্রদেশও প্রতিপালিত হইতেছে, অথচ পূর্ব্বের মত শস্য উৎপন্ন হইতেছে না।

শ্রীকুঞ্জবিহারী লাল।

(৪৮)

প্রভূত বয়সঃ পুংসো ধিয়ঃ পাকঃ প্রবর্ত্ততে।
জীর্ণস্য চন্দন তরোরামোদ উপজায়তে॥

ভাবার্থ—হয় মানবের, বুদ্ধি-পরিপাক,
বয়োবৃদ্ধি সহ তা'র।
হইলে প্রাচীন, চন্দনে যেরূপ,
বাড়ে তা'র গন্ধ-ভার॥

(৪৯)

অস্থান স্থিতিহেতোর্গুণবানপি হন্ত হাস্যতামেতি।
জরতীস্তনাবলম্বী ননু রমণীয়ো ন শোভতে হারঃ॥

ভাবার্থ—অযোগ্য স্থানেতে বাস,
করে যদি কভু গুণবান;
উপহাসাস্পদ হয়,
নাহি রহে তাহার সম্মান।
তরুণীর হৃদি-শোভা,
রমণীয় মণিময় হার,
বৃদ্ধা-বক্ষোপরি তাহা
কভু নাহি শোভে সে প্রকার॥

(৫০)

গ্রীষ্মকালে দিনং দীর্ঘং শীতকালে তু শর্ব্বরী।
পরোপতাপিনঃ সর্ব্বে প্রায়শো দীর্ঘজীবিনঃ॥

ভাবার্থ—গ্রীষ্ম-দিবামান দীর্ঘ, শিশির-শর্ব্বরী;
প্রায়শঃ দীর্ঘায়ু হয় পরানিষ্টকারী।

(৫১)

পঞ্চভির্নির্ম্মিতে কায়ে পঞ্চত্বঞ্চ পুনর্গতে।
স্বাং স্বাং যোনিমনু প্রাপ্তে তত্র কা পরিবেদনা॥

ভাবার্থ—পঞ্চভূত-বিনির্ম্মিত প্রাণিগণ-কায়,
পঞ্চত্ব পাইলে প্রাণী, পঞ্চে লয় পায়।

প্রাণি-পক্ষে পূর্ব্বাপর এই দেখা যায়,
জন্ম হ'লে মৃত্যু স্থির—কিবা দুঃখ তায়!

(৫২)

ব্রজন্তি ন নিবর্ত্তন্তে স্রোতাংসি সরিতাং যথা।
আয়ুরাদায় মর্ত্ত্যানাং সদা রাত্র্যহনী তথা॥

ভাবার্থ—নদী-স্রোতঃ ধায় যথা বেগে অবিরাম,
সমভাবে সদা,—তা'র নাহিক বিশ্রাম।
অনন্তকালের স্রোতে, দিবা ও যামিনী
হরি' প্রাণি-পরমায়ু যেতেছে তেমনি॥

(৫৩)

উত্তমঃ ক্লেশ বিক্ষোভং ক্ষমঃ সোঢ়ুং ন হীতরঃ।
মণিরেব মহাশাণ ঘর্ষণং ন তু মৃৎকণঃ॥

ভাবার্থ—উত্তম মানবে যত, সহিবারে পারে গুরুক্লেশ,
নারে কভু অধমে তেমন।
মহাশাণ-সংঘর্ষণ, সহে যথা মণি অনায়াসে;
মৃৎকণা নারে কদাচন॥

(৫৪)

ব্রহ্মহাপি নরঃ পূজ্যো যস্যাস্তি বিপুলং ধনম্।
শশিনস্তুল্য বংশোঽপি নির্দ্ধনঃ পরিভূয়তে॥

ভাবার্থ—ব্রহ্মঘ্ন হ'লেও সে-ই লোক-পূজ্য হয়,
যদি তা'র অধিকারে বহু অর্থ রয়।
শশি-সম বংশে জন্মি' দরিদ্র হইলে,
হয় হতমান সেও মানবমণ্ডলে॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ।



পথিক।

সুখের আবাস, শান্তির নিকেতন, স্বকীয় ভবন পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যব্যপদেশে বহির্গত হইলেই, সে পথিকশ্রেণীর অন্তর্গত। আপন বাড়ীতে আপনার বলিতে তাহার যে অধিকার আছে, পথে তাহার নিজের সঙ্গীয় বস্তু ব্যতীত আর কিছু আপনার বলিতে নাই। আমরা সংসারী জীব, নিজ নিকেতন, সুখের সেই সর্ব্বদানন্দময়ী পুরী পরিত্যাগ করিয়া কার্য্যব্যপদেশে এই সংসারপথের পথিক হইয়া আসিয়াছি, সুতরাং আমরাও পথিক। এই নশ্বর জগতে, মায়াময় সংসারে, আপনার বলিতে আমাদের কিছুই নাই, সুতরাং আমরা পথিক ব্যতীত আর কি? সাধারণ পথিকের স্থায় আমরাও নিকটবর্ত্তী রমণীয় বস্তু গুলির মায়ায় মোহিত হইয়া, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ক্ষণকাল চাহিয়া দেখি মাত্র, কিন্তু তাহা নিজের বলিয়া গ্রহণ করিতে সাহস হয় না। সাহস হইলেই বা কি? যাহার ধন সে লইয়া যাইবে, মনের আশা মনেই থাকিবে। সেই জন্যই পথিকের কোন বস্তুর প্রতি লোভ করা নিষ্ফল। যে অল্প মাত্র বস্তু তাহার নিজের, তাহা ব্যতীত অন্য বস্তুতে তাহার অধিকার কি?

মানব, অবনীতে অবতীর্ণ হইবার কালে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, যেন সে কি বস্তু লইয়া অবতীর্ণ হইল। বাস্তবিক, মানবের যদি নিজের বলিয়া কিছু থাকে তবে তাহাই, যাহা জীবনের সঙ্গে সঙ্গে চলে। তদ্ব্যতীত ধন সম্পত্তি, পুত্র পরিবার, এগুলি যদি নিজ সম্পত্তি হইবে, তবে ইচ্ছামত সঙ্গে লওয়া যায় না কেন? যে সাথের সাথী নয়, সে আবার আপন কিরূপ? যে সম্পত্তি আপনা আপনি ক্ষয় হইয়া যায়, তাহা আবার সম্পত্তি?

পুত্র, কলত্র, আত্মীয়, বন্ধু ইত্যাদিকে নিতান্ত আপনার জন বলিয়া কতই আহ্লাদিত হই, আত্মজের হাস্যোদ্দীপ্ত বদন-সুধাকর দর্শনে অন্তরে আনন্দের উৎস ছুটিয়া যায়; প্রণয়িণীর প্রেম সম্ভাষণে হৃদয়ে অমৃত ধারা প্রবাহিত হয়, তখন মনে হয় ইহারা আপন নয়তো আর আপন কে? এইরূপ মোহ-মদিরায় উন্মত্ত হইয়া চলিয়াছি, আত্মপর জ্ঞান হইবে কিরূপে? সর্পে রজ্জুভ্রম হইবে আশ্চর্য্য কি? বৃক্ষমূলে নানাদিক হইতে অনেক পথিক আসিয়া একত্র মিলিত হয়, ক্রমে আলাপ পরিচয়, এমন কি অনেক সময় বেশ সখ্যতার ভাবও জন্মিয়া যায়। কিন্তু পরক্ষণেই প্রত্যেকে আপন আপন অভিলষিত স্থানের উদ্দেশে

গমন করে, হয়ত আর পরস্পর সাক্ষাৎ লাভ বহু বৎসর, এমন কি জীবনেও ঘটিয়া উঠে না। বাস্তবিক যে সমস্ত পথিক স্বীয় গন্তব্য স্থানের জন্য প্রকৃত উৎকণ্ঠিত থাকে, তাহারা অন্যান্য পথিকের নিকট হইতে তাহার নিজের পথের বিষয় বিশেষ রূপে অবগত হয় এবং আপন মনে আপন উদ্দেশ্যে চলিয়া যায়। কিন্তু যাহাদের বুদ্ধি-বিকৃতি জন্মিয়াছে, দারুণ উন্মাদ রোগের আক্রমণে যাহারা স্বীয় উদ্দেশ্য স্থির করিতে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে একাকী পথ চলা বড়ই কঠিন। হয়ত সে ব্যক্তি কোন পথিকের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া হাসিয়া খেলিয়া কতক দূর অগ্রসর হইবে; আবার তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে চলিয়া যাইবে। কিন্তু তাহার নিজ গন্তব্য স্থানে আর যাওয়া ঘটিবে না। উন্মাদ, নিজ বুদ্ধিতে যাকে তাকে আত্মীয় জ্ঞানে তাহার পিছু পিছু ছুটিবে, কিন্তু যদি বুদ্ধিমান, প্রকৃতিস্থ লোক তাহাকে তাহার স্থানে রাখিয়া আইসে তবেই সে যাইতে পারিবে, নতুবা ঘুরিয়া ঘুরিয়াই সময় নষ্ট করিবে। সেই রূপ আমরাও বিকৃত প্রকৃতি হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভাবে ঘুরিতেছি। একে আমাদের প্রকৃতি বিকৃত, তাহাতে আবার মোহ-মদিরায় বিশেষ রূপে উন্মত্ত; কাজেই, আমরা উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইয়া নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল ভাবে চলিয়াছি।

কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায়ই বা যাইতে হইবে, উন্মত্ততা বশতঃ তাহা ভুলিয়া গিয়াছি, এখন আর মনে নাই। কেবল চলিতেছি, কেবল ঘুরিতেছি। পথে যাইতে যাইতে যাহার সাক্ষাৎ পাই, তাহাকেই আপন ভাবিয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়া যাই, কিন্তু হয়ত সেও ক্ষণপরে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে। তখন হতাশ মনে ক্ষণেক বসিয়া থাকিব, কিন্তু তাহাতে কি হইবে। উন্মাদ, স্থির বুদ্ধিতে কিছুই করিতে পারে না। সময় সময় আপন বাড়ীর কথা মনে হয় মাত্র, কিন্তু তৎ-ক্ষণাৎই সে স্মৃতি আপনা আপনি লুপ্ত হইয়া যায়। আমরা ক্ষীণ বুদ্ধি সম্পন্ন সংসার জীব—বাস্তবিকই অপ্রকৃতিস্থ। পুত্র, পরিবারাদি সকলকেই আপন ভাবিয়া চলিতে থাকি, হয়ত পথে কেহ ছাড়িয়া গেলে ক্ষণেকের জন্য হতাশ মনে নিজ জীবনের গন্তব্য পথের বিষয় চিন্তা করি, আবার পরক্ষণেই তাহা ভুলিয়া গিয়া আপন ভাবে চলিতে থাকি। কাজেই, আমাদের গন্তব্য স্থানে পথে আমরা চলিতে পারি না। হায়, আপন বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে আসিয়া পড়িয়াছি, প্রকৃতিস্থ না থাকিলে বাড়ী যাওয়ার উপায় কি?

যাহাদিগকে সাথের সাথী, দুঃখের ভাগী ভাবিয়া সঙ্গে লইয়াছিলাম, আপন বলিয়া যাহাদিগকে আত্ম সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলাম, তাহারা ত কেহই সাথের

সাথী নহে। কেহ আগেই চলিয়া যায়, কেহবা পাছেই পড়িয়া থাকে, তবে আর তাহাদিগকে সাথের সাথী বলি কিরূপে? কিন্তু হায়! তবে কি আমরা বাস্তবিকই পথহারা হইয়াছি। আর কি আমাদের নিজ নিকেতনে যাওয়া ঘটিবে না? এমন সাথের সাথী কি কেহ ছিল না? মনে হয় কে যেন ছিল, অভিমানে যেন তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছি। অস্পষ্ট স্মৃতি সময় সময় যেন সে আভাষ দেয়। কে যেন সঙ্গী আছে, আর কেবল সেই যেন সঙ্গে আসিয়াছে। আবার সে-ই যেন পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে। কিন্তু আমরা এমনই নির্ব্বোধ যে, পথে আসিয়াই সে পরম বন্ধুকে ভুলিয়া, আত্মহারা হইয়া ঘুরিতেছি। এ আমাদের দোষ নয়, দোষ এই অকৃতজ্ঞ সংসারের, নতুবা এখানে আসিয়াই এত অকৃতজ্ঞ হইব কেন, আগে ত এমনটী ছিলাম না। তাই বলি, এ দোষ এই অকৃতজ্ঞ সংসারের।

এই সংসারই যত অনর্থের মূল। এখানে নিয়তই কত পাপ, তাপ, অকৃতজ্ঞতা, বিশ্বাসঘাতকতা, জুয়াচুরি, বদ্‌মায়েসী প্রভৃতি ভীষণ চিত্রের অবতারণা ও অভিনয় হইতেছে। এ অতি ভয়ানক স্থান, যে একবার এ পথের পথিক হইয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, সে-ই প্রতারিত হইয়াছে। তবে কেমন করিয়া বলিব এ স্থানের দোষ নয়। কিন্তু যে পথে আসিয়া পড়িয়াছি, তাহার দোষ দেখিলেই বা কি হইবে। পথিক হইয়াছি, বাড়ী ছাড়িয়া বিদেশের পথে বাহির হইয়াছি, পথ চলিতেই হইবে। যে স্থান এমন ভয়ানক সে স্থান শীঘ্র পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। ইচ্ছা করিয়া কে সিংহ-বিবরে প্রবেশ করে; কে আপন নিধন আহ্বান করিয়া আনে। তাই বলি, এমন কুপথে আসিয়া ঠকিয়াছি! এমন রাস্তার পথিক হইয়া প্রতারিত হইয়াছি! লাভ দূরে থাকুক আসলও যে রক্ষা হয় না। অর্থ সংগ্রহের জন্য বিদেশে আসা, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে পাথেয় সম্বলও বুঝি হারাইতে হয়।

যাহারা চতুর ও বুদ্ধিমান তাহারা অর্থ উপার্জ্জনের জন্য বিদেশে আইসে, আবার অর্থ উপার্জ্জিত হইলেই, আপন বাড়ীতে চলিয়া যায়। বিদেশের আত্মীয়তা, বিদেশের বন্ধুতা, তাহার আর প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, বিদেশের সখ্যতা, বন্ধুতা, পরিচয়, তাহারা কেবল স্বার্থ সাধনের পথস্বরূপ। নির্ব্বোধ লোকে বিদেশে আসিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিয়া বাড়ী যাইবে দূরে থাকুক, বিদেশের শঠ প্রতারকের কপট মায়ায় মুগ্ধ হইয়া

আজীবন তাহারই সেবায় রত হইয়া থাকে, সেইরূপ যাঁহারা মনীষা সম্পন্ন সংসার পথিক, তাঁহারা স্ত্রী পুত্র পরিবারাদির মায়ায় ক্ষণিক মুগ্ধ হইলেও স্বীয় অর্থ চিন্তা (পরকাল চিন্তা) কখনও বিস্মৃত হয়েন না। তাঁহারা এগুলি ধর্ম্ম উপার্জ্জনের সহায় করিয়া লন মাত্র। কিন্তু আপন উদ্দেশ্য পথ হইতে কখনই স্খলিত হন না। কিন্তু যাহারা নির্ব্বোধ, তাহারা ইহাদিগকেই পরম আত্মীয় জ্ঞানে সমস্ত জীবন কেবল পরিবার প্রতিপালনরূপ দাসত্ব করিয়াই অতিবাহিত করে। তাহাদের বাড়ীর বিষয় আর মনে থাকে না; অর্থ চিন্তাও থাকে না।

আমরাও তাহাই হইয়াছি। কি জন্য আসিয়াছি, কি করিয়াই বা যাইতে হইবে, তাহা একবারও মনে স্থান দেই না। হায়! যদি কোন উদ্দেশ্য না থাকিবে, যদি কোন কার্য্য সাধন না করিব, তবে আসিলাম কেন, তাহা ক্ষণেকের জন্যও মনে হয় না। পরিবার প্রতিপালনরূপ বিষম দাসত্ব লইয়াই মনের সুখে আছি। ইহাই যেন মানব জীবনের কর্ত্তব্যকর্ম্ম। আহার নিদ্রাদির চিন্তাতেই অবিরত মগ্ন আছি। ইহাই যেন এ জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু হায়! আমরা কি ভ্রান্ত! আহার, নিদ্রা, ইন্দ্রিয়সেবা সাধারণ জীবের কার্য্য। সকলেই ইহার অধীন। দাসত্ব ত নরকেরও হেয়। তবে আর এ মনুষ্য নামের সফলতা কি হইল। যেরূপ সম্বল লইয়া আসিয়াছি, সেইরূপ অর্থ উপার্জ্জন না হইলে তবে কি জন্য আসিলাম! ঢাল, তরবারি লইয়া সাজিয়া আসিয়া কোন্ ব্যক্তি পিপীলিকা মারিয়া তৃপ্ত হয়?

সাজই কার্য্যের কারণ প্রদর্শক। সাজ দেখিয়াই কার্য্যের প্রকৃতি বুঝা যায়। ঢাল, তরবারি, সড়কী, বল্লম ইত্যাদিতে কাহাকেও সজ্জিত দেখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, এই ব্যক্তি যুদ্ধকার্য্যে গমন করিতেছে। আবার বেহালা, তবলা, সেতার, এস্‌রাজ ইত্যাদি যন্ত্র সঙ্গীতাদি কার্য্যের পরিচায়ক। বাস্তবিক, সাজ দেখিলেই সকল কার্য্যের প্রকৃতি বুঝা যায়। তবে মানুষের সাজ দেখিলে তাহার কার্য্যের প্রকৃতি বুঝা যাইবে না কেন? পরম পিতা পরমেশ্বর মানবকে যে সাজে সাজাইয়াছেন, তাহাতে তাহার কার্য্য সহজেই বুঝা যায়। দয়া, দাক্ষিণ্য, উপচীকীর্ষা, ভক্তি, ভালবাসা ইত্যাদি যে সদ্বৃত্তি গুলিতে মানব হৃদয় সজ্জিত, অন্য কোন প্রাণীরই ত সেরূপ নাই। সুতরাং মানবে পশুতে প্রভেদ অনেকই আছে। কিন্তু তথাপি যদি আমরা কার্য্যে পশু

পক্ষ্যাদির সহ পার্থক্য না দেখাই, তবে এ জীবনের আবশ্যকতা কি? এ সাজ সরঞ্জামের সার্থকতা কি?

যুদ্ধের সাজে সাজিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইলে, যুদ্ধের অনুকূল অস্ত্র শস্ত্রাদির সঙ্গেই কার্য্য করিতে হয়। তখন বাঁশী বাজাইলে বা স্তব পাঠ করিলে চলিবে না। আবার গানের আসরে বসিয়া তরবারি লইয়া লম্ফ ঝম্ফ করিলেও লোকে হাসিবে, তাই বলিয়া আবার রাগিণীর সহিত লড়াই আরম্ভ করিলেও নিতান্ত বেমানান হয়। সেইরূপ যে সাজে আসরে নামিয়াছি, সেই সাজের মান রক্ষা করিয়া, সেই সাজ সরঞ্জামের সাহায্যে যে কার্য্য করা সঙ্গত, তাহাই করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমরা তাহারই বিপরীত করিতেছি। দয়া, ভক্তি, পরোপকারিতা ইত্যাদি যে সমস্ত সদ্বৃত্তিরূপ সাজ সজ্জা আমাদের আছে, আমরা ভ্রমেও তাহাদের সাহায্য লইয়া কোন কার্য্য করিতেছি না। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্যের বিষয় লক্ষ্য না করিয়া আপন মনে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেছি। তাহাতে উদ্দেশ্য পথ হইতে যে ক্রমশঃই দূরে সরিয়া যাইব তাহার আর আশ্চর্য্য কি? এ দোষ অন্যের নয়, এ দোষ আমাদের নিজের। কিন্তু তাহাতে কি? পথহারা হইলে কি আর কেহ পথ পায় না? পথহারা হইয়া বিপথে গেলে কি সে কাহারও সাহায্যে স্বীয় উদ্দেশ্য পথে আসিতে পায় না? তবে আমাদের কি আর উদ্দেশ্য পথে আসা ঘটিবে না? এমন বন্ধু, এমন পথ-প্রদর্শক কি আমাদের নাই যে বিপথ হইতে সুপথে লইয়া যায়? আছে, কিন্তু আমরা অহঙ্কারী জীব, মোহ-মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আছি; সে উপদেশ দিতে আসিলেও আমরা তাহার আদেশ গ্রাহ্য করি না। অঙ্গুলী সঙ্কেতে পথ দেখাইয়া দিলেও তাহাতে নেত্রপাত করি না। তবে আর তাহার দোষ কি? সে ত বরাবরই সঙ্গে, কখনও অলক্ষ্যে কখনও সাক্ষাৎ থাকিয়া পথ দেখাইতে প্রস্তুত, কিন্তু আমরা এতই অহঙ্কৃত যে, অন্যের উপদেশ গ্রহণ করিতে আমাদের ইচ্ছা হয় না। মূঢ় ব্যক্তিরা আপনাকে কাহারও নিকট হীন স্বীকার করিতে চায় না।

সে পথ প্রদর্শক কে? এমন নিঃস্বার্থ পরোপকারিতায় অলঙ্কৃত সে মহাপুরুষ কে? আমাদের চতুর্দ্দিকে অনেকেই বন্ধু ভাবে অনেক পথ দেখাইয়া দিতেছে। আমরা পথহারা পথিক, কাহার কথা মান্য করিব? কাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিলে গন্তব্যপথে যাইতে পারিব, আর কোন্ পথে গেলেই বা আমাদের নিজ নিকেতনে যাওয়া ঘটিবে, তাহা কেমনে বুঝিব?

ইন্দ্রিয়াদি অনবরত যে পথ দেখাইতেছে তাহাতেও মন প্রলুব্ধ হয়, রিপুগণের প্রদর্শিত পথও তো অতি সুগম ও সুন্দর দেখি, তবে কেমন করিয়া বুঝিব ইহারাই প্রকৃত পথ প্রদর্শক নহে? যে পর্য্যন্ত ইহার ফলাস্বাদন করিতে না পারিব, সে পর্য্যন্ত ইহার দোষ গুণ কেমন করিয়া বিচার করিব?

হায়! আমরা কি নির্ব্বোধ! সকল কার্য্যই কি নিজে ভোগ করিয়া বুঝিতে হয়? মৃত্যুযাতনা কে ভোগ করিয়া পরীক্ষা করিতে পারে? কিন্তু মৃত্যুতে যে কষ্ট তাহা অন্যের দেখিয়া সকলেই উপলব্ধি করিয়া থাকে। কাহাকেও ব্যাঘ্রে হত্যা করিলে, তাহার মর্ম্মভেদী রোদনে সকলেই ব্যথিত হয়। যে কোন দিন ব্যাঘ্র দেখে নাই, তাহারও মনে ভয়ের সঞ্চার হয়। সেইরূপ আমরা যদিও নিজে, এই রিপুগণের উপদেশের কার্য্যের ফল ভোগ করিতে না পারি, তথাপি অন্যকে দেখিয়া সহজেই তাহার পরিণাম বুঝিতে পারি। যাহারা এই বিপথে আসিয়া হাহাকার ধ্বনিতে গগন প্রতিধ্বনিত করিতেছে, তাহাদের অবস্থা দেখিয়াই পথের পরিণতি বুঝিতে পারি। সেই জন্যই বলি, রিপুগণের দর্শিত পথ কেবল কণ্টকময়, কেবল দুঃখময়, কেবল যাতনাময়।

কিন্তু ঐ যে এক কোণে থাকিয়া মিষ্ট মধুরস্বরে ধীরে ধীরে তোমাকে উপদেশ দিতেছে, একটী অন্যায় কার্য্য করিতেই, যে, দূর হইতে নিষেধ করিতেছে, ঐ উনিই আমাদের পরম বন্ধু, পথ প্রদর্শক। উহার নাম "বিবেক" উহার সাহায্যেই আমরা জীবন-পথ পরিষ্কার রূপে দেখিতে পারিব। অতএব উহার উপদেশ অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। যাহারা এই মহা মন্ত্রীর উপদেশ মতে চলে তাহাদের জীবন কি সুখের! তাহারাই প্রকৃত পথের পথিক, তাহারাই নিজ নিকেতনে উপস্থিত হইতে পারিবে। উহার দর্শিত যে পথ তাহার নাম "ধর্ম্ম পথ"। বাস্তবিক ইহাই প্রকৃত গন্তব্য পথ, এই পথ ভিন্ন গন্তব্যস্থানে যাওয়ার আর দ্বিতীয় পথ নাই। এ পথ বরাবরই সেই দয়াময়ের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। তাই বলি মন! যখন পথ চলিতেই হইবে, গন্তব্য স্থানে যাইতেই হইবে, তখন আর মিছামিছি ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত হও কেন? পথ ছাড়িয়া অরণ্যে ভ্রমণ করিয়া কি ফল? ঐ যে মহাপুরুষ যে ভাবে পথ চলিতে বলেন, সেই ভাবে তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া ধর্ম্মপথে চলিতে থাক। তোমার উদ্দেশ্য সফল হইবে, আর অন্ধকারে পড়িয়া হাহাকার করিতে হইবে না। আর ঐ যে পথ দেখাইয়া দিলেন, এ বড় সুন্দর পথ, এ পথে প্রথমতঃ যদিও দুঃখ, বাধা, বিপত্তি দেখা যায়, কিন্তু যতই অগ্রসর হইবে, ততই এ পথ প্রশস্ত, ততই মনো-

হয় ও তৃপ্তিপ্রদ। যাঁহারা একবার এ পথের পথিক হইয়াছেন, ঐ শুন সেই মহাপুরুষগণ পথ হইতে ডাকিয়া সে সুখের বার্ত্তা জগতে ঘোষিত করিতেছেন। আহা যে স্থানের উদ্দেশে পথে আসিলে এত সুখ, সেস্থান কেবলই সুখময়; তথায় দুঃখ নাই, জ্বালা নাই, শোক নাই, তাপ নাই, কেবল সুখ, অনন্ত সুখ। সুখের আরামের বিশাল স্রোতস্বতী, সেই সুখময় অনন্ত সুখের আধার অনন্তে মিলিত হইয়াছে। অতএব মন! দিন থাকিতে, সময় থাকিতে চল, ঐ পথের পথিক হও। আর বিলম্ব করিও না, এই মুহূর্ত্তে, এই শুভ লগ্নেই যাত্রা কর। যাত্রার আর কোন বাধা নাই, নিয়ম নাই, এ পথে যাত্রা করিতে সর্ব্বদাই মাহেন্দ্র যোগ।

মৌলভী সৈয়দ নুরুল হোসেন।

ভিক্ষা।*

বসাইয়া হৃদয়ের পুণ্য সিংহাসনে
নিভৃত বিজন প্রান্তে হে দেব আমার!
পূজি তোমা' ভক্তি অর্ঘ প্রেম-পুষ্পদানে।
জানিনা সে তন্ত্র মন্ত্র গীতা তত্ত্বসার;
জানি শুধু তুমি মম নয়নের জ্যোতিঃ
তুমি মম ধ্রুবতারা আঁধার নিশার;—
ইহলোকে পরলোকে তুমি মাত্র গতি
তোমা বিনা এ জীবন নিতান্ত অসার।
হে মহান্ হে প্রধান, সর্ব্বশক্তিমান,
হে সত্য, হে শিব, দেব চিরানন্দময়!
হে মঙ্গল হে বিরাট্ পুরুষ প্রধান,
হে বিশ্ব-বিধাতা প্রভো করুণা-নিলয়
হে যোগেন্দ্র মহাযোগি! হে জ্ঞান অতীত
হে নির্লিপ্ত! নহ তুমি ধ্যান ধারণার;
হে চির বাঞ্ছিত মম! হে বিশ্ব-বন্দিত
জীবনেশ, এস নাথ! হৃদয়ে আমার।
জীবনের শেষ দিনে ধ্যানে যেন পাই
ও অভয় পদ যুগ; শুধু এই চাই।

শ্রীঅনুপমা দেবী।

কবির স্বপ্ন।†

(অপূর্ব্ব বিবাহ।)

আমার নাম শ্রীসর্ব্বানন্দ সর্ব্বজ্ঞ; নিবাস সুন্দরপুর। অনেক দিবস অতি-বাহিত হইল আমার শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শুভ বিবাহের সময়

* লেখিকার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থই এই কবিতাটী প্রকাশিত হইল।—সহঃ-সং।

† ১৩০৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে, "সাহিত্য-সেবক" মাসিক পত্রে, এই প্রবন্ধটী "আমার

বৈবাহিক-কার্য্য, সুচারুরূপেই নির্ব্বাহ হইয়াছিল ;—কোন প্রকার গোলযোগ বা ত্রুটি সংঘটিত হয় নাই। প্রাপ্য সামগ্রীর নিমিত্ত আমার অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষীয়েরা, কন্যাপক্ষীয়দিগের উপর, কোন বিষয়েই পীড়াপীড়ি করেন নাই। তাহার প্রথম ও মুখ্য কারণ এই যে, অসমর্থকে অন্যায়রূপে উৎপীড়ন করিলে ভদ্রতা রক্ষিত হয় না ;—অধিকন্তু, লোক-সমাজে নিন্দনীয় ও উপহাসাস্পদ হইতে হয়। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ক'নেটীর বর্ণ ও অঙ্গ-সৌষ্ঠব অতি মনোহর এবং "ঐ রমণীরত্নকেই আমি বিবাহ করিব," এই অভিপ্রায় আমার আত্মীয়গণকে বিদিত করিয়াছিলাম।

আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা 'সু-মুখী' একটু মুখরা হইলেও, তিনি সর্ব্বদা সুমৃদুহাসিনী ও মধুরভাষিণী ; এবং তিনি যে চম্পককলিকাবরণী ও গজরাজ-গামিনী, তদ্বিষয়ে আর সূচ্যগ্রমাত্রও সন্দেহ নাই। ভার্য্যা 'সু-মুখী'কে, আমি প্রাণাধিক না হোক, প্রাণসম অথবা প্রাণের পরেই ভাল বাসিয়া থাকি। তাঁহার সুন্দরী স্বস্গণকেও প্রায় সেইরূপ ভালবাসি। স্ত্রীলোক দেখিলেই তাহাকে ভালবাসার বাসনা বড়ই বলবতী হইয়া উঠে। স্ত্রীজাতিকে সু-ভাবে ভালবাসা আমার সুন্দর-স্বভাবের সুপরিচয়। ভার্য্যা 'সু-মুখী' এক পলের নিমিত্তও আমার সঙ্গ ছাড়া হইলে, আমি যথেষ্ট কষ্ট অনুভব করিয়া থাকি। শুভ বিবাহের অতি অল্প দিবস অতিবাহিত হইবার পরেই, পরম পিতা করুণাময় পরমেশ্বরের অপার কৃপায়, পুন্নামক ভীষণ নরক হইতে উদ্ধার পাইয়াছি। আমার সংসারযাত্রা পরম সুখে ও নিরুদ্বেগে নির্ব্বাহ হইতেছে। যাহার সংসারে এমন সংসার-কার্য্য-নিপুণা ভার্য্যা, তাহার সাংসারিক কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন না হইবেই বা কেন?—আমি এক জন 'সংসারী' পদ-বাচ্য নবীন পুরুষ হইলেও, প্রকৃতপক্ষে সংসারে জড়িত বা বিমুগ্ধ নহি। সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, সংসারীর যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করা একান্ত কর্ত্তব্য, আমার দ্বারা কোন ক্রমেই সে সকল কার্য্য হইয়া উঠে না। আমাকে সংসারের তাবৎ কার্য্যেই উদাসীন দেখিয়া, আমার ভার্য্যা 'সু-মুখী' সর্ব্বদাই আমাকে "পাগল" বলিয়া উপহাস

বিবাহ" ইতি শীর্ষকে ক্ষুদ্রাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইহার স্থল বিশেষ পরিবর্জ্জিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া 'কবির স্বপ্ন' নামে প্রকাশিত হইল।

এই প্রবন্ধে পুষ্পজাতিকে স্ত্রীলিঙ্গ মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে।—লেখক।

করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ, আমি পাগল নহি। আমার হিতাহিত জ্ঞান, কার্য্য-নির্ব্বাহক বুদ্ধি, স্ত্রীপুরুষ জ্ঞান, আত্ম ও পর বিষয়ক বিচারশক্তি এবং সাধারণ বিদ্যা ও বুদ্ধি যথেষ্ট আছে। আমার বন্ধুবর্গ (পুরুষ ও রমণী) আমাকে বুদ্ধিমান ও সদ্বিবেচক এবং ন্যায়বান্ জানিয়া আমার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক, আমি সকল ব্যক্তিরই নিকট সমাদৃত;—কেবল এক মাত্র চপলমতি তরুণী-ভার্য্যার নিকটেই লাঞ্ছিত ও "পাগল" উপাধিতে বিভূষিত। আমি জাগ্রত, স্বপ্ন বা কল্পনাতেও কদাচ কোন জীবের অনিষ্ট-চিন্তা করি না বলিয়া, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, এমন কি বৃক্ষ ব্রততী পর্য্যন্তও আমাকে ভাল বাসিয়া থাকে। বস্তুতঃ, আমি আদরণীয় সকলেরই নিকট। উপহাসাস্পদ—কেবলমাত্র পত্নীর নিকট।

একদা নিদাঘের নিশীথ সময়ে (সন ১৩০২ সাল,—২৬শে বৈশাখ, বুধবার, বিশাখানক্ষত্র, বৈশাখী পূর্ণিমার রজনীতে) মুখরা ভার্য্যা 'সু-মুখী'র অপ্রীতিকর ও অপমানসূচক বচনে একান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া, শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শীতল সমীর-সেবনাশায় অট্টালিকার শিরোদেশে গমন করতঃ, তথায় উপবেশন করিলাম। প্রকৃতির অনুপম মনোহর নৈশ-শোভা সন্দর্শনে মনঃপ্রাণ বিমোহিত হইল। অন্তঃকরণে অচিরে অনির্ব্বচনীয় আনন্দলাভ করিলাম। দেখিতে লাগিলাম,—অনন্ত আকাশ মণ্ডলে পৌর্ণমাসীর শুভ্র পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে। নয়ন রঞ্জন সুধাকরের কোমল হাসি-রাশি, শীতল কৌমুদীরূপে অনন্ত নীলাকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ধরণীপৃষ্ঠেও সেই সুমধুর সিত কৌমুদী নিপতিত হওয়ায়, যাবতীয় দৃশ্যমান পদার্থ হাস্যময় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। সমগ্র মেদিনী শুভ্র বেশে সুস্থির হইয়া, শান্তি-সুখ সম্ভোগ করিতেছে। দিবাভাগের অশান্তিকর কোলাহল এক্ষণে অনন্ত নীলাকাশমণ্ডলে বিলীন হইয়া গিয়াছে। রাজপথ সমূহ মানবত্যক্ত হইয়া, শান্তি-সুখ লাভ করিতেছে। দিবাচর জীবব্রজ এই স্নিগ্ধ নিশায় নিদ্রা-সুখ উপভোগ করিতেছে। সুমধুর স্নিগ্ধোজ্জ্বল চন্দ্রালোকে উলুক, বাদলী, চর্ম্মচটিকা, প্রভৃতি দিবাভীত প্রাণিগণ পরমানন্দে বিহার করিতেছে। অদূরবর্ত্তী একটী প্রকাণ্ড প্রাচীন পুন্নাগ পুষ্পবৃক্ষে দলে দলে বাদলী আসিয়া বসিতেছে, উড়িয়া যাইতেছে, আবার আসিয়া উপবেশন করিতেছে;—বিবিধ স্বরে স্ব স্ব হৃদয়োল্লাস প্রকাশ করিতেছে। বহু বৃক্ষের নানাবিধ সদ্যসুপক্ক সুরস ফলাস্বাদন করিতেছে; একটা অপরটার প্রতি প্রধাবিত হইতেছে, দুর্ব্বলপক্ষ শঙ্কাপ্রযুক্ত অন্যত্র উড়িয়া যাইতেছে

দেখিয়া, বলবান্ পক্ষ পরমানন্দ সহকারে সুপক্ব-ফল-বৃন্দের বৃন্তোপরি উপবেশন করিয়া, নিরুদ্বেগে অভিলাষানুরূপ ফলভক্ষণ করিতেছে। উলুক-কুল নীরবে নিজ নিজ আহার্য্য বস্তুর অন্বেষণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। চকোর চকোরী নিচয় সুবিমল, সুধাসিক্ত চন্দ্রিকা পানে প্রমত্ত হইয়া, স্বেচ্ছামত শূন্যমার্গে বিচরণ করিতেছে। আনন্দে বিহ্বল হইয়া, চকোর, চকোরীর সহিত প্রেমালাপ করিতেছে। পরস্পর একত্র হইতেছে, আবার বিভিন্ন হইয়া, বিভিন্ন পথে বিহার করিতেছে, আনন্দে উন্মত্ত-প্রায় হইয়া, শূন্যপথের এক প্রান্ত হইতে প্রান্তরান্তরে প্রধাবিত হইতেছে। সন্তাপ যে কি পদার্থ, তাহা তাহারা এক্ষণে ভুলিয়া গিয়াছে। জানি না, চকোর জীবনে, দুরূহ বিরহ-দুঃখ সদৃশ কোন দুরূহ সন্তাপ উপভোগ সম্ভবে কি না। কিন্তু, এই ক্ষুদ্র প্রাণিগণের কার্য্যপ্রণালী, মানব-কার্য্য-প্রণালীর অনুরূপ নহে। ইহারা সর্ব্বদাই প্রফুল্ল চিত্ত, সুখার্ণবে সতত ভাসমান, চঞ্চল, ক্রীড়াশীল, প্রেমানুরাগী ও নির্ম্মল-নৈশ-গগন-বিহারী। চকোর ও চকোরীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের পরম প্রীতিভাব অবলোকন করিয়া, অন্তঃকরণে অপূর্ব্ব শান্তিরসের সঞ্চার হইল। তৎক্ষণাৎ অদূরবর্ত্তী অরণ্য মধ্যে শিবাসঙ্ঘের বিকট অশিব রবে সুখ-চিন্তার কিঞ্চিৎ ব্যাঘাত ঘটিল। শুনিলাম,—শিবাবৃন্দ একবার বিকটরবে অনুলোম ও বিলোমভাবে, ভূতভাবন ভগবানের আরাধনা করিয়া, অনতিবিলম্বেই নিবিড় বন-মধ্যে নিহিত হইল। পল্লিগ্রামসুলভ সারমেয়াদির উৎকট চীৎকার, যতিবিহীন অমৃতাক্ষরছন্দ পাঠের ন্যায়, কর্কশ ও কর্ণকটু বলিয়া অনুমিত হইল। তৎপরক্ষণেই পুণ্যতোয়া ভাগীরথী বক্ষঃস্থ নৌযানের নাবিক-বৃন্দের সারঙ্গরববিমিশ্রিত মধুর কণ্ঠস্বরে বিমোহিত হইলাম। সুগভীরা বিভাবরী-যোগে মাঝিগণ গীত গাহিয়া, আমার অলস ও বিবশ প্রাণে অমৃতরাশি ঢালিয়া দিতেছে বলিয়া বোধ হইল। একে নিদাঘের পরম সুখ-প্রদায়িনী জ্যোৎস্নাময়ী রজনী,—স্নিগ্ধ নৈশ-সমীর বহমান,—বসুন্ধরা সুশান্তভাব-ময়ী,—তাহার উপর দূরপ্রান্তরাগত সুমধুর সঙ্গীত-ধ্বনি;—ইহাতে অনায়াসেই হৃদয় দ্রব ও মনঃপ্রাণ বিমোহিত হইল;—আত্মহারা হইয়া, সন্তাপসংযোজিত অনিত্য সংসারের অসহ্য যন্ত্রণা ভুলিয়া গেলাম;—স্বর্গীয় শান্তিসুখ উপভোগ করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম। শান্তিপ্রদায়িনী নিদ্রাদেবী আমার বাহ্য চৈতন্য হরণ করিলেন বটে, কিন্তু, জ্ঞাননেত্রে প্রকৃতির অনুপম নৈশ শোভা সন্দর্শনের, বা শ্রবণে সঙ্গীত শ্রবণের কোন বিঘ্নই সংঘটিত হইল না।

জাগ্রদবস্থায় যে ভাবে, যে রূপে, যাহা নিরীক্ষণ বা শ্রবণ করিতেছিলাম, নিদ্রিতাবস্থাতেও অবিকল সেই প্রকার দেখিতে ও শুনিতে লাগিলাম। দূর-প্রান্তরাগত সঙ্গীত-স্বরে বাস্তবিকই নিদ্রিতাবস্থাতেও বিমোহিত হইতে লাগিলাম। গীতের অস্পষ্টভাষাসংযুক্ত সুমিষ্ট স্বরলহরী কিছুকাল পরে শৈত্য-সমীরণে মিলিয়া গেল। সে সু-স্বর আর কর্ণগোচর হইল না। তথাপিও আমার হৃদয় মধ্যে সেই সুমিষ্ট স্বরলহরীর যেন সহস্র উচ্ছ্বাস হইতে লাগিল। কর্ণকুহরে সে রব যেন ধ্বনিত হইতেছে বলিয়া অনুভূত হইতে লাগিল। সে মধুর শব্দ, অতি ধীরে ধীরে, হৃদয়ের অন্তস্তলে বিলীন হইতেছে, বুঝিতে পারিলাম।

ঊর্দ্ধদেশে,অনন্ত আকাশ মণ্ডলে দেখিলাম, চঞ্চল দক্ষিণানিলে শুভ্রকায় বলাহক খণ্ড, দক্ষিণ দিক হইতে ধীরে ধীরে উত্তরাকাশে গমন করিতেছে। কদাচিৎ দুই এক খণ্ড ক্ষুদ্রকায় ধূসর মেঘ নয়নরঞ্জন পূর্ণচন্দ্রকে আবৃত করিয়া, ক্ষণকালের নিমিত্ত মধুর জ্যোৎস্নাময়ী বসুমতীকে ঈষৎ অন্ধকারময়ী করিয়া, প্রকৃতির পরম মনোহর চিত্র বিকৃত করিয়া ফেলিতেছে। তারকারূপ মণিরত্নমালা পরিবেষ্টিত, মনোহর পূর্ণচন্দ্রের রমণীয় লাবণ্য হীনপ্রভ হইতেছে। বহুদূরের বংশীরবে মনঃপ্রাণ আকুল হইতেছে। ঐ সুরব, সন্তপ্ত হৃদয়ে পরম অমৃতরাশি ঢালিয়া দিতেছে। বহু দিবস বিস্মৃত পূর্ব্বস্মৃতি, অলস অবশ মনে, অকস্মাৎ অস্পষ্ট স্বপ্নবৎ জাগিয়া উঠিতেছে। মায়াবিনী প্রকৃতিদেবী প্রকৃতপক্ষে আমাকে আত্মবিস্মৃত করিয়া তুলিতেছেন।

ক্ষণকাল পরে কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইলাম। মদীয় বাসগৃহের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত ক্ষুদ্র প্রসূনোদ্যানের প্রতি সহসা দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইল। এই পরম রমণীয় উদ্যানের অধিকাংশ পুষ্পবৃক্ষই আমার প্রিয়তমা ভার্য্যা শ্রীমতী 'সু-মুখী'র স্বহস্তরোপিত ও বহু যত্নে সংরক্ষিত। ঐ সকল পুষ্প-বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে,বেলা, যূথিকা, মল্লিকা, কুন্দ, গন্ধরাজ,জাতি, কৃষ্ণকেলী, করবী, চন্দ্রমল্লিকা, রজনীগন্ধা, কৃষ্ণচূড়া, জবা, বক, টগর ও পারুলই অধিক। রূপ গুণে মনোহর গোলাপও নিতান্ত ন্যূন নহে। সৌরভবিহীন বিদেশীয় পুষ্পবৃক্ষও, উদ্যানের বাহ্য শোভা সংবর্দ্ধনার্থ, উপযুক্ত স্থাননিচয়ে রোপিত হইয়াছে। কিন্তু তত্তাবৎ বৃক্ষ সংখ্যা অতি বিরল। স্বদেশীয় সৌরভময়ী কুসুম সমূহ কেবল মাত্র দেবার্চ্চনার নিমিত্তই ব্যবহৃত হইয়া থাকে; বিলাসের নিমিত্ত নহে। কদাচিৎ কোন দুষ্ট লোকে (নিষেধ সত্বেও) অপহরণ করিয়া, সৌরভময়ী, পরম প্রীতিদায়িণী

কোমলা কানন-সুন্দরীগণের বৃথা অপচয় করিয়া থাকে। দেখিলাম—অনন্ত আকাশমণ্ডলে যেমন অসংখ্য তারকা হাসিতেছে, তদ্রূপ, মদীয় এই যত্নসংরক্ষিত কুসুমোদ্যানে অসংখ্য প্রসূনপুঞ্জ কোমল ও সুখকর নৈশ সমীর-সঞ্চারণে ধীরে—নীরবে প্রস্ফুটিতা হইয়া, কোমল মধুর হাস্য করিতেছে। অলৌকিক রূপলাবণ্যে দিক আলোকিত করিয়াছে। সৌরভ-ভারে উদ্যানের সর্ব্বত্র আমোদিত করিয়া তুলিয়াছে; ক্রীড়াসক্ত, চঞ্চল নৈশ-সমীর সেই সকল সদ্যপ্রস্ফুটিত কোমল কুসুম রাশির ভিন্ন ভিন্ন সুবাস নিজ অঙ্গে মাখিয়া দিক বিদিকে প্রবাহিত হইতেছে। চঞ্চল সমীরণ কুসুমবালাগণকে নাচাইয়া, তাহাদিগের পরম রত্ন সৌগন্ধ অপহরণ করতঃ, সে স্থান হইতে অন্যত্র প্রস্থান করিতেছে। কুসুমকামিনীগণ নাচিয়া নাচিয়া, প্রেমে মাতিয়া, একে অন্যের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িতেছে; সুমধুর হাসি হাসিয়া, আকাশের তারকারূপী উজ্জ্বল কুসুম সমূহকে যেন বসুন্ধরার নৈশ-সংবাদ প্রদান করিতেছে। তারকাগণও যেন ঝিকিমিকি করিয়া, কুসুমের ভাষায় তাহাদের স্ব স্ব মনোভাব প্রকাশ করিতেছে। উপরে, নভোমণ্ডলে অসংখ্য নয়নরঞ্জন নক্ষত্র;—নিম্নে ধরাধামে নবপ্রস্ফুটিত বিবিধ জাতীয় বিস্তর সুগন্ধী কুসুম;—মধ্যে—শূন্যস্থানে—কৌমুদী ও পুষ্প-বাস-বাসিত স্নিগ্ধ নৈশ-সমীরণের পরস্পর সংমিশ্রণ;—সময়—গভীরা রজনী, স্থান—বিলাসপুর * * * গৃহ; সুতরাং এরূপ দুর্লভ সুখ-সংঘটনে আমি যে কি অনুপম ও অনির্ব্বচনীয় শান্তি সুখ-সম্ভোগ করিতেছিলাম; তাহা কেবল মাত্র কল্পনায় অনুভবনীয়;—প্রকাশের প্রয়াস সুদূরপরাহত। কোমলা কুসুম বালাগণের পরম রমণীয় ভাব দৃষ্টে আমার মনঃ বিমোহিত হইল। তাহাদিগের সন্নিধানে গমনের বাসনা একান্ত বলবতী হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নাবিধৌত নৈশ-সমীর-সঞ্চারিত অট্টালিকার শিখর হইতে, ধীরে ধীরে, অবরোহণ করতঃ, নিঃশব্দপদসঞ্চারে 'সু-মুখী'র কুসুমোদ্যানে প্রবেশ করিলাম। প্রবিষ্ট হইবা মাত্র, দেহে সহসা অভূতপূর্ব্ব অভিনব আনন্দ-সঞ্চার হইল। নিদ্রিত হৃদয় জাগরিত হইয়া উঠিল। প্রাণে শান্তি রসের সঞ্চার হইল। স্বর্গীয় সুপবিত্র ভাব ও সুপ্রবৃত্তিব্রাত এক কালেই মনকে আশ্রয় করিল। পৃথিবী বা সংসারের চিন্তা একেবারেই বিস্মৃত হইলাম। আনন্দান্তকরণে ও সহাস্য আস্যে কুসুম-কামিনীগণ-সদনে গমন করিলাম। পূর্ব্বজন্মের পরম সুকৃতির ফলে, দৈবানুগ্রহে, দেবের অদ্ভুত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলাম। কুসুমের ভাষা বুঝিতে ও ঐ ভাষায় আমার আত্ম মনোভাব প্রকাশ করিতে সম্যক সমর্থ হইলাম। আমি যে এই

পৃথিবীর মানব, তাহাতে সময়ে সময়ে আমার ভ্রম জন্মিতে লাগিল। কুসুম-কুমারীগণ আমাকে যথেষ্ট যত্ন ও সদ্ভাবপূর্ণ সাদর সম্ভাষণে উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করাইল। আমি তাহাদিগের বাসনানুসারে, উপযুক্ত কোমল পল্লবাসনে উপবেশন করিলাম। তাহাদিগের সু-ভাব দৃষ্টে হৃদয়ে যৎপরোনাস্তি প্রীতিলাভ করিলাম। আমি যেন তাহাদের,—ও তাহারাও যেন আমার চির-পরিচিত ও স্বজন বলিয়া অনুভূত হইল। তাহাদিগের আচার, ব্যবহার ও সদালাপে আমার মনঃ বিমোহিত হইল; আমি সহজেই আত্মহারা হইলাম। বুঝিলাম, কুসুম জন্ম অতি পবিত্র ও পরম শ্লাঘনীয় জন্ম। এই দেবতা-বাঞ্ছিত পবিত্র জন্ম, বহু পুণ্যে লাভ হইয়া থাকে। এই শ্লাঘনীয় জন্মে রোগ, শোক, অনুতাপ ও সন্তাপ সম্ভোগ করিতে হয় না; এবং হিংসা, দ্বেষ, অহঙ্কার, মদগর্ব্বতা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি ভীষণ কীটকুল হৃদয় আক্রমণ করতঃ, পাপে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিতে সমর্থ হয় না। কুসুমের কর্ম্ম ও কুসুমের ধর্ম্ম একান্ত নিষ্কাম বলিয়া বুঝিতে পারিলাম।

একটী পরমাসুন্দরী গোলাপকুসুম, সমীপবর্ত্তী 'গোলাপকুঞ্জের' মধ্য হইতে সহসা বহিষ্কৃতা হইয়া, আমার সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করিল। পরে, কথা-প্রসঙ্গে মানবজীবনের সুখ, দুঃখ, অসারতা,—মানব মনের সঙ্কীর্ণতা এবং মানব-চরিত্রের উচ্চ ও নীচ ভাবের বিষয় আমাকে উৎকৃষ্টরূপে বুঝাইয়া দিল। মানব জাতির শোক ও দুঃখের কারণ কি তাহা কহিল। মানব জাতির সুখ্যাতি করিল ও অনেক মানবের জীবনে যে সার পদার্থ আছে, তাহা কহিল। মানব জন্ম, ধরাধামে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জন্ম, তাহাও কথা প্রসঙ্গে বারংবার বুঝাইয়া দিল। আমাদিগের চিত্তে কি নিমিত্ত সন্তাপ-সঞ্চার হয়, তাহাও কহিল। আত্মা বা মনের দুঃখ কি নিমিত্ত হয়, তাহা সবিশেষ সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিল।

কুসুম-কুল-সম্রাজ্ঞী গোলাপ সুন্দরীর সমুদায় সদুপদেশ, আমি সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলাম। আমার মনের নীচতা বা হীনভাব ও কুপ্রবৃত্তিব্রাত, মনের আশ্রয় পরিত্যাগ করতঃ এক্ষণে অন্যত্র চলিয়া গেল। ক্রমে বহুবিধ বিষয়ের সন্দেহ ভঞ্জন হইল। নিজ হিত ও পরঃ হিত উভয়ই যে সমতুল্য অর্থাৎ একবিধ তাহা সুন্দর ও সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিলাম। স্বার্থ ও নিঃস্বার্থের তারতম্য সম্যক বুঝিতে পারিয়া, অতীব আনন্দিত হইলাম। সুখ ও সন্তাপের উৎপত্তির হেতু কি, তাহাও বুঝিলাম। অনন্ত সুখ ও শান্তি লাভের অব্যর্থ

উপায় কি, তাহাও সেই করুণাময়ী প্রস্থনসুন্দরীর প্রসাদাৎ প্রকৃষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হইলাম। অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। সৃষ্টির সার্থকতা উপলব্ধি করিতে আর অবশিষ্ট রহিল না।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ বিদ্যাবিনোদ।

মক্কা-তীর্থ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর।)

চতুর্থ স্তবক।

মক্কা-তীর্থে হজরত যেরূপ ভাবে হজ্জব্রতোৎসব সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক মুসলমানের অবগত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। এজন্য আমরা হাদিস অনুসারে হজ্জের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত নিম্নে সংক্ষেপে প্রদান করিলাম।

এস্লামের অভ্যুদয়-কালে হজ্জ-বিধি প্রবর্ত্তিত হয় নাই; আবহমান কাল উহা প্রচলিত আছে। পরমেশ্বর পৃথিবী-সৃষ্টির দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে 'কাবা' ভূমি সৃষ্টি করেন। কালক্রমে কাবা-কেন্দ্রের চতুষ্পার্শ্বে সমগ্র ভূভাগ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাহাতে সার্দ্ধদ্বিলক্ষ বৎসর ফেরেস্তা, জ্বেন্ ও দৈত্যগণ বসবাস করিতে থাকেন।

ফেরেস্তাগণ এবং কাবা ও হজ্জ।

ইতোমধ্যে পরমেশ্বর ফেরেস্তাগণ সমীপে মানব সৃষ্টির ইচ্ছা ব্যক্ত করিলে, সকলে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া তাঁহার বিরক্তি ভাজন হয়েন। তজ্জন্য ফেরেস্তারা সাশ্রুনেত্রে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া আর্‌শ (ব্রহ্মাসন) প্রদক্ষিণ (তোয়াফ) করিতে লাগিলেন। তাহাতে জগৎপতি রোরুদ্যমান ফেরেস্তাদিগকে আর্‌শের নিম্নস্থিত "বয়তুল-মামুরের" অনুরূপ একটী মন্দির জগদ্বক্ষে নির্ম্মাণ করিতে আদেশ করিলেন। তচ্ছ্রবণে ফেরেস্তা-বৃন্দ 'কাবা'-ভূমে "সোরাখের" (ক্রন্দন গৃহের) প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় হজ্জ করিতে লাগিলেন অর্থাৎ ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে "সোরাখের" চতুষ্পার্শ্বে মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহার বহুকাল পরে আদি-দম্পতী হজরত আদম ও হাওয়াদেবী জগন্নিবাসে

বাধ্য হয়েন। কথিত আছে, আদিপুরুষ আদম (সফিঃ) কাবা-ক্ষেত্রে পুনশ্চ উপাসনালয় প্রস্তুত করেন এবং তাঁহার সন্তানগণও প্রয়োজনানুরূপ তাহার সংস্কার করেন। তৎকালে ফেরেস্তাদের ন্যায় তাঁহারাও কাবা প্রদক্ষিণ ও ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা হজ্জ ক্রিয়া সমাধা করিতেন। মহাত্মা এব্রাহিমের সময় পর্য্যন্ত তদনুরূপ হজ্জবিধি প্রচলিত ছিল। তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তির পর হইতে অনেকবিধ কার্য্য হজ্জের অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে।

আদি দম্পতী এবং কাবা ও হজ্জ।

কালক্রমে মতয়রূরব-বংশীয় কাফেরগণ কয়েকবার কাবা-গৃহ সংস্কার করে কিন্তু তাহাদের দ্বারা কাবা-মন্দির প্রতিমাপুঞ্জে পরিপূর্ণ হয়। চিরন্তন প্রথানুযায়ী কাফেরেরাও হজ্জ-ব্রত উদযাপন করিত। তাহারা কাবা-প্রদক্ষিণ কালে বিবস্ত্র হইত। তাহাদিগের ধারণা ছিল যে, পাপের জন্য পরিধেয় অপবিত্র হয়; সুতরাং ঈশ্বর সাধনার সময় বস্ত্র পরিত্যজ্য। তৎকালে আরবের প্রত্যেক গোষ্ঠির জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঈদোৎসব-ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল। তন্মধ্যে কোরেশবর্গ মজ্‌দালেফা, ফোজাহ্ ও আরফাতে যাইয়া প্রতিমা পুঞ্জের এবং পূর্ব্ব পুরুষের গৌরব-গর্ব্ব কীর্ত্তন করিত। ইহার পরে সমতল ভূমি 'মিনায়' সকল গোষ্ঠি একত্রীভূত হইয়া তিন দিবস মেলা বসাইত। সেই সময় সকলে অন্তঃপুর-সুন্দরীগণে পরিবৃত হইয়া অভিলাষানুরূপ মদিরা পান করতঃ সমধিক পাপ-সমৃদ্ধ উৎসবে ইন্দ্রিয়ার্থ সাধন করিত।

কাফেরগণ এবং কাবা ও হজ্জ।

অনন্তর কাফেরেরা পুত্তলিকার উদ্দেশে গো, ছাগ, উষ্ট্র ও বরাহ এবং মৃত পশু বলি দিত। বলির জন্য কাবার চতুষ্পার্শ্বে ৩৬০ খণ্ড প্রস্তর সংস্থাপিত ছিল। বলিদাতারা নিহত পশুর রুধির-ধারা কাবার গাত্রে লেপন করিত এবং দেবতার তুষ্টিবিধানের জন্য বলির মাংস ভক্ষণ করিত না। তাহারা বলি-ব্যাপারের অগ্রে 'আজ্‌লাম্' ও 'আক্‌দা' অবলম্বন করিত অর্থাৎ অক্ষক্রীড়ায় ব্যবহার্য্য অস্থিখণ্ড-ত্রয় থলিয়াতে বদ্ধ করতঃ পুরোহিতের হস্তে সমর্পণ করিত। উহার প্রথম পাষ্টীতে "আম্‌রণি রাব্বি" (ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন) এবং দ্বিতীয়টীতে "নহানি রাব্বি" (ঈশ্বর নিষেধ করিলেন) এতদ্বাক্য অঙ্কিত থাকিত। অপরটী "মনিহ্" অর্থাৎ শূন্য থাকিত। বলিদানেচ্ছু ব্যক্তি উপরোক্ত থলিয়ার মধ্যে হস্তার্পণ করিয়া যে বাক্যাঙ্কিত পাষ্টী উত্তোলন করিত, পুরোহিত তাহাকে তদনুযায়ী উপদেশ প্রদান করিত। ধর্ম্ম-কর্ম্মাদি-নির্ব্বাহ কালে কাফেরেরা উহার অনুসরণ করিত।

যৎকালে প্রাচীন 'ইয়স্রব' (উৎপাত ও মৃত্যুক্ষেত্র) নগর এস্‌লামীয় নূরের পবিত্রতায় 'মদিনা' (বহুজাতির মিলন ভূমি) নামে দিগন্ত-বিশ্রুত হয়, সেই কালে হজরত মক্কা-তীর্থে হজ্জ পালনের জন্য প্রস্তুত হয়েন। তিনি ৬০০ শত শিষ্য-সমভিব্যাহারে জেল্‌কদা মাসে মদিনা হইতে প্রস্থান করেন। হাদিসে বর্ণিত আছে, তাঁহারা মদিনার ৬ মাইল দক্ষিণ 'জোলহোলায়ফা' নামক স্থানে প্রথমতঃ বিশেষ নিয়মে ব্রতধারী হয়েন; পরে মক্কাভিমুখে অগ্রসর হন। কোরেশেরা তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়া 'হোদ্‌বিয়ায়' তাঁহাদের গতিরোধ করে। তৎকালে হজরত মহা বিপজ্জালে বেষ্টিত হইয়া সন্ধি স্থাপন স্থির করিলেন। বহু বাদানুবাদের পর দশ বৎসরের মধ্যে কোরেশ ও মুসলমান কেহ কাহারও প্রতিকূলতাচরণ করিবে না এবং পরবর্ত্তী হজ্জের সময় কোরেশেরা হজরতকে সদলে তিন দিন মক্কায় বাস করিতে দিবে, এই সর্ত্তে উভয় পক্ষ সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হইল। ইহার ফলে মক্কা ভূমিতে উত্তরোত্তর সমুন্নতি-সম্পন্ন এস্‌-লামের বিমল কিরণ-জালে পৌত্তলিক-বৃন্দের বৃথা আত্মাভিমানিতা খর্ব্ব হইয়া পড়িল। যে সকল ব্যক্তি এতদিন স্বজাতির আতঙ্কে আপনাপন ধর্ম্মমত প্রকাশ করিতেন না, তাঁহারা স্বাধীন হৃদয়ে মক্কায় এস্‌লামের মহামহিমা ঘোষণার্থ ধর্ম্মোৎসাহে মাতিয়া উঠিলেন। এই সময় হজরত সশিষ্য কেশচ্ছেদন ও কোরবাণী করতঃ হজ্জব্রত ভঙ্গ করেন এবং হর্ষ ও বিষাদে মদিনার পথে প্রস্থিত হইলেন।

হজরতের হজ্জযাত্রা এবং হোদবিয়ায় সন্ধি।

হজরত পর বৎসর সন্ধির নিয়মানুযায়ী দুই সহস্র শিষ্য পরিবেষ্টিত হইয়া হজ্জপালনার্থ মক্কায় প্রবেশ করিলেন। তদ্দৃষ্টে কোরেশেরা অবক্র স্বভাবে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। তখন তাঁহারা নিরাপদে ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্পাদন করিতে লাগিলেন এবং তিন দিন পর মক্কা পরিত্যাগ করিলেন। ইহার কিয়ৎ-কাল পরে কোরেশেরা 'খজয়া' বংশীয় মুসলমানদিগকে নির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে সমগ্র মোস্‌লেম সম্প্রদায় প্রতিজিঘাংসায় অধীর হইয়া উঠিলেন। অনতিবিলম্বে হজরত দ্বাদশ সহস্র সৈন্যসহ সন্ধি ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে সমরাভিযান করিলেন। এমত সময়ে অকস্মাৎ পথিমধ্যে মহাবীর অলিদ-বেন্‌-খালেদ্‌ ভীষণ পরাক্রমে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিলেন কিন্তু কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর পরাস্ত হইয়া পলায়নপর হইলেন। বিজয়োন্মত্ত মোস্‌লেম সৈন্যের বীরদর্পে হেজ্জাজ প্রদেশ

এস্‌লামের প্রসার এবং কাবা ও হজ্জ।

কম্পান্বিত হইয়া পড়িল। নিদানে আবুসফিয়ান প্রভৃতি দলপতিগণ আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিল এবং হজরত অবলীলাক্রমে কাবা নিকেতনের ৩৬০টী প্রতিমূর্ত্তি বিচূর্ণ করিয়া ব্রহ্মোপাসনার প্রতিষ্ঠা করিলেন।

ক্রমান্বয়ে আরবের সকল গোষ্ঠিই এস্‌লামের আনুকূল্য-প্রার্থী হইল। কেবল দুর্দ্দান্ত 'হওজান' ও 'সাকিফ' বংশীয় বর্ব্বর নেতৃগণ এস্‌লামের মূলোৎসাদনমানসে উৎকণ্ঠিত রহিল। অল্পদিন মধ্যে দুরাত্মারা ৩০ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মুসলমানের প্রতিকূলে 'হোনায়ন' নামক স্থানে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। যথাকালে উভয়পক্ষে ভীষণ ভাবে যুদ্ধসংঘটিত হইল। সম্মুখযুদ্ধে মুসলমানেরা অপেক্ষাকৃত মন্দবীর্য্য হইয়া পড়িলেন। অবশেষে হজরতের অসাধারণ বীরত্বব্যঞ্জক উপদেশে মুহূর্ত্তমধ্যে সকলেই উন্মত্তবৎ হইয়া পড়িলেন। কাফেরবৃন্দের মস্তকোপরি তাঁহাদের শত্রু-শোণিতাপ্লুত অসি বিদ্যুদ্বিলসনের মত খেলিতে লাগিল। অবিলম্বে মোস্‌লেমগণ অলোক-সাধারণ আত্মত্যাগে, বিচিত্র কূট-যুদ্ধ-নিপুণতায় কাফের-প্রমথনে অমিত বীর্য্য-বত্তার পরিচয় দিলেন। পুরুষার্থ-বর্জ্জিত বধ্যমান শত্রুসৈন্য তায়েফ নগরে আশ্রয় গ্রহণ করতঃ আত্মরক্ষা করিল। তখন পর-বল-বিজয়ী মুসলমানগণ রণবাদ্য-নিনাদিত হোনায়ন হইতে বিপক্ষের চারি সহস্র উষ্ট্র, ছয় সহস্র অশ্ব ও চারি সহস্র রৌপ্যমুদ্রা হস্তগত করিয়া জের্ণিয়া ভূমিতে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। হজরত এইস্থান হইতে দ্বিতীয়বার 'ওমরা' পালনে মক্কায় প্রবিষ্ট হন এবং প্রত্যাগমনকালে তায়েফ অবরোধ করেন। কিয়দ্দিন অবরোধের পর তত্রত্য বিপক্ষগণ তাঁহার নিকট এসলামের পবিত্র 'কলেমা' (আদিবীজ) উচ্চারণ করিল; তিনিও সগৌরবে মদিনায় প্রত্যাগত হইলেন।

তৎপর দশম হিজরির জেলহজ্জ মাসে হজরত তীর্থ গমনোদ্দেশে শিষ্য মণ্ডলীকে পুনরাহ্বান করেন। এই সময় মদিনার আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই হজ্জের জন্য আগ্রহান্বিত হন। তাহাতে হজরত বিকৃতমস্তিষ্ক অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, ক্রীতদাস, দরিদ্র ও চলচ্ছক্তিবিহীন ব্যক্তি এবং সধবার তীর্থযাত্রায় প্রতিকূল মত প্রকাশ করেন এবং বলেন, যে ব্যক্তি ক্ষমতা সত্ত্বে হজ্জপালনে সংকুচিত, তাহার মৃত্যুতে ও ইহুদীর মৃত্যুতে প্রভেদ নাই। সুধার্ম্মিক এব্‌নওমর বলিয়াছেন, হজরত জিজ্ঞাসিত হয়েন, "হাজ্জিলোক কিরূপ?" তিনি বলিলেন, "দীনবেশধারী"। পুনর্ব্বার একব্যক্তি প্রশ্ন করেন, "হজ্জব্রতে কোন্ ক্রিয়া

উত্তম ?” তদুত্তরে বলেন, “তলবিয়া পাঠ ও কোরবাণী”। হৎপরে ব্যক্তি হজ্জযাত্রার উপায় জ্ঞাত হইতে চাহিলে তিনি উপযুক্ত পাথেয় ও বাহনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। হজরত সকলকে হজ্জ সম্বন্ধীয় এবংবিধ বিবিধ নীতি শিক্ষা দিয়া সদলে তীর্থগামী হইলেন।

সোল্‌তানোল্‌মোক্‌সেরিন এব্‌ন আব্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত, হজরত হজ্জ-ব্রতার্থী মদিনাবাসীদের জন্য জোল্‌হোলায়ফা, সিরিয়ার জোহফাপল্লী, নজ্দের করনোল্‌মনাজল্‌, এরাকের জাতে আর্ক্‌ ও এয়মনের ইয়লম্‌লম্‌ মিকাত বা এহ্‌রাম-ক্ষেত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করেন। তজ্জন্য হজরত জোল্‌হোলায়ফা মিকাতে সমাগত হইয়া সত্বরতা সহকারে এহ্‌রাম বন্ধনের উদ্যোগ করেন। প্রথমতঃ সকলেই আবশ্যকতানুযায়ী ক্ষৌরকার্য্য সম্পাদনন্তর স্নান করেন; পরে সূচীকর্ম্মবিহীন পরিধেয় ও উত্তরীয় গ্রহণ করেন। হজরতের নির্দ্দেশবশতঃ উত্তরীয় বস্ত্রখানি সকলকার দক্ষিণ কক্ষতল হইতে বামস্কন্ধের উপর স্থাপিত হয়। সেই সময় সুগন্ধিমিশ্রিত হরিতবসন তাঁহার পরিহিত ছিল এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ নানাবর্ণের পরিচ্ছদে সজ্জীকৃত ছিলেন। ইহার পর সকলে নমাজ পড়িয়া এহ্‌রাম-বদ্ধ হন অর্থাৎ অন্তঃশৌচ ও বহিঃশৌচ সাধনপূর্ব্বক হজ্জের বহির্গত কর্ম্মণ্যতাকে অবৈধ জ্ঞান করিয়া তৎসংক্রান্ত মন্ত্র আবৃত্তি করিলেন। হজরত তদবস্থায় সকলকে অপবিত্রতা, বৈরিতা, বৈধপ্রাণিবধ ও কেশ কর্ত্তনাদি হইতে বিরত থাকিতে বলেন এবং কাবাদর্শনে, প্রত্যূষে, প্রত্যেক নমাজান্তে, কোন উচ্চস্থানে আরোহণ ও অবতরণ কালে এবং বিভিন্ন যাত্রিমণ্ডলীকে দর্শন সময়ে ‘তল্‌বিয়া’, (ঈশ্বরের আনুগত্যসূচক প্রবচন) পাঠ করিতে উপদেশ দেন। পরে তাঁহারা হেরেমের পথে পাদক্ষেপ করিলেন।

এহ্‌রাম ও তলবিয়া।

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এব্রাহিমনবী কাবামন্দিরে “হাজারে আসোয়াদ” সংস্থাপন করিলে যতদূর তাহার আলোক সঞ্চারিত হইয়াছিল, ততদূর হেরেমের সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়। মক্কা বিজয়ের পর হজরত ও হেরেমের সীমা নিরূপক কতিপয় পতাকা প্রতিষ্ঠিত করেন।

কাবাদর্শন।

জেলহজ্জ মাসের পঞ্চম বা ষষ্ঠ দিবসে হজরত ‘জিতওয়া’ অতিক্রম করিয়া তন্মধ্যে উপস্থিত হন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে কাবাসন্দর্শনে ভক্তি গদগদকণ্ঠে ঈশ্বরের গুণানুবাদ করেন; পরে “হাজারে আসোয়াদ”কে হস্ত সংস্পর্শ সহকারে চুম্বন করতঃ চারিবার পদাতি সৈন্যের গতিতে ও তিনবার মৃদুভাবে মন্দির বেড়িয়া

পরিভ্রমণ করেন। প্রত্যেক বারেই "হাজারে আসোয়াদ" চুম্বিত হইয়াছিল। তৎপরে তিনি "মোকাম এব্রাহিম" ও কাবার মধ্যভূমিতে উপাসনা করিয়া পুনশ্চ "হাজারে আসোয়াদ" চুম্বন করেন এবং তথা হইতে 'সফা' ও 'মরওয়ার' দিকে ধাবিত হন।

সফা ও মরওয়া।

'সফা' ও 'মরওয়া' দুইটী পর্ব্বত। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, আদি পিতা আদম (সফিঃ) ও তৎপত্নী হওয়াদেবী উক্ত শৈলযুগলে উপবেশন করিয়াছিলেন। তজ্জন্য সফা (সফিঃ) ও মরওয়া (স্ত্রী) নামে পরিচিত হইয়াছে। নির্ব্বাসিতা হাজ্জের বিবি জলান্বেষণার্থ চলচিত্তে উক্ত পর্ব্বতদ্বয়ে পুনঃ পুনঃ আরোহণ ও অবতরণ করিয়াছিলেন। আমাদের হজরত তদনুরূপ সাতবার ধাবিত হইয়া সেই সুপ্তস্মৃতি চিরকালের জন্য জাগাইয়া দেন। তিনি প্রথমে সফা শিখরোপরি কাবাভিমুখে দণ্ডায়মান হইয়া স্তব করেন; এবং নিম্ন জল-সঞ্চরণ-ক্ষেত্রে অবতরণ পূর্ব্বক দ্রুতগতি মরওয়া শৈলে আরূঢ় হইয়া তদ্রূপ করেন। পরে মক্কা প্রবেশ পূর্ব্বক 'ওমরা'ব্রত পূর্ণ করিলেন।

'মিনায়' গমন।

তৎকালে হজরত দৈবোপদেশক্রমে সহচরদিগের মধ্যে যাঁহারা কোরবাণীর পশু আনয়ন করেন নাই, তাঁহাদিগকে হজ্জব্রত ভঙ্গ করিতে আদেশ করিলেন। অগত্যা অভাব-গ্রস্ত ব্যক্তিগণ মস্তক মুণ্ডন করিয়া স্খলিত-ব্রত হইলেন এবং হজরত সকলকে হজ্জের কর্ত্তব্য কর্ম্ম শিক্ষা দিলেন। পরে জেলহজ্জের অষ্টম দিবসে মিনায় গমন করিয়া যথারীতি উষ্ট্র সমূহকে জলপান করাইয়া লয়েন। সেই জন্য 'মিনায়' অবস্থানের দিন "ইয়াওমৎ-তর্ব্বিয়া" (উষ্ট্রদলের জলপানের দিন) নামে বিঘোষিত। তথায় তাঁহারা হজ্জের জন্য বিশেষ নিয়মে ব্রত অবলম্বন করিয়া পরদিন প্রভাতে 'আরফাত' প্রান্তরে সমাগত হয়েন।

আরাফায় দণ্ডায়মান হওয়া।

'আরফা' শব্দের অর্থ পরিচিত হওয়া বা জ্ঞানলাভ করা। এই স্থানে স্বর্গচ্যুত আদি দম্পতী পরস্পর পরিচিত হয়েন। অপিচ ধর্ম্মবীর এব্রাহিম (আঃ) জেব্রীল কর্ত্তৃক এস্থানে হজ্জব্রতাদির জ্ঞানলাভ করেন। যাত্রিগণ এই স্থানে দণ্ডায়মান হইলেই হাজ্জি আখ্যায় ভূষিত হয়েন। হজরত আরফাতের 'হব্‌লোল মশাত' নামক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে অবিরাম 'তলবিয়া' পাঠ করিতে বলিলেন। পরে অপরাহ্নের যাম্ পরিমিত সময়ে 'নমেরার' কেশপুঞ্জে

নির্ম্মিত পটবাসে জন সমূহকে ধর্ম্মোপদেশ দান করেন এবং সন্ধ্যা সমাগমে মজ্‌দালেফা ক্ষেত্রে প্রস্থান করেন।

'মজদালেফা' এই শব্দ 'মজ্রমা' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'মজ্রমা' শব্দের অর্থ মিলিত হওয়া। আদি দম্পতী এস্থানে প্রথমে সম্মিলিত হয়েন বলিয়া এস্থানকে 'মজ্রদালেফা' বলে। হজরত তথায় নিশাযাপন করিয়া ঊষাকালে 'মশারোল হারামে' উপাসনায় মগ্ন হয়েন। পরে সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে তিনি পুরাকালীন মক্কাক্রমণকারী আবরাহার ধ্বংসস্থান মোহাস্‌সের জলাভূমির পার্শ্বপথে ত্বরিতগমনে 'জ্বাম্‌রা তোল্‌ আক্‌বায়' উপনীত হইলেন। এই স্থানে তিনি সাতবার "ঈশ্বর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ" বাক্যোচ্চারণ পূর্ব্বক সাতটী ক্ষুদ্র উপলখণ্ড নিক্ষেপ করিলেন এবং উষ্ট্র বলিদান ভূমি 'মিনায়' প্রত্যাগত হইলেন।

মজ্রদালেফায় নিশাবাস।

মহাত্মা এব্রাহিম (আং) স্বীয় পুত্রকে কোরবাণী করিতে উদ্যত হইলে শয়তান তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে। তজ্জন্য শয়তান তৎকর্ত্তৃক প্রস্তর খণ্ড দ্বারা প্রস্তুত হয়। হজরত তাঁহার অনুকরণ করতঃ জ্বাম্‌রা তোল্‌-কোব্‌রা, মধ্য জ্বাম্‌রা ও জ্বাম্‌রাতোল-আক্‌বায় প্রস্তর নিক্ষেপ করেন এবং 'মিনায়' কোরবাণী করেন। তিনি "মিনায়" পূর্ব্বানুরূপ উপদেশ প্রদানান্তর স্বহস্তে ৬৩টী উষ্ট্র কোরবাণী করিলেন এবং অবশিষ্ট মহাত্মা মোর্ত্তজাকে কোরবাণী করিতে বলিলেন। ঈশ্বর-নিষ্ঠ জ্বাবের বলিয়াছেন, হজরত কোরবাণীর দিনের পরাহ্নে এবং অন্যান্য দিন প্রদোষ সময়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

কোরবানী এবং কঙ্কর-নিক্ষেপণ।

তদনন্তর হজরত কাবা ভূমে পুনরাগত হইয়া জমজমের জলপান করেন এবং পূর্ব্বের মত প্রদক্ষিণাদি করিয়া হজ্জ সমাপ্ত করেন। এই হজ্জে তিনি আপনার সুযোগ্য ধর্ম্ম মণ্ডলীকে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় হৃদয়োন্মাদক বিধি ব্যবস্থা শিক্ষা দিয়া তাঁহার আসন্ন মৃত্যুর কথা প্রকাশ পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করেন। তজ্জন্য ধর্ম্মেতিহাসে ইহা "হজ্জতোল্‌বেদা" অর্থাৎ "বিদায়ের হজ্জ" বলিয়া বর্ণিত। ক্রমশঃ।

মক্কা প্রত্যাবর্ত্তন।

সেখ আহামদ সোবাহান।

সমালোচনা।

আত্মবিজ্ঞান।—শ্রীযুক্ত বাবু তারকচন্দ্র দাস গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত। তারক বাবুর এই আত্মবিজ্ঞান-নামধেয় পুস্তক যুক্তিপরিষ্কৃত বেদান্তসিদ্ধান্ত অবলম্বনে লিখিত। বেদান্তই ইহার মুখ্য অবলম্বন, স্থানবিশেষে সাংখ্যের ও পাতঞ্জলের সহায়তা গৃহীত হইয়াছে। অপিচ, কৃতসিদ্ধান্ত বিষয় গুলি বিদ্যমান কালের দ্বীপান্তরীয় দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মতের ও প্রমাণাদির দ্বারা পরিপুষ্ট হওয়ায় এই গ্রন্থকে সর্ব্বমনোরম বলিবার যোগ্য। ভাষা সংকলন, পরিভাষা নির্ণয়, সে সকলের যথাযোগ্য প্রয়োগ, এ সকল বিষয়েও তারকবাবুর বিশেষ নৈপুণ্য দেখা যায়। যে সকল গুণ থাকিলে পুস্তক প্রশংসাযোগ্য হয়, তারকবাবুর এই আত্মবিজ্ঞান পুস্তকে সে সকল গুণও প্রচুর পরিমাণে আছে।

প্রাচীন বৈদান্তিকেরা ও অন্যান্য প্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিতেরা আত্মার স্বরূপ ও স্বভাবাদি সম্বন্ধে যে সকল তথ্য নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, তারক বাবুর এই আত্মবিজ্ঞান পুস্তকের প্রথম বিভাগে সে সমস্তই অতি সুন্দর রূপে সংকলিত হইতে দেখা যায়। নানাবিধ যুক্তি তর্ক ও প্রমাণ সহকারে দেখান হইয়াছে যে, আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ, এ সকলের অতিরিক্ত ও অনাগন্তুক পদার্থ। অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বপ্রকাশ ও নিত্যসিদ্ধ বস্তু।

জীব মাত্রেরই সামান্যতঃ আত্মজ্ঞান আছে সত্য; পরন্তু সে আত্মজ্ঞানের দ্বারা তাহাদের মাত্র দেহযাত্রা নির্ব্বাহিত হয়, সুখস্পৃহা চরিতার্থের সম্পূর্ণতা সিদ্ধ হয় না। সেই জন্য অর্থাৎ দুঃখশান্তির জন্য অথবা সুখাভিব্যক্তির বাধা বিনাশের জন্য, অথবা সুখস্পৃহা চরিতার্থের পূর্ণতাকরণ জন্য, আত্মবিষয়ক বিশেষ জ্ঞান অর্জ্জনের আবশ্যকতা আছে, ইহা তিনি এই পুস্তকের অন্যান্য বিভাগে উত্তমরূপ বুঝাইয়া দিয়াছেন। ব্যাধিজ্ঞান সামান্যতঃ উৎপন্ন হইলেও তদ্দ্বারা ব্যাধি দুঃখ নিবারণের উপায় অবধারণ করা যায় না। তাহা বা সে ব্যাপার বিশেষ জ্ঞান সাপেক্ষ। এইরূপ সদা অনুভূয়মান সামান্যতঃ আত্মজ্ঞান দ্বারা যে আত্মার সুখব্যাপিত্ব আবৃত হইয়া রহিয়াছে সে আবরণ বিনা বিশেষ জ্ঞানে বিনিবৃত্ত হয় না। এই সর্ব্ববাদিসম্মত রহস্যটুকু তারকবাবুর দ্বারা বিবৃত হওয়ায় তারকবাবুর আত্মবিজ্ঞান পুস্তক খানি আত্মজিজ্ঞাসু ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট আদরণীয় হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অঙ্কুর।

বীজাদঙ্কুরনিষ্পত্তিরঙ্কুরাদ্বৃক্ষসম্ভবঃ।
ফলপ্রদোভবেদ্বৃক্ষইত্থমাশাক্রমোমতঃ॥

২য় বর্ষ।] জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪। [৫ম সংখ্যা।

শিল্প।

ইতিহাস লেখকগণের মতে, যাঁহারা মধ্য এসিয়ার আমুদরিয়া, শিরদরিয়া, বলগা প্রভৃতি নদী-তীর হইতে আসিয়া কোল, দ্রাবিড়, তুরাণীয় প্রভৃতি অনার্য্যদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আর্য্য নামে অভিহিত। পরাজিত অনার্য্যগণ তাঁহাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়া আর্য্য-সংসর্গে ক্রমশঃ সভ্য হইতে থাকিলে এবং গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে আর্য্যদিগের বর্ণ ক্রমে মলিন হইতে দেখা দিলে, উভয় শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য ক্রমশঃ লোপ পাইতে লাগিল। আর্য্যগণ পার্থক্য দেখাইবার নিমিত্ত উপবীত গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হন, এবং অনার্য্যদিগকে শূদ্র নাম দিয়া, তাঁহাদের সেবা করিতে আদেশ দিলেন। যাঁহারা ধাতুর ব্যবহার, মৃণ্ময় পাত্রাদি নির্ম্মাণ ও বস্ত্রাদি-বয়ন-কার্য্য, কাষ্ঠ-দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ ও চিত্র প্রভৃতি শিল্পকার্য্য জানিতেন, তাঁহারাই আর্য্য অর্থাৎ সভ্য, অন্যথা শূদ্র।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডোক্ত দশম অধ্যায়ে জানা যায় যে ;—

বিশ্বকর্ম্মাচ শূদ্রায়াং বীর্য্যাধানং চকার সঃ।
ততো বভুবুঃ পুত্রাশ্চ নবৈতে শিল্পকারিণঃ॥
মালাকারঃ কর্ম্মকারঃ শঙ্খকারঃ কুবিন্দকঃ।
কুম্ভকারঃ কংসকারঃ ষড়েতে শিল্পিণাং বরাঃ॥
সূত্রধারশ্চিত্রকরঃ স্বর্ণকারস্তথৈব চ।
পতিতাস্তে ব্রহ্মশাপাদযাজ্যা বর্ণসঙ্করাঃ॥

অর্থাৎ—বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে শূদ্রার গর্ভে মালাকার, কর্ম্মকার, শাঁখারী, তাঁতি, কুম্ভকার ও কাঁসারী এই ছয়টী প্রধান শিল্পী এবং স্বর্ণকার, সূত্রধর, চিত্রকর এই তিনটী পতিত শিল্পিপুত্রের জন্ম হয়।

অনেকে হয়ত, স্বর্ণকার, চিত্রকর ও সূত্রধারের কার্য্যকে নিন্দনীয় মনে করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, উক্ত পুরাণে লিখিত স্বর্ণকার, চিত্রকর ও সূত্রধর এই তিনটী পতিত জাতিকে, বঙ্গের কৌলিন্য প্রথা প্রচলনকারী, যথেচ্ছাচারী, বৈশ্যবংশধ্বংসকারী দ্বিতীয় পরশুরাম, রাজা বল্লালসেন আবার পতিত করিলেন কি প্রকারে। পুরাণগুলি কি বল্লাল সেনের পরে লিখিত ?

শিল্পের উন্নতি ও অবনতির কারণ।

দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে পক্ষিগণ যে প্রকার বাসা নির্ম্মাণ করিত, শৃগাল প্রভৃতি জন্তুগণ যে প্রকার গর্ত্ত খনন করিয়া বাস করিত, এখনও ঠিক তদ্রূপ করিতেছে, তাহাদের কোন প্রকার অবনতি হয় নাই, কিন্তু ভারতবর্ষীয় শিল্পিগণ প্রাচীন অবস্থাতেও শিল্পকার্য্য রাখিতে পারে নাই, বরং কত নিম্নে যে পড়িয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। হায়! আজ আমরা পশুপক্ষীদিগেরও অধম! শিল্পের অবনতির প্রধান কারণ—শিল্পিজাতিদিগকে ঘৃণা করা, সহানুভূতি ও উৎসাহের অভাব; ইহা বই আর কিছুই নহে। দ্রব্যাদি যেমন মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার না করিলে মরচা পড়িয়া অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে, পুনঃ পরিষ্কার করিলে পূর্ব্বাপেক্ষাও পরিষ্কৃত হইতে পারে, তদ্রূপ আমরা যদি মস্তিষ্ক পর্য্যালোচনা করিয়া একটী জিনিষ ভাঙ্গি আর গড়ি—আমরাও পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি লাভ করিতে পারিব। শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্য কেবল নিম্ন শ্রেণীর লোকের হাতে দিলে চলিবে না, সকলেরই হাতে লওয়া উচিত। আমরা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছি যে, উৎসাহ ও সহানুভূতির জন্যই এখানকার বহরমপুরী সিল্ক, মীর্জাপুর ও শিবগঞ্জের রেশমী কাপড়, খাগড়াই বাসন প্রভৃতি ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিতেছে। ঘৃণার জন্যও যে অনেক শিল্পিসন্তান শিল্পকার্য্য ত্যাগ করিয়াছে,তাহা বলা বাহুল্য।

কেবল ভারত-সন্তানদিগকে নহে, পৃথিবীর সভ্যজাতিগণকেও একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, সর্ব্বোচ্চস্থানীয় শিল্পপ্রধান ভারত এখন সর্ব্ব নিম্নস্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারতীয় শিল্প দ্রব্যাদি পৃথিবীর সর্ব্বত্রই রপ্তানি হইত এমন এক দিন গিয়াছে, সে দিনের বিষয় মনে করিলে আজ তাহা স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত লালা লাজপৎ রায়, দাদাভাই নৌরজী, সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখেল, বালগঙ্গাধর তিলক, ফেরোজ সা মেটা, অশ্বিনীকুমার দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ভারতের বর্ত্তমান মহাত্মাগণের প্রাণপণ চেষ্টায় পুনঃ ভারতীয় শিল্পকার্য্য উন্নতিপথে ধাবিত হইতেছে। আধুনিক শিল্পজাত দ্রব্যাদি বাহ্য চাকচিক্যময় না হইলেও যে অধিক দিন স্থায়ী, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। তবে যাঁহারা এখনও বিদেশী শিল্পজাত বস্তু ক্রয় করিতেছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি,—আপনার পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া, অন্যের অপেক্ষাকৃত সুশ্রী ছেলেকে বেশী ভালবাসিবেন কি? উত্তরে বলিবেন—কখনই না। তবে বিদেশী জিনিষ ব্যবহার করিতেছেন কেন?

পরম মঙ্গলময় জগদীশ্বরের কৃপায়, আজ তেত্রিশ কোটী ভারত-সন্তান শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষি কার্য্যের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়াই, দাসত্ব শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য শিল্পাদি কার্য্যে বদ্ধপরিকর হইয়াছে। উক্ত নয়টী শিল্পীকেই যে শিল্পকার্য্য করিতে হইবে এমন নহে, সকলেরই করা উচিত। জাপান আছে তাই হিন্দু-গৌরব এখনও শীর্ষস্থানীয় করিয়া রাখিয়াছে, নতুবা হিন্দুর গৌরব একেবারেই নির্ম্মূল হইত। পৃথিবীর সভ্যজাতিগণ যেমন আপন আপন জাতীয় গৌরব পৃথিবীকে দান করিতেছে, হে ভারত সন্তানগণ! তোমরাও সেই প্রকার এমন জাতীয় গৌরব দান কর, যাহা তোমাদের নিজের, অন্যের উচ্ছিষ্ট নহে। করুণাময় জগদীশ্বর—পাঁচ সাত টাকার জন্য দাসখৎ লিখিয়া দিয়া, পিঞ্জরাবদ্ধ পশুপক্ষীর ন্যায় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য—যদি তোমাদিগকেই পাঠাইয়া থাকেন,—তবেই তোমরা শিল্পাদি স্বাধীন ব্যবসায় করিও না—তবেই সুযোগ্য মাননীয় মহাত্মাদিগের নিয়মে চালিত হইয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিও না—তবেই দেশের হিতের জন্য জীবনোৎসর্গ করিও না।

শুধু শিল্পকার্য্য নয়, যে কোন ব্যবসায় হউক না কেন, সাধুতা ও পরিশ্রম ব্যতীত কিছুতেই তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় না। সাধুতা ও পরিশ্রমই উন্নতির মূল। আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদন করা উচিত; কর্ত্তব্যপালনে রাজা, মহারাজা, উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্র সকলই সমান। নিজের অবস্থা, বিদ্যা, বুদ্ধি ও সামর্থ্যানুসারে কার্য্য না করিলে ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। যে কোন. কার্য্য হউক না কেন, সুখ্যাতি লাভের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

অশিক্ষিত ও নির্ব্বোধ লোকদিগকে শিল্পাদির উপকারিতা বুঝান অত্যন্ত কঠিন, একথা অনেকেই বলিয়া থাকেন। ইহা অনেকটা সত্যও বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—দোষ কাহার? শিক্ষিত না অশিক্ষিত লোকের? ঐ দেখুন—রাখাল বালকদিগের পেটে ভাত নাই, পরিবার কাপড় নাই, তথাপি তাহারা সিগারেটের ধোঁয়ায় ইতস্ততঃ আমোদিত করিয়া, গরু, ভেড়া, ছাগলাদি চরাইতেছে—ম্যাথরেরা চুলের ছোট বড় নানাপ্রকার ঢেউ তুলিয়া, বাবু সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, চুরুট টানিতে টানিতে পায়খানার কার্য্য করিতেছে—পরিবার কাপড় নাই, আহারাদির সংস্থান নাই, তবুও গায়ে কোট দিয়া, সিগারেট টানিতে টানিতে কৃষকেরা ভূমি কর্ষণ করিতেছে, মজুর খাটিতেছে, কুলির কার্য্য করিতেছে—ইত্যাদি—ইত্যাদি। কীট, পতঙ্গাদি যেমন অগ্নিকে আনন্দ জানাইতে গিয়া প্রাণ হারায়, অস্মদ্দেশীয় নিম্নশ্রেণীর লোকগণও, তদ্রূপ, সভ্যতা দেখাইতে গিয়া, অন্নাভাবে কষ্ট পায়। এখন আবার জিজ্ঞাসা করি, দোষ কাহার? অনুকরণ প্রিয় অশিক্ষিত লোকের, না শিক্ষিত লোকের? আমি এখানে একটী উদাহরণ না দিয়া থাকিতে পারিলাম না; "একদা কোন এক ধার্ম্মিক দরজি জামা ও টুপি বিক্রয় করিবার জন্য হাটে যাইতে ছিল। নামাজের সময় হওয়ায় সে জামা ও টুপির বস্তাটী একটী বৃক্ষতলে রাখিয়া, পুকুরের ধারে নামাজ পড়িবার জন্য তথায় যাইলে, বৃক্ষস্থিত অনুকরণ প্রিয় বানর-দল বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া দরজির ন্যায় প্রত্যেকে জামা ও টুপি পরিধান পূর্ব্বক বৃক্ষে আরোহণ করিল। দরজি কোন উপায় না দেখিয়া, নিজের পরিহিত জামা ও টুপি ফেলিতে আরম্ভ করিলে বানরগণও তদ্রূপ করিল। সুতরাং দরজিকে আর কোন কষ্ট পাইতে হইল না।" শিক্ষিত মহোদয়গণ, আপনারা দরজির মত, যদি একেবারে বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন করিতে পারেন—তবেই দেখিবেন, আদর্শপ্রিয় লোকগণও তদ্রূপ করিবে। হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায়, নানাপ্রকার সদুপদেশে বা তর্কে অশিক্ষিত লোকের চৈতন্য হওয়া সুকঠিন।

অনেকে আবার বলিয়া থাকেন, স্বদেশী আন্দোলনের জন্য শিল্পের কি উন্নতি হইল? ভারতীয় শিল্পিগণ অন্নাভাবে ক্রন্দন করিতেছিল, স্বদেশী আন্দোলনের ফলে হাস্য করিতেছে, দুর্ব্বলেরা বল পাইতেছে, অন্ধেরা চক্ষু পাইতেছে, ভারত উন্নতি পথে ধাবিত হইয়াছে। বোম্বাই প্রদেশে ১৪৬টী, মান্দ্রাজে ১১টী, বঙ্গে ১০টী, মধ্য প্রদেশে ৭টী, পঁচিচেরিতে ৫টী, পঞ্জাবে ৬টী,

অযোধ্যায় ৪টী, নিজামরাজ্যে ৩টী, মধ্যভারতে ২টী, মহীশূরে ২টী, রাজপুতানায় ২টী, বেরার প্রদেশে ১টী, ত্রিবাঙ্কুরে ১টী, লঙ্কাদ্বীপে ১টী কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, স্বদেশী আন্দোলনের ফলেই ভারতে দুইশতেরও অধিক কাপড়ের কল, অগণ্য তাঁত, দেয়াশলায়ের কল কারখানা, নানা প্রকার জিনিসের কল কারখানা হইয়াছে। রেশম ও পশমজাত দ্রব্যাদিরও পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছে।

সামান্য বেতনে দাসত্ব স্বীকার অপেক্ষা মোটামুট শিল্পকার্য্যে স্বাধীনভাবে কালাতিপাত করা শ্রেষ্ঠ বলিয়া, নিম্নে কতিপয় সাধারণ শিল্প প্রণালীর উল্লেখ করা গেল।

১। দর্পণ বা আর্সি। মসৃণ কাচোপরি রাং পাত রাখিয়া, বুরুষ দ্বারা সমান করিবার পর, ভাল পারদ চারিদিকে দিয়া তাহার উপর এক খণ্ড পরিষ্কৃত কাচ বসাইয়া সমভাবে চাপ দিবে, পরে তদুপরি কাগজ বসাইয়া ফ্রেম আঁটিয়া দিবে।

২। আবির বা ফাগ। গোলেলা বা লাল ম্যাজেণ্টা ২ কাঁচ্চা ও আরারুট জল আড়াই সের একত্র করিয়া শুকাইয়া লইতে হয়।

৩। অরেঞ্জ সিরাপ। টিঞ্চার অরেঞ্জ ১ কাঁচ্চা ও চিনির রস আধ পোয়া মিশাইতে হয়।

৪। অদৃশ্য কালি। সমভাগ নিশাদল ও তুঁতে কিংবা জলে সোরা ও লবণ গুলিয়া লিখিলে দেখা যায় না, অগ্নিতাপে দেখা যায়।

৫। অডিকলোন। অয়েল বার্গামট ৪ ড্রাম, লিমন অয়েল ও ইংলিশ ল্যাভেণ্ডার অয়েল দুই দুই ড্রাম; রোজমেরী ও অরেঞ্জ অয়েল এক এক ড্রাম; রেক্টিফায়েড স্পিরিট ১ পাউণ্ড, নিরোলী ২০ ফোঁটা একত্রে মিশ্রিত করিতে হয়।

৬। লোম নাশক। বেরি সাল্‌ফায়েড ১ ভাগ, এরারুট ৪ ভাগ, জল দিয়া কাদার মত হইলে, ৫।৭ মিনিট লোমযুক্ত স্থানে লাগাইয়া পরে ধুইয়া ফেলিবে।

৭। ইংলিশ কারি-পাউডার। ধনিয়া ও লবণ দুই দুই পাউণ্ড; মরিচ ২৬ আউন্স; তেজপাতা, লঙ্কা, জৈত্রী, সাজীরা, হরিদ্রা, সাদারী বীজ ও আদা এক এক আউন্স; সরিষা ৪ আঃ এবং লবঙ্গ ১০ আউন্স উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া একমাস কাল আবৃত পাত্রে রাখিতে হয়।

৮। ঘড়ির তৈল। শিশির তলদেশ ঢাকা পড়ে এরূপে শিশার গুঁড়া দিয়া, একটী শিশিতে উৎকৃষ্ট অলিভ অয়েল রাখিয়া ছিপি বন্ধ করিয়া একুশ দিন রৌদ্রে রাখিলে শিশির তলায় যে সার পড়ে, সাবধানে তাহা বাদ দিয়া উপরের তৈল ব্লটীং কাগজে ছাঁকিয়া লইতে হয়।

৯। গোলাপী আতর। টাটকা সুগন্ধি গোলাপ ফুল একটী জলপূর্ণ ছোট কাচপাত্রে করিয়া রৌদ্রে রাখিলে যখন খুব ফেণা উঠে, তখন সেই ফেণাগুলি একত্রিত করিয়া উহার ৩।৪ গুণ চন্দনের সহিত মর্দ্দন করিয়া লইতে হয়।

১০। কাচ। পরিষ্কার সাদা বালি, সাজিমাটী, কলা গাছের ক্ষার ও সোরা একত্রে অগ্নিতাপে গলাইয়া একটু মেটে সিন্দুর ও সামান্য হরিতাল দিয়া নামাইতে হয়।

১১। কপিং কাগজ। ব্ল্যাকলেড পাউডার জলে মিশাইয়া ঐ জল এক খণ্ড কাপড়ে মাখাইয়া সাদা কাগজে লাগাইলে যে কপিং কাগজ প্রস্তুত হয়, উহা কাগজের নিচে দিয়া লিখিলে ৩।৪ খানা কাগজে একবারে লেখা যায়।

১২। কার্ব্বলিক সাবান। এক ভাগ কার্ব্বলিক এসিডের সহিত বার ভাগ সাদা সাবান মিশাইতে হয়।

১৩। কালীর দাগ উঠান। সোডা, নিশাদল ও সোহাগা একত্রে পেষণ করিয়া লাগাইলে অক্ষর উঠিয়া যায়।

১৪। গামছার রং। হীরাকষের জলে একটু চুণ মিশাইয়া গামছা ভিজাইলে চাঁপা ফুলের মত রং হয়।

১৫। বিস্কুট। একপোয়া এরারুট, এক ছটাক চিনি, এক ছটাক মাখন ভিনিগারে মাখিয়া ছোট ছোট নেচী পাকাইয়া ভাজিতে হয়।

১৬। উইণ্ডসার সোপ। অলিভ্ অয়েল্ একভাগ, চর্ব্বি ৯ ভাগ কিছু সোডার সহিত মিশাইয়া পরে কিঞ্চিৎ আম্বার গ্রিস্ দিয়া রং করিয়া অয়েল সিনেমন, অয়েল ল্যাভেণ্ডার ও অয়েল বার্গামট সামান্য পরিমাণে মিশাইলে সাবান প্রস্তুত হয়।

১৭। এসেন্স হোয়াইট্ রোজ। ভায়লেট ও রোজ স্পিরিট দুই দুই আউন্স; জেস্মিন্, ও মৃগনাভি স্পিরিট এক এক আউন্স একত্রে মিশাইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে টিঞ্চার গ্রাস দিয়া রং করিয়া লইতে হয়।

১৮। গিল্টি। একুশ আউন্স নাইট্রিক এসিডের সহিত জল ১৪

আউন্স ও স্বর্ণ ৫ আউন্স একত্রিত করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে ৪ গ্যালন জল ও ২০ আউন্স বাইকার্ব্বনেট সোডা দিয়া দুই ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া ইহাতে যাহা ডুবাইবে তাহাই গিল্টি হইবে।

১৯। কাঠ জুড়িবার উপায়। আরবী গঁদ কিংবা ধুনা ৪ ভাগ, মোম ১ ভাগ ও বিলাতী মাটী ২ ভাগ মিশাইয়া ফুটাইয়া লইতে হয়।

২০। জর্ম্মণ সিল্‌ভার। তামা ৫০ ভাগ, দস্তা ২৪ ভাগ, নিকেল ২৭ ভাগ একত্রে গলাইলে সিল্‌ভার প্রস্তুত হয়।

২১। পিতল ও কাঁসা। তামা ২ ভাগ ও দস্তা ১ ভাগ মিশাইলে পিতল এবং তামা ৩ ভাগ ও রঙ্গ ১ ভাগ মিশাইলে কাঁসা প্রস্তুত হয়।

২২। ব্লু-ব্ল্যাক কালি। প্রথমে মাজুফল ও হরিতকী তিন তিম পোয়া এবং টহরী একপোয়া চূর্ণ করিয়া পাঁচসের জলে দিন ছয় ভিজাইয়া পরে লৌহ কড়াতে কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিয়া তাহাতে ½ পোয়া হীরাকস ও ২ কাঁচ্চা খদির মিশাইয়া বেশ কাল রং হইলে নামাইয়া ছাঁকিয়া ১০।১২ দিন সেই ভাবে রাখিবে। পুনঃ ছাঁকিয়া ১ কাঁচ্চা নীল রং ও ২ গ্রেণ পীত ম্যাজেণ্টা মিশাইবে।

২৩। রেশমী ও পশমী দ্রব্যে তেল-দাগ। তার্পিণ তেল, ন্যাপথা কিংবা ডিমের কুসুমের সহিত সাবান মিশাইয়া জল দিয়া ধুইলে তেল উঠে।

২৪। ফুলল তেল। যে কোন টাট্‌কা সুগন্ধি ফুল কোন একটী সমতল ও প্রশস্ত তলা বিশিষ্ট পাত্রে একস্তর সাজাইয়া তদুপরি তিল ছড়াইয়া দিবে। এইরূপ থাক ছয় সাজান হইলে, পাত্রমুখ আবৃত করিয়া ২৪ ঘণ্টা রাখিয়া, পরে চাপা দিয়া তেল বাহির করিবে, যেন ফুলগুলি রগ্‌ড়াইয়া না যায়।

২৫। সোডা ওয়াটার। সোডার বোতলে ১ পোয়া জল ও অর্দ্ধড্রাম টার্টারিক অ্যাসিড দিয়া খুব নাড়িয়া দেড় ছটাক গুঁড়া সোডা দিয়া তৎক্ষণাৎ ছিপি বদ্ধ করিবে।

২৬। লেমনেড। কার্ব্বনেট অফ সোডা অর্দ্ধ ড্রাম, চিনি ২ ড্রাম, লিমন এসেন্স ২ ফোঁটা দিয়া সোডার বোতলের বাকিটুকু জল ও ৩৫ গ্রেণ টার্টারিক এসিড দিয়া ছিপি বদ্ধ করিয়া কিছুক্ষণ নাড়িবে।

২৭। ল্যাভেণ্ডার ওয়াটার। ইংলিশ ল্যাভেণ্ডার অয়েল ২॥০

ভরি, স্পিরিট ৭৫ ভরি এবং গোলাপ জল ৬ ভরি উত্তমরূপে মিশাইয়া ২।৩ ঘণ্টা পরে ছাঁকিয়া লইবে।

২৮। রোজ সিরাপ। জল দশ ছটাক ও এক ছটাক গোলাপ ফুলের পাপড়ি অল্প তাপে সিদ্ধ করিয়া, পরে একসের চিনি মিশাইয়া জ্বাল দিয়া লইতে হয়। সালফিউরিক এসিড দিলেই সুন্দর গোলাপী বর্ণ হয়।

২৯। লিমন সিরাপ। পাতিলেবুর খোসা ২ আউন্স, লেবুর রস ২০ আউন্স অল্প তাপে সিদ্ধ করিয়া ৩৬ আউন্স চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া পুনঃ সিদ্ধ করিয়া বোতলে ছিপি বদ্ধ করিয়া রাখিবে।

৩০। তুবড়ী বাজী। সোরা ১০ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ ও লৌহচূর্ণ ৪॥০ ভাগ।

শ্রীকুঞ্জবিহারী লালা।

বঙ্গে ব্রাহ্মণ বসতি।

(১ম প্রস্তাব)

কতিপয় প্রত্নতত্বানুশীলক বাঙ্গালী লেখক লিখিয়াছেন, "প্রাচীনকালে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণের বসতি ছিল না; সমগ্র বঙ্গভূমি ব্রাহ্মণ শূন্য ছিল। আদি-কালের বঙ্গদেশ অসভ্য ও অশিক্ষিত।" যাঁহারা এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন এবং যাঁহারা এবম্প্রকার অভিমতের অনুবর্ত্তী, তাঁহারা "বঙ্গদেশ কত প্রাচীন এবং সম্ভবতঃ কত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশ অসভ্য বা অশিক্ষিত ছিল" এই গুরুতর ও প্রয়োজনীয় প্রশ্নের আদৌ মীমাংসা করিতে পারেন নাই। কোন কোন ঐতিহাসিক স্থির করিয়াছেন, বঙ্গদেশ প্রাচীন দেশ নহে, ইহা আধুনিক দেশ। কিন্তু বঙ্গদেশের বয়ঃক্রম সম্বন্ধে তাঁহারা কিছুই বলেন না বা লেখেন না। প্রাচীন বঙ্গের ভৌগলিক সীমা সম্বন্ধেও তাঁহাদের রচনায় কোন স্থির সিদ্ধান্ত দেখা যায় না। কেহ কেহ ইহাও লিখিয়াছেন যে, আদিশূর রাজা সর্ব্বপ্রথমে (কাণ্যকুব্জ বা কনোজ নগর হইতে) বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাঁহাদিগকে বাসভূমি ও সম্পত্তি দান করেন; ঐ রাজার সময় হইতেই বঙ্গে ব্রাহ্মণের আদি বসতি; ইহার পূর্ব্বে বঙ্গে আদৌ ব্রাহ্মণ ছিল না। আমার বিবেচনায়, উপরে যে সকল অভিমত উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমুদয় ভ্রান্তিমূলক। আদিশূর রাজার শাসন কালের

পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ ছিল না, ইহা উন্মাদের কথা। সুতরাং, এই অভিমত একেবারেই অগ্রাহ্য।

যেমন নিশার শোভা শশী এবং শশীর শোভা তারা, সেইরূপ ভারতের শোভা হিন্দু এবং হিন্দুর শোভা ব্রাহ্মণ। যেমন সরোজের আশ্রয় সলিল, যেমন আধেয় বস্তুর আশ্রয় আধার, যেমন অট্টালিকার ছাদের অবলম্বন প্রাচীর কিম্বা স্তম্ভ, সেইরূপ হিন্দুসমাজের আশ্রয় ও সামর্থ্যের নাম ব্রাহ্মণ। যেমন জল বিনা মীন, সূর্য্য বিনা দিন, চৈনিক বিনা চীন অথবা অভাব বিনা ঋণ থাকিতে পারে না, তেমনই ব্রাহ্মণ ভিন্ন হিন্দুসমাজ কখনই তিষ্ঠিতে সমর্থ হয় না। রাজা আদিশূরের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ ছিল এবং বঙ্গদেশে বাঙ্গালী জাতি, হিন্দুসমাজ ও হিন্দুধর্ম্ম ছিল; ব্রাহ্মণ না থাকিলে হিন্দুজাতি, হিন্দুসমাজ এবং হিন্দুধর্ম্ম কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে? হস্তীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে হইলে যেমন তাহার স্থূলাকার দেহ, স্তম্ভসদৃশ পদ, কুলার মত কর্ণ এবং দীর্ঘ দন্ত প্রভৃতিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হয়, হিন্দুসমাজের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলে অবশ্যই তৎসঙ্গে সেস্থানে ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। আদিশূরের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী কাল হইতে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ছিল, আদিশূর রাজার শাসনকাল বহু প্রাচীন নহে; সুতরাং আদিশূরের পূর্ব্বে বঙ্গে ব্রাহ্মণ ছিল না, এই উক্তি অতিশয় অযৌক্তিক। ব্রাহ্মণ না থাকিলে হিন্দুসমাজ চলিত কিরূপে? বিশেষতঃ সেকালের ধর্ম্মভীরু হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ বিনা একদিনের জন্যও তিষ্ঠিতে সমর্থ হইত না। পণ্ডিতেরা বলেন, যে গ্রামে বা যেস্থানে আদৌ ব্রাহ্মণ নাই অথবা ব্রাহ্মণের গতিবিধি নাই, সে গ্রামে বা সেই স্থানে যেন কোন বুদ্ধিমান হিন্দু বাস না করেন। শাস্ত্রকারেরা কহেন, যে হিন্দু পুরুষ বা রমণী এক সপ্তাহ কাল মধ্যে ব্রাহ্মণের মুখ দর্শন করে নাই, সে ব্যক্তি, অপরাধ জন্য, প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য। ইহার প্রায়শ্চিত্ত বিধি এইরূপ—গঙ্গাস্নান অথবা ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধকাহন কড়ি দান কিম্বা একটি ব্রাহ্মণ ভোজন অথবা একশত এক বার সূর্য্য প্রণাম। যে ব্যক্তি একমাস কাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ দেখে নাই, তাহাকে তিনটি ব্রাহ্মণ ভোজন এবং একটি ব্রাহ্মণকে গাভী দান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। মহামতি মহারাজ মনু তাঁহার ভুবন বিখ্যাত "মনুসংহিতা" নামক ব্যবস্থাশাস্ত্রের দশম অধ্যায়ের ৪৩ শ্লোকে লিখিয়াছেন "বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনে ন চ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অদর্শনে মনুষ্য শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলেই এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, হিন্দু

গৃহস্থের যে ব্রাহ্মণের নিত্য প্রয়োজন হয়, সেই ব্রাহ্মণ বিনা হিন্দুসমাজ ছিল অথবা আছে কিম্বা থাকিতে পারে, একথা যে ব্যক্তি সাহস করিয়া বা নিশ্চয় করিয়া কহিতে পারে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই নির্ব্বোধ।

বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ জাতির বসতি ও বিস্তার এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আলোচনা করিতে হইলে, আদিশূর, বল্লালসেন প্রভৃতি রাজাদিগের ঐতিহাসিক বিবরণের দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। তদ্ভিন্ন কনোজ নগরের ইতিহাস, প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস, বল্লালসেনের বিস্তৃত জীবন চরিত, আদিশূরের জীবন চরিত, কায়স্থ জাতির ইতিহাস প্রভৃতির বর্ণনা করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। মৎপ্রণীত "সিদ্ধান্ত সমুদ্র" গ্রন্থের যে খণ্ডে কায়স্থ জাতির ইতিহাস মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে, আমি সেই খণ্ডে এই সকল বিষয়ের সুবিস্তৃত বিবরণ দিব; এই কারণে এস্থলে তাহার পুনরুক্তি করিলাম না। প্রকৃত কথা এই, আদিশূরের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ জাতি এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, কিন্তু নানা কারণে কতিপয় ব্রাহ্মণের প্রতি বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি রাজা আদিশূর অসন্তুষ্ট হওয়ায়, কান্যকুব্জ হইতে তিনি কতকগুলি ব্রাহ্মণকে আনাইয়া ছিলেন এবং সেই সকল ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে বাস স্থাপন করিয়া যে বংশ উৎপাদন করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার রাঢ়ী কায়স্থ এবং ব্রাহ্মণবৃন্দ সেই বংশ হইতে সমুদ্ভূত।

রাজা আদিশূরের শাসনকালে এবং তাহার পূর্ব্বে বঙ্গদেশের নানাস্থানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মও প্রবল ছিল। বৌদ্ধেরা তখন বঙ্গদেশের অনেক স্থানে বিচরণ করিত এবং স্থানে স্থানে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা প্রচারকগণ আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিত। অনেক স্থানে হিন্দুসমাজ বৌদ্ধ উপদেশক-গণের সংসর্গে আসিয়া স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক স্থানের ব্রাহ্মণ সন্তান বৌদ্ধসংসর্গে মতিভ্রষ্ট হইয়া যথেচ্ছাচার করিত এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিপরীত ব্যবহার করিয়া রাজা ও প্রজার অসন্তুষ্টি বিধান করিত। রাজা আদিশূর এইরূপ অনেক ব্রাহ্মণ দর্শন করিয়া এবং এতাদৃশ অনেক ব্রাহ্মণের অশাস্ত্রীয় ব্যবহার শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হয়েন।

সাধারণতঃ এদেশের যুবতী রমণীরা যে বয়সে গর্ভবতী হয়েন, মহারাজা আদিশূরের সহধর্ম্মিণী (মহারাণী) সেই বয়সে গর্ভবতী না হওয়ায় মহারাজা চিন্তিত হইলেন। বংশধর না থাকিলে বংশলোপ, পিণ্ড লোপ এবং রাজ্যলোপ হইবে এই দুশ্চিন্তায় মহারাজা বাহাদুর দিনযামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। অবশেষে, আচার্য্যগণ, জ্যোতিষীগণ এবং হিতৈষী ব্রাহ্মণবৃন্দের পরামর্শ ও

ব্যবস্থানুসারে শাস্ত্রমতে আদিশূর একটি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ সমাধা করিতে অভিলাষী হইয়া যে সকল ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিলেন এবং যে সকল ব্রাহ্মণের দ্বারা যজ্ঞক্রিয়া ও তদনুসঙ্গিক কার্য্যকলাপ নিষ্পন্ন করিবার বন্দোবস্ত করিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ তাঁহার এবং সভাসদের মনস্তুষ্টি বিধান করিতে পারিলেন না। অনুসন্ধানে প্রকাশিত হইল, এই সকল ব্রাহ্মণ মধ্যে প্রবলভাবে বৌদ্ধদোষ প্রবেশ করিয়াছে। ঐ সকল ব্রাহ্মণ-মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবণতা দোষের সঙ্গে শ্রীমন্মহারাজা বাহাদুর এবং রাজসভাসদগণ আরও যে সকল দোষ দেখিতে পাইলেন তাহার প্রধানগুলি এস্থলে উল্লেখ করিয়া দিলাম। দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও পুষ্প বিক্রয়, শূদ্রের সহিত বাস, কুসীদ গ্রহণ, চিকিৎসা ব্যবসা করা, সুরাপান ও সুরা বিক্রয়, ছাগ কম্বল প্রস্তুত করা, চিত্রবিদ্যা শিক্ষা, শূদ্রের গৃহে পাচকের কার্য্য করা এবং বহু শিষ্যের গুরু হইয়া বহুস্থানে, বহুজাতির মধ্যে, দান গ্রহণ করা। কিন্তু রাজা আদিশূর যখন আরও সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন, তখন জানিতে পারিলেন, অনেক ব্রাহ্মণ ক্রিয়াহীন, নাস্তিক ও বেদবিষয়ে মূর্খ হইয়া গিয়াছে, এইজন্য মহারাজা আদিশূর লজ্জা, ক্রোধ ও বিরক্তিতে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিলেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে—

১। অযাজ্য যাজনৈ শ্চৈব নাস্তিক্যেন চ কর্ম্মণা।
কুলানাশু বিনশ্যন্তি যানি হীনানি মন্ত্রতঃ॥

২। ক্রিয়া হীনশ্চ মূর্খশ্চ সর্ব্বধর্ম্ম বিবর্জ্জিতঃ।
নির্দ্দয়ঃ সর্ব্বভূতেষু বিপ্রশ্চণ্ডাল উচ্যতে॥

অর্থাৎ—ভগবান মনু কহেন, অযাজ্য যাজন, নাস্তিকতা ও বেদাদি মন্ত্র অনধ্যয়ন হেতু ব্রাহ্মণ আপন কুলকে আশু বিনাশ করেন। ভগবান অত্রি বলেন, ক্রিয়াহীন, ধর্ম্মহীন, সুকর্ম্মহীন, গায়ত্রীহীন, এবং নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ চণ্ডাল মধ্যে গণ্য। যাহা হউক, অনুসন্ধান করিয়া, যাগ, যজ্ঞ, হোম ক্রিয়া প্রভৃতি সম্পাদন করিতে সমর্থ এমন ব্রাহ্মণ বহু সংখ্যায় প্রাপ্ত হওয়া সত্বেও, মহারাজা আদিশূর এরূপ বিরক্তমনা হইয়া ছিলেন যে, অন্য দেশ হইতে সুব্রাহ্মণ আনাইয়া পুত্রেষ্টি যাগ নিষ্পন্ন করিবার বন্দোবস্ত করিলেন।

এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে আদিশূরের রাজ্য মধ্যে সুবর্ণ বণিক জাতীয় সনক আঢ্য নামে একব্যক্তি বাস করিতেন। ধনে, মানে ও পুণ্য কর্ম্মে ইনি বিশেষ বিখ্যাত হইয়া উঠিয়া ছিলেন। সুবর্ণ বণিক জাতির কুলাচার্য্যগণ কৃত

কারিকাদি পুস্তকে সনক আঢ্য সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, কুশল নামক বণিকের পুত্র সনক সুবর্ণ ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তাঁহার সনাতন ও সনৎকুমার নামে দুই সহোদর ছিল।

জাতাস্ত্রয়ো যে কুশলস্য পুত্রা।
বাণিজ্যকারী সনকস্তু হেম্নঃ।
আসীন্মণেস্তেষু সনাতনো বৈ।
গন্ধাদি সস্তস্য সনৎ কুমারঃ।

সনক আঢ্যের ভার্য্যার নাম বরাটিকা ছিল এবং ইহাঁরা বৈশ্যকুল সম্ভূত ছিলেন।

যা পদ্ম গন্ধাঙ্গ সুবর্ণ বর্ণা
বরাটিকা হ'স্তে সনকশ্চ যস্তৌ।
জায়াপতী বৈশ্যকুলে হি জাতৌ
শ্রীমাধবৌ বৃষ্ণিকুলে যথা'হস্তাম।

সনক আঢ্য—মণি ব্যবসায়ী, স্বর্ণ ব্যবসায়ী এবং রত্ন ব্যবসায়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই ব্যবসা উপলক্ষে তিনি স্বয়ং এবং তাঁহার অধীনস্থ বহু লোক নানাদেশে গমনাগমন করিত। সুতরাং বহুস্থানের সমাচার ইহাঁদের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যাইত। মহারাজা আদিশূর সনক আঢ্যকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "হে আঢ্য! তোমার লোকেরা নানা দেশে গমনাগমন করিয়া থাকে সুতরাং তোমার দ্বারা আমি একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ের সমাচার প্রাপ্ত হইবার আশা করি। আমি এক্ষণে অপুত্রক; পুত্র কামনায় শাস্ত্র বিধিমতে পুত্রেষ্টি যাগ সমাধা করিতে ইচ্ছা করি। দেশান্তর হইতে শাস্ত্রকুশল, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ও সদাচারী ব্রাহ্মণাধ্যাপক আনাইয়া এই যাগ সম্পন্ন করিব এরূপ অভিলাষ করিয়াছি, অতএব কোথায় এরূপ সুপণ্ডিত ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইতে পারে, তুমি তদ্বিষয়ক সম্বাদ দিতে পার কি?" মহারাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সনক আঢ্য কহিলেন "হে মহারাজ! কান্যকুব্জ নামক প্রসিদ্ধ নগরে এরূপ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথাকার নরপতিকে পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিলে আপনার অভিলাষ পূর্ণ হইবে ইহা ধ্রুব সত্য।" সভাসদগণ সনক আঢ্যের উক্তিকে যুক্তি যুক্ত বলিয়া স্থির করায়, মহারাজ আদিশূর সনক আঢ্যের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে "বণিকরাজ" বা সুবর্ণ বণিক উপাধি প্রদান করিলেন। আদিশূর সনক আঢ্যের সম্মান বৃদ্ধির জন্য তাঁহাকে যে তাম্র ফলক উপহার প্রদান করেন তাহাতে এই শ্লোকটি খোদিত হইয়াছিল—

স্বর্ণ বাণিজ্য কারিত্বা দত্র স্থিত বিশাংময়া।
সুবর্ণ বণিগিত্যাখ্যা দত্তা সম্মান বৃদ্ধয়ে।

অর্থাৎ—আমার রাজ্যবাসী বৈশ্য বৃন্দের সুবর্ণ বাণিজ্যহেতু তাঁহাদিগের সম্মান বৃদ্ধির জন্য আমি মহারাজা আদিশূর তাঁহাদিগকে সুবর্ণ বণিক আখ্যা প্রদান করিলাম। ঐ নামানুসারে সুবর্ণ ব্যবসায়ীদিগের বাসস্থানেরও নাম সুবর্ণ গ্রাম হইয়াছিল।

মহারাজা আদিশূর রাজসভাসদগণ কর্তৃক সমর্থিত হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুত্রেষ্টি যাগের জন্য কান্যকুব্জ দেশ হইতে আমি শাস্ত্রকুশল ব্রাহ্মণ আনাইবার কারণ অভিলাষ করিয়াছি, কারণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রাবল্য হেতু এবং তৎসঙ্গে নানা কারণে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের হীনতা হওয়ায় দেশান্তর হইতে সুব্রাহ্মণ আনয়ন করাই আমি যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি।" রাজানুগত ব্রাহ্মণবর্গ ইহাতে রাজার পক্ষেই অভিমত প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া প্রথিত আছে।

বিপ্রাণ বেদবিধান বঞ্চিত হৃদো
বিজ্ঞায় বিজ্ঞো বিভূঃ।
গৌড়স্থান্ সকলান্ কলিপ্রকলিতান্
বিঘ্নোপশস্তে ক্ষমান্॥

(কায়স্থকুল পত্রিকা)

অনন্তর মহারাজা আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ নগরে দূত প্রেরিত হইল। প্রধান দূত বণিক জাতীয় পুরুষ ছিলেন; সম্ভবতঃ, তিনি সনক আঢ্যেরই সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি।

কনোজের ব্রাহ্মণ-সমাজ অতীব প্রসিদ্ধ ও অতীব পুরাতন। পৃথিবীর যে যে স্থানে কান্যকুব্জ দেশীয় ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জন্মস্থান কনোজ। এক সময়ে নিজ কান্যকুব্জ নগরে দুই লক্ষ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, এখনও এতদঞ্চলে ব্রাহ্মণের বসতিই অধিক। কান্যকুব্জা নগরী অতীব প্রাচীনা। চন্দ্রবংশীয় পুরুরবার অন্বয়ে দশম পুরুষে কুশ নামা নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। কুশের পুত্র কুশনাভ নরপতি, "মহোদয়" নামে দেশ বা নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। কুশনাভের একশত কন্যা ছিল। বায়ু কর্ত্তৃক কন্যাগণ কুব্জা হয়। একথা রামায়ণের বালকাণ্ডান্তর্গত ৩২ সর্গে উল্লিখিত আছে। এই জন্য "মহোদয়" নগরের নাম কান্যকুব্জ হইয়াছে। "কান্যকুব্জ

মিতিখ্যাতং ততঃ প্রভৃতি তৎপুরং"। কুল্লুকভট্ট মহাশয় মনুসংহিতার টীকায় কনোজের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কান্যকুব্জ প্রদেশের লোকেরা এমন ধনবান, বিদ্বান, বিক্রমী ও সৌখীন পুরুষ ছিলেন যে, তাঁহাদের অনেকের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া দূরবর্ত্তী প্রদেশস্থ নরপতি বা প্রখ্যাত বণিক সমূহ আশ্চর্য্য হইয়া যাইতেন, বড় বড় পণ্ডিতেরা ও সাহসী এবং বলবান বীরেরা ইহাঁদের পাণ্ডিত্য, সাহস ও শারীরিক সৌন্দর্য্য এবং বল দেখিয়া অবাক হইয়া থাকিতেন। প্রাচীন কনোজ নগরে ত্রিশ হাজার তাম্বুল বিক্রেতা বাস করিত। সুখ স্বচ্ছন্দতা থাকিলেই মানুষের মন সাধারণতঃ বিলাসের দিকে প্রধাবিত হয়; সুতরাং, পুরাতন কনোজে বিবিধ প্রকার প্রসূন, বিবিধ প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য, চন্দন, তাম্বুল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান কনোজ, কেবল ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে। আমি ইংরাজি ১৯০৪ অব্দে কনোজে গমন করিয়া চারিদিকে অগণ্য প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশিষ্ট দর্শন করিয়াছিলাম। কলিকাতার "জন্মভূমি" নাম্নী মাসিক পত্রিকায় ১৩১২ সালের শ্রাবণ, ভাদ্র ও কার্ত্তিক এই তিন সংখ্যায় কনোজের বিবরণ লিখিয়াছিলাম। পাঠকেরা তাহা পাঠ করিলে প্রাচীন ও বর্ত্তমান কনোজ সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। কনোজের শেষ স্বাধীন নরপতির নাম জয়চন্দ্র।

কনোজের রাজা, বীরসিংহের নিকট, মহারাজা আদিশূর যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

রাজা বীরসিংহের প্রতি রাজা আদিশূরের পত্র।

শ্রীমৎ রাজাদিশূরো ভবদবনিপতি ধর্ম্মরাজোহি শান্তো।
সল্লোকঃ সদ্বিচারা রৈরদিতি সুতপতিঃ সর্ব্বথাসীৎ তথাসীৎ॥
প্রতাপাদিত্য তপ্তাখিল তিমিররিপুস্তত্ত্ব বেত্তা মহাত্মা।
জিত্বা বুদ্ধাংশ্চকার স্বয়মপি নৃপতি গৌড় রাজ্যান্নিরস্তান॥
পাত্রং প্রপচ্ছ পূতং পরমসুর পদদ্বন্দ্ব পদ্মার্চ্চকোসৌ। *
কাসন্তে কাগুপীশাঃ ক্রতুকৃতি কুশলাঃ কাপি ক্ষত্রিয়া কুলীনাঃ॥
পাত্রস্তেষামবোচৎ পরিচয়মখিলং ভূপবাক্যাদ্ দ্বিজান্তো।
কোলাঞ্চস্থাঃ কুরঙ্গা ইব কিল তপসা নৈব কেষামধীনাঃ॥

---

* এই পাত্র (সভাসদ) সুনক আঢ্য।

কোলাঞ্চস্থ মহীপতিঃ ক্ষিতিভুজা মেকত্রধানঃ প্রধীঃ।
স্বেষ্টে নিষমতি মহাশয়তরঃ শ্রীবীরসিংহ স্বভূৎ॥
তদ্দেশবাসিনঃ সমাধিকৃতিনঃ পাপালিসংহারিণঃ।
সন্তি ব্যবসমাঃ সভাসদ ইতো গৌড়েন্দ্র ভূমীশ্বরাঃ॥
ভূপোদ্ভূদ্ ভবনে স্বচেষ্টিতপরঃ সদভৃত্য ভার্য্যোন্বিতান্।
ভূদেবান বৃষলান্ বিচিত্র লিখনৈরানেতুকামঃ স্বয়ম্॥
পত্রেণ প্রণব প্রমোদর চিতাং শ্রীবীরসিংহে লিপিং।
গৌড়স্মা পতিরেব পুণ্য সুমতির্দুতেন প্রস্থাপয়ৎ॥
সুকৃত সুকৃত সংহাঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থ দক্ষা।
লপিত হত বিপক্ষা স্বস্তিবাক্যাঃ শ্রুতিজ্ঞাঃ॥
সুজিত সুগত বৃন্দে গৌড়রাজ্যে মদীয়ে,
দ্বিজকুলবর জাতাঃ সানুকম্পাঃ প্রবাস্ত।
নৃপতি সুকৃতিসারঃ স্বীয় বংশাবতারঃ।
প্রবলবলবিচারো বীরসিংহোত্তিবীরঃ।
ময়ি বরসখিতাস্তে ভূমিদেবান্ সক্ষত্রিয়ান পুনরপি মম গৌড়ে
প্রাপয়ন্তং নিতান্তম্।
মুদা গণ্ডকামাঃ পুরাবাস গৌড়াঃ সমাহার কোলাঞ্চ দেশং ক্ষিতীশম্।
নৃপাত্বাঞ্চলব্ধা সদারাদি ভৃত্য মহাযোগিনস্তে বভূবঃ সক্ষত্রিয়াঃ।
মহারাজ রাজাদিশূরো মহাত্মা ত্বয়া বীরসিংহস্য মেস্তাদিসখ্যম।
ভবাজ্ঞানুসারাব্ধি প্রস্থাপব্যমি দ্বিজান্ পঞ্চগোত্রান্ স্বদারাদি সহচরাঃ॥

এস্থলে উপরিউক্ত পত্রের অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে। সুরপতি ইন্দ্র যেমন স্বর্গে রাজত্ব করেন, শ্রীমান আদিশূর নরপতি সেইরূপ পৃথিবীতে রাজত্ব করিতেছেন। রাজ্য শাসনে তিনি ধর্ম্মরাজ সমতুল্য, সদ্বিচারে তিনি নিতান্ত সৌজন্য প্রকাশক। সূর্য্যদেব যেমন তাঁহার উজ্জ্বল কিরণ জালে অন্ধকার সমূহ নষ্ট করেন, তিনি তেমন স্বীয় প্রতাপ-প্রভাবে অরাতিকুল ধ্বংস করেন। তিনি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মা এবং স্বয়ংই বৌদ্ধগণকে পরাভূত করিয়া স্বীয় গৌড় রাজ্য হইতে তাহাদিগকে নিষ্কাষিত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি পরম দেবতার পাদপদ্মদ্বয় সর্ব্বদাই অর্চ্চনা করিতেন। একদা তিনি তাঁহার ধর্ম্ম-পরায়ণ ও পবিত্রচেতা পাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে কোথায় যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকুশল ব্রাহ্মণ এবং সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় পণ্ডিত দেখিতে পাওয়া যায়?

নৃপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পাত্র তাঁহাকে কহিলেন, হে মহারাজ! কান্যকুব্জ দেশের ব্রাহ্মণগণ তপোবলে স্বাধীনচেতা, তাঁহারা তথায় কুরঙ্গের ন্যায় স্বচ্ছন্দে বাস করেন এবং কাহারও অধীন নহেন। সেই কান্যকুব্জ দেশের অধীশ্বর মহারাজাধিরাজ শ্রীবীরসিংহ ধীশক্তি সম্পন্ন, উদার প্রকৃতিক ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ। তদ্দেশবাসী ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞকার্য্য কুশল, পাপসংহরণক্ষম ও বেদব্যাস তুল্য তেজ-সম্পন্ন। তাঁহারা রাজসভাতে গমনাগমন করেন। হে গৌড়াধিপতে! আপনি সেই ভূদেবগণকে এখানে আনিবার চেষ্টা করুন। গৌড়াধিপতি নৃপতি ইহা শুনিয়া নিজ রাজ্যে সেই ব্রাহ্মণগণকে ও লিপি-কুশল ক্ষত্রিয়বর্গকে আনয়ন করিবার ইচ্ছায় পাত্রবরের সহিত পরামর্শ করিয়া আনন্দচিত্তে এই প্রণয়লিপি রচনাপূর্ব্বক, দূত দ্বারা তাহা বীরসিংহ ভূপতির নিকট প্রেরণ করিলেন।—হে বীরসিংহ নরপতে! আমি গৌড়রাজ্যে বৌদ্ধগণকে পরাজয় ও তথা হইতে দূরীভূত করিয়াছি, এক্ষণে ইচ্ছা করি পুণ্য-কর্ম্ম-পরায়ণ সর্ব্বশাস্ত্রবিদ, বিপক্ষ-বিজয়ী, স্বস্তিবাক্যসংযুক্ত বেদজ্ঞ সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণগণ অনুকম্পার সহিত মদীয় এই রাজধানীতে আগমন করেন। আপনি নৃপতি কুলে পুণ্যযশাঃ, স্বীয় বংশের অবতংস স্বরূপ বীরাগ্রগণ্য এবং বল প্রয়োগে ও বিচার কার্য্যে সুদক্ষ। আমি আপনার সহিত সখ্য বন্ধনে অভিলাষী। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক মদীয় গৌড়দেশে কতিপয় ব্রাহ্মণ প্রেরণ করুন এবং তাঁহাদের সঙ্গে যেন কতিপয় ক্ষত্রিয় থাকে।—নরপতি বীরসিংহ আদিশূরের পত্র পাঠ করিয়া, তাহা প্রচার করায় কতিপয় মহাযোগিব্রাহ্মণ নৃপাজ্ঞামতে কান্যকুব্জ দেশ ও তদ্দেশীয় ভূপতিকে পরিত্যাগ করিয়া, দারাদি পরিজন ও ক্ষত্রিয় সহচরের সহিত গৌড়দেশে বাস করিবার জন্য আনন্দে তথায় গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন বীরসিংহ নরপতি পত্রোত্তরে লিখিলেন, হে মহারাজাধিরাজ আদিশূর! আপনি মহাত্মা, আপনার সহিত অদ্য আমার প্রথম সখ্যবন্ধন হইল। আমি আপনার আজ্ঞা মতে পঞ্চগোত্রীয় দ্বিজপঞ্চককে প্রেরণ করিলাম, তাঁহারা নিজ নিজ পরিজন ও ভৃত্য লইয়া যাইতেছেন। (অনুবাদ সমাপ্ত)

উপরে যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের নাম এই—ভট্টনারায়ণ, শ্রীহর্ষ, দক্ষ, ছান্দড় ও বেদগর্ভ। ইহাঁদের সহচর ক্ষত্রিয় পঞ্চকের নাম দশরথ, মকরন্দ, বিরাট, কালিদাস ও পুরুষোত্তম। দশরথ বসু গৌতম গোত্রেয় লোক, মকরন্দ ঘোষ সৌকালীন গোত্রেয়, বিরাট গুহ কাশ্যপ গোত্রেয়, কালিদাস মিত্র বিশ্বামিত্র গোত্রেয় এবং পুরুষোত্তম দত্ত মৌদ্গল্য

গোত্রের লোক ছিলেন। দক্ষের সঙ্গে দশরথ, ভট্টনারায়ণের সঙ্গে মকরন্দ, শ্রীহর্ষের সঙ্গে বিরাট, বেদগর্ভের সঙ্গে কালিদাস এবং ছান্দড়ের সঙ্গে পুরুষোত্তম বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইতে বাঙ্গালার কনোজ-ব্রাহ্মণ শ্রেণী সমুদ্ভূত এবং ঐ ক্ষত্রিয়কপঞ্চ বর্ত্তমান বঙ্গের কায়স্থ জাতির আদিপুরুষ। ভট্টনারায়ণের গোত্র শাণ্ডিল্য, দক্ষের কাশ্যপ, ছান্দড়ের বাৎস্য, শ্রীহর্ষের ভরদ্বাজ এবং বেদগর্ভের সাবর্ণ গোত্র ছিল।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

কবির স্বপ্ন।

(অপূর্ব্ব বিবাহ)

[১৫৩ পৃষ্ঠার পর]

কিছুকাল নীরবে অতিবাহিত হইলে পর, আমি বিনয়নম্রবচনে পুনর্ব্বার গোলাপসুন্দরীকে কহিলাম, "অয়ি দয়াশীলে! তোমার সদুপদেশপূর্ণ মধুর বচনে আমার মনঃপ্রাণ একান্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে অন্তঃকরণে অসীম আনন্দ উপভোগ করিতেছি। এরূপ বিমলানন্দ, এ জীবনে আর কখনও ভোগ করি নাই।" কুসুমকুলেশ্বরীর কোমল হৃদয় করুণ রসে সিক্ত হইল। তাহার প্রফুল্ল ওষ্ঠাধরে মৃদু হাস্যের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গেল। সুহাসিনী সেই মধুর হাস্যময় আস্যে আমাকে প্রিয় সম্ভাষণ করিয়া কহিল—"কি লইয়া অন্তঃকরণ? কোন্ কোন্ পদার্থের সমষ্টিতে অন্তঃকরণের নাম করণ হইয়াছে—জান কি?" আমি কহিলাম—"আমি মহা মূর্খ; মানব জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণ কুলে এমন অজ্ঞান আর নাই। কি কি বস্তু লইয়া অন্তঃকরণ—আমাকে বুঝাইয়া দাও; শিক্ষা করিয়া, সে বিষয়ের জ্ঞানলাভ করি।" গোলাপসুন্দরী স্বল্প কথায়, সংক্ষেপে কহিল—"মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারিটীর সমষ্টিকেই অন্তঃকরণ কহে। কণ্ঠনালী-মধ্যে মনের, বদন-মধ্যে বুদ্ধির, নাভিদেশে চিত্তের এবং হৃদয়-মধ্যে অহঙ্কার বৃত্তির স্থিতি-স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে জানিবে। সন্দেহ, নিশ্চয়, অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি এবং অভিমান, এই চারিটী অন্তঃকরণের বিষয় বলিয়া কথিত আছে। সংশয়কে মনের বিষয়, নিশ্চয় জ্ঞানকে বুদ্ধির বিষয়, অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তিকে চিত্তের বিষয়, এবং অভিমানকে

অহঙ্কারের বিষয় বলিয়া জানিবে। মনঃই সুখ ও দুঃখের একমাত্র ভোক্তা। সেই মনকে অসার বিষয়-বাসনা হইতে আকর্ষণ করিয়া, একমাত্র ভগবানের শ্রীচরণাম্বুজে সমর্পণ করিতে পারিলেই, অনন্ত শান্তিসুখে সুখী হওয়া যায়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, বিচার অথবা কু তর্কের কিছুমাত্রও আবশ্যকতা নাই। একমাত্র ঈশ্বরই সত্য। 'এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বচরাচর মায়িক পদার্থ, সুতরাং মিথ্যা' এই জ্ঞান জন্মিলেই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে ; তখন জানিতে পারা যায় যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার কোনই প্রভেদ অর্থাৎ পৃথক সত্তা নাই। তোমার নিজের কোনই সত্তা নাই ; একমাত্র ভগবানের সত্তাতেই সকল জীব স্বত্ববান। জীব কিছুই নহে, সকলই সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বর। যেমন চৌর কর্ত্তৃক চোর ধৃত হয়, গঙ্গাজলে গঙ্গা-পূজা হয়, কণ্টক দ্বারা কণ্টক উদ্ধৃত হয়, সেইরূপ মনঃ দ্বারাই মনঃ বশীভূত হইয়া থাকে। মনকে স্ববশে আনয়ন করিতে মনঃই সমর্থ।" গোলাপসুন্দরীর এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, আমার অন্তঃকরণে প্রভূত ভক্তি ও শান্তিরসের সঞ্চার হইল। নয়ন যুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। পুণ্যময়ী প্রসূন সুন্দরীর অপার কৃপায়, সকল বিষয়ই সুন্দররূপ উপলব্ধি করিয়া বিমোহিত হইলাম। পরে আরও কয়েকটী অত্যাবশ্যক বাক্য শ্রবণ করিলাম। সে সকল কথা বা উপদেশ বাস্তবিকই বড় উপাদেয়—কিন্তু আমার পক্ষে সে সকল বিষয় পরম গোপনীয় বিধায়, এস্থলে সে সমুদায় বিষয় উল্লিখিত হইল না। এই মুহূর্ত্তেই আমি ফুলের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলাম। এ ধর্ম্ম অপর কিছুই নহে, কেবল মাত্র অন্যের হিত-সংসাধনার্থ আত্মত্যাগ—এই মাত্র। এই পরম নিষ্কাম ধর্ম্ম কুসুমকুল যেমন বুঝে ও প্রতিপালন করে, আর কোন সৃষ্ট জীবই সেরূপ বুঝে না। অপর জীবের মঙ্গল-সাধন দূরের কথা,—কেবলমাত্র অন্যের মনস্তুষ্টি, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত বা বিলাসের জন্যও কুসুমকুল অনায়াসেই অকাতরে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। ত্যাগ স্বীকারেই প্রকৃত সুখ বা শান্তি-লাভ হইয়া থাকে, ইহা মানব-ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। কুসুমকুল ত্যাগপরায়ণা ; সুতরাং ইহারা যেমন অনন্ত সুখের অধিকারিণী, অপর প্রাণী কদাচ সেরূপ নহে। কুসুমকুলের রূপ ও গুণ উভয়ই একাধারে বিদ্যমান। উভয়ই অনন্যসাধারণ, উভয়ই জগতে অতুলনীয়, উভয়ই জ্ঞানবান জীবের লোভের কারণ। এই হেতুই ত্রিদিবের অমরনিকর পর্য্যন্তও প্রসূন-লাভের নিমিত্ত একান্ত লালায়িত হইয়া থাকে। সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে কুসুম যে সর্ব্বাপেক্ষা

সুন্দরী, মনোহারিণী ও প্রীতিদায়িনী * তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। যাহার যেরূপ প্রকৃতি, সে প্রসূন লইয়া, সেই রূপই ব্যবহার করিয়া থাকে। এক পুষ্পেই, সাধুর সদ্বৃত্তির বিকাশ ও বিলাসী বা অসাধুর ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। হায়! কত পুণ্যে কুসুম জন্ম লাভ হইয়া থাকে সাধারণ মানবে তাহা বুঝিতে পারে না।

চিন্তার বেগ মন্দীভূত হইলে—আমি গোলাপ কুসুমটীকে কহিলাম—"অয়ি সুভাষিণি! তোমরা সর্ব্বত্যাগিনী; ধরাধামে তোমাদিগের তুল্য ত্যাগশীল জীব আর নাই। সর্ব্বত্যাগী হইলেই, প্রকৃত সুখ ও শান্তি-লাভ হইয়া থাকে। মায়াবদ্ধ মানবে অর্থাৎ সাধারণ সংসারী জীবে তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় না। মানবে, কেবলমাত্র আত্মসুখ অন্বেষণ করিয়া থাকে। অপরের সুখের প্রতি আদৌ লক্ষ্য করে না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আত্ম সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভের নিমিত্ত, অপরের যথেষ্ট অনিষ্ট করিতে মানবে কিছুমাত্রও কুণ্ঠিত নহে। কোনরূপ উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইলে, নির্ব্বোধ নরে স্বীয় পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হয়, নিজ শক্তি বা ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া থাকে। কৃতবিদ্য ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যেও ইহার ব্যতিক্রম পরিদৃষ্ট হয় না। ভূম্যধিকারী, রাজা, মহারাজা, এমন কি প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটও এই অন্যায় আচরণের বশবর্ত্তী। সমগ্র ভারতবর্ষ-মধ্যে, বঙ্গবাসীকেই অপর প্রদেশের লোকে, অধিকতর ঘৃণা ও উপহাস করিয়া থাকে। বাঙ্গালীর মত পরশ্রী কাতর ও স্বজাতীর উন্নতি-বিঘ্নকারী মানব-সম্প্রদায় আর কোথাও নাই। হে সুন্দরি!—মানবজাতিকে একান্ত স্বার্থপর বলিয়া জানিবে।" মানবজাতির উপর,—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর উপর—আমার ঘোর ঘৃণার উদ্রেক হইল। গোলাপ কুসুমটী, মানবের চরিত্র সম্বন্ধে আমাকে অনেক বিষয় বলিয়া নিরস্ত হইলে পর, আমি চিত্রপট-চিত্রিত মূর্ত্তিবৎ নীরব রহিয়া, কুসুম কুলেন্দ্রাণীর সারগর্ভ উপদেশ সমূহের অর্থ ও ভাব চিন্তা করিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে, প্রায় সমুদায় প্রসূন সুন্দরীই আমার সন্নিকটে আসিল।

কত পুষ্প কত উপহাস করিল। পুষ্পজাতি সর্ব্বজ্ঞা; কেননা, দেখিলাম—অনেক পুষ্প আমার বহুপূর্ব্বে সময়ের বহুবিধ ঘটনা স্মরণ করাইয়া, আমাকে লজ্জিত করিল; পুষ্পসঙ্ঘ সর্ব্বজ্ঞা না হইলে তাহারা আমার মানসিক ভাব এবং

* এই প্রবন্ধে কুসুম জাতিকে স্ত্রীলিঙ্গ মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে, ইহা পুর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে। লেখক।

একান্ত গোপনীয় ঘটনা কি প্রকারে জানিবে? 'সুমুখী'র সহিত আমার কৌতুক-জনক অনেক ঘটনাও স্মরণ করাইয়া দিল। আমি লজ্জিত হইয়া নির্ব্বাক রহিলাম, বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। কুসুমসুন্দরীগণ আমার আরও বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন প্রকার অতি গূঢ় রহস্য প্রকাশ করিল; ঘটনাবলীর বার, তারিখ, এমন কি, দণ্ড পল বিপল পর্য্যন্তও অনায়াসে বলিয়া দিল, যাহা আমি ভিন্ন, অপর কাহারও জানিবার, কিছুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। এস্থলে সে সকল গোপনীয় বিষয়ের উল্লেখ অনাবশ্যক বিধায় ক্ষান্ত রহিলাম। আমাকে প্রকৃতই 'ভাল মানুষ' জ্ঞান করিয়া, ফুলসুন্দরী সমূহ ক্রমশঃ আমার অতি নিকটে আসিল। তাহাদিগের নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট পল্লবাসন পরিত্যাগ করতঃ, আমার কঠোর কলেবরের অনেক স্থানাধিকার করিয়া উপবেশন করিল। আমি, আমাকে পরম পুণ্যবান ও ধন্য জ্ঞান করিয়া সুখিত হইলাম। কোমলা কুসুমাঙ্গনাগণের পবিত্র অঙ্গ-স্পর্শজনিত সুখে, আমার দেহ রোমাঞ্চিত হইল; জন্ম সার্থক জ্ঞান করিলাম। (কুপ্রবৃত্তি বা নীচ ভাব কুসুমে কদাচ সম্ভবে না, পাঠক পাঠিকাগণ ইহা স্থির জানিবেন) নিঃস্বার্থকর্ম্ম ও নিঃস্বার্থ পবিত্র প্রেমই যে জগতের সারধর্ম্ম, গোলাপসুন্দরী পুনর্ব্বার আমাকে উৎকৃষ্টরূপে, অতি সরল ও সহজ বাক্যে তাহা বুঝাইয়া দিল। আমি যৎপরোনাস্তি হৃষ্টচিত্ত হইলাম, পুলকে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। আমি সামান্য মানব; তাহারা স্বর্গীয় ভাবাপন্না পরম পবিত্রা প্রসূন, এতদুভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ তাহা, তৎকালে আমার মনোমধ্যে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। সর্ব্ব বিষয়েই আমি কুসুমজাতির সমকক্ষ; ইহাই স্থির জ্ঞান করিয়া, সেই ভাবেই কুসুমকুলাঙ্গনাগণ-সহ বাক্যালাপ করিতে লাগিলাম। সর্ব্ব প্রথমাগতা সুরসিকা নবীনা কুসুমটী, কোমলমধুর ভাব সংযুক্ত প্রীতি সহকারে আমাকে কহিল—"সর্ব্বানন্দ! তুমি একটী মানব মাত্র; আমরা আমাদিগের কৌসুমিক মোহিনীশক্তি-প্রভাবে, তোমাকে ভিন্ন প্রকৃতি প্রদান পূর্ব্বক ভুলাইয়া রাখিয়াছি। তুমি তোমার নিজ পতিপ্রাণা ধর্ম্মপত্নীর সামান্য একটী ব্যঙ্গবচনে ব্যথিত হইয়াছ; কিন্তু ইহা কদাচ প্রেমিক ও সুবুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।" এতচ্ছ্রবণে আমি লজ্জিত হইয়া অধোবদনে অবস্থিতি করিতে লাগিলাম। গোলাপ সুন্দরী কহিতে লাগিল—"যিনি প্রেমিক অর্থাৎ যাঁহার হৃদয়ে পবিত্র প্রেমের কোমল মধুর সু-ভাব সর্ব্বদাই জাগরূক আছে, যাঁহার কোমলান্তঃকরণে সারল্য আছে, মানসক্ষেত্রে সুরস ও পর-হিত-চিন্তা আছে, তিনি—কি সুহৃদ্, কি শত্রু, কি সাধু, কি অসাধু কি জ্ঞানী, কি

মূর্খ, কি নর, কি নারী, কি বালক, কি বৃদ্ধ, সকল প্রাণীকেই সমানরূপ কৃপানেত্রে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন ও সকল ব্যক্তিকেই সুহৃদ বা মিত্র জ্ঞান করেন। এই প্রকৃতির ব্যক্তিবৃন্দকে ব্রহ্মাবলোকনকারী সর্ব্বজন-মিত্র বলা যায়। তাঁহারা আত্মাকে, কীট পতঙ্গ হইতে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাদি পর্য্যন্ত, সর্ব্বভূতেই তুল্যরূপে বিদ্যমান দর্শন করিয়া থাকেন। সর্ব্বভূতকেও আত্মাতে অবিচ্ছিন্নভাবে অবলোকন করিয়া থাকেন। এই সকল ব্যক্তিবর্গকে বিশ্বপ্রেমিকও কহে। হে সর্ব্বানন্দ! তুমি স্পষ্টবক্তা, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মিষ্টভাষী এবং তোমার মহদন্তঃকরণ দয়া বা মমতা পরিশূন্য এবং নীরস নহে, তাহাও আমরা অবগত আছি। সত্য বাক্য গুলিন প্রায়শঃ নীরস হয়, এই নিমিত্তই অনেক 'পণ্ডিতমূর্খ' তোমার সত্য বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া অনেক সময়েই অনর্থক অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকে।"

এই সময়ে রূপরেখা নাম্নী চম্পক জাতীয়া একটী কিশোরী কুসুম আসিয়া নবীনার শ্রুতিমূলে, মৃদুস্বরে একটী কথা কহিলে পর, তদুত্তরে নবীনা কহিল—"রূপরেখা! তুমি চিন্তিতা হইও না, আমি সকল কার্য্যেরই সুবিধান করিব।" তৎক্ষণাৎ গোলাপসুন্দরীর ভাব-পরিবর্ত্তন হইল। অপর বিষয়ের উল্লেখ করতঃ, একটী অর্দ্ধ বিকসিতা, পরম লাবণ্যময়ী কুসুমকে নির্দ্দেশ করিয়া, প্রীতি প্রফুল্ল চিত্তে আমাকে কহিল—"হে সর্ব্বানন্দ! হে ভদ্র, হে কুলীন, হে নরকুলরত্ন! আমার ভগ্নী, এই নব-প্রস্ফুটিতা সৌগন্ধবতী সদা প্রীতিদায়িনী, পরম লাবণ্যময়ী বালিকা 'কুন্দসুন্দরী'কে বিবাহ কর। এই মধুমতী 'কুন্দ' সহধর্ম্মিণী নামের যথার্থ সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থা হইবে। ইহার দ্বারা তোমার সাংসারিক যাবতীয় ক্লেশ ও অসুবিধা বিদূরিত এবং নিত্য নব নব অভূতপূর্ব্ব সুখের সঞ্চার হইবে। এই কুসুমললাম 'কুন্দসুন্দরী' সৌরভময়ী, স্থিরযৌবনসম্পন্না কুসুম রূপেই তোমার নিকট অবস্থিতি করিবে, মানবরূপ ধারণ করিবে না। দেহের সহিত দেহের কোনই সম্বন্ধ নাই। সুখ দুঃখাদি সম্ভোগ করিবার একমাত্র কর্ত্তা মনঃ, ইহা আমি ইতঃপূর্ব্বেই তোমাকে কহিয়াছি; সুখ বা সন্তাপ, দর্শন-যোগ্য পদার্থ নহে, আত্মায় উহাদিগের উপলব্ধি হইয়া থাকে মাত্র। বাস্তবিক, সুখ ও দুঃখ কেবল মাত্র মনেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। কুন্দকলিকার সু-ভাব, তোমার সু-ভাবে সম্মিলিত হইলে পর, যে অমৃত ফল উৎপন্ন হইবে, তাহার সু-রসাস্বাদনে তুমি ইহ সংসারে নিরবচ্ছিন্ন সুখই সম্ভোগ করিবে। দম্পতীর

যুগলপ্রাণ একীভূত হইবে, তাহাতে তোমার চিরজীবন শান্তি-সুখে অতিবাহিত হইবে। আমি যথার্থই কহিতেছি, তুমি ইহাকে বিবাহ করিলে, প্রকৃত সুখে সুখিত হইতে পারিবে।”

আমি এতাবৎকাল সেই সদ্য-প্রস্ফুটিতা কোমলা, কুন্দকলিকার তরুণ যৌবন-লাবণ্য দৃষ্টে, একান্ত বিমোহিত হইয়াছিলাম। গোলাপসুন্দরীর সকল কথা আমার শ্রবণ-বিবরে প্রবিষ্ট হইলেও, আমার চিত্তস্পর্শ করিতে সমর্থ হয় নাই। ‘বি—বা—হ’ শব্দ শুনিয়াই, শিষ্টের সদৃশ সরলান্তঃকরণে, সহাস্যবদনে ও প্রফুল্লমনে তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলাম। তন্মুহূর্ত্তেই শুভ বিবাহের উদ্যোগ হইল। কানন-সুন্দরীগণের একান্ত অনুগতা ও আশ্রিতা মধুমক্ষিকাগণকে রসনচৌকীর বায়না দেওয়া হইল; কিন্তু, তাহারা নিশান্ধ বিধায় আবশ্যক সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইতে সমর্থ হইল না। ঝিল্লিগণের দ্বারা সে কার্য্য আংশিকভাবে সম্পাদিত হইল।

কুসুমসুন্দরীগণের মধ্যে হেমাঙ্গিনী, প্রেমাঙ্গিনী, সুরঙ্গিনী, সুশালা, সরলা, অমলা, কমলা, চপলা, বিমলা, দয়া মমতা, প্রতিজ্ঞা, ক্ষমা, স্নেহ, মাধুর্য্য, প্রীতি, শ্রী, সুমতী, সুনীতি, গায়ত্রী, বুদ্ধি, সুহাসিনী, সুভাষিণী, সুমালিনী, সুবদনী, ইন্দুমালা, চন্দ্রলেখা, প্রভৃতি কিশোরী ও তরুণী কুসুম নিচয় সমবেত হইয়া, আমার গাত্রে হরিদ্রা প্রদান করিল। এরূপ সুন্দর পীত বর্ণের ও এমন সু-বাস বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট হরিদ্রা কোথা হইতে সংগ্রহ করিল জানিতে পারিলাম না। মাঙ্গলিক শঙ্খ-ধ্বনি হইল, আমোদিনী কুসুমাঙ্গনাগণের কুসুম-কণ্ঠ-সম্ভব কোমল মধুর হুলু-ধ্বনিতে, নীরব নিশাকালে গোলাপকুঞ্জটীকে মুখরিত করিয়া তুলিল। কুসুমকুলের কোমল-প্রফুল্ল ওষ্ঠাধরের বিমল হাস্য, পরম রমণীয় অনুভূত হইল। বৈবাহিক-কার্য্যগুলিন, যথা নিয়মে, একের পর অপরটী, সুনিয়মে সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন হইল; সঙ্গে সঙ্গে শুভ বিবাহ-কার্য্যও নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইল। যথা বিধানে শুভ-বিবাহ-কার্য্য, সুসম্পন্ন হইয়া গেল দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণের আনন্দ-উৎস উথলিয়া উঠিল। গোলাপসুন্দরীর অনুমতি অনুসারে আমি ক’নের লজ্জা বস্ত্রখানি ধীরে ধীরে আকর্ষণ করতঃ, তদ্দ্বারা তাহার হাস্যোৎফুল্ল বদনেন্দুর উর্দ্ধাংশ আবৃত করিয়া দিলাম। তদনন্তর, কয়েকটী কৌতুক-ভাব-সম্পন্না কমনীয়া কুসুম প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে পরম সমাদরে বরকন্যাকে রসের বাসর ঘরে উপবেশন

করাইল। তথায় হাস্যমুখী, চপল প্রকৃতি বিশিষ্টা, কোমলা কুসুমাঙ্গনাগণের রীতিমত 'মে য়ে ম জ লি স' বসিল। পুণ্যপ্রাণা কুসুমসুন্দরীসমূহকে ত্রিদশালয়ের সুপবিত্রা দেবাঙ্গনাগণের ন্যায় সুদর্শনা, সুন্দরী ও পবিত্র ভাবাপন্না দেখিলাম। এমন সুখময় স্থান, গোলাপকুঞ্জের এরূপ সুন্দর শোভা, নিদাঘ-নিশীথে সুমধুর চন্দ্রালোকে কুসুমকামিনী কুলের এমন সুন্দর সম্মিলনী সভা, এমন পবিত্রভাবে পরস্পরের সহিত পরস্পরের মধুরালাপ এবং এমন সুনিয়মে কার্য্যাদি সম্পাদন, আমি কখনও কুত্রাপি সন্দর্শন করি নাই। মানব জীবনে এরূপ সুখকর দৃশ্য-দর্শন অসম্ভব। আমার দেহ ও মনের প্রত্যেক পরমাণুই যেন, এই সময়ে, অপরিসীম আনন্দ সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতেছে অনুমিত হইল। কুসুমাঙ্গনাগণের কার্য্যাদি পরিদৃষ্টে ও তাহাদিগের মধুরালাপে আমার হৃদয় ও মন পরম পরিতৃপ্ত হইল; জন্ম সার্থক জ্ঞান করিলাম। এই সকল আনন্দ যথাবৎ প্রকাশের শব্দ, ভাষা-মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া, সফল মনোরথ হইলাম না; সুতরাং সে সকল বিষয় অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়া গেল; রসজ্ঞ পাঠক ও রসিকা পাঠিকাগণের জ্ঞান-গোচর করিতে অসমর্থ হইলাম বিধায়ে, মনোমধ্যে সম্যক্ সন্তাপ রহিয়া গেল।

বেলা, মল্লিকা, যূথিকা, জাতি, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা ও কমল প্রভৃতি পুষ্প শ্যালিকা রূপে দর্শন দিয়া, আমার সন্নিধানে আসিয়া উপবেশন করিল। বিস্তর পরিহাস, বিস্তর রসালাপ, বিস্তর—কুসুমোচিত—পবিত্র রহস্য করিল। তাহাদিগের কোমল ও সুমধুর ভাষায় আমি বিমোহিত হইলাম। বকুল, চম্পক, পলাশ, বক, পারুল, করবী, আতশী, অপরাজিতা, আকন্দ ও কলিকা পুষ্প শ্বশ্রূাদি মাতৃভাবে আগমন করতঃ, উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করিল। গোলাপ, গাঁদা, জবা, কৃষ্ণচূড়া, ঝুমকা, অশোক, ঘেঁটু, দোপাটী, পলাশ, মুচ্‌কুন্দ প্রভৃতি পুষ্প, 'দিদিশ্বাশুড়ী' রূপে দর্শন দিয়া, উপযুক্ত আসনে সমাসীনা হইল। মর্য্যাদা ও বয়ক্রমানুসারে প্রত্যেক পুষ্পই উপযুক্ত বেশে, উপযুক্ত ভাবে, উপযুক্ত আসনে উপবেশন করিল। কুসুমাঙ্গনাগণের সুমধুর সঙ্গীত-ধ্বনিতে বাসর ঘরে অপূর্ব্ব আনন্দ-প্রবাহ বহিতে লাগিল। দেবব্রাত-বাঞ্ছিত ত্রিদিব-শোভা নন্দন কাননের নিত্যানন্দময় কেলিগৃহ মনে পড়িল। সর্ব্ব প্রথমে, ঝুম্‌কা পুষ্প তাহার অদ্ভুত অলঙ্কার রাশির দুর্ব্বহ ভারাক্রান্তা হইয়া, বিস্তর আড়ম্বরসহ, উদ্বেল হৃদয়ে এই গীতটী গাহিয়াই ঘর্ম্মাক্ত কলেবরা ও ক্লান্তা হইয়া পড়িল।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

প্রেমের ধরায় প্রেম বিরাজে—
প্রেমই ধরার সার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল প্রেমের আধার॥
প্রেমে সৃষ্টি, প্রেমে স্থিতি,
প্রেমে বাঁধা এ সংসার।
মানবে দেবত্ব লভে,—হ'লে হৃদে প্রেম-সঞ্চার॥

ঝুমকার অলঙ্কার-রাশিই তাহার অসুবিধার একমাত্র কারণ হইয়াছিল। মল্লিকার বয়স অল্প এবং সে কৃশাঙ্গী, সবে মাত্র যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছে; উপর্য্যুপরি তিনটী গীত গাহিয়াই সেও ক্লান্তা হইয়া কুন্দকলিকাকে গীত গাহিতে অনুরোধ করিল। কুন্দও সবেমাত্র যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিয়াছে, এখনও তাহার সকল অঙ্গ সম্যক্ প্রস্ফুটিত হয় নাই। লজ্জাবনতমুখী কুসুমটী ভালরূপ গাহিতে পারিল না দেখিয়া, অসামান্যা রূপবতী কুসুমকুলেন্দ্রাণী শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী আপন অতুলনীয় রূপরাশিসহ আমার একান্ত সমীপবর্ত্তিনী হইল এবং কুসুমোচিত সু-ভাবে ও অপূর্ব্ব ভঙ্গীতে কুসুম-কণ্ঠ-সম্ভব মৃদু মধুর স্বরে গাহিল—

বিভাষ—একতালা।

মধুরা রজনী, চন্দ্রমাশালিনী—
মধুর মলয় বায়।
মধুর গগনে, মধুর মিলনে,
চকোর চকোরী ধায়॥
মধুময়ী ধরা, মধুরসে ভরা;
হেরি সব মধুময়—
মধুর লহরি, অমিয় সঞ্চারি'
মধুর পরাণে বয়—
প্রেমের নাগর, রসের সাগর
রসিকা নাগরী তায়—
মিলেছে মধুর; আনন্দ প্রচুর—
ফুলবালা সবে আয়॥

প্রীতিফুল্ল প্রাণে, মধুময় তানে,
গাহিব মধুর গান—
মাতিবে কানন, মাতিবে গগন,
মাতিবে জীবের প্রাণ—
গানে গানে ধনি ! যাপি' নিশাথিনী ;
সুখ-নিশা ব'য়ে যায়।
বাঁধি জনে জনে, প্রেমের বন্ধনে,
আয় সখি !—সবে আয়॥
কুসুমের মনঃ কোমল কেমন !
কুটিলতা নাহি তায়।
সেই মনে মনঃ, বাঁধে যেই জন,
পড়ে না সে প্রেম-দায়॥

বিশুদ্ধ প্রেম বিলাসিনী, মাধুর্য্যময়ী, শ্রীমতী গোলাপসুন্দরীর এই সদ্ভাবপূর্ণ সুললিত প্রেম-সঙ্গীত-প্রবাহে মনঃপ্রাণ পুলকিত হইল। এরূপ সুধাসিক্ত সুমিষ্ট স্বর বিশিষ্ট সু-ভাবের মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি ইতঃপূর্ব্বে আর কখনও আমার শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইয়া, আমার মনঃ হরণ করে নাই। সঙ্গীতান্তে সকল পুষ্পই, রসিকা গোলাপসুন্দরীর যথেষ্ট প্রশংসা করিল। রসের কথায়, রসের সঙ্গীতে, রসের আলাপে, রসের পরিহাসে, রসের বাসরগৃহে রসের প্রবাহ বহিতে লাগিল। তৎকালে, আমার মনঃ যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে নিমগ্ন ছিল, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যের অনুভব একান্ত অসম্ভব। সুখের সময়টী অনতিবিলম্বেই অতিবাহিত হইল। সুখময়ী রজনী অবসানপ্রায় পরিদৃষ্টে, আমার নবপরিণীতা পত্নীর পিতামহী ঠাকুরাণী লাবণ্যময়ী গোলাপ ফুলটীর নিকট, আমার সদ্যবিবাহিতা, রূপবতী, তরুণী বনিতা সমভিব্যাহারে স্বগৃহে প্রত্যাগমনের অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিলাম। এই অপূর্ব্ব বিবাহের উপহার স্বরূপ কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ দুষ্প্রাপ্য কমল-মধু পাওয়া গিয়াছিল ; রত্নমালা নাম্নী রজনীগন্ধা জাতীয়া, একটী যুবতী, দীর্ঘাকারা, স্থূলাঙ্গী ও মধুর হাসিনী প্রজাতা প্রসূন আমাকে সাদর সম্ভাষণে কহিল—ভাই সর্ব্বানন্দ ! এই সুধাসম উপাদেয় এবং মহোপকারী মকরন্দ তোমার মুখরা 'সু-মুখী'র কোমল কণ্ঠে ঢালিয়া দিও, ইহার সুগুণে সে 'মধুরভাষিণী' হইবে।" সুচারুহাসিনী রত্নমালার সুমধুর বচনে আমি কোন প্রকার উত্তর না দিয়া মৌনভাবে রহিলাম,

ওষ্ঠাধরে মৃদু হাসি-রেখা-বিকাশ হইল মাত্র। আমার মনোভাব অনুভব করিয়া রত্নমালাও হাসিল। গুপ্ত মনোভাব আমার বদন মণ্ডলে প্রকাশ পাইতেছিল। কুসুমাঙ্গনাগণ মৃদু মধুর হাসিল! আমি তাহাদের হাসির কারণ বুঝিতে না পারিয়া মূকের মত নির্ব্বাক রহিলাম। কাঙ্গালিনী ভিখারিণী স্বরূপ—কিছু প্রাপ্তির আশায়—বিস্তর পিপীলিকা বিবাহ-স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আমি সমুদায় কমলমধু তাহাদিগকে বিতরণ করাতে, তাহারা আমাকে শুভাশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বনান্তরে প্রস্থান করিল।

দেখিতে দেখিতে ক্রমে পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কৃত হইতে লাগিল। ঊষাদেবীর শুভাগমনের পূর্ব্বাবস্থায় তিমিররাশি ম্লানভাব ধারণ করতঃ গভীর নিবিড়ারণ্য-মধ্যে লুক্কায়িত হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে রূপবতী ঊষার আরক্তিমারাগ অস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। নিদাঘ-প্রভাতের কোমল-স্নিগ্ধ সমীরণ মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতে লাগিল। প্রফুল্লকমলসমলঙ্কৃত বিমলসলিলসরোবর-কূলে ভ্রমরাদি মধুপায়িপ্রাণিগণের আনন্দ-গুঞ্জন শ্রুতিগোচর হইল। নিদ্রোত্থিত বিহঙ্গমনিবহ নিজ নিজ নীড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুমধুর স্বরে প্রভাতী গীত গাহিয়া, গোলাপকুঞ্জ আমোদিত করিতে লাগিল। প্রভাত কালের শৈত্য-সমীর-সঞ্চালনে, পার্শ্ববর্ত্তী আরামের কুসুম-কলিকাকুল নীরবে ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিতা হইতে লাগিল এবং অসীম আকাশের তারকারূপিণী প্রসূননিচয়, এই সময়ে, একে একে নীলাম্বরাভ্যন্তরে বিলীন হইল। দিবাভীত জীবব্রজ বনমধ্যে লুক্কায়িত হইল। পরে—প্রভাতের নবোদিত তরুণ তপনালোকে অন্ধকার রাশি অল্পে অল্পে বিনষ্ট হইতে লাগিল। মুক্ত-বাতায়ন-পথ-প্রবিষ্ট প্রভাকর-কর-স্পর্শে অর্দ্ধনিদ্রিত যুবা জম্পতীর প্রগাঢ় প্রেমালিঙ্গন শিথিল হইতে লাগিল। সুপ্ত বিশ্ব জাগিয়া উঠিল। প্রকৃতিসুন্দরী অপূর্ব্ব অভিনব ভাব ধারণ করিয়া জগজ্জনকে বিমোহিত করিল। বিভাবরী বিগতা দেখিয়া, আমার সুস্থির চিত্ত কিঞ্চিৎ বিচলিত হইল। কেননা, এমন সুখের দিন আর ফিরিবে না। লাবণ্যময়ী শ্রীমতী গোলাপসুন্দরীর সদনে স্বকীয় মনোভাব পরিব্যক্ত করায়, তিনি শারদীয় পূর্ণশশধর-সদৃশ সহাস্য আস্যে ও প্রফুল্ল বদনে বলিলেন—"আমার ভগ্নী 'কুন্দসুন্দরী'কে তুমি এখনই স্বগৃহে লইয়া যাইবে; আমাদের পরম যত্নের নিধি, কুন্দকে তুমিও যত্নে রাখিবে ও পরমাদরে প্রতিপালন করিবে, তাহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। তুমি 'কুন্দসুন্দরী'কে সংসার-মধ্যে মানবী মূর্ত্তিমতী রমণীরূপে নিরীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না।

প্রেম-পাত্রী প্রিয়তমা পত্নীকে তোমার অপার প্রেমপূর্ণ পবিত্র হৃদয়-কন্দরে নিরীক্ষণ করিয়া সুখিত হইবে। কুন্দসুন্দরী নিভৃত সময়ে তোমার হৃদয় মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্তা হইয়া তোমার সম্মুখবর্ত্তিনী হইবে; কিন্তু তোমার নিজ ইচ্ছায় কদাচ তোমার সম্মুখীন হইবে না। কুন্দ, আপন অভিলাষানুযায়ী বহির্গতা হইয়া তোমার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করিবে। কুন্দসুন্দরীর সহিত বিশুদ্ধ প্রেমালাপে তুমি সম্যক্ সুখী হইতে পারিবে। উচ্চ তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, সংস্কার থাকা আবশ্যক; এ সংসারে সকলের সংস্কার সমান নহে। অনেক পুণ্যে, লোকে বিশুদ্ধ সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। কুসংস্কার সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কদাচ উচ্চ তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। হে সর্ব্বানন্দ! তুমি আপন হৃদয়-মধ্যে অনুসন্ধান কর, আমার প্রসাদে সমস্ত দৃশ্যমান পদার্থই তথায় দেখিতে পাইবে। পুষ্প কি, উদ্যান কাহাকে বলে, প্রত্যেক বস্তুর সহিত প্রত্যেক বস্তুর কি সম্বন্ধ, জড় ও চেতনে কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে কি না, মৃত্যু কি বস্তু, কাহার নাম মৃত্যু, মৃত্যুও তোমার অধীন কি না, ইত্যাদি বিষয় সুন্দররূপে বুঝিতে পারিবে। স্বামী কাহাকে বলে জান কি? ক্রমে জানিতে পারিবে। তুমি আমার স্বামী কি আমি তোমার স্বামী, এ উচ্চ তত্ত্ব এখন বুঝিতে পারিবে না। বারান্তরে বুঝাইয়া দিব। স্বামীকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসা, তাঁহার পরম পবিত্র পদপঙ্কজে প্রাণোৎসর্গ করা, এবং তাঁহার পরিচারিকা অথচ প্রাণবল্লভা হইয়া, নিত্য নিয়ত সদ্ভাবে অবস্থিতি করাই কুসুমকুলের কুলধর্ম্ম। আমরা কোন অবস্থাতেই স্বামী—অর্থাৎ মূর্ত্তিমান ধর্ম্ম—পরিত্যাগ করি না। ধর্ম্মই আমাদিগের সহায়, শক্তি, সম্পদ, সুহৃদ, সম্বল ও ঐশ্বর্য্য। ধর্ম্ম ব্যতীত ইহ সংসারে অপর কোন পদার্থেই সুখ নাই। ধর্ম্মবল যাহার যত, সে তত সুখী। ধর্ম্মেই সুখ—অধর্ম্মে অসুখ। এই সংসার মহা সঙ্কটাকীর্ণ এবং ক্লেশ রাশিতে পরিপূর্ণ। যাহাদিগের বিশেষরূপ ধর্ম্মবল আছে, যাহারা সুখ ও দুঃখ এতদুভয়-কেই সমান জ্ঞান করিয়া কার্য্য করে, যাহারা দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণকে আত্মবশে রাখিয়া উপযুক্ত বিষয়ে পরিচালিত করে, যাহারা তত্ত্বজ্ঞ, অলাভে যাহাদিগের চিত্ত বিচলিত ও ক্ষুব্ধ না হয়, সন্তাপ যাহাদিগের হৃদয়ে আশ্রয় প্রাপ্ত না হইয়া দূরে প্রস্থান করে, তাহারাই সংসাররূপ মহা ভীষণ অর্ণব হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়। মণিমাণিক্যাদি রত্নরাজি মহামূল্য ও দুর্লভ সামগ্রী বটে, কিন্তু ধর্ম্মের সহিত তুলনায় সে সকল পদার্থ অতি তুচ্ছ বা অকিঞ্চিৎকর। ধর্ম্ম অমূল্য; ধর্ম্মের উপমা ধর্ম্ম, ধর্ম্মের মূল্য ধর্ম্ম এবং ধার্ম্মিকই ধর্ম্মের মহিমা

জানে। হে প্রিয়দর্শন! সৌরভবিহীন প্রসূনের মনোহারিণী কান্তি ও সুন্দর বর্ণ বিদ্যমানেও তাহার সম্যক্ সমাদর নাই, ইহা স্থির। দশন বিহীন আননের যেমন সৌন্দর্য্য নাই, সত্যহীন বাক্যের যেমন আদর নাই, সেইরূপ ধর্ম্মবিহীন মানবেরও কোথাও যশঃ-সুখ্যাতি লাভের কিছুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। পুণ্যের অনুষ্ঠান করিলে, ধর্ম্মবুদ্ধি ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে; কিন্তু, পাপাচরণে নীচবৃত্তিনিবহ অতীব ভীষণ ভাব ধারণ করে এবং পরিশেষে অসীম অনর্থ ঘটায়। অতএব হে 'সু-মুখী'-জীবন! তুমি সর্ব্বদাই সর্ব্বপ্রযত্নে সাত্বিক ভাবে মঙ্গলকর পুণ্য-কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবে, কেননা, তাহাতে দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি হইয়া নিরন্তর সুখেরই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মানবের, ধর্ম্মশাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক এবং অকর্ম্ম অর্থাৎ সংন্যাসাশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিবারও তত্ত্ব বিদিত হওয়া কর্ত্তব্য এবং বিকর্ম্ম অর্থাৎ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মেরও বিষয় অবগত হওয়া একান্ত উচিত, যেহেতু কর্ম্মের গতি অতি দুর্জ্ঞেয়। কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম কেবল গুরু-মুখেই অবগত হওয়া যায়। গ্রন্থপাঠে উহাদের নিগূঢ় রহস্য জানা যায় না। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণোগতিঃ॥"

গীতা, ৪র্থ অঃ, ১৭শ শ্লোকঃ।

এমন সময়ে মণিপ্রভা (কুণ্ডলিনী) নাম্নী, চন্দ্রমল্লিকা জাতীয়া (সহস্রদল) একটি রসিকা (রসস্খলন হয়) নবীনা (সদা কোমল ভাব) কুসুম আসিয়া আমাকে কয়েকটী সুকথা শুনাইয়া দেহতত্ত্ব বিষয়ক উপদেশ দিল। (কারণ, এতদিন পরে, এই সময়ে আমার সে গূঢ় উপদেশ গ্রহণ ও ধারণা করিবার প্রকৃত সময় উপস্থিত হইয়াছিল) মণিপ্রভার উপদেশ গুলিন অমূল্য * এক একটী উপদেশের মূল্য এক একটী জীবন। যাহারা তত্ত্বজ্ঞ, কেবল মাত্র তাহারাই বুঝিতে পারে আত্মতত্ত্ব কি বস্তু এবং সে তত্ত্বে জ্ঞান লাভ করিতে

* উপদেশ গুলির মধ্যে দুই একটী লিখিবার ইচ্ছা ছিল এবং লিখিলেও বোধ হয় সাধারণ পাঠকের পরম তৃপ্তিকর হইত। কিন্তু তান্ত্রিকগণের নিকট তাহা নূতন বলিয়া বোধ হইত না। এই প্রবন্ধটির ১মাংশ মাত্র প্রকাশিত হইলে "স্বদেশী" সম্পাদক মহাশয় "ইহাতে কিছু নূতনত্ব নাই" বলিয়া স্বীয় পত্রে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং, শঙ্কা-প্রযুক্ত উপদেশগুলিন লিখিলাম না।—লেখক।

পারিলে পরিণামে কি হইয়া থাকে। যেমন—ঈশ্বর লাভ হইলে কি হয়? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—ঈশ্বর লাভ হইলে 'ঈশ্বর লাভ' হয়, ইহা ভিন্ন আর কোন উত্তর হইতেই পারে না। মিষ্টান্ন খাইলে কি হয় জিজ্ঞাসা করিলে, তদুত্তরে বলা যাইতে পারে—রসনা পরিতৃপ্ত, উদর পূর্ণ ও সুখ লাভ হয় ইত্যাদি। কিন্তু, ঈশ্বর লাভের বেলায় আর কোন উত্তরই সঙ্গত হয় না। ঈশ্বর লাভে যে কিরূপ অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় তাহা সাধারণের জ্ঞান-বহির্ভূত।

গোলাপসুন্দরী সহস্র দল, লালবর্ণ, কোমল, সুগন্ধবিশিষ্টা, গর্ভে বীজকোষ; তথাচ সে বীজে কাজ হয় না) পুনর্ব্বার কহিতে লাগিল—"স্ত্রীলোকের সহিত (এ স্থলে স্ত্রীলোক কাহারা তাহা বিজ্ঞ পাঠক বুঝিবেন, বিজ্ঞের নিকট নূতনত্ব থাকিবেনা বলিয়া, এস্থলে সে সকল কথা খুলিয়া বলা হইল না।) নিরন্তর বাস করা, বা তাহাদিগের সহিত সতত হাস্য পরিহাস, কৌতুক, বাদানুবাদ এবং ঘনিষ্ঠতা করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। পাপের প্রধান সহায় নারী *। নারী হইতে সর্ব্বদা দূরে বাস করিবে। পরনারী-প্রসঙ্গে বহুবিধ দোষ সংঘটিত হইয়া থাকে; ইহাতে ধন, মান, সম্ভ্রম, গুণ, ব্রত, ধর্ম্ম, দেহ ও অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। নিদারুণ নিদাঘের মধ্যাহ্নকালীন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড সন্দর্শনে যেমন কোমল লোচনের বিমল জ্যোতিঃ আশু বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ, পররমণীর প্রতি কু-দৃষ্টি প্রদানে শক্তি ও তেজের বিনাশ হইয়া থাকে। যে গৃহে নারী বাস করে, সে গৃহে সাধু বা উদাসীন বাস করে না; যে স্থানে সিংহী বাস করে, তথায় মৃগের বাসে, মৃগেরই সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে; যেখানে প্রজ্বলিত পাবকরাশি বিরাজমান, তথায় তুলা রাশির অস্তিত্ব কখনই সম্ভবপর নহে; নিজ পতিপ্রাণা পত্নী ব্যতীত যে ব্যক্তি পরনারীতে অনুরক্ত হয়, তাহার আয়ুঃ, ধন, মান, যশঃ, জ্ঞান ও পুণ্যনাশ হইয়া থাকে।" ইত্যাদি।

কুসুমকুলগৌরবিনী গোলাপসুন্দরীর সদুপদেশপূর্ণ মধুর বচনাবলী সুধাংশুর অংশু সম মনোহর; মলয় সমীরণের ন্যায় স্নিগ্ধ ও প্রাণ শীতলকর; গঙ্গাবারির ন্যায় পবিত্র এবং চন্দন-সম চিত্ত প্রফুল্লকর। এই সকল পরম উপাদেয় উপদেশ সংসার-তাপ-সন্তপ্ত ব্যক্তিবর্গের পক্ষে তুলসীর ন্যায় নিতান্ত হিতকর। এই সকল সদুপদেশ শ্রবণে, আমার চির নীরস হৃদয়েও সু-রসের সঞ্চার

---

* নারী শব্দের অর্থ নরজাতিস্ত্রী এবং অন্য অর্থে ৩ অক্ষর ছন্দো বিং। এ প্রবন্ধে উভয় অর্থই সঙ্গত হয়। উভয় অর্থেরই সুব্যাখ্যা হইতে পারে। লেখক।

হইল।* আনন্দরসে হৃদয় উথলিয়া উঠিল, মূঢ়ের মত বসিয়া রহিলাম, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। পরে, কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে দেখিলাম, আমাদিগের 'শুভ বিদায়ের' সমস্ত বিষয়েরই আয়োজন হইয়াছে। তখন আমি পরম হিতৈষিণী গোলাপসুন্দরী ও অপরাপর কুসুমসমূহকে যথাযোগ্য নমস্কার ও আদর সম্ভাষণ করিয়া, আনন্দাশ্রুপূর্ণ লোচনে তাহাদিগের নিকট হইতে শুভ বিদায় গ্রহণ করিলাম। কৃপাশীলা, পুণ্যবতী, ও মধুরভাষিণী গোলাপসুন্দরী আমাকে আরও বহুপ্রকার সদুপদেশ দিয়া পরিশেষে সহাস্য আস্যে কুসুমোচিত বহুবিধ শুভাশীর্ব্বাদসহ বিদায় দিল। কুসুমকুলের রীত্যনুসারে অষ্টাহান্তে পুনর্ব্বার আমাকে লইয়া যাইবার জন্য, উপযুক্ত বাহন ও লোক প্রেরণ করিবে, আমাকে পুনর্ব্বার সস্ত্রীক "গোলাপ-কুঞ্জে" আসিতে হইবে বলিয়া দিল। আমি হৃষ্টচিত্তে, সরলান্তঃকরণে, সহাস্য বদনে সম্মতি দান করিলাম। কুসুমাঙ্গনাগণের সুকোমল কণ্ঠ-ধ্বনিতে লতাকুঞ্জ আর একবার মুখরিত হইয়া উঠিল। এই সমুত্থিত মঙ্গলধ্বনি মলয়ানিলে মিলাইতে না মিলাইতে, আমরা তথা হইতে বিদায় হইলাম।

অপূর্ব্ব-বিবাহ-লব্ধ অপূর্ব্ব ভার্য্যা লইয়া, অপূর্ব্ব আনন্দ ও যৎপরোনাস্তি উৎসাহ সহকারে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। নিজ নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করতঃ, দুগ্ধফেননিভ শুভ্র ও সুকোমল শয্যার উপর পরমানন্দে উপবেশন করিলাম এবং বিবিধ সুখ-চিন্তায় নিমগ্ন হইলাম। মনে হইল, পরম পিতা পরমেশ্বর প্রসন্ন হইলে, শার্দ্দূল, সিংহ প্রভৃতি বন্য হিংস্রক প্রাণিগণও অজ্ঞাতসারে মানবের হিত-সাধন করিয়া থাকে। বেলা ক্রমশঃ অধিক হইতে লাগিল, তথাপি আমার এই অপূর্ব্ব বিবাহের বার্ত্তা বাটীর কাহাকেও, এ পর্য্যন্ত জানাইতে পারিলাম না। লজ্জা বাধা দিতে লাগিল। আমার নব বিবাহিতা কুসুম-বনিতাকে দর্শনাভিপ্রায়ে, নিজ হৃদয়-মন্দির-মধ্যে অনুসন্ধান করিলাম।

সর্ব্বনাশ! একি!!—বিস্ময়বিহ্বল চিত্তে ও চকিত নেত্রে নিরীক্ষণ করিলাম কুসুমবনিতার পরিবর্ত্তে, হৃদয়াসনে, আমার পূর্ব্ব-বিবাহিতা বনিতা সুধামুখী শ্রীমতী 'সুমুখী' পুষ্পময়ী হইয়া বিরাজ করিতেছে। কৃষ্ণ রেশম সম সুকোমল, সুচিক্কণ, মসৃণ ও উজ্জ্বল কেশপাশ বিমুক্ত করিয়া, খড়্গাহীনা মুক্ত-

---

* সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বেই সাধকের হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ-সঞ্চার হইয়া থাকে, ইহা না হইলে সাধকের ধৈর্য্য থাকে না। সদনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গেই বিমল আনন্দরাশি হৃদয় অধিকার করে। লেখক।

কেশিনী স্বরূপা হইয়া রহিয়াছে। তাহার অনুপম রূপ-লাবণ্যে আমার হৃদয় মন্দির উজ্জ্বলিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিত হইয়াছে *। লোহিতাভ সুকোমল ওষ্ঠাধরের পরম রমণীয় হাস্যে ও স্থির কোমল প্রসন্ন দৃষ্টিতে করুণাময়ীর অপার করুণার আভাস পাওয়া যাইতেছে। হৃদয়ের মধ্যস্থল হইতে সুমধুর স্বর লহরী উর্দ্ধে উঠিয়া সহস্রারে মিলিতেছে। সকল বিষয়ই নূতন ভাবে ও নূতন রূপে দেখিতেছি। যেন সকল বস্তুই সমভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে। হৃদয় মন্দিরে প্রসূন বনিতাকে দেখিতে না পাইয়া আমি বিস্মিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এরূপ ব্যতিক্রম হইবার হেতু কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ভয়-বিহ্বল-চিত্তে, নম্রভাবে, সুমৃদু স্বরে 'সু-মুখী'কে জিজ্ঞাসা করিলাম "আমার কুসুম ভার্য্যা কোথায় ?" 'সু-মুখী' সহাস্য আস্যে, মধুর বচনে, স্বাভাবিক কোমল স্বরে সুধীরে উত্তর প্রদান করিল—"জীবিতেশ! জীবনসর্ব্বস্ব! অবলার একমাত্র সুহৃদ! কুসুম-বিবাহ সর্ব্বৈব মিথ্যা, ঐন্দ্রজালিক ভ্রম; উহা 'কবির স্বপ্ন' মাত্র। আমিই তোমার একমাত্র ধর্ম্মপত্নী, হৃদয়ের স্ত্রীরূপা প্রণয় কুসুম। সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, জলে, স্থলে অন্তরীক্ষে, সকল সময়ে, সকল অবস্থায় আমিই তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী পত্নী, আমিই সহধর্ম্মিণী, আমিই ইহ-পরকালের সঙ্গিনী। তুমি পুরুষ, আমি প্রকৃতি। তুমি জ্ঞান, আমি মায়া। সৃষ্টিকার্য্যে আমিই প্রধানা, আমিই মূল প্রকৃতি। সুধাকর ও জ্যোৎস্নার মত, রবি ও রৌদ্রের মত, পুষ্প ও পুষ্পসৌরভের মত, আমি তোমার নিত্য সহচরী; আমাদের উভয়ের বিচ্ছেদ নাই। এই আমাদের প্রকৃত বিবাহ। মায়া-ত্যাগ হইলেই, জীবাত্মা পরমাত্মায় লয় হইয়া যায়। এ-ই প্রকৃত বিবাহ। ইহার কোন কল্পে,কোন যুগে কোন অবস্থায় বিচ্ছেদ নাই,তাহাই প্রকৃত বিবাহ। এ বিশ্বে আর কেহই নাই; কেবল তুমি আর আমি অথবা আমি আর তুমি। আমরা কেহই পৃথক নহি। সুতরাং, জ্ঞানবানে কহিয়া থাকে—ব্রহ্মাণ্ডে দুই নাই আছে মাত্র এক; যিনি একমেবাদ্বিতীয়ং। সেই এক বস্তুই 'আমি' কারণ, সেই এক ভিন্ন সমগ্র বিশ্বে আর কিছুই নাই যাহাকে তুমি বলিয়া উল্লেখ করিতে পারা যায়। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমরা (স্ত্রী পুরুষে) সম্মিলিত হইলাম। এক্ষণে আর দুই বস্তু রহিল না। উভয়ে মিলিয়া এক

---

* বান্ধুলি পুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বল কান্তি বিশিষ্ট অনাহত নামে হৃদ্‌পদ্ম আছে। উহার বর্ণ সিন্দূর বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ। এই স্থানের সিদ্ধি লাভ হইলে সাধককে আর নিম্নগামী হইতে হয় না।—লেখক।

হইলাম। এ অবস্থার অপরিসীম আনন্দ, প্রকাশ করা অসম্ভব। ভুক্তভোগী ব্যক্তিই কেবল এ অবস্থার আনন্দ স্বয়ং উপভোগ করিতে সমর্থ হন মাত্র। প্রকাশের ক্ষমতা থাকেনা। সে আনন্দের আভাস প্রদান করাও সুদূর পরাহত।

এমন সময়ে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখি, নিদাঘ-কোমল-নৈশ-সমীর প্রবাহিত, সেই স্নিগ্ধ--শুভ্র-কৌমুদী-বিধৌত অট্টালিকার শিরোদেশেই শয়ন করিয়া আছি। 'সুমুখী' সুন্দরী পরম সমাদরে আমার কর ধারণ পূর্ব্বক মধুর বাক্যে কহিতেছে—"রজনী অধিক হইয়াছে, এক্ষণে শয়ন কক্ষে চল।" তখনও, আমার মনঃ স্বপ্ন-কুয়াশায় সমাচ্ছন্ন থাকায়, স্বরূপ নির্দ্ধারণে সম্পূর্ণ অসমর্থ আছি। স্বপ্নটীকেই প্রকৃত ঘটনা বলিয়া জ্ঞান করিতেছি। ভার্য্যা 'সু-মুখী'র পুনঃ পুনঃ তাড়নায়, বিনা আপত্তিতে শয়ন মন্দিরে গমন করিলাম।

কুসুমকুল-সম্রাজ্ঞী, করুণাময়ী গোলাপসুন্দরীর সৌজন্য, সুমিষ্টালাপ, সদাশয়তা, সদ্ব্যবহার ও শুভাশীর্ব্বাদ এবং যৎপরোনাস্তি যত্ন প্রদত্ত অমূল্য উপদেশাবলী, অদ্যাবধি বিস্মৃত হই নাই। সে সকল ঘটনা ইহ জীবনে বিস্মৃত হইতে পারিব না।

সমাপ্ত।

কবির স্বপ্নটী 'চাঁদরাণী'কে উপহার দিলাম।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ।

মশক।

বাছারা ঘুমের ঘোরে ছিল যবে,
খোলা পথ পেয়ে ঢুকিলি ঘরে।
তখন তোদের পাখাটি নড়েনি,
শবদ একটী ক'রোনি, জোরে।
বিপিনে থাকিতে, পশুর শোণিতে,
উদর পূরিতে তখন তোরা।
এবে ঘরে পশি, পাখসাট মারি,
অহঙ্কারে ভাব ধরারে সরা।
ভ্রমরের মত মধুর গুঞ্জনে
মধু ঢালি দেও কাণের কাছে।

ফলে, ছলে, বলে, হুলটি ফুটাও,
আগে বুঝা ভার, বুঝে তা পাছে।
বাছাদের বুকে পশিয়া বসিয়া
হুল ফুটাইয়া শোণিত পান,
নীরবে করিছ, নিয়ত নিভৃতে,
পান করি ধর মধুর তান।
বাহিরিয়া লও, দেহের রুধির,
এক বিন্দু তার দেখা কি যায়?
এক বিন্দু তার বাহিরে পড়েনা,
কি করি মানব বুঝিতে পায়।
অরে, রে মশক, শোণিত শোষক,
শোণিত লভিয়া উড়িয়া যাও।
পুনঃ উড়ি আসি, বুকেতে বসিয়া
শোণিত শুষিয়া কোথায় ধাও?
ঝঙ্কার করিয়া, হুহুঙ্কার করি,
বুঝাও জগতে "আমরা বীর"।
তবে কেন সবে ঘুমালে, নীরবে
পশিলে এ ঘরে নোয়ায়ে শির।
তোদের বীরত্ব, বুঝেছি বুঝেছি,
বুঝেছি তোদের মধুর বাণী!
বাছারা জাগিছে, উদিছে তপন,
থাকিলে তোদের হইবে হানি।
যারে পলাইয়া শোণিত শোষক,
মশকের পাল, ঝেঁটিয়া দিব।
বাছাদের আর, ঘুমাতে দিব না,
শিয়রে বসিয়া জাগিয়ে নিব'।

শ্রীজগদীশ্বরী দেবী।

সাহিত্য সভার "সাহিত্য-সংহিতা"।

কল্যাণীয় সহযোগী সম্পাদক !—

শ্রীযুত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী রায় বাহাদুরের মত অনেকগুলিন কৃতবিদ্য, সংস্কৃত-পণ্ডিত, মহামহোপাধ্যায় ও জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তি লইয়া, শোভাবাজার, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে সাহিত্য-সভা সংগঠিত হইয়াছে। বহুতর মান্যগণ্য ও বিশিষ্ট পণ্ডিত, এই সভার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হইয়াছেন। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ও পুষ্টিসাধন করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রায় একাদশ বৎসর হইল, এই সভার কার্য্য সমভাবে চলিতেছে বটে, কিন্তু সভ্যগণ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষার কিছুমাত্রও উন্নতি হয় নাই। এই মহতী সভা হইতে "সাহিত্য সংহিতা" নামক (সাহিত্যমূলক) একখানি পত্র, প্রতি মাসে (?) প্রকাশিত হইয়া থাকে। সাহিত্য-সভার সভ্যবৃন্দ, এই পত্র, বিনামূল্যে পাইয়া থাকেন। অপরের পক্ষে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা নির্দ্ধারিত আছে। কাগজখানি নিয়মিতরূপ বাহির হয় না। বাঙ্গালীর কাগজ যেমন বাহির হয়, এখানিও সেইরূপ ভাবে বাহির হইয়া থাকে। বঙ্গের প্রায় সমুদায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এই সভায় যোগ দিয়াছেন এবং যাহাতে, বঙ্গভাষা, উন্নতি লাভ করে সকলেই প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতেছেন।

"সাহিত্য-সংহিতা"র বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম, এ, বি, এল ; এফ্, আর, জি, এস্। সহযোগী সম্পাদক শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র। সম্পাদকের নাম অতি ক্ষুদ্র অক্ষরে এবং সহযোগী সম্পাদক সুবলচন্দ্রের নাম গ্রেট্ টাইপে ছাপা হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না।

গত দশ বর্ষ মধ্যে, অনেক ব্যক্তি এই পত্রিকা খানির সম্পাদক হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আমলে পত্রিকা খানি ভালরূপ চলিত। যখন হইতে এই পত্রিকা খানি সুবল বাবুর হস্তে আসিয়াছে, তখন হইতেই ইহার অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। বিশেষতঃ সন ১৩১২ ও ১৩১৩ সালের সাহিত্য-সংহিতা যারপরনাই নিকৃষ্ট হইয়াছে। আমি চৈত্র মাহার সাহিত্য-সংহিতা এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। সম্ভবতঃ আমার নিজ বাটীতে গিয়া থাকিবে। এক্ষণে আমি বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের কোন বিশেষ কার্য্যের নিমিত্ত কলিকাতায় আসিয়াছি। জ্যৈষ্ঠ মাহার শেষ পর্য্যন্ত কলিকাতায় থাকিতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই যে, আমার কলিকাতায়

অবস্থানকালের মধ্যে সাহিত্য-সভার কোন অধিবেশন হইল না। তাহা হইলে, সাহিত্য-সংহিতা সম্বন্ধে, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়কে কিছু বলিতে পারিতাম। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের সহিত কোন সময়ে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। "সাহিত্য-সংহিতা" সম্বন্ধে তিনিও সে সময়ে প্রতিকূল মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক বর্ত্তমান ১৩১৩ সালের মাঘ ও ফাল্গুন মাহার "সাহিত্য-সংহিতা" হইতে গুটিকতক ভাষার ভুল দেখাইতেছি। চৈত্র-সংখ্যা এখনও (জ্যৈষ্ঠ মাসের ১০ই তারিখেও) প্রাপ্ত হই নাই। উহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই, ডাকঘর হইতে এ সম্বাদ লইয়াছি। সাহিত্য-সংহিতার প্রবন্ধ লেখকের ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু সে ভ্রম যদি সম্পাদকদ্বয়েরও থাকে, তাহা হইলে, পাঠকে বলে কি? দরজিপাড়া প্রবাসী, সাহিত্য সভার জনৈক সভ্য বলেন—"সাহিত্য সভা এক্ষণে হরিঘোষের গোয়াল হইয়াছে।" ইদানীং তিনি সাহিত্য সভায় যাতায়াত বন্ধ করিতেছেন। প্রথমতঃ, মাঘ মাহার সাহিত্য-সংহিতার কয়েকটী ভুল দেখুন, যথা :—

সাহিত্য-সংহিতা

(মাঘ।)

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	কলম।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৫৬১	২১	২য়	রমন্তেই	রমন্তেঽস্মিন্নতীব
৫৬২	৬	১ম	তদ্‌শ্রেণীভুক্ত	তৎশ্রেণীভুক্ত
ঐ	৮	২য়	ময়ূরাচাব্যস্য	ময়ূরাচার্য্যস্য
ঐ	৯	২য়	নিগাদিতে	নিগদিতে
৫৬৩	২৩—২৬	২য়	পূর্ব্বে গর্ত্তমধ্যে যে সকল শুক্তি স্থাপিত রাখিবার কথা বলা হইয়াছে, কিছুদিন উহা মৃত্তিকার অভ্যন্তরে থাকিলে, শুক্তির মাংস গলিত হইয়া যায়।	(কেমন ভাষা?)
৫৬৫	২১	১ম	চৈতন্যভাবাৎ	চৈতন্যাভাবাৎ
ঐ	৪	২য়	প্রাণস্যোত্তরস্মিন্	প্রাণস্যোত্তরস্মিন্
৫৬৬	৫	২য়	প্রাণ স্যৈতানি	প্রাণস্যৈতানি
ঐ	২৮	২য়	স্যৈত্যনি	?
৫৬৮	১৬	১ম	সুষুপ্নং	সুষুপ্তং
৫৬৯	১৭—১৯	১ম	অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য কার্য্যটী হইতে অতি মহৎ ও বৃহৎ কার্য্যটী পর্য্যন্ত	ক্ষুদ্র ও সামান্য! মহৎ ও বৃহৎ!!

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	কলম।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
৫৭০	১৬	২য়	পুত্রদায় গৃহদিষু	পুত্রদার গৃহাদিষু
৫৭০	১৮	২য়	বায়স্তু	রায়স্তু
৫৭০	১৯	২য়	যীরুচ্যতে	ধীরুচ্যতে
৫৭১	১	১ম	ব্যাভিচারিণী	ব্যভিচারিণী
৫৭১	৫—৬	১ম	এস্থলে যাহা দ্বারা সম্যক্ জ্ঞানলাভ হইতে পাবে বা জ্ঞানোপায়কেই জ্ঞান বলিয়া উক্ত হইতেছে।	এ কি সাহিত্য সভার বাঙ্গালা ?
ঐ	২৯	২য়	তদ্ভেদোতস্তয়োঃ	তদ্ভেদোহতস্তয়োঃ
ঐ	৩২	২য়	ভিন্না	ভিন্নো
ঐ	৩৩	২য়	সংবিত্তদ্ধাদ্দিনাস্তরে	সংবিত্তদ্বদ্দিনান্তরে
ঐ	৩৫	২য়	লোদেতি	নোদেতি
৫৭৩	২৮	১ম	প্রায়শোপি	প্রায়শোহপি
ঐ	৩৩	১ম	সব্ব	সর্ব্ব
ঐ	৩৬	১ম	ভবেবন্নিশ্চয়রূপা	ভবেন্নিশ্চয়রূপা
৫৭৪	২৯	১ম	স্থানুর্বৈত্যাদি	স্থানুর্বেত্যাদি
৫৭৪	৩৩	১ম	অনুভূতিশ্চতুর্বিষা	অনুভূতিশ্চতুর্বিধা
৫৭৪	৩৪	১ম	ঘ্রাণণজাদি	ঘ্রাণজাদি
ঐ	ঐ	ঐ	ষড়বিধ	ষড়বিধং
৫৭৭	হেডিং		গায়ত্রি	গায়ত্রী। সর্ব্বত্রই "গায়ত্রি" দৃষ্ট হয়। মাত্র এই স্থানে বলিয়া নহে।
৫৭৭	৭—৮	১ম	সামাজিক গৌরব বা সৌরভ সম্পাদনে সমর্থ হইতে পারে না।	সামাজিক সৌরভ কি ?
৫৭৭	২১	১ম	শ্লোকাৎ	শ্লোকাৎ
৫৭৭	১১	২য়	পাঠশালাকে স্মরণ হয়	'কে' আবার কেন ?
৫৭৯	২	২য়	মধুলব্ধা	মধুলুব্ধা
৫৭৯	৩	২য়	জ্ঞানংলব্ধা	জ্ঞানলুব্ধা
৫৭৯	৩	২য়	শিষ্যা	শিষ্যো
ঐ	ঐ	ঐ	গুর্ব্বাং	গুরো
ঐ	১৬	ঐ	ভূবঃ ওঁ মহঃ	ভূবঃ ওঁ স্বঃ মহঃ
৫৮০	১২	১ম	গিরামস্ম্যেকমক্ষরং	গিরামস্ম্যেকমক্ষরং
৫৮০	১৪	১ম	পবিত্রে	পবিত্র
ঐ	২৪।২৫	১ম	অক্ষরা নাম অকারোস্মি	অক্ষরানামকারোহস্মি

পৃষ্ঠা।	পংক্তি।	কলম।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
ঐ	৩৩	১ম	ভূতানামস্ত	ভূতানামস্ত
ঐ	৩৪	১ম	অবিভক্ত	অবিভক্তঞ্চ
ঐ	১৭	২য়	ওঁঃ র্ভব	ওঁঃ ভূবঃ
৫৮১	১১	১ম	হোতারং বত্নধাতম্	(অর্থ কি ?)
৫৮২	৪—৯	১ম	ধী মহী ইত্যাদি	ধী মহি। ৪—৯ পংক্তি পর্য্যন্ত সংস্কৃত বচনের যে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে তাহা দেখিয়া অবাক হইতে হয়। এ দোষ একান্ত অমার্জ্জনীয়।
৫৯১	১৬	২য়	শিব বৃষগণের বাহন	বৃষ শিবের বাহন
৫৯৪	২০—২১	১ম	ব্রহ্মা এই হংসাখ্য দেবগণের বাহন বা নেতা ছিলেন।	(এ কথা কি ঠিক ?)
৫৯৬	১০	১ম	সংক্ষীয়সাণে	সংক্ষীয়মানে
ঐ	১৬	১ম	যুষ্যমানো	যুধ্যমানো
ঐ	১৪	২য়	নকাযবন	(অর্থ বুঝা গেল না)

সাহিত্য-সংহিতা।

(ফাল্গুন।)

প্রথমেই "বাসন্তী" কবিতা—লেখক শ্রীপ্রমোদকান্ত বসু। কবিতায় না আছে রস, না আছে ভাব। কেবল শব্দ সাজান মাত্র। সম্পাদক মহাশয় 'শিশু শিক্ষার' "গোপালের" মত (গোপাল যা পায় তাই খায়,যা পায় তাই পরে—সেইরূপ) যাহা পান তাহাই ছাপেন। যা পান তাই রাখেন। এই কবিতার ভাব দেখুন—

(১) আকুলি ব্যাকুল চঞ্চল চরণ,
খঞ্জন নিন্দিত চকিত চলন
অধীরে শিথিল দুকূল বসন
কপোল-পুলিনে ভ্রমর গুঞ্জন
উছলে রূপ-গরিমা। ইত্যাদি

(২) অধরে বিকাশি জোছনা হাসি,
পরশে কুসুম ফুটিছে রাশি,
চামেলা বকুল যূঁথিকা মিশি,
সৌরভে চুমিত হতেছে দিশি—
সান্ধ্য গগনে চন্দ্রমা—ইত্যাদি

বাহবা !! কেমন অর্থ হয় দেখিলেন ?—আবার দেখুন

(৩) ফুল্ল যৌবন কম্প্র ফোয়ারাতে বুঝি তুমি অনুপমা,
বিধুমুখী বিনোদিনী বিধাতা গৌরব রূপ-মহিমা।

আর কত তুলিব ? কবিতাটীর অনেক স্থলেরই অর্থ বোধ হয় না। কেবল ইটের পাঁজার মত একটা স্তূপ সাজান আছে মাত্র। এরূপ জঘন্য কবিতা "সাহিত্য সংহিতা"র পৃষ্ঠে শোভা পায় না। বোধ হয় আত্মীয়তার খাতিরে মিত্রজ মহাশয় এ কাজ করিয়া থাকিবেন। নচেৎ আর কি বলিব ? কেবল মাত্র শব্দের আড়ম্বরে ভুলিয়া এ কবিতাটীকে সাহিত্য-সংহিতায় স্থান দিয়া সম্পাদক মহাশয় ভাল কাজ করেন নাই। পঞ্চাঙ্গ প্রভাকর শীর্ষক প্রবন্ধটীতে এমন কথা অনেক আছে, যাহা না লিখিলেও কোন ক্ষতি বা অসুবিধা হইত না। তুলা পিঁজিয়া পর্ব্বত সমান করিয়াছেন। ভিতরে ফাঁক পড়িয়া গেছে। শ্রীপঞ্চানন সাহিত্যাচার্য্য লিখিত এই প্রবন্ধের সকল বিষয়ে আমরা একমত হইতে পারি না। ইহাতে ধান ভানিতে শিবের গীতেরও অবতারণা করা হইয়াছে। আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের ক্রম বিকাশ প্রবন্ধটী শ্রীঅচ্যুতানন্দ সরস্বতী কর্ত্তৃক লিখিত। সরস্বতীর ভাষা জ্ঞান দেখুন—"বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সোপান পরম্পরা অতিক্রম করিলেই অদ্বৈত বাদের বিবিধ মণি খচিত অতুলনীয় প্রাসাদের উপসর্পণ অসঙ্গ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাত্মার পরোক্ষা পরোক্ষ উভয় বিধ অনুভূতিই উহার অন্তর্গত।" ৬১৮ পৃঃ। "তদ্রূপ দ্বৈত শব্দ অধিকার করিয়া অশনি দৃঢ় আক্ষেপ হইয়া থাকে, যে দ্বিত্ব সংখ্যা সিদ্ধি একত্ব সংখ্যা সিদ্ধি সাপেক্ষ।" ৬১৮ পৃঃ। "একত্বই বহুরূপী হইয়া আমাদিগের আগন্তুক বেশের চমকে ভুলাইয়া ফেলিয়াছে" ৬১৮ পৃঃ। "তাঁহারা অদ্বৈত ব্রহ্মার শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনে নিযুক্ত হইয়া" ৬১৯ পৃঃ। "এ স্থলে গঙ্গা পদের তীরে লক্ষণার অর্থ গঙ্গা পদের শক্যার্থে যে প্রবাহ তীরের সহিত তাহার সামীপ্যরূপ সম্বন্ধ"। ৬১৯ পৃঃ। "মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন মুমুক্ষুর মনে ব্রহ্মাকার বৃত্তি বিশেষ উৎপন্ন হয়—" ৬১৯ পৃঃ। "পশ্চাৎ বারিদ পটলীর অপগমে যেরূপ অংশুমালী ইত্যাদি" ৬১৯ পৃঃ। "যদ্যপি একমাত্র সমাধি সংবেদ্য, মায়াতীত নিষ্কল (?) ব্রহ্ম বাক্‌শক্তির অনধিগম্য—" ৬১৯ পৃঃ। "ঐ পরমারাধ্য দেবের উপদেশ অধিকারীর প্রতি করিতেন।" ৬১৯ পৃঃ। "কেবল ধন্যবাদ লাভেই তাঁহার সন্তোষ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিবে।" ৬২০ পৃঃ। "তিনি যদৃচ্ছাক্রমে রক্ষ্যাতে উপবিষ্ট হইয়াও স্বরূপানুভূতি সুখে ডুবিতে পারেন।" ৬২২ পৃঃ। "তৃণায়মাণ" ৬২২ পৃঃ। "ঐ শুদ্ধ বাসনাই যেন হস্ত ধৃত করিয়া"—ইত্যাদি। ৬২২ পৃঃ। "কষায়ম্বর ধারী" ৬২৩ পৃঃ। "স্থিত প্রদ মহর্ষিদিগের" ৬২৩ পৃঃ। "অবাঙ্মনসোগোচর" ৬২৩ পৃঃ। "যাহা ভিক্ষুকের বসুন্ধরা পরিপূর্ণ করিতে ও বিষয় রস ভোগজনিত প্রত্যক্ষ সুখকে বিষ বলিয়া জানিতে—ইত্যাদি" ৬২৪ পৃঃ। "তবে অনুপদেয় বলিয়া জিনিষ থাকে কৈ ?" ৬২৪ পৃঃ। "শ্বেতকেতু প্রভৃতির মহর্ষির অভ্যুদয় হইত না।" ৬২৪ পৃঃ। "ভূস্বামিবৃন্দ বৈরাগ্যের প্রেরণায় নিবিড় অরণ্যানী সেবন করিয়াও—" ৬২৪ পৃঃ। "ব্রহ্মবিদ্যার লোকান্তর বলে বলীয়ান—" ৬২৪ পৃঃ। "এই জন্যই বেদ হইতে ভাগবত পর্য্যন্ত আর্য্য গ্রন্থ বৈরাগ্য ও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।" ৬২৫ পৃঃ। শাস্ত্রের আশয়ে

যদি সকলের পক্ষে আজীবন বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়া থাকাই হইত—" ৬২৫ পৃঃ। "বৈরাগ্য কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠাবলই অবশ্যম্ভাবী কারণ নহে—" ৬২৫ পৃঃ। আর কি কহিব! আর কি দেখাইব!! অচ্যুতানন্দ সরস্বতী বাঙ্গালা ভাষার আদ্যশ্রাদ্ধ করিয়া ছাড়িয়াছেন। ইহার পরেও কি দেখিতে হইবে জানি না, কারণ "আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ" প্রবন্ধটী এখনও শেষ হয় নাই। এখনও "ক্রমশঃ" আমি "সাহিত্য-সংহিতার" সম্পাদক ও সহযোগী সম্পাদক, উভয় পণ্ডিতকেই অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন উপরোক্ত (উদ্ধৃত) পদ গুলির ব্যাখ্যা করিয়া দেন। ভরসা করি তাঁহারা নীরব রহিবেন না। শ্রীযুত নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় কি একেবারে জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়াছেন? জ্ঞান শূন্য না হইলে এরূপ নিকৃষ্ট প্রবন্ধ সাহিত্য-সংহিতায় ছাপেন কেন? সুবলবাবুও সম্পাদক-নাম কলঙ্কিত করিতেছেন। সম্পাদকেরা যদি প্রবন্ধ দেখিতে না পারেন, তবে, অবসর গ্রহণ করুন। তাঁহাদের নাম সাহিত্য-সংহিতার বক্ষঃ হইতে উঠাইয়া লউন। এ বিড়ম্বনার আবশ্যক কি? সাহিত্য-সংহিতার ন্যায় একখানি মাসিক পত্রের কার্য্য-সম্পাদন করা সহজ কাজ নহে। সুবল বাবুর সে শক্তি আদৌ নাই। তাঁহার ভাষা বোধ থাকিলে, কাগজ খানির অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইত না। "সাহিত্য-সংহিতা" দেখিয়া সাহিত্য পরিষৎ পক্ষীয় ব্যক্তিগণ হাসিত না।

বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়ের—"অদ্ভুত দেশাচার" একটী বাজে প্রবন্ধ। এরূপ ধরণের প্রবন্ধ পূর্ব্বে নব্যভারত, ভারতী, ভরতদর্পণ, আর্য্যদর্পণ প্রভৃতি পত্র ও পত্রিকায় বাহির হইয়া গিয়াছে। এ প্রবন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা নূতন নহে। এ প্রবন্ধ সাহিত্য-সংহিতার উপযুক্ত নহে। বোধ হয় মিত্রজ মহাশয় অনুরুদ্ধ হইয়াই, এই কাজ করিয়া থাকিবেন।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্নের লিখিত "বাহন-তত্ত্ব" প্রবন্ধটী, সাহিত্য-সংহিতায় না ছাপিলেই ভাল হইত। ইহার আগাগোড়াই পাগ্‌লামী। তাঁহার কোন মতই সমীচীন নহে। এই বাতুল লেখকের প্রবন্ধ, সাহিত্য-সংহিতার কলঙ্ক স্বরূপ হইয়া আছে। সহযোগী সম্পাদক সুবলবাবুর "জীবন চরিত সঙ্কলন" "চর্ব্বিত চর্ব্বণ ও বেমালুম—" ইত্যাদি মর্ম্মে "সময়" বহুবার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। "স্বদেশী," "মিহির" প্রভৃতি পত্রও এই প্রবন্ধটী "সংগৃহীত" বলিয়াছেন। এ প্রবন্ধ, "সাহিত্য-সংহিতায় আর প্রকাশিত হইবে না" বলিয়া লেখক বিজ্ঞাপন দিয়াছিলেন, কিন্তু যশোলিপ্সার বশীভূত হইয়া প্রতিজ্ঞাপালনে

সমর্থ হন নাই। সুবলবাবু, ১৩১৩ সালে প্রকাশিত বাঙ্গালা সাহিত্যাদি পুস্তকের সমালোচনা করিয়া সাহিত্য-সভায় পাঠ করিবেন শুনিয়াছিলাম। তাঁহার সমালোচ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে সাহিত্য-সংহিতার সমালোচনাও করিবেন। ঘরামী পরের চাল্ ছাইয়া থাকে, কিন্তু নিজের চাল্ ছেঁদা থাকে। তাহার আর সংস্কার হয় না।

অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়। দুই সম্পাদক পড়িয়া (বেওয়ারিশ মাল) বাঙ্গালা ভাষাকে রসাতলে দিতেছেন। এরূপ নিকৃষ্ট ভাষায় সাহিত্য-সংহিতা প্রকাশিত হইলে গ্রাহকগণ ইহা গ্রহণ করিবেন কি? ১৩১৩ সালের সাহিত্য-সংহিতায় (চৈত্র বাদ) অন্ততঃ ২০০ দুইশত ভুল আছে, ইহা স্থির।

অঙ্কুরের, কল্যাণীয় সহযোগী সম্পাদক, এই প্রবন্ধটী অবিকল প্রকাশ করিবেন ভরসা করি ব্রাহ্মণের অনুরোধ রক্ষা করিয়া বাধিত করিবেন। আপনারা যদি মধ্যে মধ্যে সাহিত্য-সংহিতার যথাযথ সমালোচনা করেন, তাহা হইলে, সাধারণে ইহার দোষ গুণ বুঝিতে পাবে। কোন পত্র-সম্পাদকই উপযুক্তরূপ সমালোচনা করেন না। কেবল "সময়" সম্পাদক "এটা ভাল না, এটা টক, এটা কটু, এটা পুরাতন, এটা অনুপযুক্ত, এটার নূতনত্ব নাই" মধ্যে মধ্যে এইরূপ ভাবে সমালোচনা করিয়া, অগাধ বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় দেন। যিনি ভুল দেখাইয়া দুইটা শক্ত কথাও বলেন তাঁহাকেও ভক্তি করা যায়, কিন্তু দোষ-গুণ না দেখাইয়া, যিনি অজ্ঞের মত স্বীয় মত প্রকাশ করেন তাঁহার বালাই লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। ধন্য সাহিত্য-সভা; ধন্য সাহিত্য-সংহিতা; ধন্য সম্পাদক দ্বয়; ধন্যা যশোলিপ্সা !!!

শুভাশীর্ব্বাদক

শ্রী——

জনৈক সাহিত্য-সভার সভ্য।

গত বৈশাখ মাহার অঙ্কুরের ভ্রম সংশোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩২	২০	পোষয়িতব্বা	পোষয়িতব্যা
„	২১	তমৃমিং	তমৃর্মিং
„	„	অস্মাষু	অস্মাসু
„	২৬	বধা ৩াং	বধাংতাং
„	২৭	পরঃ	পযঃ
১৩৩	১	নিগৃহ্লা হু	নিগৃহ্লাতু
„	২৫	সমনমঃ	সমনসঃ
„	২৮	ষথায়ঃ	সথায়ঃ
„	২৯	যুনং	যুনক্তং
১৩৪	১	সীর	সীরা
[illegible]	৮	ষত্রকোশং	সত্রকোশং
১৩৪	১৩	আতৃষিংচ	আতৃসিংচ
„	১৪	পরিষজং	পবিষ্বধ্বং
„	১৫	মানোহত-যানের	মানোহংত-যোনের
১৩৭	১৮	শেরসার	সায়েস্তাখাঁর
„	২৪	লাল	লালা
১৪৮	২	কার্য্য নির্ব্বাহক বুদ্ধি	কার্য্য-নির্ব্বাহিকা বুদ্ধি
„	৭	জাগ্রত	জাগরণ
১৫১	১৫	সুগন্ধী কুসুম	সুগন্ধি কুসুম

অঙ্কুর।

বীজাদঙ্কুরনিষ্পত্তিরঙ্কুরাদ্‌বৃক্ষসম্ভবঃ।
ফলপ্রদোভবেদ্‌বৃক্ষইত্থমাশাক্রমোমতঃ॥

২য় বর্ষ।] আষাঢ়, ১৩১৪। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

গিরিয়ার যুদ্ধ।

সুজাউদ্দিন—সরফরাজ খাঁ।

(১৭২৫—১৭৪০ খৃষ্টাব্দ)

পারস্য দেশীয় খোরাসানের প্রসিদ্ধ আফ্‌সার নামক তুর্কবংশ সম্ভূত সুজাউদ্দিনের দক্ষিণাপথস্থ বুর্হানপুরে জন্ম হয়। বঙ্গের দেওয়ান মুরশিদ কুলীখাঁর কন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তিনি প্রথমতঃ উড়িষ্যার নায়েব দেওয়ান এবং তৎপরে নায়েব নাজিম হন। সুজাউদ্দিনের স্ত্রী জিন্নেতুন্নেসা বেগম ধর্ম্মপরায়ণা ও পতিব্রতা ছিলেন এবং তাঁহার গর্ভে তুকী খাঁ ও মীর্জা আমনীর পিতা সরফরাজ খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। আলীবর্দ্দী খাঁ প্রভৃতির মন্ত্রণায় দিল্লীর দরবার হইতে নবাবী সনন্দ পাইয়া সুজাউদ্দিন বাঙ্গালার নবাব হন। কুলীখাঁর ত্যক্ত সম্পত্তি প্রায় একষষ্টি লক্ষ টাকা, কতিপয় হস্তী ও অন্যান্য উপঢৌকন দিল্লীর দরবারে পাঠাইয়া সুজাউদ্দিন "মোতোমন্‌-উল্‌-মূলক্‌—সুজাউদ্দিন-বাহাদুর আসদ্‌ জঙ্গ (রাজ্যের সুবিশ্বস্ত কর্ম্মচারী) উপাধি প্রাপ্ত হন। সুজাউদ্দিন হুগলী ও আজিমগঞ্জ ব্যতীত কতিপয় নূতন চৌকী (শুল্ক গ্রহণ স্থান) স্থাপন করেন এবং সৈন্য সংখ্যা প্রায় পঁচিশ হাজার করিয়াছিলেন। মৃত্যুকাল সন্নিকট জানিয়া সকল অনুচরবর্গ ও কর্ম্মচারীবর্গকে দুই মাসের বেতন পুরস্কারস্বরূপ দিতে আদেশ দিয়া, সকলকে তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। যদি কখনও কাহার নিকটে কোন বিষয়ে অপরাধী থাকেন ভাবিয়া সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই, মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

সুজাউদ্দিনের মৃত্যু হইলে সরফরাজ খাঁ পিতার নবাবী পদে অভিষিক্ত হন। রাজোচিত বুদ্ধিমত্তার অতিশয় অভাব ছিল বলিয়া বন্ধুদিগের প্ররোচনায় আলীবর্দ্দীখাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহম্মদকে প্রধান দেওয়ানি কার্য্য হইতে অবসর দিলে,হাজি আহম্মদ সরফরাজকে পদচ্যুত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন, অথচ, মনোভাব এই বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন যে, নবাব তাঁহাকে বৃদ্ধ বয়সে কার্য্য হইতে অবসর দিয়া তাঁহার ধর্ম্মকার্য্যের সহায়তা করিয়াছেন এবং প্রয়োজন হইলে তিনি প্রভু-পুত্র সরফরাজকে রাজকার্য্যের জন্য পরামর্শ প্রদান করিবেন। হাজি আহম্মদের পরামর্শানুসারে সৈন্য সংখ্যা হ্রাস হইতে লাগিল, অবসর প্রাপ্ত সৈন্যগণ আলিবর্দ্দীর দলপুষ্টি করিতে লাগিল এবং রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। সরফরাজের হিতসাধনকারী বন্ধুগণ হাজীকে বন্দী করিবার পরামর্শ দিলে, সরলচিত্ত সরফরাজ তাহাও হাজির নিকট প্রকাশ করিল। হাজি আহম্মদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আলিবর্দ্দীকে সমস্ত জানাইয়া নবাবকে পদচ্যুত করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন।

জগৎশেঠ ফতেচাঁদের পৌত্র মহাতাপ রায়ের পত্নীর রূপ-লাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া, সরফরাজ তাঁহার দর্শনেচ্ছা জ্ঞাপন করিলে, অথবা মুরশিদ কুলীখাঁর শেঠভবনে গচ্ছিত সাত কোটী টাকার জন্য সরফরাজ খাঁ পীড়াপীড়ি করিলে শেঠবংশ নবাবের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া হাজি আহম্মদের পক্ষাবলম্বন করিলেন। দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ শাহের দরবার হইতে সরফরাজ খাঁ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার জন্য হাজি আহম্মদ ও আলীবর্দ্দী খাঁ বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। ইতঃপূর্ব্বেই মির্জ্জা মহম্মদের সহিত রাজমহলের ফৌজদার আতাউল্লা খাঁর যে কন্যার বিবাহ-প্রস্তাব স্থির হইয়াছিল, হাজির মনস্তুষ্টির জন্য সরফরাজ খাঁ দৌহিত্রীর পুত্রের সহিত উক্ত কন্যার বিবাহ-প্রস্তাব করিলে হিতে বিপরীত ঘটিল। সরফরাজের বিবাহ-প্রস্তাব অপমান জনক মনে করিয়া হাজি আহম্মদ স্বভাবসিদ্ধ তিলকে তাল করিয়া ভ্রাতা আলিবর্দ্দীকে লিখিলেন যে, তিনি অতি সত্বর না আসিলে দুর্বৃত্ত সরফরাজ বলপূর্ব্বক উক্ত কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া কুলে কলঙ্ক জন্মাইবে।

আলিবর্দ্দী খাঁ আর থাকিতে না পারিয়া ভোজপুরের বিদ্রোহী জমিদার-দমনচ্ছলে, সসৈন্যে ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে পাটনা হইতে বহির্গত হইলেন। আতাউল্লা খাঁ রাজমহল হইতে শাকৃড়ীগালি পর্য্যন্ত দিয়া কোনও লোককে বাঙ্গালা আসিতে দিলেন না, পাছে আলিবর্দ্দীর আগমন বার্ত্তা সরফরাজের কর্ণ গোচর হয়।

আলিবৰ্দ্দী খাঁ শাক্‌ড়ীগালী হইতে কিয়দ্দূর আসিয়া তাঁহার আগমন বার্ত্তা প্রচারান্তর সরফরাজকে এই বলিয়া পত্র লিখিলেন যে, "পরিবারবর্গের অপ-মানের সংবাদ পাইয়া বিনানুমতিতে এতদূর অগ্রসর হইয়াছি, মনে কোনই বিরুদ্ধ ভাব নাই, পরিবারবর্গকে নিকটে পাঠাইলেই প্রত্যাগমন করিব। আশা করি, আমাকে আর এই ভাবে বেশী দূর যাইতে হইবে না।" উক্ত পত্র মুর্শিদাবাদে পৌঁছিলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল এবং বন্ধুগণ হাজিকে বন্দী করিবার জন্য সরফরাজকে পরামর্শ দিলে, হাজি শপথ করিয়া বলিলেন, "প্রভু পুত্র সরফরাজের প্রতি আলিবৰ্দ্দীর কখনই বিরুদ্ধ ভাব হইতে পারে না, আমাকে আদেশ দিলে তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইব কিম্বা আপনার নিকটে উপস্থিত করিব।" প্রধান সেনাপতি গৌসখাঁর মতানুসারে সরফরাজ মনোভাব জানিবার জন্য দুই জন বিশ্বস্ত লোক সহ হাজিকে রাজমহল পাঠাইলেন। চতুর্থ দিনে প্রেরিত লোকদ্বয় এক পত্রসহ ফিরিয়া আসিল। পত্র খানা এই;—"আমি আপনার পিতার অনুগ্রহে উচ্চপদ ও সম্মান পাইয়াছি, আপনার প্রতি অন্যায়াচরণ করি নাই এবং করিব না। বিহারে সুজা খাঁর নিয়োজিত সৈন্যদল সাত লক্ষ টাকা বাকী বেতনের প্রার্থনায় আসিয়াছে, আমি তাহাদের পশ্চাতে আসিয়াছি মাত্র। আর এক কথা, গৌস খাঁ প্রভৃতি আমার শত্রুদলকে দরবার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিন; চক্ষুলজ্জায় নিজে এতদূর করিতে না পারেন, অনুমতি দান করুন, আমি তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিব। আমি কোরাণ লইয়া শপথ করিলাম, এই কোরাণ আপনার নিকট প্রেরিত হইতেছে (কোরাণের পরিবর্ত্তে বস্ত্রমণ্ডিত একখণ্ড ইষ্টক প্রেরিত হইয়াছিল)।"

সরফরাজ খাঁ সৈন্য সমভিব্যহারে ভাগীরথীর পূর্ব্বপারস্থিত গিরিয়ায় (জঙ্গিপুরের চারি মাইল উত্তরে) অপেক্ষা করিতে ছিলেন এবং সেনাপতি গৌস খাঁ পশ্চিম পার দিয়া বিপক্ষের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, এমন সময়ে উক্ত পত্র প্রাপ্তান্তে তাঁহার আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। ইতঃপূর্ব্বেই ধনকুবের জগৎ শেঠ টাকা দিয়া সরফরাজ খাঁর দলের অনেকের মুখ বন্ধ করিয়াছিলেন, তোপখানায় গোলা বারুদের পরিবর্ত্তে ধূলা, মাটি, ইষ্টক প্রভৃতিতে পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং তোপখানার দারোগা সাহরিয়ারকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থানে ফিরিঙ্গী আণ্টনীর দেশজ সন্তান পাঁচুকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

আলিবৰ্দ্দী খাঁর চারি সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য জঙ্গিপুরের পর-

পারস্থিত চড়কা ও বালিঘাট্টা পর্য্যন্ত আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। আলিবর্দ্দী খাঁ নিজ পতাকা সহ অর্দ্ধাংশ সৈন্য বিশ্বস্ত সেনাপতি নন্দলালের অধীনে পশ্চিম পারে রাখিয়া, আফ্গান প্রভৃতি দুই দল উৎকৃষ্ট সৈন্য লইয়া, রাত্রে ভাগীরথী পার হইলেন। প্রত্যূষে কামান গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই একটী গোলা সরফরাজের তাম্বুর ভিতর দিয়া চলিয়া গেলে অনুচরবর্গ তাঁহাকে যুদ্ধ হইতে পলায়ন করিতে অনুরোধ করিলেন।

নবাব সরফরাজ খাঁ নামাজ শেষ করিয়া হস্তী-পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক, হস্তে কোরাণ লইয়া অসীম সাহসের সহিত শত্রু পক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই অনেকে হতাহত হইয়াছিল এবং শত্রু-পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল। কিয়ৎকাল যুদ্ধের পর নবাবসৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেও তূণীরের সমস্ত বাণ শেষ না হওয়া অবধি সরফরাজ সতেজে অগ্রসর হইতেছিলেন। নিষেধ ও তিরস্কার সত্ত্বেও যখন, হস্তী, প্রভুর প্রাণ রক্ষার্থ পলায়ন করিতেছিল, তখন শত্রুর এক গোলা সরফরাজের মস্তকে লাগিয়া তাঁহার প্রাণবায়ুর অবসান করিল। মীর হবিব, রাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ, সমসের খাঁ প্রভৃতির দল দর্শকের ন্যায় বরাবর দণ্ডায়মান ছিল। নবাব সরফ-রাজের অসীম বলশালী ও সাহসী প্রধান সেনাপতি গৌস খাঁ পশ্চিম পারে নন্দলালের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাভূত ও নিহত করিয়া আলিবর্দ্দীর দিকে অগ্রসর হইতে ছিলেন। গৌস খাঁ ও দ্বিতীয় সেনাপতি সরীফুদ্দীন শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিজয় সিংহ গিরিয়ার পাঁচ মাইল পূর্ব্বস্থিত খামরার নিকটে আলিবর্দ্দী খাঁ কর্ত্তৃক নিহত হইলে, তদীয় জালিম সিংহ নামক নবম বর্ষীয় পুত্র নিষ্কোষিত অসি হস্তে মৃত পিতার শরীর রক্ষার্থ দণ্ডায়মান ছিল দেখিয়া কতিপয় নীচাশয় সৈন্য উক্ত বালক বধের চেষ্টা করিলে, এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে আলিবর্দ্দী খাঁ চমৎকৃত হইয়া, বালক বধ করিতে নিষেধ করণান্তে মৃতদেহ সংকারের আদেশ দিলেন। অদ্যাপি উক্ত স্থান জালিম সিংহের মাঠ বলিয়া পরিচিত।

বর্ত্তমান সাহা নগর থানার নিকটবর্ত্তী নাক্টাখালির বাটীতে সরফরাজের মৃতদেহ তদীয় পুত্র মির্জা আমনী কর্ত্তৃক সমাহিত হয়। গিরিয়ার নিকটবর্ত্তী মোমিনটোলায় অসাধারণ বীর ঘোস বা গোস খাঁর সমাধি মন্দির ছিল। এক্ষণে ইহা ভাগীরথীর পশ্চিম পারস্থিত নবোনচোয়া গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও রাখাল বালকেরা, "একেলা গোসখাঁ লড়ে আলিবর্দ্দী সনে।

দেখিয়া বীরত্ব, কম্পিত বিপক্ষগণে—ইত্যাদি" বলিয়া গ্রাম্য গীতি গাহিয়া থাকে।

দ্বিতীয় গিরিয়ার যুদ্ধ।

প্রথম গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ খাঁকে পরাজিত ও নিহত করিয়া আলিবর্দ্দী খাঁ বাঙ্গালার নবাব হন। তিনি ১৭৪১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলে, তদীয় কনিষ্ঠা কন্যা আমিনার পুত্র সিরাজউদ্দৌলা এক বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। সিরাজের বিশ্বাসঘাতক কয়েকজন প্রধান কর্ম্মচারী ও অর্থ লোলুপ, প্রবঞ্চক, জালিয়াৎ ক্লাইব, সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত ও নির্দ্দয়রূপে হত্যা করাইয়া প্রথমতঃ মীর্জাফরকে তৎপরে মীর কাশিমকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। অর্থলোলুপ, বিশ্বাসঘাতক, প্রবঞ্চক, ভারতীয় কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পাদির অনিষ্টকারী, ভারতশক্তি হ্রাসকারী ইংরাজদিগকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিয়া না দিলে দেশের কিছুতেই মঙ্গল হইবে না ভাবিয়া, পাশ্চাত্য প্রণালী মতে সৈন্যগণকে শিক্ষিত করিবার মানসে মুর্শিদাবাদ হইতে পাটনায় রাজধানী স্থাপন করেন।

মীরকাশিমের প্রায় চল্লিশ হাজার পাশ্চাত্য প্রণালী মতে শিক্ষিত সৈন্যদল, অপরিমিত অর্থ-বল, প্রচুর অস্ত্রোপকরণ থাকিলেও যে, স্বার্থপর, বিশ্বাস-ঘাতক, পদলেহনকারী কয়েকজন ইংরাজের আজ্ঞা বহনে প্রস্তুত থাকিয়া মীর-কাশিমকে পরাস্ত করিবে, তিনি তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। মীরকাশিমের প্রেরিত সৈন্যদল ভাগীরথীর পশ্চিম পারে এবং মহম্মদ তুকী খাঁর সৈন্যদল পূর্ব্বপারে সমবেত হইল। বর্দ্ধমানের দিক হইতে একদল ইংরাজ সিপাহী মেজর আডম্‌সের সহিত আসিতেছে শুনিয়া পশ্চিম পারস্থিত সৈন্যগণ, সেই দিকেই ধাবিত হইল। কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী অজয় নদীর তীরে উভয় দল সম্মুখীন হইলে মুসলমান সেনাদল পরাজিত হয় (১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ১৯শে জুলাই)। পাছে তুকীর সৈন্যগণও তাহাদের দৃষ্টান্তে কর্ত্তব্য কার্য্য বিস্মৃত হয়, এই ভাবিয়া উক্ত পরাজিত সেনাদলকে আশ্রয় দেন নাই। পরাজিত সৈন্যগণ অনেক দূরে গিয়া শিবির সন্নিবেশ করিল। ইংরাজ সৈন্য তুকী খাঁর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলে সেনাপতি তুকীর পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল দেখিয়া, উক্ত সেনাদলও পলায়ন করিল।

মীরজাফর ইংরাজ বন্ধুবর্গসহ ২৩শে জুলাই মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিলেন

দেখিয়া সিরাজের শ্বশুর ইরেজ খাঁ নাগরিকবর্গকে সংযত করিয়াছিলেন। মীরজাফর পুনঃ সিংহাসন গ্রহণ করিলে, অনেকে তাঁহার দল-পুষ্টি করিতে লাগিল। ইংরাজ সেনাপতি আডম্‌সের সেনাগণ চতুর্থ দিবসে ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া থানা স্থতীর দিকে অগ্রসর হইলে, দিন দুই পরে মীরজাফরও সদলে যোগ দিলেন এবং চতুর্দ্দিক হইতেও সৈন্য আসিয়া যোগ দিতে লাগিল। ইংরাজদিগের মোট এক হাজার গোরা ও চারি হাজার সিপাহী সৈন্য ছিল।

এদিকে মীরকাশিম পরাজয় সংবাদ পাইয়াই আবার যুদ্ধার্থ কৃতসংকল্প হইলেন। নবাব মীরকাশিমের আদেশ অনুসারে মর্কার ও সমরু আট দল উৎকৃষ্ট তেলেঙ্গা, মীরনাশের উৎকৃষ্ট পদাতিক ও গোলন্দাজ, আসহুল্লা সাত হাজার অশ্বারোহী লইয়া এবং পূর্ণিয়ার ফৌজদার শের আলি ও হায়বৎউল্লা সদলে রাজধানী পাটনা হইতে আসিতে ছিলেন। সৈন্যদল গিরিয়ার সম্মুখস্থ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে সমবেত হইলে ইংরাজদল নয়ন পথে পতিত হয়। মীরকাশিমের সেনাদলের আক্রমণে ইংরাজ দল যায় যায় হইলেও যথাশক্তি স্থিরভাবে যুদ্ধ করাতে পরিণামে তাঁহাদেরই জয় হইল। ভারতে ইংরাজদিগের সৌভাগ্য উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিল। মীরকাশিম পরিবারবর্গ ও ধনরত্ন রোটাসের দুর্গে প্রেরণ পূর্ব্বক, রাজা রামনারায়ণ, পুত্রগণসহ রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ-ভ্রাতৃদ্বয়, সপুত্র রায় রায়াঁ, উমেদরাম, রাজা ফতে সিংহ, বুনিয়াদ সিংহ ও বিহারী ঐশ্বর্য্যশালী জমিদারগণকে নির্দ্দয়রূপে হত্যা করিয়া স্বয়ং উধুয়ানালায় সৈন্য পরিদর্শনার্থ উপস্থিত হন। তিনি ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট তারিখে উধুয়ানালায় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া দিল্লী ও আগরার মধ্যবর্ত্তী সামান্য স্থানে দারিদ্র্যের চরম ক্লেশ ভোগ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন।*

বঙ্গে ব্রাহ্মণ বসতি।

(২য় প্রস্তাব)

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রস্তাবে, মহারাজা আদিশূরের সংস্কৃত পত্রের যে বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে পাঠক মহাশয়েরা অতি সহজে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন। মহারাজা

* লেখক মহাশয় প্রবন্ধ-পত্রে স্বীয় নাম, ধাম, ঠিকানা, তারিখ কিছুই লেখেন নাই। —সহযোগী সং।

আদিশূর, বল্লাল সেন বা লক্ষ্মণ সেন, ইহাঁদের কেহই বৈদ্য বা ব্রাহ্মণ ছিলেন না; ইহাঁদের কাহারও ধর্ম্ম বিশ্বাস অ-হিন্দু জনোচিত অথবা বৌদ্ধমতানুযায়ী ছিলনা ইহাও ধ্রুব সত্য। অনেকের বিশ্বাস আছে, রাজা আদিশূরের সহিত কান্যকুব্জাধিপতির কুটুম্বিতা ছিল; উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক সমূহ মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন, এই ধারণা ভ্রমাত্মিকা। কান্যকুব্জের নরপতিকে আদিশূর যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেই সুস্পষ্ট বুঝা যায়, আদিশূর তাঁহার অপরিচিত। রাজা আদিশূর কনোজাধিপতি বীর সিংহের নিকট হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন এ কথাও ঠিক নহে, তিনি "কতিপয় সুব্রাহ্মণ প্রেরণ" জন্য পত্র লিখিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন; কান্যকুব্জের মহারাজা পঞ্চ জন মাত্র পাঠাইয়া দিয়া আদিশূরের অনুরোধ রক্ষা ও তাঁহার মনস্তুষ্টি বিধান করিয়াছিলেন। এই পঞ্চ গোত্রের পঞ্চ জন ব্রাহ্মণ বিশিষ্ট বিদ্যা-বুদ্ধি সম্পন্ন, সুকবি, সৎ ক্রিয়াশালী ও তপোবল দ্বারা বাক্য সিদ্ধ এবং তাঁহাদের সহচরগণ অতীব সৎগুণ সম্পন্ন ও পরম ভক্ত বলিয়া গণনীয় ছিলেন। এই পঞ্চজন সহচর বঙ্গের কায়স্থ জাতির আদি পুরুষ। সেই পুরাকালে রেলওয়ে, তার, ডাকঘর প্রভৃতি ছিলনা; পথ দুর্গম ও বিপদাচ্ছন্ন ছিল; এই কারণে পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদের সহচরগণ ধনুর্ব্বাণ সঙ্গে লইয়া পথাতিক্রম করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের ব্রাহ্মণত্বের হানি বা ধৃষ্টতা প্রদর্শন হয় নাই। তাম্বুল চর্ব্বণ করা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে, সুতরাং তাঁহারা তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে তাঁহাদের উপরে যে অপবাদ আরোপ করেন তাহাও ভুল। পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে অপর যে পাঁচ জন আগমন করিয়াছিলেন তাঁহারা ভৃত্য নহেন, "সহচর" বা সখা বলিয়া গণ্য। ইহাঁরা শূদ্র হইলে কনোজের বেদাভিজ্ঞ সাত্বিক ব্রাহ্মণেরা কখনই ইহাঁদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিতেন না। এই সহচরগণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় এবং ইহাঁরাই বর্ত্তমান বঙ্গের বিক্রমী কায়স্থ জাতির আদি পুরুষ। মৎ প্রণীত "সিদ্ধান্ত সমুদ্র" গ্রন্থের যে খণ্ডে কায়স্থ জাতির সুবিস্তৃত ইতিহাস প্রকাশিত হইবে, সেই বিরাট খণ্ডে বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে অতি প্রাচীন ও প্রয়োজনীয় কথা সমূহ আলোচিত হইবে। এখন সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা গেল, বঙ্গের রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বৃন্দের আদি পুরুষদিগের জন্মস্থান কনোজ। ইহাতে আরও জানা গেল, বাঙ্গালা দেশের কায়স্থ জাতির আদি পুরুষেরও জন্মস্থান কনোজ নগর। সুপ্রসিদ্ধ কান্যকুব্জ নগর হইতেই বঙ্গের ব্রাহ্মণ ও

কায়স্থদিগের আদি পুরুষ এদেশে শুভাগমন করিয়াছিলেন, সুতরাং পবিত্র কনোজ নগর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির পক্ষে তীর্থ স্থান সমতুল্য। এই নগর দর্শন যোগ্য। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সদাই বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ। কিন্তু প্রাচীন কনোজের শোভা, সমৃদ্ধি, বিক্রম, সাহস, বীর্য্যবত্তা, পাণ্ডিত্য, স্বাধীনতা প্রভৃতি বর্ত্তমান কনোজে কিছুই নাই। "পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিন মধুনা তত্র সরিতাম্"—ভগবান শ্রীরামচন্দ্র বনবাস সমাপ্ত করিয়া আর একবার দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তখন তিনি যে স্থানে স্রোতস্বিনীর স্রোত সন্দর্শন করিয়াছিলেন, এখন তিনি সেই স্থান পুনঃ দর্শন করিয়া কহিলেন "পুরা যত্র স্রোতঃ পুলিন মধুনা তত্র সরিতাম্" এখন সেখানে পুলিন মাত্র দর্শন করিতেছি। প্রাচীন কনোজ যাঁহারা দেখিয়াছেন, বর্ত্তমান কনোজ দেখিলে তাঁহাদিগকে ঠিক এইরূপ কথাই কহিতে হইবে।

মহারাজা বীরসিংহ কর্ত্তৃক প্রেরিত ব্রাহ্মণ পঞ্চক বঙ্গে উপনীত হইয়া, মহারাজা আদিশূরের প্রাসাদ ভূমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষে আগমন করিলে, মহারাজা আদিশূর শ্রবণ করিলেন, তাঁহারা গোযানে আসিতে আসিতে চর্ম্ম পাদুকা পরিধান করিয়া, ধনুর্ব্বাণ হস্তে তাম্বুল চর্ব্বণ করিয়াছেন। এই কথায় মহারাজা বাহাদুর ব্রাহ্মণ পঞ্চকের প্রতি প্রথমে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন নাই এবং উপেক্ষা করিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে বহির্দ্দেশে আগমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ এবং তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতে বিলম্ব করিতে ছিলেন। কান্যকুব্জ হইতে আগত ব্রাহ্মণেরা তাহা জানিতে পারিয়া পরামর্শ করিলেন "এই মায়ামুগ্ধ সংসারী জীবকে, অর্থাৎ রাজা আদিশূরকে, মায়ানিদ্রা হইতে জাগ্রত করা আবশ্যক। ইহাকে দিব্য চক্ষু দান করা উচিত এবং ইহার চৈতন্য বিধান করিয়া ইহার ভ্রম অপনোদন করা নিতান্ত প্রয়োজন।" ঘটনাক্রমে ঐস্থানে একটা শুষ্ক তরু খণ্ড ছিল, ব্রাহ্মণ পঞ্চক তদুপরে মন্ত্রপূত জল ছড়াইয়া দিয়া ঐ শুষ্ক তরুকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিলেন। শুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ড বসন্তের অতি মনোহর তরুরূপে পরিণত হইয়া, ফল ফুলে অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিল। মহারাজা আদিশূর ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্য ও অনুতপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের পদস্পর্শ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং অতীব ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মানে তাঁহাদের সেবা সুশ্রূষা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। ক্রমে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণকুলতিলক বঙ্গদেশে পঞ্চখানি গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া, বাসস্থাপন করিলেন। মহারাজা আদিশূর যে পাঁচখানি গ্রাম দান করেন, তাহাদের নাম

পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম এবং বটগ্রাম। কুলকারিকাকার লিখিয়াছেন—

"পঞ্চকোটি কামকোটি হরিকোটি আদি।
কঙ্কগ্রাম বটগ্রাম পৈত্র অবিবাদী।
বিপ্রা ব্রাহ্মণ্য প্রচার জন্য গঙ্গাবাসে।
রাজা দেন পাঁচ গ্রাম দ্বিজ অভিলাষে।"

শাণ্ডিল্য গোত্রের ভট্ট নারায়ণ পঞ্চকোটী, কাশ্যপ গোত্রের দক্ষ কামকোট, বাৎস্য গোত্রের ছান্দড় হরিকোটি, ভরদ্বাজ গোত্রের শ্রীহর্ষ কঙ্কগ্রাম এবং সাবর্ণ গোত্রের বেদগর্ভ বটগ্রাম প্রাপ্ত হইয়া আপনাপন গ্রামে বাস করেন। মহারাজা আদিশূর কেবল পুত্রেষ্টি যাগ সমাধা করিবার জন্যই কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ পঞ্চককে আনয়ন করেন নাই, পরন্তু বঙ্গদেশে শাস্ত্র কুশল সদাচারী ব্রাহ্মণের বসতি স্থাপন করাও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

সেকালে প্রায় সর্ব্বত্র বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের এবং বিশেষতঃ আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণবর্গের প্রবলতা ছিল। এই জন্য নানা স্থানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বিস্তার করিয়া দেওয়া আদিশূরের সঙ্কল্প ছিল। তিনি মানভূম অঞ্চলের পঞ্চকোটে (বা রঙ্গাপুর গ্রামে) ভট্টনারায়ণকে, মল্লভূমে কামকোটি বা কামটী স্থানে দক্ষকে, মুর্শীদাবাদ জেলার হরিকোটি (বর্ত্তমান নাম হরিপুর) গ্রামে ছান্দড়কে, রাজসাহী জেলার কঙ্ক বা কাঁকরা গ্রামে শ্রীহর্ষকে এবং মালদহ জেলার বটগ্রামে (বটরিয়া বা বটোরি গ্রামে) বেদগর্ভকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা তথায় বাসস্থাপন করিলেন। "কামঠী ব্রহ্মপুরী চাহরিকোটস্তথৈব চ। কঙ্ক গ্রামো বটগ্রাম এষাং স্থানানি পঞ্চ চ।" (এড়ু মিশ্র ও হরিমিশ্র কৃত কুলকারিকা দেখুন)।

এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধরগণ বাঙ্গালায় রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। ইহাঁরা দুইটি ভিন্ন সম্প্রদায় নামে পরিচিত, কিন্তু আদিতে উভয়ে এক ছিলেন, এখনও উভয় সম্প্রদায়ই সেই আদিপুরুষের বংশধর বলিয়া প্রসিদ্ধ। স্থানভেদে ও আচারভেদে কালক্রমে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই দুই আখ্যায় সৃষ্টি হইয়াছে। অনেক দিন পূর্ব্বে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র মধ্যে বিবাহাদি পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। সার্দ্ধ তিন শত বৎসর অতীত হইল, বৈষ্ণব কবি নিত্যানন্দ দাস তাঁহার "প্রেমবিলাস" গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন—

"নিত্যানন্দ প্রভুর কন্যা হয় গঙ্গানাম।
মাধব আচার্য্যে প্রভু কৈলা কন্যা দান।

রাঢ়ীতে বারেন্দ্রে বিয়ে না ভাবিও আন্।
রাঢ়ী ও বারেন্দ্র হয় একের সন্তান।
রাঢ়ী ও বারেন্দ্র বিয়ে হৈয়াছে অনেক।
দেশ ভেদে নাম ভেদ এই পরতেক।”

যাহা হউক, বঙ্গের ব্রাহ্মণবর্গ যত প্রকার শ্রেণী বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হউন না, প্রাচীনকালে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ কেবল বঙ্গদেশ বা ভারতবর্ষের নহে, পরন্তু সমগ্র পৃথিবীর মানব সমাজের অলঙ্কার মধ্যে গণ্য হইয়া উঠিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালেও বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বিদ্যা, বিক্রম, সাহস, ধর্ম্মপরায়ণতা, ধন, মান, বুদ্ধি, প্রতিভা প্রভৃতিতে কম নহেন। ভারত বিখ্যাত শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামী তাঁহাদের পদাবলী মধ্যে অনেক বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গের ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে যে প্রশংসা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ সমাজেরও তদনুরূপ প্রশংসা করা যাইতে পারে। রূপ সনাতন পদাবলী মধ্যে পাঠ করা যায়—

“ভারতে কাশী, কাঞ্চী, অবন্ত্যাদি অঙ্গ।
বিদ্যা-ব্রাহ্মণ্যে প্রামাণ্য হ’ল আজি বঙ্গ।
রঘুনন্দ, রঘুনাথ, আর শ্রীচৈতন্য।
পণ্ডিত বসুদেব, গুরুত্ব হেতু ধন্য।
রঘুনন্দ, হরিহরজ গঙ্গাদাস-পৌত্র।
কাণা ভট্ট, সাহরী, শূলপাণি-দৌহিত্র।
বাৎস্যে বৈদিক জগ, চৈতন্য-পিতা।
নীলাম্বর মাতামহ, শচী যার মাতা॥
ন্যায়, স্মৃতি, তত্ত্বজ্ঞানে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ।
সর্ব্ব দেশ হতে আসে বুভুৎসু গরিষ্ঠ।
যদিও ষট্ কর্ম্মার সংখ্যা ক্রমে অল্প।
তথাপি ব্রাহ্মণ্য না করিত বৃথা গল্প।
ময়ুর, কুল্লুকভট্ট, আচার্য্য উদয়ন।
আদি কবি শিরোমণি, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
হলায়ুধ, গোবর্দ্ধন, ধোয়ী উমাপতি।
শরণ জয়দেব, লক্ষ্মণ সভাপতি।
পঞ্চ কান্যকুব্জে কবি-সংখ্যা করা ভার।
চরিত কথায় রূপ সনাতনে প্রচার॥”

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

(৫৫)

ইন্দ্রিয়াণি চ সংযম্য বকবৎ পণ্ডিতো নরঃ।

দেশকালবলং জ্ঞাত্বা সর্ব্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ ॥

ভাবার্থ—সংযমিয়া ইন্দ্রিয় নিচয়, দেশ-কাল-সামর্থ্য বুঝিয়া,

বকবৎ—পণ্ডিত সুজন

কার্য্য-চেষ্টা রাখিয়া অন্তরে, বাহ্য শান্তশিষ্ট ভাব ধরি'

করিবেক কার্য্য অনুক্ষণ।

(৫৬)

বনানি দহতে বহ্নিঃ সখা ভবতি মারুতঃ।

স এব দীপনাশায় ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবম্ ॥

ভাবার্থ—বহ্নি যবে বনরাজি করয়ে দহন।

হয় তার প্রিয় সখা—সমীর তখন ॥

দীপনির্ব্বাণের মূল সেই বায়ু হয়।

ক্ষীণের গৌরব ভবে, কহ কোথা রয় ?

(৫৭)

শত্রোরপি গুণা বাচ্যা দোষা বাচ্যা গুরোরপি।

সর্ব্বদা সর্ব্বযত্নেন পুত্রে শিষ্যে হিতং বদেৎ ॥

ভাবার্থ—অরিরও গুণব্রাত, গুরুরও দোষ যত,

করে ব্যক্ত সদা ন্যায়বানে।

সর্ব্বযত্নে সর্ব্বক্ষণে, সুত আর শিষ্য জনে

হিত শিক্ষা দিবে সুবচনে ॥

(৫৮)

নির্গুণেষ্বপি সত্ত্বেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ।

ন হি সংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্রশ্চণ্ডালবেশ্মনি ॥

ভাবার্থ—নির্গুণেও করে কৃপা যত সাধু জন।

নিপতিত প্লব-ঘরে

সুবিমল চন্দ্রকরে

সুধাকর সংহরণ করে না কখন ॥

(৫৯)

অপ্রিয়স্যাপি পথ্যস্য পরিণাম সুখাবহঃ।
বক্তা শ্রোতা চ যত্রাস্তি রমন্তে তত্র সম্পদঃ॥

ভাবার্থ—অপ্রিয় অথচ যাহা পথ্য, পরিণামে
তাহা অতি সুখকর হয়।
রহে হেন বক্তা আর শ্রোতা যেইস্থানে,
সম্পদ তথায় নিত্য রয়॥

(৬০)

বিদ্বানেব হি জানাতি বিদ্যার্জ্জন পরিশ্রমম্।
ন হি বন্ধ্যা বিজানীয়াৎ গুর্ব্বীং প্রসববেদনাম্॥

ভাবার্থ—বিদ্যা উপার্জ্জনে, কত পরিশ্রম,
বিদ্বানেই মাত্র তাহা জানে।
প্রসব-বেদনা কিরূপ কঠিন
বন্ধ্যা তাহা বুঝিবে কেমনে!

(৬১)

সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখম্।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥

ভাবার্থ—সুখ-অন্তে আসে দুঃখ, সুখ অতঃপর।
ঘুরিতেছে চক্রবৎ দু'টী নিরন্তর॥

(৬২)

অবংশে পতিতো রাজা মূর্খপুত্রশ্চ পণ্ডিতঃ।
অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবন্মন্যতে জগৎ॥

ভাবার্থ—হীন-বংশ-জাত ব্যক্তি যদি রাজ্য পায়,
মূর্খ-সুত যদি দৈবে সুপণ্ডিত হয়,
নির্ধন যদ্যপি বহু অর্থ লাভ করে,
তাহ'লে সেজন ধরা তৃণ সম হেরে।

(৬৩)

অশক্তস্তস্করঃ সাধুঃ কুরূপা চেৎ পতিব্রতা।

রোগী চ দেবতাভক্তো বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী ॥

ভাবার্থ—অসমর্থ হ'লে পরে চোরে সাধু হয়।

কুরূপা রমণী পতিব্রতা হ'য়ে রয় ॥

রোগগ্রস্ত নরে হয় দেব-পরায়ণ।

বৃদ্ধা হ'লে তপস্বিনী হয় বেশ্যাগণ ॥

(৬৪)

রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং ধিয়া পশ্যতি পণ্ডিতঃ।

পশুঃ পশ্যতি গন্ধেন ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ ॥

ভাবার্থ—হেরে নৃপ সমুদায় আপন শ্রবণে।

বুদ্ধি-বলে হেরে সব সুপণ্ডিত গণে ॥

পশু যত গন্ধ-যোগে হেরে সমুদায়।

হইলে অতীত কার্য্য, অজ্ঞে দেখে তায় ॥

(৬৫)

দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যাশ্চোত্তরদায়কাঃ।

সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥

ভাবার্থ—দুষ্টা ভার্য্যা, শঠ মিত্র, সমোত্তরদাতা ভৃত্য,

বাস অহি পূর্ণ ভবনেতে।

সংসারে এ সমুদায়, মৃত্যুর কারণ হয় ;

নাহি কিছু সন্দেহ ইহাতে ॥

(৬৬)

আলস্যং হি মনুষ্যানাং শরীরস্থো মহারিপুঃ।

নাস্ত্যুদ্যম সমো বন্ধুঃ কৃত্বা যন্নাবসীদতি ॥

ভাবার্থ—দেহস্থিত আলস্যই মহারিপু হয়।

উদ্যমই অদ্বিতীয় মিত্র সুনিশ্চয় ॥

অবসাদ গ্রস্ত কভু—উদ্যমশীলেরে।

না হয় হইতে,—এই কর্ম্মের সংসারে ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যবসায় বাণিজ্য।

(১ম প্রস্তাব)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও জলপথ ও স্থল পথ, উভয় বাণিজ্যেই শুল্ক প্রদান করিতে হইত। পরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিনা শুল্কে আমদানী রপ্তানী করিবার রাজাজ্ঞা বা ফারমান প্রাপ্ত হন। কোম্পানী ইয়ুরোপ হইতে যে সকল দ্রব্য আমদানী করিতেন এবং ইয়ুরোপে রপ্তানীর জন্য যাহা ভারতবর্ষে ক্রয় করিতেন,—তৎসমুদায়ই বিনা শুল্কে দেশের মধ্য দিয়া যাতায়াতের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইংরেজ প্রেসিডেন্টের বা ইংরেজদের কুঠির প্রধান ব্যক্তির দস্তখতি 'দস্তক' বা সার্টিফিকেট 'টোল'গৃহে প্রদর্শিত হইলেই কোম্পানীর জন্য দ্রব্য, সর্ব্ব প্রকার কর হইতে অব্যাহতি পাইত।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর বঙ্গদেশে ইংরেজ জাতির প্রাধান্য বর্দ্ধিত হয়। কোম্পানীর কর্ম্মচারিবর্গ বড় মানুষ হইবার আশায়, গোপনে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা বিলাতে পণ্যদ্রব্য প্রেরণ করতঃ বাণিজ্য করিতে পারিতেন না, বঙ্গ দেশেই জলপথে ও স্থলপথে ব্যবসায় করিতেন। তাঁহারাও এখন কোম্পানীর ন্যায় বিনা শুল্কে বাণিজ্যাধিকার লাভের দাবী করিতে লাগিলেন। এই বিষয়টী ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। কারণ, ইহারই ফলে পরবর্ত্তীকালে দেশের চারিদিক হইতে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয় এবং এই ঘটনা পরম্পরার অন্তরালেই দেশের আর্থিক, ব্যবসায়িক এবং রাজনৈতিক ইতিহাস প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

কোম্পানীকে বিনা শুল্কে ব্যবসায় করিবার যে ফারমান প্রদত্ত হয়, বাঙ্গালার নবাব তাহা মানিয়া লন। কিন্তু কোম্পানীর কর্ম্মচারীবর্গ নিজেদের স্বার্থের জন্য গোপনে যে সকল ব্যবসা করিতেন এবং যে সকল পণ্য বঙ্গদেশের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে আদান প্রদান হইত, তাহাও শুল্ক হইতে মুক্ত বলিয়া দাবী করেন।

পলাসীর যুদ্ধাবসানে ক্লাইভ ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মীরজাফরকে বঙ্গদেশের নবাব করেন। মীরজাফর অকর্ম্মণ্য শাসনকর্ত্তা হইয়া পড়ায়, এবং ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার যে সকল চুক্তি ছিল, তাহা পূরণ করিতে অসমর্থ হওয়ায়

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নবাবীর অবসান হয় এবং মীরকাশিমকে নবাব বলিয়া ঘোষণা করা হয়। নূতন নবাব কোম্পানীকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর এবং চট্টগ্রাম এই তিন জেলার রাজস্ব অর্পণ করেন এবং মীরজাফরের অঙ্গীকৃত টাকার মধ্যে যাহা পরিশোধ করিতে বাকী ছিল তাহা এবং কোম্পানীর দক্ষিণ ভারতের যুদ্ধের সাহায্যকল্পে পাঁচ লক্ষ টাকা প্রদান করিতে সম্মত হন। মীরকাশিম বিশ্বাসের সহিত এই সকল অঙ্গীকার পালন করেন এবং দুই বৎসরের মধ্যে ইংরেজদিগের নিকট তাঁহার সর্ব্বপ্রকার দেনা পরিশোধ করেন।

কিন্তু, ক্রমে অন্তর্বাণিজ্য সম্বন্ধে গোলযোগ বাড়িতে লাগিল। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ বিনাশুল্কে দেশের মধ্যে ব্যবসায় করিতেন। অপর পক্ষে দেশীয় ব্যবসায়িদিগকে প্রভূত পরিমাণে মাশুল দিতে হইত। ইহাতে দেশীয়গণের ব্যবসায় মাটী এবং সঙ্গে সঙ্গে নবাবের রাজস্বও হ্রাস হইয়া পড়ে। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ ব্যবসায় বাণিজ্য একচেটে করিয়া ভাগ্যলক্ষ্মীকে কঠোর ভাবে শৃঙ্খলিত করিতে লাগিলেন।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ক্লাইভের পদে হেনরী ভ্যান্সিটার্ট শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। তিনি এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"ব্যবসা সম্বন্ধে মীরজাফরের নিকট কোন সুবিধা চাওয়া হয় না, কোম্পানীর তদ্রূপ কোন প্রয়োজনও ছিল না। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগকে যে সুবিধা দেওয়া হয় তাহাতেই তাহারা সন্তুষ্ট ছিল। কেবল তাহারা নবাবের যথেচ্ছাচারিতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেন। দেশের মধ্যে আমাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর কর্ম্মচারী বা তাহাদের অধীনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা নূতন ধরণের কার্য্য সম্পাদিত হইতে লাগিল। যে সকল দ্রব্যের ব্যবসা পূর্ব্বে নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা সেই সকল দ্রব্যের ব্যবসায়ে লিপ্ত এবং দেশের অপরাপর কার্য্যেও হস্তক্ষেপ করিতে লাগিলেন।" (১)

মিঃ ভেরেলষ্ট—যিনি পরবর্ত্তী কালে শাসনকর্ত্তার পদ প্রাপ্ত হন, তিনিও ঐরূপ লিখিয়াছেন।—"শুল্ক না দিয়াই ব্যবসা চালান হইত এবং তন্নির্ব্বাহকল্পে নানা অত্যাচার অবিচার অনুষ্ঠিত হইত। ইংরেজ এজেণ্ট বা গোমস্তাগণ লোকের প্রতি শুধু অত্যাচার করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁহারা রাজ ক্ষমতাকেও পদদলিত করেন। তাহাদের স্বার্থে আঘাত লাগিবে ভাবিয়া, নবাব-কর্ম্মচারিগণের প্রতিও

(1) A Narrative of the Transactions in Bengal, Vol I.

দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিলেন। মীরকাশিমের সহিত যুদ্ধ সংঘটিত হইবার ইহাই প্রধান কারণ।" (২)

নবাব মীরকাশিম স্বয়ং ইংরেজ শাসনকর্ত্তার নিকট কোম্পানীর কর্ম্মচারী-দিগের অত্যাচারের কথা তীব্র ভাবে লিখিয়া পাঠান।—"কলিকাতার কুঠি হইতে আরম্ভ করিয়া কাসিমবাজার, পাটনা এবং ঢাকার সমস্ত ইংরেজ দলপতি (chief) তাহাদের গোমস্তা, কর্ম্মচারী ও এজেণ্টগণ—রাজ্যের প্রত্যেক জেলায় কালেক্টর, জমীদার, তালুকদার এবং খাজানা আদায়কারী রূপে যুগপৎ কার্য্য করিতেছেন এবং কোম্পানীর নিশান উড়াইয়া দিয়া আমার কর্ম্মচারিদিগকে কোনরূপ ক্ষমতা পরিচালন করিতে দিতেছেন না। এতদ্ব্যতীত গোমস্তা এবং অপরাপর ভৃত্যেরা প্রত্যেক জেলায় তৈল, মৎস্য, খড়, বাঁশ, চাউল, ধান্য, গুপারী এবং অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসায় চালাইতেছে এবং যে কেহই কেন হোক্ না, কোম্পানীর দস্তক হাতে লইয়া নিজকে কোম্পানীর অপেক্ষা ছোট ভাবিতেই পারিতেছে না।" (৩)

মীরকাশিমের অভিযোগ অপ্রকৃত নহে। বিশেষতঃ কোম্পানীর পাটনা কুঠির অধ্যক্ষ মিঃ ইলিস্ তাহার প্রতিদ্বন্দীতার দরুণ সম্রাটের বিষ নজরে পতিত হন। একজন আরমানি বণিক নবাবের জন্য কিছু সোরা ক্রয় করার অপরাধে অভিযুক্ত হন। ইহাতে কোম্পানীর স্বত্ব নষ্ট হইয়াছিল মনে করিয়া মিঃ ইলিস বণিককে ধৃত করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে কলিকাতায় প্রেরণ করেন। ইংরেজ সৈন্য-বিভাগের দুইজন পলাতক সৈন্য নবাবের মুঙ্গের দুর্গে আশ্রয় লইয়াছে বলিয়া ইলিসের সন্দেহ হয়। তদনুসারে তিনি দুর্গ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত নিজের সৈন্য সামন্ত প্রেরণ করেন, কিন্তু পলাতকদ্বয়কে পাওয়া যায় না। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ এই সময় শাসনকর্ত্তৃসভার সভ্যপদে নিযুক্ত ছিলেন। নবাবের ক্ষমতা এই ভাবে উপেক্ষা করা অকর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহার প্রতীতি হয় এবং ইহার ভাবী ফলও তাঁহার নিকট সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত হয় না। তিনি বলিয়াছেন,—"মিঃ ইলিস্ সম্বন্ধে আমি যে কি করিব, তাহা কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছি না। আমার বিবেচনায় তিনি অত্যন্ত অবিবেচকের ন্যায় কার্য্য করিয়াছেন এবং নবাবের প্রতি তাহার অশ্রদ্ধার ভাব অতি সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। নবাব যদি ইহার সমুচিত প্রতিফল দিতে ইচ্ছা করেন,

(2) View of Bengal.

(3) Mirkasim's letter, dated 26th March 1762.

তাহা হইলে কোম্পানী গুরুতররূপে বিপন্ন হইবে। * * * লোকে ঘটনা-পরম্পরা হইতে বিচার করিয়া দেখিবে যে, নবাবের ক্ষমতাকে প্রকাশ্যতঃ বিদ্রূপ করা হইয়াছে, তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দকে কারারুদ্ধ, তাঁহার দুর্গে সিপাহী প্রেরণ করা হইয়াছে এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই প্রদেশের ইংরেজ দলপতিগণ নবাবের সুবাদারী ক্ষমতা স্বীকার করেন না। এই সকলের অনিবার্য্য ফল প্রকাশ্য সমর অভিনয়।"

ওয়ারেন হেষ্টিংস্ নিরন্তর কোম্পানির ভৃত্যগণের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের শুল্ক নির্মুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং তদ্ধেতু বঙ্গবাসিগণের ব্যবসায়ের যে সর্ব্বনাশ হইতেছে তদ্বিষয়ে অনুযোগ করিতেন। তিনি একবারে স্বার্থান্ধ ছিলেন না এবং স্বজাতি প্রেমে মুগ্ধ হইয়া, বঙ্গবাসীদিগের উপর যে অবিচার হইতেছে তার তীব্র দোষারোপ করিতে বিরতও হইতেন না। "আমি আপনাদের নিকট একটী গুরুতর অভিযোগের কথা ব্যক্ত করিতেছি, যাহার আশু প্রতিকার অত্যাবশ্যক এবং যাহা না হইলে নবাবের সহিত কোম্পানির ঘনিষ্ঠতা দীর্ঘস্থায়ী করিবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। সে অভিযোগ এই—ইংরেজনামের বলে অনুষ্ঠিত অত্যাচার। * * * পর্য্যটন ব্যপদেশে নানাস্থানে ইংরেজ-পতাকা উড্ডীন হইতে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি এবং নদীর উপর—আমার মনে হয় পতাকা বিহীন একখানি নৌকাও আমার নয়ন পথে পতিত হয় নাই। তাহারা যে নামই কেন পরিগ্রহ করুক্ না, আমার নিশ্চিত ধারণা আছে যে, তাহাতে নবাবের রাজস্বের কোনরূপ উন্নতি, দেশের কোনরূপ মঙ্গল বা আমাদের স্বজাতির কোনরূপ গৌরব বর্দ্ধিত হইবে না, পরন্তু তদ্দ্বারা ইহার প্রত্যেকটীরই অবনতি হইবার সম্ভাবনা। যে সিপাহীদল আমাদের অগ্রে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারা লুণ্ঠনপ্রিয়তা ও অবাধ্যতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছে—বিশেষতঃ যেস্থানে তাহারা স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারিয়াছে। পথিমধ্যে আমার নিকট তাহাদের বিরুদ্ধে বহুতর অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং অধিকাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহর ও সরাই আমাদের আগমনে পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং ঐরূপ ব্যবহার আশঙ্কা করিয়া সমস্ত বিপণি অর্গলবদ্ধ হইয়াছে। আপনি বুঝিতে পারেন, মহাশয়, যে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিচার হইতে এবং তাহার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে দেশের লোকের মনে আমাদের শাসন বিষয়ে প্রতিকূল ধারণা বদ্ধমূল হইবে।" (১)

(১) Hasting's Letter to the Governor, dated 13th and 26th May and 25th April 1762.

হেষ্টিংস্ অনেক দিন ভারতবর্ষে কাটাইয়া গিয়াছেন। তিনি কোম্পানির ভৃত্যদিগের বিষয়ে দেশীয় দিগের যে অপ্রীতিকর অভিমতের কথা বলিয়াছেন, তাহা মিথ্যা নহে, শিয়ার মুতক্ষরীণের লেখক, সমর-ক্ষেত্রে ইংরেজ সৈন্যদিগের গৌরবান্বিত চরিত্রের বিষয় উল্লেখ করিলেও তাহাদের civil administration এর শোচনীয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। (১)

বাঙ্গালার নবাবও ইংরেজ শাসনকর্তার নিকট নিষ্ফল অভিযোগ করিতে থাকেন,—"প্রত্যেক পরগণায়, গ্রামে এবং প্রত্যেক কুঠিতে কোম্পানির গোমস্তাগণ লবণ, শুপারি, ঘৃত, ডাউল, খড়, বাঁশ, মৎস্য, আদা, শর্করা, তামাকু, অহিফেন এবং অন্যান্য বহুতর দ্রব্য যাহা লেখা আমার সাধ্যাতীত এবং যাহার উল্লেখও নিষ্প্রয়োজন বোধ হয়,—তৎসমুদয় ক্রয় বিক্রয় করে। তাহারা জোর জবরদস্তি করিয়া রায়ত, বণিকদিগের দ্রব্য সস্তার সিকি মূল্যে লইয়া যায়; এবং অত্যাচার উৎপীড়ন দ্বারা রায়ত প্রভৃতিকে এক টাকার জিনিষ পাঁচ টাকা দিয়া লইতে বাধ্য করে। * * * প্রত্যেক জেলার কর্ম্মচারিগণ তাহাদের কর্তব্য কার্য্য সম্পাদন হইতে বিরত হইয়াছে; কাজেই এবম্প্রকার অত্যাচার নিবন্ধন আমার বাৎসরিক প্রায় পঁচিশলক্ষ টাকার রাজস্ব হ্রাস হইয়াছে। * * * আমি যে সন্ধি এবং চুক্তি করিয়াছি, ভগবানের কৃপায় আমি তাহা ভঙ্গ করি নাই বা ভবিষ্যতেও করিব না। তবে কেন ইংরেজ দলপতিগণ আমার শাসনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া আমার অহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন?" (২)

কোম্পানীর ভৃত্যবর্গের কার্য্যাবলীর এতদপেক্ষাও বিশদ বিবরণ সার্জ্জেন ব্রিজোর (Sergeant Brego) পত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন,—"এক ভদ্রলোক খরিদ বিক্রয়ের জন্য এখানে এক জন গোমস্তা প্রেরণ করেন। সে আসিয়াই এই ভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করে যে, অধিবাসীদিগের মাল পত্র কেবল তাহার নিকটই ক্রয় বিক্রয় হইবে, এইরূপে তাহাদিগকে বাধ্য করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা তাহার আছে। তৎপর কেহ তদ্রূপ করিতে অস্বীকৃত বা অসমর্থ হইলে, তাহার প্রতি বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা বা অবরুদ্ধ ভাবে রাখিবার প্রণালী অনুসৃত হয়। কিন্তু ইহাই পর্য্যাপ্ত নহে; অপর একটী জুলুম আরম্ভ হয়। ব্যবসায়ের প্রত্যেক বিভাগই তিনি

(১) Siyar Mutakharin, vol. II. P. 101.

(২) Nawab's Letter written May 1762.

নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার প্রয়াস পান। দেশের লোক ইহাতে আপত্তি বা অসম্মতি প্রকাশ করিলে পূর্ব্বোক্তরূপ দণ্ডের পুনরাবৃত্তি হইতে থাকে। * * * বঙ্গদেশের গোমস্তাগণের প্রাত্যহিক আচরিত এইরূপ বহুতর উৎপীড়নের বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে; এবং এই কারণেই এই স্থান (বাখরগঞ্জ বঙ্গের একটী সমৃদ্ধিশালী জেলা) মানব শূন্য হইতেছে; লোকে, নিরাপদ স্থানের আশায় প্রত্যহই দলে দলে সহর ত্যাগ করিতেছে। এবং যে বিপণি পূর্ব্বে প্রচুর দ্রব্য সম্ভার সরবরাহ করিত, এক্ষণে তথায় ব্যবহারোপযোগী কদাচিৎ কোন দ্রব্য পাওয়া যায়। গোমস্তাদের পিয়নেরা উপায় হীন দরিদ্র ব্যক্তিগণের উপর জুলুম করিতেছে; তাহাদের জমিদার ইহার প্রতিবিধান করিতে চেষ্টিত হইলে, তাহাকেও তদ্রূপ দণ্ডিত করিবার ভয় দেখান হইয়া থাকে। পূর্ব্বে প্রকাশ্য কাছারীতে বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ হইত; এক্ষণে প্রত্যেক গোমস্তাই এক এক জন বিচারক এবং তাহাদের গৃহই এক একটী কাছারী হইয়াছে। তাহারা জমীদারদিগের উপরও দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করে এবং কল্পিত অনিষ্টের ভয় দেখাইয়া তাহাদের নিকট হইতে অর্থ শোষণ করে। * * *”। (১)

এইরূপ আর একখানি পত্র ঢাকার কালেক্টর মহাম্মদ আলী কলিকাতার ইংরেজ শাসনকর্ত্তাকে লিখিয়াছিলেন;—“প্রথমতঃ একদল বণিক কুঠির লোকদের সহিত যোগ সাজস করিয়া নিজেদের নৌকায় ইংরেজ-পতাকা উড়াইয়া ইংরেজ নামের দোহাই দিয়া পণ্য দ্রব্য লইয়া যাইতেছে। ইহাতে সাহাবন্দর এবং অন্যান্য স্থানের বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। দ্বিতীয়তঃ লক্ষ্মীপুর এবং ঢাকা কুঠির গোমস্তাগণ তামাকু, কার্পাস, লৌহ এবং তদ্রূপ অন্যান্য দ্রব্য বাজার দর অপেক্ষা ঊর্দ্ধ মূল্যে তাহাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিতে মহাজনদিগকে বাধ্য করতঃ, জোর করিয়া তাহাদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেছে; এতদ্ব্যতীত, তাহারা তাহাদের নিকট হইতে পিয়নদের খোরাকীর টাকা এবং চুক্তি ভঙ্গ হেতু জরিমানার টাকা আদায় করে। এতদ্দ্বারা আড়ং এবং অন্যান্য স্থানগুলি বিনষ্ট হইয়াছে। তৃতীয়তঃ লক্ষ্মীপুর কুঠির গোমস্তাগণ তহসিলদারের নিকট হইতে জোর করিয়া নিজের ব্যবহারের জন্য তালুকদারের তালুক সকল (কৃষকের কৃষি ক্ষেত্র) ছিনাইয়া লইয়াছে, অথচ তাহার খাজানা প্রদান করে না। কতিপয় ব্যক্তির প্ররোচনায় তাহারা একটী

(১) Letter dated 26th May 1762.

অভিযোগ উপলক্ষ করিয়া দেশের মধ্যে 'দস্তক' সহিত ইংরেজ এবং সিপাহী প্রেরণ করতঃ গোলযোগের সৃষ্টি করে। তাহারা স্থানে স্থানে চৌকী স্থাপন (টোল-গৃহ) করিয়া গরীব লোকদিগের গৃহে যে কোন দ্রব্য দেখিতে পায়, তাহাই বিক্রয় করিয়া অর্থ গ্রহণ করে। এই অত্যাচারে দেশ উচ্ছন্ন যাইতেছে এবং রায়তেরাও সচ্ছন্দে গৃহে থাকিয়া মালগুজারি আদায় করিতে পারিতেছে না। বহুতর স্থানে মিঃ সিভালির (chevalir) স্ববাহু-বলে নূতন হাট এবং কুঠি প্রতিষ্ঠিত করতঃ নিজের পক্ষের জাল সিপাহীদল প্রস্তুত করিয়াছেন এবং ইচ্ছানুসারে যাকে তাকে ধৃত করিয়া অর্থ দণ্ড আদায় করিয়া লইতেছেন। এই জবরদস্তি মূলক কার্য্যের ফলে বহু হাট, ঘাট এবং পরগণা সমূহ বিনষ্ট হইয়াছে।"

কোম্পানীর ভৃত্য ও এজেন্টগণ সমস্ত প্রধান জেলাতে বসিয়া যখন বঙ্গদেশের সমগ্র অন্তর্ব্বাণিজ্য আলোড়ন করে, তৎকালে শিল্প কলা সমূহের উপর একাধিপত্য স্থাপন করিতেও তাহারা তুল্যরূপ অত্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। উইলিয়ম বোল্ট নামক এক ইংরেজ সওদাগর স্বচক্ষে সমস্ত বিষয় অবলোকন করতঃ তৎ সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, আগামী বারে তাহার উল্লেখ করিব। *

ক্রমশঃ।

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

গঙ্গারাম।

প্রথম খণ্ড।

১ম পরিচ্ছেদ।

শ্যামা নৌকারোহণে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছিল। শ্যামা বড়মানুষের মেয়ে, জমিদারের বৌ; সুতরাং একটু জাঁকজমকের সহিতই যাইতেছিল। নৌকা খানা বড়, বেশ সাজান। নৌকায় একজন দাসী, দুইজন সশস্ত্র ভোজপুরী দ্বারবান। তা' ছাড়া দাঁড়ী মাঝি সাতজন।

শ্যামার বাপের বাড়ী রসুলপুরে, শ্বশুরবাড়ী চকদীঘী। রসুলপুর হইতে

* Indian Trade.—By R. C. Dutt..

চকদীঘী নৌকাপথে দেড়দিনের রাস্তা। শ্যামার মা নাই, বিমাতা আছে। পিতা হরগোবিন্দ চৌধুরী জমীদার না হইলেও বড়লোক। তাঁহার অনেক জমিজমা আছে, তেজারতি কারবার আছে, চকমিলান বাড়ী আছে, বাড়ীতে দাসদাসী আছে। দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিলেও হরগোবিন্দ বাবু শ্যামাকে নিতান্ত অনাদর করিতেন না। কিন্তু সে আদরে শ্যামার সুখ বা তৃপ্তি ছিল না। সেই যে দুই বৎসর পূর্ব্বে একদিন তাহার স্বামী গোপীনাথ, শ্বশুরের সহিত বিবাদ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, কন্যার মুখের দিকে না চাহিয়া অভিমানসর্ব্বস্ব হরগোবিন্দ বাবু সেই যে রূঢ় বাক্যে জামাতাকে বিদায় দিয়াছিলেন, তদবধি শ্যামার মনে সুখ শান্তি ছিল না। ইহার পর শ্যামা অনেক কাঁদা কাটা করিয়া স্বামীকে দুই তিন খানা পত্র লিখিয়াছিল। তখন এরূপ ডাকের বন্দোবস্ত ছিল না, লোকের হাতে পত্র যাইত। নফরার মা নাম্নী জনৈকা স্ত্রীলোক পত্র লইয়া যাইত, এবং পত্রের উত্তর আনিত। শ্যামা পত্রের কথাটা গোপনে রাখিবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিলেও শ্যামার বিমাতার দানশক্তির মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া নফরের মা শ্যামার অনুরোধটা রক্ষা করিতে পারে নাই। সুতরাং কথাটা হরগোবিন্দ বাবুর কাণে গেলে তিনি কন্যাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। ইহাতে শ্যামা শুধু একটু কাঁদিয়াছিল।

তারপর সেই পত্রের প্রভাবেই হউক, বা শ্যামার অদৃষ্টবশতঃই হউক, একদিন বৈশাখ মাসের শেষে একজন দাসী ও দুইজন দ্বারবানের সহিত এক খানা নৌকা আসিয়া রসুলপুরের ঘাটে লাগিল। হরগোবিন্দ বাবু কন্যাকে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু শ্যামা সে কথা শুনিল না। সে পিতার অনভিমতেও শ্বশুরবাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। ইহাতে হরগোবিন্দ বাবু অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি কন্যার মুখের উপর স্পষ্টবাক্যে বলিলেন; আজি হইতে শ্যামার সহিত তাঁহার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। পিতার এই কঠোর ব্যবহারে শ্যামা একটু দুঃখিত হইল, মাতাকে স্মরণ করিয়া একটু কাঁদিল। তারপর সে যখন পাল্কী হইতে নামিয়া নৌকায় উঠিল, দুইখানা পাল তুলিয়া দিয়া অনুকূল স্রোতের মুখে নৌকা যখন ছুটিল, রসুলপুর পশ্চাতে ফেলিয়া, প্রাতঃসূর্য্যকিরণোদ্ভিন্ন তরঙ্গমালা ভেদ করিতে করিতে, নূতন নূতন মাঠ ঘাট গ্রামের কাছ দিয়া নৌকা যখন চলিল, তখন আবার শ্যামার মুখে হাসি ফুটিল। সে গবাক্ষ

খুলিয়া ক্ষুন্ন দৃষ্টিতে মৃদুতরঙ্গশিরে প্রভাতারুণরশ্মির চঞ্চল নৃত্য দেখিতে দেখিতে চলিল। হায় শ্যামা, সংসারে প্রভাত কতটুকু স্থায়ী?

ক্রমে প্রভাতের সূর্য্য মাথার উপর উঠিল, সেখান হইতে আবার পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িল। শ্যামা কত নূতন দেশ, নূতন মানুষ, নূতন মাঠ, নূতন ঘাট প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে চলিল। অপরাহ্নে বাতাস কমিয়া আসিল। তখন পাল নামাইয়া দাঁড়ীরা দাঁড় ধরিল। নৌকা ধীরে ধীরে চলিল।

সন্ধ্যার সময় মাঝিরা একটা বাজারের নিকট নৌকা বাঁধিয়া রাখিতে চাহিল। কিন্তু দ্বারবানদ্বয় গোঁফে চাড়া দিয়া বলিল, "কুছ্ ডর নেহি, চালাও।" অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া দিল।

নদীর দুই পাশে জঙ্গল। জঙ্গল কোথাও ঘন, কোথাও বিরল। যেখানে বিরল, সেখানে দুই চারি ঘর বসতি আছে। অধিবাসীরা ইতর জাতীয়। মাছ ধরা ও সুযোগ মতে মানুষ মারাই তাহাদের ব্যবসায়। তা' ছাড়া ঘন জঙ্গলের মধ্যে অনেক ডাকাতের আড্ডাও আছে। তন্মধ্যে গঙ্গা ডাকাতের নামই প্রসিদ্ধ।

আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তখন বাঙ্গালার এক মহাসন্ধিক্ষণ। তখন রাত্রি যাইতেছে, দিবা আসিতেছে, অথবা দিবা যাইতেছে, রাত্রি আসিতেছে। তখন মুসলমান শাসনের অবসান ও ইংরাজ রাজত্বের অভ্যুদয় কাল। কিন্তু তখনও ইংরাজ তুলাদণ্ড ছাড়িয়া শাসনদণ্ড গ্রহণ করে নাই। মুসলমান নাম মাত্র রাজা, কিন্তু রাজ্য শাসনে উদাসীন; ইংরাজ অর্থশোষণে ব্যস্ত। সুতরাং দেশ মধ্যে তখন দস্যুতা ও অত্যাচারের একাধিপত্য। তখন ডাকাতেরা পত্র পাঠাইয়া ডাকাতি করিত, নির্জ্জন পথের ধারে লাঠীয়ালেরা কাত্‌লা ফেলিত, দস্যুদল নৌকা করিয়া জলপথে লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত।

রজনী গভীরা। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ নির্জ্জন। কেবল কৃষ্ণাদশমীর চাঁদ পূর্ব্ব গগন আলোকিত করিয়া জঙ্গলের পাশ হইতে উঁকি দিতেছিল। তাহার বনান্তরাল পতিত দুই একটা রশ্মি শান্ত নদী তরঙ্গের উপর পড়িয়া নাচিতেছিল। কেবল নদী তীর হইতে অশ্রান্ত ঝিল্লীধ্বনি উঠিতেছিল। আর নদীগর্ভে ছয়খানা দাঁড়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হইতেছিল। মাঝি হাল ধরিয়া ঝিমাইতেছিল, দ্বারবান্ দ্বয় বসিয়া বসিয়াই নাক ডাকাইতেছিল। নৌকার ভিতরে দাসী এক পাশে পড়িয়া ঘুমাইতেছিল; শ্যামা শুইয়া বিনিদ্র নয়নে কল্পনায় ভবিষ্যতের একটা আলোক চিত্র আঁকিতেছিল।

সহসা পশ্চাতে আর একখানা নৌকার দাঁড় পতনের শব্দ উঠিল। সে শব্দ নিদ্রালস মাঝির কাণে গেল। সে চক্ষু মুছিয়া ফিরিয়া চাহিল। ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে দেখিল, পশ্চাতে একখানা বোটে নক্ষত্রগতিতে ছুটিয়া আসিতেছে। বোটের গতি দেখিয়া তাহার সন্দেহ হইল। সে সন্দেহের কথা মৃদুস্বরে দাঁড়ীদিগকে জানাইল। দাঁড়ীরা দ্বারবানদ্বয়কে সতর্ক করিতে গিয়া দেখিল, তাহারা নাক ডাকাইতেছে। অনেক ডাকাডাকি ঠেলাঠেলির পর তাহারা "ক্যা হুয়া" "ক্যা হুয়া" করিতে করিতে জাগিয়া উঠিল। তারপর চক্ষু মুছিয়া, ব্যাপার কি জানিয়া হাতিয়ার ঠিক করিবার পূর্ব্বেই পশ্চাতের বোটখানা তীরবেগে আসিয়া নৌকার গায়ে লাগিল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা হইতে প্রায় কুড়ি জন সশস্ত্র দস্যু নৌকার উপর লাফাইয়া পড়িল। তাহাদের অস্ত্রের ঝনৎকার শুনিয়াই দাঁড়ী মাঝিরা ঝুপ্ ঝাপ করিয়া জলে পড়িল। দ্বারবানদ্বয় অতর্কিত ভাবে আক্রান্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। তারপর দুই চারি ঘা লাঠীর আস্বাদন প্রাপ্ত হইয়া, তাহারাও মাঝিদের অনুসরণ করিয়া শক্তি ও নিমকের পরিচয় প্রদান করিল। তখন দস্যুগণ চীৎকার করিয়া নৌকার ভিতর ঢুকিল।

সে চীৎকারে দাসীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। নৌকার ভিতর আলোক জ্বলিতেছিল। সে আলোকে দস্যুদের ভীষণ মূর্ত্তি এবং অস্ত্রের চাক্‌চিক্য দেখিয়া বিস্ময় পূর্ব্বক চীৎকার করিতে করিতে দাসী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কিন্তু শ্যামা মূর্চ্ছিত হইল না, চীৎকারও করিল না। সে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া বলিল, "তোমরা আমায় স্পর্শ করিও না ; আমার যা' কিছু আছে দিতেছি।"

কিন্তু উন্মত্ত দস্যুদল সে কথা শুনিল না। তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রসর হইয়া শ্যামার গা হইতে গহনা খুলিয়া লইতে গেল। শ্যামা আপনার বিপদ বুঝিতে পারিল, বুঝিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার সে কাতর চীৎকার ঘুরিয়া ঘুরিয়া নদীবক্ষে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সে প্রতিধ্বনির শেষ রেখা দিগন্তের কোলে না মিলাইতেই সহসা নদীবক্ষঃ প্রকম্পিত করিয়া বন্দুকের শব্দ উঠিল, 'গুড়ুম্'। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একটা গুলি আসিয়া অগ্রবর্ত্তী দস্যুর মস্তকে বিদ্ধ হইল। দস্যু চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে শ্যামাও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। আবার বন্দুকের শব্দ উঠিল, আবার একটা গুলি আসিয়া জনৈক দস্যুর স্কন্ধ ভেদ করিল। তখন, "মাছি লেগেছে" বলিয়া দস্যুগণ আহত সঙ্গীদ্বয়কে তুলিয়া লইয়া বাহিরে আসিল ; এবং

মুহূর্ত্ত মধ্যে বোটেয় উঠিয়া বোটে ছাড়িয়া দিল। বোটে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া চলিল।

মুহূর্ত্ত পরেই আবার সব স্থির। কেবল মূর্চ্ছিতা শ্যামাকে বক্ষে লইয়া নাবিকবিহীন নৌকা নাচিতে নাচিতে স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যিনি গুলি করিলেন, তিনি বিল্বগ্রামের জমিদারের জনৈক কর্ম্মচারী—রাধানাথ চক্রবর্ত্তী। রাধানাথ মহাল হইতে খাজানা আদায় করিয়া ফিরিতেছিলেন। সম্মুখে লাটের কিস্তী। তিনি টাকা লইয়া গেলে তবে খাজানা দাখিল হইবে। সুতরাং দস্যু ভয় সত্ত্বেও তাঁহাকে রাত্রিকালে নৌকা চালাইতে হইয়াছিল। তবে সঙ্গে লোকজন অস্ত্র শস্ত্র থাকায় ততটা ভয়ের সম্ভাবনা ছিল না।

শ্যামার নৌকা যে দিকে যাইতেছিল, রাধানাথ সেই দিক হইতেই আসিতেছিলেন। সুতরাং তিনি সম্মুখের নৌকার বিপদ সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বুঝিবামাত্র দস্যুদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িয়াছিলেন। তাঁহার অব্যর্থ সন্ধানে দুই জন দস্যু আহত হইল, অবশিষ্ট সকলে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল।

তারপর কর্ণধারবিহীন স্রোততাড়িত নৌকাখানা যখন তাঁহার সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া চলিল, তখন তিনি সেখানাকে ধরিবার জন্য মাঝিদের আদেশ দিলেন,মাঝিরা নৌকা ধরিল। রাধানাথ নৌকার আরোহিদিগের অবস্থা জানিবার নিমিত্ত তাহাতে উঠিলেন। নৌকার বাহিরে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ভিতরে আলোক জ্বলিতেছিল। রাধানাথ ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়াই যাহা দেখিলেন, তাহাতে তিনি মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেখিলেন, সম্মুখে ছিন্ন নলিনীদলবৎ এক মূর্চ্ছিতা রমণী মূর্ত্তি। তেমন মূর্ত্তি, তেমন রূপ, তেমন সৌন্দর্য্য সচরাচর দেখা যায় না। রাধানাথও তাহা এই প্রথম দেখিলেন। দেখিয়া মুগ্ধ—স্তম্ভিত হইলেন।

রাধানাথ নিজের নৌকার লোকদিগকে ডাকিয়া মূর্চ্ছিতাকে আপনার নৌকায় তুলিলেন। তারপর পলায়িত দাঁড়ী মাঝিদের অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু রাত্রিকালে সেই জঙ্গলের মধ্যে তাহাদের কোনও উদ্দেশ পাইলেন না। এদিকে তাঁহার অপেক্ষা করিবারও সময় নাই। অগত্যা আরোহীশূন্য নৌকাখানাকে তীরের নিকট বাঁধিয়া তিনি আপনার নৌকা ছাড়িয়া দিলেন।

কিন্তু নৌকাখানা একবারে আরোহীশূন্য ছিল না। তখনও তাহার ভিতরে একপাশে দাসী মূর্চ্ছিতাবস্থায় পড়িয়াছিল। রাধানাথ যখন শ্যামাকে তুলিয়া লইয়া যান, তখন তাহার কতকটা চৈতন্য হইয়াছিল। কিন্তু সে যখন দেখিল, ডাকাতেরা শ্যামাকে তুলিয়া লইয়া পলাইতেছে, তখন সে নীরবে পড়িয়া থাকাই যুক্তিযুক্ত বোধ করিল। শব্দ করিলে পাছে ডাকাতেরা তাহাকে দেখিতে পায়, দেখিয়া পাছে তাহাকেও ধরিয়া লইয়া যায়। দাসীর বিশ্বাস, তখনও তাহার ডাকাতে ধরিবার মত বয়স আছে।

দাসী যেখানে পড়িয়াছিল, সেস্থানটা কিছু অন্ধকার। সুতরাং রাধানাথ তাহাকে দেখিতে পান নাই। আর এতটা দেখিবার বা অন্বেষণ করিবার অবসর বা প্রবৃত্তিও বুঝি তখন তাঁহার ছিল না। পদ্মবনের ভিতর একটা কল্‌মী ফুল ফুটিয়া থাকিলে কে তাহা দেখিতে পায়? ফুল্ল জ্যোৎস্নালোকে দাঁড়াইয়া কে আবার ছায়ার অন্বেষণ করে? যাহার সম্মুখে মাণিক জ্বলে, তাহার কি রাঙ্‌তা খুঁজিয়া বেড়াইবার অবসর বা প্রবৃত্তি থাকে?

নৌকা কিছুদূর গেলে শ্যামার চৈতন্য হইল, সে উঠিয়া বসিল; নৌকায় অপরিচিত পুরুষ দেখিয়া মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিল। তখন রাধানাথ তাহাকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া দিয়া নির্ভয় হইতে উপদেশ দিলেন। শ্যামা ততটা ভীরুস্বভাবা বা লাজুক মেয়ে ছিল না। তাহা হইলে পিতার অনভিমতে সে কখনই বাটীর বাহির হইতে পারিত না। সুতরাং সে অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিল, "আপনারা আমাকে আমার নৌকায় পৌঁছিয়ে দিন।"

রাধানাথ বলিলেন, "সে নৌকায় কেহই নাই।"

শ্যা। আমার লোক জন?

রা। নাই।

শ্যা। দাঁড়ী মাঝি?

রা। পালিয়ে গিয়েছে।

শ্যা। তবে এখন আমার উপায়?

রা। কাল বেলা দুই প্রহরের পর উপায় করিব।

শ্যা। কি উপায় করিবেন?

রা। আপনার গন্তব্যস্থানে আপনাকে পৌঁছিয়ে দিব।

শ্যা। আজই কেন দিন না?

রা। তা' হ'লে আমার মনিবের কাজ নষ্ট হবে।

শ্যা। কেন ?

রা। লাটের কিস্তীর আর পাঁচ দিন মাত্র বাকী। আমার কাছে টাকা। আমি কাল সন্ধ্যার মধ্যে টাকা পৌঁছিয়ে দিতে না পারলে লাটের কিস্তীর খাজানা দাখিল হ'বে না।

শ্যা। খাজানা দাখিল না হ'লে কি হ'বে ?

রা। জমিদারী বিকিয়ে যেতে পারে।

শ্যা। তবে কি আগে জমিদারীতে খাজানা পৌঁছিয়ে দিয়ে তারপর আমার উপায় করবেন ?

রা। না, জমীদারীতে যাব না। সোণাপুরে আমাদের কাছারী আছে। সেখানে নৌকা ধ'রে, ঘোড়সওয়ারে টাকা পাঠিয়ে দিয়ে নৌকা ফেরাব।

শ্যা। সোণাপুর এখান হ'তে কত দূর ?

রা। তিন প্রহরের পথ।

শ্যা। আর চকদীঘী ?

রা। নৌকায় যাইতে প্রায় একদিন লাগে।

শ্যা। হাঁটা পথে ?

রা। বলিতে পারি না। আপনি চকদীঘী যাইবেন ?

শ্যা। হাঁ।

রা। সেখানে কি আপনার—

প্রশ্নের ভাব বুঝিয়া শ্যামা বলিল,—"সেখানে আমার শ্বশুর বাড়ী।"

রাধানাথ বলিলেন, "আপনার স্বামীর নাম কি ?"

শ্যামা মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া নীরবে রহিল। রাধানাথ বুঝিলেন, প্রশ্নটা অন্যায় হইয়াছে; স্ত্রীলোকেরা স্বামী বা শ্বশুরের নামোচ্চারণ করে না। তিনি বলিলেন, "আপনি একটা দিন অপেক্ষা করুন। একদিন পরে আপনাকে চকদীঘীতে পৌঁছিয়ে দেব।"

শ্যামা বলিল,—"সে পর্য্যন্ত আপনারা কেহ নৌকার ভিতরে আসিবেন না।"

স্বীকৃত হইয়া রাধানাথ বাহিরে আসিলেন।

পরদিন বেলা দুই প্রহরের পর নৌকা সোণাপুরের ঘাটে লাগিল। রাধানাথ নৌকা হইতে উঠিয়া কাছারীতে গেলেন। এবং ঘোড়সওয়ার ঠিক করিয়া তাহার দ্বারা খাজানার টাকা বিল্বগ্রামের কাছারীতে রওনা করিয়া দিলেন।

তারপর আহারাদি শেষ করিতে প্রায় অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। এদিকে তখন বাতাস প্রতিকূল বহিতেছিল, আকাশে একটু মেঘও উঠিয়াছিল। সুতরাং সেদিন আর শেষ বেলায় নৌকা ছাড়া হইল না। পরদিন প্রভাতে চকদীঘী অভিমুখে নৌকা ছাড়া হইল।

এদিকে নৌকালুঠের পরদিন প্রভাতে মাঝিরা খুঁজিতে খুঁজিতে কিছু দূরে বনের পাশে নৌকাখানাকে বাঁধা দেখিতে পাইল। তাহারা গিয়া নৌকায় উঠিল। দেখিল, নৌকায় দাসী একা আছে, শ্যামা নাই। জিজ্ঞাসায় জানিল, ডাকাতেরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তখন তাহারা অগত্যা নৌকা ছাড়িয়া দিল। দাসী বাহিরে বসিয়া তাহাদের সহিত ডাকাতির অদ্ভুত গল্প করিতে লাগিল।

দ্বারবান্‌দ্বয় নৌকার অনুসন্ধানের অপেক্ষা না রাখিয়া হাঁটা পথেই রওনা হইয়াছিল। সুতরাং তাহারা অগ্রে চকদীঘীতে পৌঁছিল। পৌঁছিয়া ডাকাতির বৃত্তান্ত প্রভুর নিকট নিবেদন করিল। গোপীনাথ তাহাদিগকে ডাল রুটী দ্বারা দুই দিনের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন।

সন্ধ্যাকালে নৌকা পৌঁছিল। নৌকা আসিল, দাসী আসিল, কিন্তু শ্যামা আসিল না। দাসী বাড়ীর ভিতর গিয়া দস্যু কর্ত্তৃক শ্যামার হরণ বৃত্তান্ত সবিস্তারে সালঙ্কারে বিবৃত করিল। তারপর বাহিরে আসিয়া রামার মা, শ্যামার পিসি, গয়লা বৌ প্রভৃতি যাহাকে দেখিল, তাহারই নিকট এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া সকলের কৌতূহল নিবৃত্তি করিল। রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে গ্রামের ঘরে ঘরে ডাকাতির এই বিস্ময়কর গল্প নানা আকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্রমশঃ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

অনুতপ্তা।

(১)

সখি, আজ শুধু মনে হয়
কোলাহল ভরা এ বিশাল ধরা
কিছু নয়, কিছু নয়!
হেথাকার হাসি, হেথাকার গান,
পরাণের হেথা আদান প্রদান,
দু'দিনের মাঝে হবে অবসান
জাগে সদা এই ভয়!
মরমের আশ, আকুল তিয়াষ
হেথা মিটিবার নয়!

(২)

সখি, সেই মোর ছিল ভাল
বসি একাকিনী দিবস-যামিনী
কাটাতাম শুধু কাল!
আপনার কথা, আপনার মনে,
উঠিত পড়িত নীরবে গোপনে,
কেহত ছিল না সে সুখ-সদনে
জ্বালাতে বারেক আলো!
নিজ সুখ-দুখ বিষাদ-কৌতুক,
সেই মোর ছিল ভাল!

(৩)

সখি, মোর সেই ছোট ঘরে
জ্যোছনার খেলা, কুসুমের মেলা,
মাতিত বিহগ স্বরে!
দেবতার মোর পূত আব্‌ছায়া,
রাজিত সকল মানস ভরিয়া,
গাঁথিতাম মালা সাধ মিটাইয়া
নিয়ত তাঁহারি তরে!
কোনো দিন যদি, মিলে সেই নিধি,
মোর সেই ছোট ঘরে!

(৪)

মোর জীবনের দিন গুলি
লহরের পর, যেমতি লহর,
তেমতি যাইত চলি!
না ছিল ভাবনা, না ছিল বেদনা,
স্বপনে মননে একই সাধনা,
নব উপাচার করিত রচনা
দেব-পদে দিতে তুলি'!
কেবলি নীরবে, আপন গরবে,
যেত মোর দিন গুলি!

(৫)

সখি, একদা কেমনে জানি
পড়িল নয়নে যেন কি ছলনে
মায়াময় ধরা খানি!
তার প্রতি অণু রেণুকার মাঝ,
মনে হ'ল ধরি প্রেমময় সাজ,
দেবতা আমার করেন বিরাজ
রচি মহা রাজধানী!
সবাকার সনে, যেন কি বাঁধনে,
ডাকে মোরে ধরা খানি!

(৬)

সখি, সে ছলে ভুলিয়ে হায়
জগতের মাঝে দেবতার খোঁজে
নিয়ে এনু আপনায়!
বুঝিবা তটিনী এই মত করি'
শৈশব-আবাস দূরে পরিহরি'
মদির-লহরে জন-মন হরি'
সাগর তলাসি ধায়!
দেবতার তরে, তেয়াগিনু ঘরে,
কি ছলে ভুলিয়ে হায়!

(৭)

সখি, কি যেন কপাল-লেখা
দেবতা কোথায়, পলকে লুকায়,
অকূলে ভাসিনু একা!
চারিদিক হতে ঘাত-প্রতিঘাত,
দুরবল শিরে করিল আঘাত,
ডাকিনু কাতরে 'কোথা তুমি নাথ,
দাও এবে দাও দেখা!'
সাধনা কামনা, কিছুই র'ল না,
অকূলে ভাসিনু একা!

(৮)

আজি সাধ যায় শত মতে
ফিরে যেতে সখি, জগত উপেখি'
এসেছিনু যথা হতে!
সেই সুখময় নিরজন ঘরে,
মোর দেবতার পদযুগ স্মরে'
লইতে সমাধি চিরদিন তরে
পুরাইতে মনোরথে!
হায়রে কেমনে ফিরিবে সদনে
নদী যদি আসে পথে।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

মক্কা-তীর্থ।

পঞ্চম স্তবক।

আরবিস্থানের বিস্তৃতি। এশিয়ক তুরস্কের দক্ষিণাংশে আরবিস্থান। আরবিস্থানের দুই দিকে সমুদ্র। উত্তরে সিরিয়া, পূর্ব্বে আরব, দক্ষিণে আদন উপসাগর এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর। আল্‌হেজাজ, এমন ও আল্‌হাসা এই তিনটী প্রদেশ আরবিস্থানের অন্তর্ভুক্ত। লোকসংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষ। উহার মধ্যস্থলে আল্‌হেজাজ অবস্থিত। মক্কা, মদিনা, তায়েক এবং গোর ও নজদের সীমান্তবর্ত্তী স্থান সমূহ ইহার অন্তর্গত। প্রধান নগর মক্কা, লোহিত সাগরের ৬০ মাইল পূর্ব্ব, কলিকাতার ৩০৪০ মাইল পশ্চিম ও মদিনার ২৭০ মাইল দক্ষিণ।

অধিবাসী। আরবিস্থানের অধিবাসী সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত,—বেদুইন অর্থাৎ ভ্রমণকারী ও নগরবাসী। 'বেদুইন' বা বদ্দুগণ অতীব দুর্দ্ধর্ষ ও শ্রমশীল। নগরবাসীরা সমধিক শিষ্টাচার-সম্পন্ন। তন্মধ্যে হেজাজের রাজধানী মক্কার অধিবাসীরা জ্ঞান-ধর্ম্মে অগ্রণী। তাঁহাদের চরিত্র মাহাত্ম্য জগতে অতুলনীয়। মক্কার লোকসংখ্যা প্রায় অর্দ্ধলক্ষ।

ভূমি ও শস্য। আরবিস্থানের অভ্যন্তর ভাগ প্রায় মাল ভূমি, পাহাড় ও কণ্টকবন সমাকীর্ণ, অনেকস্থান প্রধানতঃ বালুকাময়,—তাহাতে মৃত্তিকার অংশ নাই বলিলেই হয়। অতিরিক্ত বৃষ্টির জল ব্যতীত এখানে শস্য জন্মাইতে পারে না। আরবের মরুভূমির 'সায়মুম' বায়ু প্রবাহিত হইয়া প্রায়শঃ এখানকার বায়ু দূষিত করিয়া থাকে; তবে পর্ব্বতাংশ অপেক্ষাকৃত শীতল। তায়েফ, সানা ও মোখা প্রভৃতি স্থানের সমতল উর্ব্বর ভূমিতে খোরমা, দাড়িম্ব, আঙ্গুর, জরদা আলু ও গোধূম প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাজারে সচরাচর আঙ্গুরের সের দেড় আনা, জরদা আলুর সের পাঁচ পয়সা ও দাড়িম্ব এক পয়সায় ৫।৬টী পাওয়া যায়।

শিল্প ও স্থাপত্য। হেজাজের কোরেশ ও এমনীয় প্রভৃতি সম্প্রদায় স্থাপত্য ও শিল্প-বিদ্যায় প্রাচীন কাল হইতেই অনুরাগী। শ্বেত, পীত ও নীল বর্ণের প্রস্তর দ্বারা আরবিস্থানে তাঁহারা অসংখ্য মস্‌জিদ, সমাধি মন্দির ও মিনার প্রস্তুত করিয়াছেন। তৎসমুদয়ের বিচিত্র সৌন্দর্য্য চিরদিন দর্শকবৃন্দের

মনঃপ্রাণ মুগ্ধ করিবে। তদ্ব্যতীত কোরেশগণ তরবারি, বর্শা এবং অন্যান্য আধুনিক রণসম্ভার নির্ম্মাণেও পারদর্শী। হাজিগণ মক্কা হইতে পিতল প্রভৃতি ধাতুর তৈজস পাত্রাদি আনিয়া থাকেন। তাহাতে মক্কা নিবাসীদের শিল্প নৈপুণ্যের যথেষ্ট উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। বলা বাহুল্য, সূক্ষ্ম রেশম শিল্পেও তাহারা অগ্রণী।

বন্দর। ক্ষুদ্র আরবিস্থানে বন্দরের অভাব নাই। হেজাজের জেদ্দা, ইয়াম্বু এবং মোখা প্রভৃতি নগরী সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্য-স্থলী। এতদ্ভিন্ন মক্কা ও অন্যান্য স্থানে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গঞ্জ আছে। বন্দর সমূহে পারস্যোপ-সাগরের মুক্তা, আরবের অশ্ব ও উষ্ট্রাদি, আরবিস্থানের নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য ও শস্য এবং বৈদেশিক স্বতন্ত্র-বিধ পণ্যদ্রব্য সকল জাহাজ ও উষ্ট্রের সাহায্যে আনীত হইয়া থাকে। ভারত ও আফ্রিকাদি-বাসী হাজিগণ জেদ্দা দিয়া মক্কা তীর্থে যাতায়াত করেন বলিয়া অধুনা জেদ্দা বন্দর সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। পুরাকাল হইতে দেশাধিপতিগণ বন্দর সমূহের উন্নতিবিধানের জন্য বহুল অর্থ ব্যয় করিয়া আসিতেছেন। সোল্‌তান সলিমখা গোরী, প্রযত্ন-সহকারে জেদ্দানগরীর পত্তন করিয়া ছিলেন। অধুনা আমিরুল মোমেনিন্ সোল্‌তান গাজি আব্‌দল হামিদ খানবাহাদুর, হদৈদা বন্দরের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য ২ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছেন।

আচার ব্যবহার। এসলাম ধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে একমাত্র কোরেশ গোষ্টিকেন, মতবর্-রবের বংশতরুর যাবতীয় শাখা প্রশাখায় বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছিল। পরিশেষে এসলামের পবিত্র শিক্ষা-প্রভাবে তৎসমস্ত আশ্চর্য্যরূপে তিরোহিত হয়। * মক্কার সামাজিক রীতিনীতি ধর্ম্মশাস্ত্রের অঙ্গীভূত। ধর্ম্মগ্রন্থ কোরান ও হাদিসের বিধি ও শাসনানুযায়ী, তদ্দেশবাসিগণ সরলান্তঃকরণে কি অতিথি, কি দরিদ্র, কি নিরাশ্রয় সকলেরই প্রতি আলাপে ব্যবহারে কোমলতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কুত্রাপি মিথ্যাবাদী, বিলাসী, সুদখোর, নিন্দুক ও রুক্ষ প্রকৃতির লোক দেখা যায় না। সকলেই একতা-সূত্রে গ্রথিত এবং অহর্নিশ ধর্ম্মালোচনায় দৃঢ়-চিত্ত। তথায় ধর্ম্মবিগর্হিত জঘন্য নৃত্যগীতাদির অস্তিত্ব মাত্রও নাই।

ভাষা। আরবদেশে সাতটী ভাষা পরিদৃষ্ট হয়;—প্রথম কোরেশীয় ভাষা, দ্বিতীয় এমনীয় ভাষা, তৃতীয় তয় ভাষা, চতুর্থ হাওজান ভাষা, পঞ্চম

* See spirit of Islam.

সকিফ ভাষা, ষষ্ঠ হজিন ভাষা এবং সপ্তম বনি-তমিম্ ভাষা। কোরেশীয় আরবী ভাষায় কোরান শরিফ অবতীর্ণ হওয়ায় আরবী ভাষা প্রায় আরবের সাধারণ ভাষায় পরিণত হইয়াছে। পৃথিবীর আদি-ভাষা হিব্রু, আরবী ভাষার প্রসূতি।

সাহিত্য। ধর্ম্ম বিদ্যা শিক্ষা কোরেশ জীবনের ধ্রুব কর্ত্তব্য; তাহাদের সাহিত্যও সুতরাং ধর্ম্ম মূলক। কোরান ও হাদিস এবং প্রেরিত পুরুষ ও তপস্বীদিগের জীবনী-বর্ণনায় আরবীয় সাহিত্যের অঙ্গ পরিপুষ্ট। তদ্ব্যতীত মৌলিক গদ্য ও পদ্য গ্রন্থেরও অপ্রতুলতা নাই।

কোরান শরিফ। ঈশ্বরের বাক্য (কালামল্লা) সমূহকে 'কোরান' বলে। হজরত পবিত্রাত্মা (রুহল কুদ্দ্স) যোগে কোরান শরিফ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 'ফাতেহা' (উদ্‌ঘাটিকা) নাম্নী 'সুরাটী' (অধ্যায়টি) কোরানের সর্ব্ব প্রথমে। এজন্য 'সুরাফাতেহার' অন্যতম নাম 'ওম্মল কোরান' অর্থাৎ কোরানের প্রসূতি। তৎপরে অন্যান্য সুরাগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। হজরতের জীবিতকালে কোরান শরিফ গ্রন্থ-বদ্ধ হয় নাই। তৎকালে 'সৈয়দলকরা' (কোরান পাঠকের অগ্রণী) ও বব্-বেন্নে-কাব প্রভৃতি শ্রুতি-ধরেরা কোরান কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন এবং অনেকেই তাহা খোরমা পত্রে, মৃগ চর্ম্মে এবং শ্বেত প্রস্তরে অঙ্কিত করিয়া রাখিতেন। হজরতের পরলোকান্তে ধর্ম্মপরায়ণ জয়দ ও এব্নে-কাব প্রমুখ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহায্যে খলিফাগণ কোরান পুস্তকাকারে সন্নিবদ্ধ করেন। এব্নে-কাব স্বগুণে 'সৈয়দল করা', 'সৈয়দল আন্সার' ও 'সৈয়দল মোস্লেমিন' এই ৩টী খেতাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কোরান শরিফ চতুর্দ্দশাধিকশত অধ্যায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে সপ্তাশীতি অধ্যায় মক্কায় অবতীর্ণ হয় এবং অবশিষ্ট মদিনায়। হজরতের মুখ নিঃসৃত আয়েত (প্রবচন) গুলি শ্রবণে মক্কার কোরেশগণ প্রথমে "উহা যাদুকরের মন্ত্র", "উহা কবিতা" ইত্যাকার নানা কথা বলিত এবং আবুজেহেল হজরতকে "ক্ষিপ্ত", আবুলাহাব "ভবিষ্যদ্বক্তা" ও হবিতাব "কবি" আখ্যা দিয়াছিল। কোরান ত্রয়োবিংশ বৎসরে সম্পূর্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিল।

হাদিস শরিফ। ধর্ম্মানুষ্ঠান-বিষয়ে হজরতের স্বপ্রবর্ত্তিত বিধি-সমূহ 'হাদিস' নাম-ধেয়। হাদিস ত্রিবিধ;—যথা—'কওলী হাদিস' (হজরতের বচনাত্মক), 'ফেলী হাদিস' (হজরতের ক্রীয়াত্মক) এবং 'তকবিরী হাদিস'

(হজরতের স্বীকৃত কার্য্য বিধি)। কোরানের ন্যায় হাদিসও হজরতের জীবিতকালে গ্রন্থে নিবদ্ধ হয় নাই। সার্দ্ধ শত হিজরির মধ্যে এব্নে জরিহ, আবুহোরায়েরা ও এমাম মালেক (রহঃ) প্রভৃতি মহাত্মগণ প্রথম হাদিস সংগ্রহে যত্নবান হন। অতঃপর সংসার-বিরাগী ধর্ম্মবীর মোহাম্মদ বেন্ এস্মায়িল বোখারী পরম্পরাগত হাদিস সংগ্রহের জন্য তুরস্ক, মিসর, এমন, হেজাজ, বাগ্দাদ ও বাসরা পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি সহস্রাধিক ব্যক্তির নিকট হইতে হাদিস শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং ষোড়শ বৎসরে ৬ লক্ষ হাদিস বিশ্লেষণ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন পরম্পরাগত ৪ সহস্র হাদিস পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে 'সহিমোস্লেম', 'সনন-আবু-দায়ুদ,' 'জামেতরমজি', 'সনন নেসায়ী,' 'সনম এবনে-মজি' প্রভৃতি কয়েকখানি সুবৃহৎ হাদিস প্রকাশিত হইয়াছিল।

হাদিস ও কোরান সুচারুরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য কোরেশগণ ধর্ম্ম শাস্ত্রান্তর্গত 'অসুল' ও 'বালাগৎ' প্রভৃতি ব্যাকরণ ও অলঙ্কার এবং 'ফেকা' আবিষ্কার করিয়াছিলেন। মোহাম্মদ-বেন এয়াকুব 'কামুস' (শব্দসিন্ধু) নামক সুবৃহৎ অভিধান (লোগৎ) সঙ্কলন করিয়া ধর্ম্ম গ্রন্থাধ্যায়ীর মহদ্ভাব মোচন করিয়াছিলেন।

কাব্যগ্রন্থ। আরবিস্থানের মধ্যে কোরেশদিগকে কবি-জাতি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কোরেশেরা স্বভাব-কবি। কোরেশীয় কবিতার ভাষা প্রাঞ্জল ও ভাব চিত্তাকর্ষক। তবে তথাকার "বটতলার" কাব্যগুলি আদি ও ভক্তিরস-মিশ্রণে বিরচিত। শব্দচ্ছটাই তৎ কাব্যগুলির পরম সম্পদ। লোবিদ, মের্ত্তিজা (রাজিঃ) ও এমাম আবুহানিফা (রহঃ) প্রভৃতি কাব্যশাস্ত্র-বিশারদগণের লেখনী প্রসূত শ্লোক সমূহের ভাষা সুললিত ও সমালঙ্কৃত, স্বভাব বর্ণন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর এবং অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য-সমন্বিত। কল্পনাপ্রিয় কোরেশ কবির অতিশয়োক্তি ও গর্হিত রুচির নিবারণার্থ সুপবিত্র কোরান শরিফ অদ্ভুত লালিত্য ও মাধুর্য্যময়ী কবিতায় অবতীর্ণ হয়। তৎপাঠে বা শ্রবণে অনেক পৌত্তলিক কবীশকুল তাহার স্বর্গীয় ভাবের মাহাত্ম্যে অতিমাত্র বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শিক্ষা। আরবে "দ্বিজেতর" বলিয়া একটা কিছুই নাই। সকলেই এক প্রাণ; সকলেরই ধর্ম্ম গ্রন্থে সমান অধিকার আছে। হেজাজে শিক্ষা প্রসারের জন্য রাজদত্ত সাহায্যে কতকগুলি মাদ্রাসা পরিচালিত হইতেছে, মাদ্রাসায় ধর্ম্ম বিদ্যা ব্যতীত ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও রসায়ন প্রভৃতি

শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। মহিলাকুলও শিক্ষা লাভে বঞ্চিতা নহেন। পূর্ব্বকাল হইতে পরম বিদুষী আসামা, মোয়জা, লব্‌বাবা ও হমানা প্রভৃতি রমণীবৃন্দ ধর্ম্মসভা আহূত করিয়া, মৌলুদ শরিফ এবং এস্‌লামের শ্রেষ্ঠতা-বিষয়ক 'আশায়ার' (পদ্যাবলী) পাঠ করিতেন। অধুনা শত শত রমণী বোরকা পরিধান করত সভাগৃহে উপস্থিত হয়েন; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যে, পবনদেবও তাঁহাদের মৃদু স্বরতরঙ্গ বহির্দ্দেশে বহন করিয়া আনিতে অসমর্থ।

ধর্ম্ম-প্রচার। আরবীয়গণ ধর্ম্মপ্রচারে চিত্তশৈথিল্য প্রদর্শন করেন না। তাঁহারা 'হকিকত' অর্থাৎ ধর্ম্ম বিজ্ঞান, 'তরিকত' অর্থাৎ বিশুদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ, 'শরিয়ত' অর্থাৎ শাস্ত্রীয় যুক্তি-প্রমাণাদি-মূলক বিতর্ক, দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন। মক্কা হইতে এস্‌লাম আবির্ভূত হইলে সমস্ত আরব ধর্ম্ম ও ভাষা সম্বন্ধে একাত্মা হইয়াছিল এবং সকলে সার্ব্বভৌমিক প্রীতি-প্রভাবে এক অপূর্ব্ব জাতিতে পরিণত হইয়া জগদ্বাসীকে আপনাদের অন্তরঙ্গ আত্মীয় করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। পণ্ডিত-প্রবর আবু আব্দোল্লা, ওয়াবেহুল্লা ও এব্‌নে আববাস প্রমুখ ব্যক্তিগণ দেশ দেশান্তরে শুধু ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইতেন। হাদিস শাস্ত্রবিদ্‌ এবনে-আববাস একজন বাগ্মিতা শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন এবং তরজমানল কোরান (কোরানের অনুবাদক) ও সোল্‌তানল মোখ্‌সেরিন (ভাষ্যকারাচার্য্য) ছিলেন।

জেহাদ। হজরত আবুতালেব ও আবুজেহেনকে এস্‌লামে দীক্ষিত করিতে বিশেষ চেষ্টান্বিত ছিলেন এবং তজ্জন্য সর্ব্বদা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন। তাহাতে তিনি প্রত্যাদিষ্ট হয়েন যে, "তোমার কার্য্য, প্রত্যাদেশ প্রচার করা মাত্র।" কোরান শরিফে উক্ত বিধ আয়েত বহুল পরিদৃষ্ট হয়। "বল পূর্ব্বক ধর্ম্মে দীক্ষিত কর" তিনি কখন এতদ্রূপ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয়েন নাই। হজরতের বিদ্যমান কালে মোমেন (বিশ্বাসী) মোনাফেক (কপট) ও কাফের (পৌত্তলিক) * এক তিন প্রকার লোক ছিল, মোনাফেকগণ বাহ্যতঃ মোসলমান ছিল বটে, কিন্তু তাহারা গোপন ভাবে কাফেরদিগকে কুমন্ত্রণা দিত। কাফেরেরা নিরীহ মোমেনদিগকে খড়্‌গসাৎ করিতে গায়ের

* 'কুফর' হইতে 'কাফের' শব্দের উৎপত্তি। 'কুফর'-অর্থ 'গোপন করা' অর্থাৎ যাহারা ঈশ্বরকে গোপন রাখিয়া তদীয় কল্পিত মূর্ত্তি পূজা করে, তাহারাই 'কাফের' পদ-বাচ্য।

উপর আসিয়া পড়িত। তৎকালে মোমেনেরা কাতরতা প্রকাশ করিলে তাহারা মন্থর গতি অবলম্বন করিত; সুতরাং মোমেনেরাও তদনুরূপ চেষ্টা না করিয়া পারিত না।

'জেহাদ' শব্দের অর্থ 'চেষ্টা করা,' 'ধর্ম্ম প্রচারার্থ যুদ্ধ করা' নহে। এতৎসম্বন্ধে রাখাল রাজ খ্রীষ্টের দণ্ডতলস্থিত জীবগুলা বিকট চীৎকার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহাদের পুরোদস্তুর বাতুলতা মাত্র। এসলাম ধর্ম্ম Missionary Religion. * তাহার সর্ব্বাবয়ব সুন্দর বৈচিত্র্যময়। উহার নীতির প্রসাদে এক কালে কতিপয় কোরেশীয় 'খলিফায়েরা সেদীন' পদবাচ্য হইয়া ছিলেন; স্যালজুক তোর্ক ও আফ্রিকীয় † সঞ্জীবিত হইয়া ছিল। অধুনাও ইংলণ্ড, নিউগুইনা, জাপান প্রভৃতি স্বতঃই তাহাতে আকৃষ্ট হইতেছে। এমন এক দিন আসিবে, যখন অবলীলাক্রমে জগৎ তাহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার ও কীর্ত্তন করিবে।

উপসংহার।

মোস্লেম জগতের আমূর্খ-পণ্ডিত সকলেই যে রুমের বাদশাহের নাম শ্রবণ মাত্র ভক্তি-গদগদ-চিত্ত হইয়া পড়েন এবং যাঁহার প্রাধান্য-সংক্রান্ত নানা বিষয়ের কথোপকথন আরম্ভ করেন, তিনি এই মক্কা তীর্থের অধীশ্বর এবং পবিত্র 'আমিরুল মুমেনিন' (বিশ্বাসী বৃন্দের অধিনেতা) উপাধিতে অলঙ্কৃত। পৃথিবীতে কোন কালে কোন জাতির সম্রাট্ এতাদৃশ সার্ব্বভৌমিক সম্মান গৌরবের অধিকারী হয়েন নাই। পৃথিবীর যাবতীয় মোসলমান বৎসরের প্রত্যেক শুক্রবারের সামাজিক উপাসনা কালে (সালাতজ্জমাত) ও প্রত্যেক ঈদ উৎসবের উপাসনা কালে তুরস্কের সোল্‌তানের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল-কামনা করিয়া 'খোৎবা' পড়িয়া থাকেন। উপসংহারে আমরা সেই মহা তেজস্বী রুমের বাদশাহের অর্থাৎ তুরস্কের সোল্‌তানের প্রাণপণে রক্ষিত মক্কা তীর্থের সাতটী বিচিত্র গৌরব-নিদর্শনের ঐতিহাসিক বার্ত্তা ঘোষণা করিব।

১। পতাকা—ইহা হজরতের চিত্তরঞ্জিনী সহধর্ম্মিণী আর্য্যা আয়শা সিদ্দীকার (রাজিঃ) পরিচ্ছদের অংশ বিশেষ। হজরত মক্কায় অবস্থিতি কালে, স্বীয় জামাতা ধর্ম্মাত্মা মোর্ত্তজার (রাজিঃ) দ্বারা এই বস্ত্রাংশে অনন্ত আশা জনক একটী 'এবারত' লিখাইয়াছিলেন; তাহার মর্ম্ম এই;—'যাহারা স্বধর্ম্ম ও

* See—"Missionary Religion" Fort review, July 1874.

† See—Arnold's Preaching of Islam—introduction.

স্বজাতির বিপদ-কণ্টক উৎসাদন করিতে এই পতাকাতলে রণরঙ্গে মত্ত হইবে এবং শত্রু হস্তে মৃত্যুর ভয়ে পৃষ্ঠ ভঙ্গ না দিবে, তাহারা বিচারের দিবসে ফেরেস্তা কর্ত্তৃক পরম সম্মানের সহিত স্বর্গধামে পরিগৃহীত হইবে।" হজরত প্রকৃতির সবুজ বর্ণ পসন্দ করিতেন; তজ্জন্য তাঁহার পারিবারিক পরিচ্ছদ সবুজ ছিল। প্রাগুক্ত পতাকাও সবুজ বর্ণ। ইহাই মোসলমানদিগের জাতীয় সাম্রাজ্যাদি রক্ষার অন্তিম সম্বল।

কালপ্রবাহের বিচিত্র গতি এই পতাকাখানি ভাসাইয়া পরস্পরা সম্বন্ধে কয়েকটী রাজ শক্তিকে প্রতারিত করিয়াছে। প্রথমতঃ ওম্মিয়া বংশীয় খলিফা হজরত মাবিয়া অশীতি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা ব্যয়ে ইহা দামস্কের সৌভাগ্য শিরে বিন্যস্ত করেন। অনন্তর অষ্ট লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা বিনিময়ে ইহা আববাছ বংশীয় খলিফাগণ হস্তগত করেন। তাহার বহুকাল পরে মিশরের শেষ নৃপতি উক্ত পতাকাখানি ওসমানবংশীয় খলিফাকে উপহার প্রদান করেন। অদ্যাপি ইহা অবিকৃত ভাবে ওস্মানীয় মহাপরাক্রান্ত তুরস্কের সোলতানের ভাগ্য-লক্ষ্মীর নিকট গচ্ছিত আছে। ওস্মানীয় সোল্তানগণ আত্মসম্মান রক্ষার নিমিত্ত ঐ পতাকাখানি কয়েকবার ব্যবহার করিয়াছেন। ৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে য়ূরোপত্রাস জন-নেসারী সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া ওসমানীয় সাম্রাজ্য উৎসন্ন করিতে রণোন্মত্ত হইলে, সোল্তান দ্বিতীয় মহমুদ এই পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন। তৎকালে ধর্ম্মোন্মত্ত মোস্লেম জাতির ভীষণ সম্মিলনে বিদ্রোহিগণ ধ্বংসীভূত হয়। কথিত আছে, মহারাজধানী ভায়না (Vienna) নগরী অবরোধ কালেও একবার ইহা ব্যবহৃত হইয়াছিল। বিগত ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের রুষ তুরস্ক-যুদ্ধে মহামান্য সোল্তান, রুষিয়ার ধ্বংস সঙ্কল্প করিয়া ঐ পতাকা ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক হন; কিন্তু যুদ্ধ-বিশারদ মহমুদ পাসার পরামর্শে তিনি তৎকার্য্যে বিরত হয়েন।

২। হজরতের আমায়াশরিফ (শিরস্ত্রাণ)। ধর্ম্ম গ্রন্থে এইরূপ প্রকাশ আছে যে, ইহা স্বর্গীয় দূতবর জেব্রায়িল হজরতকে উপহার দিয়াছিলেন।

৩। হজরতের কতকগুলি পবিত্র সংশ্রব।

৪। 'সায়ফল বেদা' অর্থাৎ বিদায়ের তরবারি। হজরত জগৎ হইতে চির বিদায় গ্রহণের সমকালে মৃত্যু শয্যা হইতে ওসামা-বেন-জয়েদের হস্তে একখানি তরবারি অর্পণ করত সুরিয়া-বিজয়ের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন।

৫। 'মেন্তেকা' অর্থাৎ কটিবন্ধ, যাহা হজরত স্বয়ং ব্যবহার করিতেন।

৬। হজরতের ভগ্ন দন্ত। হিজরির তৃতীয় বৎসরে শওয়াল মাসের ৭ই অহোদে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে প্রথমতঃ মোসলমানেরা জয়শ্রী লাভ করেন। পরিশেষে তাহারা হঠ-কারিতায় হজরতের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া বিপর্য্যস্ত হইয়া যান এবং হজরত কাফের-নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে ভগ্ন দন্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হয়েন। ইহা তাঁহারই সেই পবিত্র ভগ্ন দন্ত।

৭। হজরতের একখানি পদাঙ্কিত ফলক।

এই অমূল্য অতুলনীয় পবিত্র সামগ্রী সপ্তক মোশ্লেম জগতের মহৈশ্বর্য্যে পরিগণিত। কনষ্টাণ্টিনোপলের রাজপ্রাসাদের একটি বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠে এই সমস্ত দুর্লভ পদার্থ নিচয় প্রধান রাজস্ব সচিবের তত্ত্বাবধারণে সংরক্ষিত আছে। (সমাপ্ত)

শেখ আহম্মদ সোবাহান।

বঙ্গমাতা।

ত্রিযামার শেষ-যাম অতীত-সময়ে,
হেরিনু বিস্ময়ে স্বপ্নে—শয়ন-মন্দিরে—
প্রসন্ন-বদনা এক দিব্য-দেবাঙ্গনা।
বরাভয় করদ্বয়ে, শান্তি পদ-যুগে;
উজলিত দশ দিক্ স্বরূপ-প্রভায়,
সুধাংশু-উদয়ে যথা নভঃ-ভূমণ্ডল।
দেব্যঙ্গ-সৌরভে মুগ্ধ মনো মধুকর;
কোমল প্রফুল্ল-আঁখি—কিবা মনোহর!
অলক্তক-সুরঞ্জিত অভয় চরণ;
বিশদ বসন, দেহে দিব্য আভরণ।
করুণা নিদানভূতা কল্যাণ কারিণী—
কহিলা দাসীরে হাসি'—"এতদিন পরে
জাগিয়াছে পুত্রগণ মোহ-নিদ্রা হ'তে;
বু'ঝেছে তা'দের আর বঙ্গ জননীর—
হ'য়েছে কি হীন দশা—দশা স্বদেশের—
মিলিতেছে ভ্রাতৃ-প্রেমে বাদ দ্বন্দ্ব ত্যজি'

হাস্তাননে পরস্পর ;—ভুলি' পূর্ব্ব-ভাব
করি'ছে জীবন পণ, সাধিতে যতনে
আপন কর্ত্তব্য যাহা ; নব ভানূদয়ে
উদি'ছে ঈপ্সিত আশা, বঙ্গবাসি-হৃদে ;
পূরিবে তা'দের সাধ—নিশ্চয় অচিরে।
ভাসিবে সুখের সরে মানস মরাল।
মাতিবে গৌরবে বঙ্গ, দেখিবে জগৎ।
অমা নিশা-অন্তে পুনঃ বঙ্গের আকাশে
হাসিবে যশের শশী, দুই দিন পরে।
অলক্ষ্যে সাধিব কার্য্য—সন্তান-কল্যাণে
করিব তা'দের হিত—কহি সত্য করি''।
বর দিয়া বঙ্গমাতা বর-দেশোদ্দেশে
করিলা প্রয়াণ ;—আমি উঠিনু জাগিয়া ;
অপূর্ব্ব আনন্দ স্রোতঃ বহিল অন্তরে।

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

স্বদেশী বৈদ্যক ও বনৌষধী।

কটুকীঃ—প্রচলিত কথায় ইহাকে কট্‌কী বলে। চিকিৎসা শাস্ত্রে ইহার আরও কয়েকটী নাম উল্লেখিত আছে যথা, তিক্তা, অশোকা, চক্রাঙ্গী, মৎসপিত্তা, কাণ্ডরুহা ইত্যাদি। ইহা শীতবীর্য্য, ভেদক, অগ্নিবর্দ্ধক, কটু পরন্তু পাকস্থলীর পরম উপকারক। কফ্ পিত্ত ঘটিত জ্বর, প্রমেহ, রক্তদোষ, শ্বাসকাস, দাহ প্রভৃতি নিবারক। ভাব প্রকাশের মতে ইহার গুণ :—

"কট্বীতু কটুকা পাকে তিক্তা রূক্ষা হিমালঘুঃ।
ভেদিনী দীপনী হৃদ্যা কফ্ পিত্ত জ্বরাপহা।
প্রমেহ শ্বাস কাসাস্র দাহ কুষ্ঠ কৃমি প্রণুৎ॥"

পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরে ২ তোলা কট্‌কী চূর্ণ,চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া গরম জলের সহিত পান করিলে পীড়ার বিশেষ উপকার হয়। ইহার মূলের চূর্ণ ২০-৩০ রতি অর্দ্ধ তোলা শর্করা সহযোগে ঈষদুষ্ণ জলের সহিত সেবনে বিরেচকের কার্য্য করে। অজীর্ণ ও অন্ত্রের পীড়ায় ইহা পরম হিতকর।

কটকী আতাইচ, আকনাদি, মুথা, ইন্দ্রযব, গোমূত্র দ্বারা যথাবিধি ক্বাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে কণ্ঠ রোগ নিবারিত হয়। সপ্তাহ কাল নিয়মিত ভাবে দিবসে, তিন চারি বার সেবন করিলে উদরী প্রভৃতি শোথ রোগেরও উপশম হইয়া থাকে। জ্বরঘ্ন এবং বলকারক বলিয়া বোম্বাই অঞ্চলে ইহা বহুলরূপে প্রচলিত। ৩০ হইতে ৫০ গ্রেণ মাত্রায় ইহা প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কণ্টকারী ঃ—স্বনামখ্যাত এক প্রকার কণ্টক বিশিষ্ট লতা। সংস্কৃতে ইহাকে দুঃস্পর্শা, ব্যাঘ্রী নিদিগ্ধিকা ও বৃহতী বলে। ইহা উগ্রবীর্য্য, রুক্ষ, কটু, অগ্নি-প্রদীপক, শুক্রস্রাবক, ভেদক, পিত্তবর্দ্ধক, জ্বর, ক্রিমি, কণ্ডু কফ্ বায়ু প্রভৃতির নাশক। দেশীয় চিকিৎসকগণ ম্যালেরিয়া জ্বরের চিকিৎসায়, কণ্টকারী, ক্ষেত-পাপড়া ও শুলঞ্চ এই ত্রিবিধ গুল্মের কাথ প্রস্তুত করতঃ ব্যবহার করিয়া থাকেন; ইহা শুভ ফলপ্রদ। বৈদ্যক গ্রন্থে কণ্টকারী কাথ সম্বন্ধে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে,—

"কণ্টকার্য্য মৃতা ভাগী বিশ্বেন্দ্র যব বাসকম।
ভুনিম্বং চন্দনং মুস্তং পটোলং কটু রোহিণী,
বিপাচ্য পায়য়েৎ ক্বাথং পিত্তশ্লেষ্ম জ্বরাপহম।
দাহ তৃষ্ণা রুচিচ্ছর্দ্দি কাস শূল নিবারণম্॥"

এই সকলের প্রত্যেকটী ২৪ রতি, ৩২ তোলা জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা শেষ নামাইয়া পরিমিত মাত্রায় সেবন বিধি। শোথ, প্রমেহ প্রভৃতি রোগে ইহা পরম হিতকর। পুরাতন উদরাময় রোগেও ইহা সর্ব্বদা প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মূত্রের স্রাবণ বৃদ্ধি কারক বিধায় শোথ রোগের পরম প্রয়োজনীয় মহৌষধ। শ্বেত কণ্টকারীও পূর্ব্বোক্ত সকল গুণ বিশিষ্ট, অধিকন্তু গর্ভপ্রদ।

মহামুনি চক্রপাণিদত্ত মহোদয়ের মতে, কণ্টকারী ক্বাথ পিপুল চূর্ণ সহযোগে পীত হইলে সর্ব্বপ্রকার কাস রোগের উপশম হয়। এতদ্ব্যতীত

"ঘৃতং রাস্না বলা ব্যোষশ্বদংষ্ট্রা কল্ক পাচিতম্
কণ্টকারী রসে পাণাৎ পঞ্চকাস নিসূদনম্"

অন্য মতে, কণ্টকারী, কিসমিস্, বাসক, বালা, কর্পূর, শুঁঠ ও পিপুল, এই সকলের ক্বাথ মধু ও চিনির সহযোগে পান করিলে পিত্তজ কাস প্রশমিত হয়।

কাসমর্দ্দ ঃ—প্রচলিত কথায় ইহাকে কাল কাসান্দা বলে। ভারত-বর্ষ ও অপরাপর উষ্ণ প্রধান দেশে এই লতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার বল্কল, পুষ্প, পত্র বীজ সকলই ঔষধীরূপে প্রযুক্ত হয়। কেবলমাত্র পত্রের

নির্য্যাসে, নানা প্রকার বাত, কাস, মূত্রের পীড়া এবং কফ প্রভৃতি পীড়ার উপকার হয়। ইহা পাচক, কণ্ঠ শোধক ও পিত্তহারী। পত্র, পাকে কটু ও উষ্ণ পরন্তু শ্বাস কাস ও অরুচিঘ্ন, অধিকন্তু শুক্রবর্দ্ধক। পুষ্প উর্দ্ধবাত বিনাশক। অত্রি সংহিতার মতে ইহা বিবিধ বাত নাশক ও মল মূত্রের পীড়া বিনাশক। কোন কোন দ্রব্য-তত্ত্বজ্ঞের মতে, ইহার বল্কল, পত্র ও বীজ বিরেচকের কার্য্য করে। রস দদ্রু সংহারক। পরন্তু চন্দনের সহিত ব্যবহৃত হইলে অধিকতর উপকারী হয়। কেহ কেহ পত্রের নির্য্যাস স্থলে মূলের রস ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহার ছালের রস ও বীজ চূর্ণ, মধুর সহিত একত্রিত করিয়া সেবন করিলে বহু মূত্র রোগের উপশম হয়। ইহার শীতল কাথ নব প্রমেহাদি রোগের পরম হিতকর ঔষধ।

"সিংহল দেশীয় চিকিৎসকগণ কাসান্দার পাতা, তিসি বা রেড়ীর তৈলে ভাজিয়া সেই তৈল নিংড়াইয়া রাখে, এতদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার চর্ম্ম রোগের চিকিৎসায় প্রযুক্ত হইয়া থাকে।" মুসলমানগণের চিকিৎসা শাস্ত্রে ইহাকে সর্পাঘাতের একটী পরম উপকারী ঔষধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ডাক্তার টমসন বলেন "উপদংশ রোগে এই ঔষধও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।"

কুকুন্দর।—ইহার অপর নাম তাম্রচূড়। প্রচলিত কথায় ইহাকে কুকসিমা বলে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহা একটী পরম হিতকারী ঔষধরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই গাছ পাওয়া যায়। বর্ষা ও শরৎকালেই ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার রস কটু ও তিক্ত পরন্তু জ্বর ও কফ বিনাশক এবং শোণিত শোধক। রক্তামাশয় রোগে ইহার পত্রের নির্য্যাস সামান্য শর্করা ও দধি সংযোগে পান করিলে পীড়ার উপশম হয়। এবং চিনি ও জল মিশ্রিত করিয়া রস সেবন করিলে অর্শ রোগের রক্তস্রাব নিবারিত হয়। জ্বর কালীন অতিরিক্ত পিপাসার সময় এই গাছের একখণ্ড মূল মুখ মধ্যে রাখিয়া দিলে মুখ বিবর শীতল হইয়া পিপাসার শান্তি হয় অধিকন্তু মুখ শোষও নিবারিত হয়। চর্ম্মরোগ নিবারণের জন্য ইহার সমগ্র মূল, পত্র, ডাঁটা একত্রে নিষ্পীড়িত করিয়া তাহার রস, প্রাতে ও সন্ধ্যায় অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন যে, বহুমূত্রাদি রোগে ইহার প্রয়োগ পরম কল্যাণপ্রদ। ইহার ফল অতিসার রোগে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। গাছের রস পরিমাণ সর্ষপ তৈল একত্রিত করিয়া মালিশ করিলে হস্ত পদাদির জ্বালা নিবারণ হয়।

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

সাবিত্রী।

(রবিবর্ম্মার চিত্র দর্শনে লিখিত।)

(১)

চিত্রকর, কল্পনার কোন কুঞ্জে বসি,
ধরেছিলে হেম তুলিকায়,
কোন পুণ্য প্রভাতের সোণার কিরণ,
মাখায়েছ ছবিটির গায়।

(২)

সুদূর অতীত গর্ভে কালিমায় ঢাকা,
মনে পড়ে সে দিনের কথা,
মুমূর্ষু পতিরে যবে অঙ্কে ধরি বালা,
তরুগণে ক'য়েছিল ব্যথা।

(৩)

সুখ দুখস্মৃতিমাখা সেই সে দিনের,
ফুটন্ত প্রেমের ছবিখানি,
অপরূপ শিল্পবলে দেখাইছ আজ,
বিস্মৃতির আবরণ টানি।

(৪)

তুমি দেবি সতীত্বের জীবন্ত মূরতি,
পতি পদে প্রাণ দেছ ঢালি,
ছল ছল জলভরা আঁখিতে তোমার,
পতি প্রেম উঠিছে উছলি।

(৫)

যে প্রেমশৃঙ্খলে বাঁধা প্রিয়তম তব,
পারিবেনা হরিতে শমন,
ও কোমল বাহুলতা ও পুণ্যবন্ধন,
ছিন্ন করে কে আছে এমন !

(৬)

অসীম অনন্ত তব প্রেম সুধারাশি,
জীবনে মরণে না ফুরায়,
জগতের ভালবাসা মোহের স্বপন,
এই আছে এই ভেঙ্গে যায়।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ পাল, বি-এ।

অঙ্কুর।

বীজাদঙ্কুরনিষ্পত্তিরঙ্কুরাদ্‌বৃক্ষসম্ভবঃ।"
ফলপ্রদোভবেদ্‌বৃক্ষইত্থমাশাক্রমোমতঃ॥

২য় বর্ষ।] শ্রাবণ, ১৩১৪। [৭ম সংখ্যা।

বিবর্ত্তবাদ।

সমুদ্রে ভাসমান এই বিস্তীর্ণ মেদিনীমণ্ডল, আকাশে ভাসমান ঐ অসংখ্য-জ্যোতিষ্কমণ্ডল, পৃথিবীবক্ষে অবস্থিত মেঘচুম্বী গিরিরাজি, পর্ব্বত মালার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া রজতধারার ন্যায় পর্ব্বতগাত্রে শোভমান নির্ঝর সমূহ, পৃথিবীবক্ষে প্রবলবেগে ধাবনোন্মুখ তরঙ্গোন্মত্ত নদী সহস্র, তরঙ্গমাত্র-সৌরভভারমন্থর পুষ্পচুম্বীসমীরণ, অন্ধকারচ্ছেদীআলোকবর্ষী প্রদীপ্ত হুতাশন, শয্যোপধান প্রভৃতি গৃহোপকরণে শোভিত পর্ণকুটীর হইতে রাজ-প্রাসাদ পর্য্যন্ত গৃহ সমূহ, আবার সেই গৃহ সমূহে অবস্থিত আমাদের নবনীত কোমল বা কর্ম্ম-কঠোর এই দেহ সমূহ, এই সমস্ত বিচিত্র জগতের উপাদান কারণ, নৈয়ায়িকদিগের ভাষায় সমবায়ী কারণ—বিচিত্র, নানা? না এক? এই কারণসামগ্রী ও কার্য্যসামগ্রী ভিন্ন আর কোন পদার্থ আছে কিনা? মাতৃ অঙ্কের ন্যায় সুশীতল ভারত ভূমির অঙ্কে প্রসুপ্ত হইয়া মাতৃস্তন্য অপেক্ষা সুমধুর ভারতভূমির স্তন-নিঃসৃত গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর পূতধারা পান করিয়া আমরা এই এই আকারের প্রশ্ন করিতে শিখিয়াছি। ঐহিক সর্ব্বস্ব ম্লেচ্ছগুরুর নিকটে শিক্ষা দীক্ষা লাভ করিয়াও এ পর্য্যন্ত তাহা বিস্মৃত হইতে পারি নাই, কখনও বিস্মৃত হইব কিনা জানি না। সেই জন্য এই ঘোর দুর্দ্দিনেও সেই সকল প্রাচীন প্রশ্নের উত্থাপন ও সমাধান করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছি। কথিত আছে যেন একজন ভারতীয় কবি রাজাজ্ঞায় শূলে আরোপিত হইয়াছেন,

এই সময়ে তিনি তাঁহার কবিতার উদ্‌বোধক কিছু দেখিলেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেই ভীষণ বিপৎপাতের বিভীষিকা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল, তিনি তখন আনন্দে অধীর হইয়া, ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া, অমৃত ধারার ন্যায় কবিতা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই জন্যেই বলিতেছি, যাহা যাহার নিজস্ব, তাহা তাহার অস্থিমজ্জায় বিজড়িত হইয়া অনুস্যূত হইয়া থাকে; মৃত্যু সম্মুখীন হইলেও তাহা হইতে সে কখনও বিচ্যুত হয় না। রাজনীতির খরধার তরবারির নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়াও ভারতবাসী দার্শনিকতা ভুলিবে না। যিনি উপনিষদে "আদি বিদ্বান" বলিয়া কথিত, যিনি দার্শনিকদিগের নিকটে "আদি বিদ্বান" বলিয়া পরিচিত, পুরাণে যিনি "নারায়ণের অবতার" বলিয়া বর্ণিত, ভাগবতে যিনি সাংখ্যযোগ বর্ণনা দ্বারা নিজ মাতা দেবহূতির মোহজাল কর্ত্তিত করিয়াছিলেন, রামায়ণে যিনি নেত্ররশ্মি হইতে অগ্নি বৃষ্টি করিয়া কোশলাধিপতি সগরের ষষ্ঠি সহস্র পুত্রকে ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়াছিলেন, দেব-মনুষ্য পূজিত সেই মহর্ষি কপিল এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে বলিয়াছেন, মনুষ্য প্রভৃতির দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত পরিদৃশ্যমান জগৎ একমাত্র প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। প্রকৃতিই সমস্ত কার্য্য সমূহের উপাদান কারণ বা সমবায়ি কারণ। সত্ত্ব, রজঃ, তমোনামে প্রকৃতির তিনটী গুণ আছে, এই গুণত্রয়ের তারতম্যানুসারে জগতে এত বৈচিত্র্য, এত বৈষম্য। প্রকৃতির নিয়ত পরিণাম ধর্ম্ম, প্রকৃতিই ক্রমে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছে। নট নটীরা যেমন সামাজিক দিগের বিনোদনার্থ নানারূপ ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গালয়ে উপস্থিত হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ আত্মার বিনোদনার্থ নানারূপ পরিবর্ত্তনের আশ্রয় গ্রহণ করে। বলা বাহুল্য যে, এই কার্য্য সমূহেরও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয় না। কার্য্য সমূহ প্রকৃতিতে তিরোভূতরূপে, প্রসুপ্তরূপে অবস্থিত থাকে, গুণত্রয়ের বিক্ষোভে কার্য্য সমূহের সময়ে সময়ে আবির্ভাব হয়। কূর্ম্ম কখনও নিজদেহে হস্ত পদ ও মস্তকের সঙ্কোচ করে, কখনও আবার প্রসারণ করে। সঙ্কোচনের সময়ে সেই অঙ্গগুলির বিনাশ হয় না, প্রসারণের সময়েও সেই গুলির উৎপত্তি হয় না। সেইরূপ প্রকৃতিতে সঙ্কুচিত-কার্য্যজাতের বিনাশ হয় না, প্রকৃতি হইতে প্রসারিত কার্য্যজাতেরও নূতন সৃষ্টি হয় না। সমস্ত কার্য্যই নিত্য। এই কার্য্যজাতের উপভোগের জন্য রঙ্গালয়ে দর্শকের মত স্বতন্ত্র চৈতন্যরূপ আত্মা আছে, প্রকৃতির মত আত্মার পরিণাম হয় না, আত্মা অবিকৃত, নিত্য আত্মা এক নহে, অসংখ্য। এক হইলে, একের সুখে

অপরের সুখ হইত, একের দুঃখে অপরের দুঃখ হইত, একের মৃত্যুতে অপরের মৃত্যু হইত। সাংখ্যাচার্য্য যাহা বুঝাইলেন, পাঠক তাহা বুঝিলেন কিনা বলিতে পারি না। এই বিচিত্র জগতের, এই অসংখ্য পদার্থের একটী মাত্র কারণ করিবার জন্য সাংখ্যাচার্য্যের আগ্রহও আছে, অথচ যখন কোনও মতে একটী মাত্র কারণ হইতে এই বিচিত্র জগতের নানা বর্ণের, নানা আকৃতির, নানা গুণের, নানা পদার্থের উৎপত্তি অসম্ভব, কারণে বিভিন্নতা না থাকিলে কার্য্যে বিভিন্নতা অসম্ভব, কার্য্যে বিভিন্নতারূপ কার্য্যের জন্য, আবার কার্য্যান্তরের প্রয়োজন, সেই কারণান্তর নাই বলিয়া কার্য্যে বিভিন্নতা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াই-তেছে, তখন সাংখ্যাচার্য্য কার্য্য কারণ ভাবের সদ্ভাব স্বীকার করিয়াও প্রতিক্ষণে আমরা যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ প্রত্যক্ষ করিতেছি, সেই পদার্থকে জ্ঞানবৃদ্ধ মহর্ষি নিত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন ও তাহার দ্বারা নূতন দুর্ব্বোদ্ধ্য প্রহেলিকার সৃষ্টি করিলেন। এই সময়ে এই বিষয়ের মীমাংসা করিবার জন্য মহাপ্রতিভা-শালী মহর্ষি গোতম শিষ্যবৃন্দে পরিবৃত হইয়া অগ্রসর হইলেন, বলিলেন, সমস্ত পদার্থই নিত্য নয়, বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা আমরা যে সমস্ত পদার্থের প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ, সে সমস্ত পদার্থই অনিত্য, যে যে পদার্থের অবয়ব আছে, অংশ আছে, সে সে পদার্থ অনিত্য. সেই সেই পদার্থের উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে, যে যে পদার্থের উৎপত্তি বিনাশ আছে সেই সেই পদার্থকার্য্য, কার্য্য, কারণ ভিন্ন হয় না। এই যে ঘট, পট, মঠ, শয্যা, উপধান, বসন ভূষণ প্রভৃতির আমরা প্রতিনিয়ত ব্যবহার করিতেছি, এই যে আমরা পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতির প্রতিনিয়ত উপলব্ধি করিতেছি, এ সমস্তই সাবয়ব, সমস্তই উৎপত্তি বিনাশশীল, সুতরাং কার্য্য। এই সমস্ত কার্য্য সমূহের উৎপাদনের জন্য সমবায়ি কারণ আছে, এই সমবায়ি কারণ এক নয়, অনেক, অসংখ্য। ঘট মঠ প্রভৃতির স্পষ্ট সমবায়ি কারণ যেমন মৃত্তিকা, সেইরূপ সেই মৃত্তিকার সমবায়ি কারণ পার্থিব-পরমাণু-সমূহ। ঘট মঠ প্রভৃতি পদার্থ সমূহের অবয়ব আছে, অংশ আছে, এই সমস্ত পদার্থকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া নানা ভাগে বিভক্ত করা যায়, আবার সেই সমস্ত অংশগুলিকেও আবার চূর্ণ বিচূর্ণ করা যাইতে পারে, আবার সেই সকল সূক্ষ্ম চূর্ণ গুলিরও অংশ আছে, এই ভাবে অংশ হইতে হইতে এমন সূক্ষ্ম অংশ, সূক্ষ্ম চূর্ণ আসিয়া উপস্থিত হয়, আর তাহার অংশ হয় না, আবার সেই সূক্ষ্ম অংশের প্রত্যক্ষও হয় না। অণুবীক্ষণ (Microscope) দ্বারা যে যে সূক্ষ্ম অংশের প্রত্যক্ষ হয়, সে গুলিরও সূক্ষ্ম অংশ হয়, যাহার আর সূক্ষ্ম অংশ হইতে

পারে না, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই "পরমাণু" বলা হইতেছে। এই পরমাণু সমূহই আমাদিগের এই দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সমবায়ি কারণ। পরমাণুর উৎপত্তি বিনাশ নাই; সুতরাং পরমাণুর জন্য আর স্বতন্ত্র কারণের প্রয়োজন হয় না। এই পরমাণু সমূহ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; পার্থিব, জলীয়, আগ্নেয় ও বায়বীয়। এই অনন্ত আকাশে অনন্ত অসংখ্য পরমাণু রাশি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় প্রতিনিয়ত উড়িতেছে, আবার দৈববলে কর্ম্মপ্রভাবে সজাতীয় একটী পরমাণু অপর একটী সজাতীয় পরমাণুর সহিত মিলিত হইয়া দ্ব্যণুক, ত্রসরেণু ক্রমে উৎপন্ন হইয়া, অসংখ্য অসংখ্য পরমাণুর মিলনে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিতেছে, আবার কর্ম্মানুসারে ক্রমে ক্রমে পরস্পর বিচ্যুত হইয়া, বিভক্ত হইয়া, আবার তাহাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। পরমাণু ভিন্ন, আত্মা আকাশ প্রভৃতি আরও কতকগুলি নিত্য পদার্থ আছে। মহর্ষি কণাদও এই পরমাণুবাদে মহর্ষি গোতমের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। পরমাণু পুঞ্জ সমস্ত জগতের সমবায়ি কারণ বলিয়া, ইহাকে পরমাণুবাদ বলে। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ, দ্ব্যণুকের আরম্ভক বলিয়া ইহাকে আরম্ভবাদও বলে। সাংখ্যাচার্য্য মহর্ষি কপিল যাহা বলিয়াছিলেন, ভগবান পতঞ্জলিও তাহার অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। এই সাংখ্য পাতঞ্জল মতের নাম প্রকৃতিবাদ বা পরিণাম।

অষ্টাদশ পুরাণের রচয়িতা, পঞ্চমবেদ মহাভারতের সৃষ্টিকর্ত্তা পুরাণচ্ছলে বেদার্থের প্রচারক, বেদসংহিতার বিভাজক, উপনিষদের মীমাংসক, মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদান্ত সূত্র প্রণয়ন করিয়া একমাত্র ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে, একমাত্র ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত কারণ, একমাত্র ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ, দৃষ্টান্ত উর্ণনাভের দেহ তন্তুর উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ। বেদব্যাসের পবিত্র লেখনী হইতে মায়াবাদের আবিষ্কার হইয়াছে, বিবর্ত্তবাদের আবিষ্কার হইয়াছে, এক্ষণে আমরা দর্শনশাস্ত্রে তিনটী বাদ দেখিতে পাই, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ বা পরিণামবাদ, নৈয়ায়িকের পরমাণুবাদ বা আরম্ভবাদ, বৈদান্তিকের মায়াবাদ বা বিবর্ত্তবাদ। মায়া কাহাকে বলে, বিবর্ত্ত কাহাকে বলে, ইহার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিবার অগ্রে নৈয়ায়িকের মত প্রদর্শিত পরমাণুবাদ ও আরম্ভবাদের অবধারণ যে স-দোষ, তাহাই প্রদর্শিত হইবে। যিনি মহাদেবের অবতার বলিয়া জগতে কীর্ত্তিত, যিনি বত্রিশ বৎসর মাত্র ইহ জগতে জীবিত থাকিয়া দর্শনশাস্ত্রে এক অভিনব যুগের প্রবর্ত্তনা করিয়াছেন, যাঁহার প্রতিভার দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত, জন্মভূমি ভারত

হইতে বিতাড়িত, সুদূর চীন, জাপান তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি দেশে উপস্থিত হইয়া দেববৎ পূজিত, অদ্বৈতবাদের সেই কর্ণধার মহা প্রতিভাশালী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, বেদব্যাস প্রণীত বেদান্ত সূত্রের, বেদের শীর্ষভাগ উপনিষদ্ সমূহের মহাভাষ্য প্রণয়ন করিয়া দার্শনিক পণ্ডিত সমূহকে যুগপৎ বিস্মিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই অচ্ছেদ্য-যুক্তি-তর্ক বুঝাইতে সমর্থ হইব বলিয়া আশা করি না, যৎকিঞ্চিৎ প্রদর্শন করিবার জন্য যথামতি বুঝাইবার জন্য যত্ন চেষ্টা করিব। প্রথম প্রশ্ন পরমাণু সাবয়ব বা নিরবয়ব, পরমাণু সাবয়ব হইলে তাহার অংশ আছে স্বীকার করিতে হয়, যাহার অংশ আছে, তাহার সেই অংশ অপর অংশে সংযুক্ত হইয়া সেই দ্রব্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যাহার সৃষ্টি আছে তাহার ধ্বংস আছে, সেই অংশদ্বয় বিচ্যুত হইলে তাহার ধ্বংস অনিবার্য্য। এক সময়ে একদেশে যে কোন পদার্থ অবস্থিত থাকিলে, ঠিক সেই সময়ে সেই দেশে যদি অপর কোন পদার্থ থাকিতে পারে না, তবে বুঝিতে হইবে এই উভয় পদার্থই সাবয়ব, যে সময়ে যে স্থানে একখানি পুস্তক রহিয়াছে ঠিক সেই সময়ে সেই স্থানে অন্য কোন পুস্তক থাকিতে পারে না। এই পুস্তকদ্বয় এবং পুস্তক সদৃশ অন্য বস্তু সাবয়ব বুঝা যাইতেছে। কাল, আকাশ ও আত্মা এই গুলি নিরবয়ব, এই গুলি পরস্পর পরস্পরের এক সময়ে এক স্থানের অবস্থানের বিরোধ জন্মাইতে পারে না, যে সময়ে যে স্থানে একটী পরমাণু অবস্থিত হয়, সে সময়ে সে স্থানে অপর পরমাণু অবস্থান করিতে পারে না, সুতরাং পরমাণু সাবয়ব। সাবয়ব হইলে তাহার ধ্বংস আছে। ন্যায়াচার্য্যেরা পরমাণুকে মূর্ত্ত বলিয়াছেন, মূর্ত্ত ও সাবয়বে কি প্রভেদ আছে বুঝিতে পারা যায় না। মূর্ত্ত ও সাবয়বের প্রভেদ থাকে থাকুক, যে যে মূর্ত্ত, সে সে সাবয়ব, পরমাণু যখন মূর্ত্ত, তখন সেও সাবয়ব, এইরূপ অনুমান, আমরা অনুমান-সর্ব্বস্ব-নৈয়ায়িকদিগকে শুনাইতে পারি। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়, এই সংযোগ আংশিক অথবা সার্ব্বত্রিক, আংশিক সংযোগ একটী অংশ লইয়াই হয়, যেমন দুইটী অঙ্গুলির সংযোগ এক অঙ্গুলির একাংশের সহিত অপর অঙ্গুলির অপরাংশের সংযোগ হয়, সর্ব্বাংশের সংযোগ হয় না, এই আংশিক সংযোগে সেই উভয় মিলিত নূতন সৃষ্ট দ্রব্যের উপচয় করে, বর্দ্ধন করে, আয়তন বাড়াইয়া দেয়। অংশত সংযোগ না হইলে সেই নূতন সৃষ্ট দ্রব্যের শরীরের বৃদ্ধি হয় না, সুতরাং সর্ব্বাঙ্গীন সংযোগ একটী অপ্রসিদ্ধ পদার্থ, এইরূপ সংযোগ জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু মিলিত

হইয়া ক্রমে এই সুবৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে পরমাণু-দ্বয়ের সর্ব্বাঙ্গীন সংযোগ হয় নাই, আংশিক সংযোগ হইয়াছে। এই আংশিক সংযোগ দ্বারা পরমাণু অপেক্ষা বর্দ্ধিত দ্ব্যণুকের সৃষ্টি হইয়াছে। যাহার আংশিক সংযোগ আছে, বলিতে হইবে, তাহার অংশ আছে, যাহার অংশ আছে, বলিতে হইবে তাহার অবয়ব আছে, যাহার অবয়ব আছে বলিতে হইবে, সে সাবয়ব। যে সাবয়ব, তাহার উৎপত্তি আছে ও বিনাশ আছে। সুতরাং পরমাণুকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। পরমাণু যখন সৃষ্ট বস্তু অবধারিত হইতেছে, তখন তাহার আবার উপাদান কারণ কে ? প্রথমতঃ পরমাণুদ্বয়ে ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, এই ক্রিয়া (পরিস্পন্দন) হইতেই পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ হয়, পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ না হইলে, পরমাণুদ্বয় পরস্পর সংযুক্ত হইতে পারে না, সুতরাং ক্রিয়ার আবশ্যক। নিরবয়ব আকাশের গতি নাই, নিরবয়ব কালের গতি নাই, নিরবয়ব আত্মার গতি নাই, নিরবয়ব রূপ রস প্রভৃতির গতি নাই। পরমাণু নিরবয়ব হইলে, তাহার গতি থাকিতে পারে না, সুতরাং সংযোগ হইতে পারে না। সুতরাং দ্ব্যণুক, ত্র্যসরেণু প্রভৃতি ঘট, পট, মঠ প্রভৃতি পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না। পাঠক, দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দিলাম, এই এই স্থানে ব্যাপ্তিগ্রহ স্থির করিয়া অনুমানের আকার প্রস্তুত করুন, ও অনুমানসর্ব্বস্ব নৈয়ায়িকদিগকে শুনাইয়া দেউন।

রামকুমার কর্ম্মকারের সাধের প্রস্তুত করা শাণিত তরবারি গ্রহণ করিয়া, তাহার শত্রু রামদাস কুম্ভকার তাহার স্কন্ধ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। বৈদান্তিকদিগের এই সমস্ত অনুমান দ্বারা খণ্ডন দেখিয়া সেই ঘটনাটি মনে হয়। নৈয়ায়িকের মতে আকাশ নিত্য, দিক্ নিত্য, কাল নিত্য, ঘট, পট, মঠ, প্রভৃতি পরিদৃশ্যমান প্রত্যেক কার্য্যের সমবায়ি কারণ পরমাণু সমূহ নিত্য। আবার ঘট সমূহ, পট সমূহ, মঠ সমূহ, অনিত্য হইলেও ঘট সমূহের উপরে ঘটত্বজাতি নামে একটী পদার্থ আছে, সে ঘটত্বজাতি নিত্য। পট সমূহ অনিত্য হইলেও পট সমূহের উপরে পটত্বজাতি নামে একটী পদার্থ আছে, সে পটত্বজাতি নিত্য, মঠ সমূহ অনিত্য হইলেও সেই মঠ সমূহের উপরেও মঠত্বজাতি নামে একটী পদার্থ আছে, সে মঠত্বজাতি নিত্য। এইরূপ অসংখ্য জাতি আছে, সেই অসংখ্য জাতি নিত্য। আবার কপাল-কপালিকার সংযোগে যে ঘট প্রস্তুত হইয়াছে, সূত্র সমূহের সংযোগে যে পট প্রস্তুত হইয়াছে, ইষ্টক-সমূহের সংযোগে যে মঠ প্রস্তুত হইয়াছে, এই সমস্ত সংযোগ অনিত্য হইলেও, সেই

সেই পদার্থের সহিত সেই সেই পদার্থের অবয়বের সম্বন্ধ সমবায় নামে ন্যায় দর্শনে কথিত। সেই সমবায়-সম্বন্ধ আবার নিত্য; কপালিকা ঘটের অবয়ব, পটের তন্তু পটের অবয়ব; মঠের ইষ্টক মঠের অবয়ব, সুতরাং সেই গুলির সহিত ঘট-পট-মঠের সমবায় সম্বন্ধ। সমবায় সম্বন্ধ নিত্য; গো প্রভৃতির সহিত গোত্ব প্রভৃতি জাতির সম্বন্ধ সমবায়, অতএব সমবায় নিত্য। অভাবের মধ্যে অত্যন্তাভাব নামে এক শ্রেণীর অভাব আছে, এই অত্যন্তাভাব নিত্য, ঘট অনিত্য হইলেও ঘটের অত্যন্তাভাব নিত্য। ঘট, পট, মঠ, অসংখ্য আছে; সুতরাং সেই সেই পদার্থের অত্যন্তাভাবও অসংখ্য; আত্মা নিত্য, সর্ব্ববাদী সম্মত। নবদ্বীপে রূপদাস বাবাজি খঞ্জনী বাজাইতে বাজাইতে নৈয়ায়িক-শ্রেষ্ঠ শিবনাথ বাচস্পতির চতুষ্পাঠীতে তাহার ভাঙ্গাসুরে একটী গোষ্ঠের পদ গাহিতে লাগিল। বাচস্পতি মহাশয় তাহাকে থামাইয়া বলিলেন, "ওহে রূপদাস, তোমার শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার দেহ পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া গিয়াছেন, আর এক্ষণে ত গোষ্ঠ হয় না, সুতরাং গোষ্ঠ গাহিয়া আর ফল কি?" রূপদাস বিনীতভাবে বলিল, "না, তাহা কি হয়? শ্রীনন্দ-নন্দন দেহত্যাগ করিতে পারেন না, তাঁহার যে নিত্যরূপ।" বাচস্পতি মহাশয় হাসিয়া বলিলেন; "শ্রীকৃষ্ণের নিত্যরূপ, তবে তাঁহার অষ্ট সখীরও নিত্যরূপ, তাঁহার শ্রীদাম প্রভৃতি সখাদিগেরও নিত্যরূপ, গোষ্ঠবিহারী ধেণুবৃন্দেরও নিত্যরূপ, তাঁহার হস্তস্থিত বংশীটীরও নিত্যরূপ, কেমন?" রূপদাস আরও একটু বিনয়ের সহিত বলিল, "আপনারা নৈয়ায়িক, আপনাদিগের মতে ঘটত্ব, পটত্ব পর্য্যন্ত নিত্য, দিক্ কাল আকাশ নিত্য, ঘটের সহিত তাহার গলাটীর সম্বন্ধ টুকুও নিত্য, আবার যাহা নাই, তাহাও নিত্য, এত নিত্যের হাট বাজার সাজাইয়া, এত অসদ্বস্তুর উপরে নিত্যতা স্বীকার করিয়া "অবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন" বলিয়া জীবন শেষ করিলেন, আর ভগবানের নিত্যরূপ টুকু স্থির করিতে পারিলেন না! আমি মূর্খ বৈরাগী, কি বলিব? সাংখ্যাচার্য্যেরা জগতের উপাদান কারণ একমাত্র প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়াছেন এবং তাহাকে ও কার্য্য সমূহকে নিত্য বলিয়াছেন"। ন্যায়াচার্য্য তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না, এত নিত্য স্বীকার করা নিতান্ত অযুক্তিক বলিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে আরম্ভবাদের প্রবর্ত্তনা করিলেন। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে ন্যায় মতে অধিক নিত্য, না, সাংখ্যমতে ঘটের কারণও প্রকৃতি, পটের কারণও প্রকৃতি, এবং মঠের কারণও প্রকৃতি, সেই একটী কারণ মাত্র নিত্য? আর ন্যায় মতে একটী ঘটের অসংখ্য

পরমাণু কারণ এবং সেই সেই পরমাণু সমূহের প্রত্যেকটাই নিত্য। আবার সাংখ্য মতে ঘটরূপ কার্য্যটী মাত্র নিত্য ; কিন্তু ন্যায়মতে ঘটের সহিত ঘটের অবয়বের সমবায় সম্বন্ধ এবং ঘটের সহিত ঘটত্বজাতি সমবায় সম্বন্ধ নিত্য। ঘটের উপরে অবস্থিত ঘটত্বজাতি নিত্য এবং ঘটের অত্যন্তাভাব নিত্য। কোন মতে অধিক গৌরব বিচার করা আবশ্যক। কর্ত্রী নগেন্দ্রবালা দত্ত সংবাদ পত্র পড়িতেছিলেন। মাধী আসিয়া হাত নাড়িয়া বলিল, "দেখ মা, হীরা বড় গাল করে, সে তোমার ডিবে হ'তে অনেকগুলিন পান চুরি ক'রে নিয়েছে, আমি হাতে নাতে ধরে'ছি ; হীরা আসিয়া হাত নাড়িয়া বলিল, "তুমি যে কর্ত্তার জলখাবার রেকাব হ'তে আগে ভাগে সন্দেশ তুলিয়া লইয়াছ, তাহা বুঝি আমি দেখি নাই ? এস, মা, আমি দেখাইয়া দিতেছ।" ফল দুই জনেই ধরা পড়িল ও দুই জনেই গর গর করিয়া "বাড়ীতে আর চাকরী করা হইবে না" বলিয়া সে বাড়ী ত্যাগ করিয়া, অন্যত্র চলিয়া গেল। মাধী ও হীরা দুই দাসীই যাহার সহিত চিরদিন হিংসা করিত, সেই গৌরী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিল ও মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিল, আর বলিল, "আমার কিছুই করিতে হইল না, তোরা দুই জনেই দু'জনের সর্ব্বনাশ করিলি" আজ বৈদান্তিক, তেমনি, ন্যায় ও সাংখ্যের বিবাদ দেখিয়া মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিলেন ও গৌরীর কথিত উক্তি গুলির আবৃত্তি করিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

গৌরবে না রৌরবে ?

(১ম প্রস্তাব)

দয়া, দাক্ষিণ্য, বিদ্যা, ধর্ম্ম, পুণ্য, চরিত্র প্রভৃতি বরণীয় গুণে মানবেরা মহত্ত্ব লাভ করে এবং নর সমাজে মহৎ বলিয়া প্রখ্যাত হয় ; এই সকল "মহৎ" আখ্যার পুরুষশ্রেষ্ঠের নামে তাঁহাদের স্বজাতিবর্গ গৌরব প্রকাশ করেন এবং তাঁহাদিগকে দেশের, জাতির ও সমাজের মহামূল্য অলঙ্কার বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। ইহাঁদের সুপবিত্র নামে সুষুপ্ত মানুষ জাগ্রত, অধঃপতিত জাতি উন্নত, জরাজীর্ণ প্রবৃদ্ধ তরু নব মুকুলিত এবং মৃত মন্ত্র সঞ্জীবিত হইয়া উঠে, ইহা ধ্রুব সত্য। সুতরাং ইহাঁরা মানবরূপে দেবতার

স্থান অধিকার করিয়া পৃথিবীর "গৌরব" বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়েন। যাহারা ইহার বিপরীত ভাবাপন্ন, তাহাদের গৌরব বা সৌরভ হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা রৌরব নামক ভয়ানক ক্লেশদায়ক নরকে অবস্থান করে। হিন্দুশাস্ত্র মতে, রৌরব নামক নরকের বর্ণনা অতীব ভয়ঙ্করী। যিশু খৃষ্টও নরক মানিতেন, তিনিও দুরাত্মা পাপীদিগের জন্য যে রৌরবের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত আছে—"নরকের সেই প্রজ্বলিত হুতাশন কখন নির্ব্বাপিত হয় না এবং সেই চির প্রজ্বলিত মহাতেজোময় বৈশ্বানর-মধ্যস্থিত ভয়ঙ্কর কীটাদি জন্তু কখন মৃত্যুমুখে পতিত হয় না।" সুতরাং বুঝা গেল, ধার্ম্মিকের জন্য "গৌরব" এবং মহাপাপীর জন্য "রৌরব" পৃথিবীর প্রায় সমুদয় প্রাচীন শাস্ত্রে উজ্জ্বলাক্ষরে বর্ণিত আছে।

কিন্তু এই সংসার অতীব মায়াময়, এই মৃণ্ময় সংসার ক্ষেত্রে মায়ামুগ্ধ জীবগণ কখন শ্বেতকে কৃষ্ণ, কখন কৃষ্ণকে শ্বেত, অথবা কঠিনকে কোমল এবং কোমলকে কঠিন ভাবিয়া ন্যায় ও যুক্তির পবিত্র শীর্ষদেশে পদাঘাত করিয়া থাকে; এই জন্য এই জগতে—এই মায়াপ্রপঞ্চাচ্ছন্ন সংসার ধামে—ধর্ম্ম প্রায়ই অধর্ম্মরূপে এবং অধর্ম্ম ধর্ম্মরূপে অনেক সময়ে দেখা দেয়। এই জন্য, যাহার আপাদ মস্তক কলঙ্কে পরিপূর্ণ, সে ব্যক্তি কখন মহা পুণ্যাত্মা বলিয়া বিখ্যাত হয়। আবার, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধী ও নিষ্কলঙ্ক, সে ব্যক্তি জগতের নিকটে কলঙ্ক-কালিমাঙ্কিত নীচ পুরুষ বলিয়া উপেক্ষিত, নিন্দিত ও বর্জ্জিত হইয়া থাকে। সংসারের ইহাই গতি, ইহাই সাধারণ নিয়ম। ধন, জন, যৌবন এবং প্রভুত্ব এই চারিটি শাণিত অস্ত্রের সহায়তায়, মূর্খ "পণ্ডিত" বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং অধার্ম্মিকেরা ধার্ম্মিক ও কলঙ্কিতেরা বিশ্ববিখ্যাত মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হয়। নির্ব্বোধ লোকেরা তাহাদের মায়া-প্রপঞ্চে বিমোহিত হইয়া, রজ্জুতে অহিভ্রমের ন্যায়, সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। প্রতি দিবস ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইতিহাস ইহার চিরসাক্ষী।

কিশোরাবস্থা হইতে শুনিয়া আসিতেছি, লর্ড ক্লাইব পৃথিবীর একজন মহাপুরুষ। ইনি এসিয়া মহাদেশে, ইংরাজ জাতির জন্য ভারতাধিকার নামক মহাযজ্ঞ সমাধা করেন এবং ইহাঁর দ্বারাই সমগ্র ইউরোপ ও আমেরিকার জন্য ভারতের বহুকাল রুদ্ধ সুবর্ণ দ্বার সর্ব্ব প্রথম স্থায়ীরূপে উন্মুক্ত হয়। অনেকের ধ্রুব বিশ্বাস, লর্ড ক্লাইব পৃথিবীর পরমোপকারী মহাপুরুষ। ইতিহাস-

প্রসিদ্ধ ক্লাইব নামক ব্যক্তি মহাপুরুষ কি না তাহা অতঃপর বিচার করা যাইবে, কিন্তু অতীব আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অনেকের এখনও বিশ্বাস আছে যে, লর্ড ক্লাইব একজন আদর্শ ইংরাজ। কিন্তু লর্ড ক্লাইব যদি আদর্শ পুরুষ বলিয়া গণ্য হয় এবং ইহার নামে ও কীর্ত্তিতে ইংরাজ জাতি "গৌরব" করিতে সম্মত হয়, তাহা হইলে এমন আদর্শ হইতে আমরা চিরকালের জন্য স্বতন্ত্র থাকিতে ইচ্ছা করি। বহু ইংরাজ ঐতিহাসিক পুরুষ বলেন "শারীরিক তেজে, মানসিক বলে, চরিত্রে, দৃঢ়প্রতিজ্ঞায়, অধ্যবসায়ে, সত্যের সম্মান রক্ষায়, ক্লাইব অদ্বিতীয়। সুতরাং তিনি ইউরোপীয় জাতির গৌরব"। এই জ্বলন্ত মিথ্যা কথার তীব্র প্রতিবাদ নিতান্ত আবশ্যক। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, লর্ড ক্লাইবের স্থান কোথায়? আমি দেখাইতে চাই, এরূপ পুরুষ "গৌরবে" থাকিবার অনুপযুক্ত; "রৌরবে" তাহাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। ক্লাইব চরিত্রে সমস্ত বাঙ্গালার ইতিহাস—সমস্ত ভারতবর্ষীয় ইতিহাস—ঘোরতর রূপে কলঙ্কিত, এই কলঙ্ক ইউরোপীয়ের পক্ষে—বিশেষতঃ ইংরাজের পক্ষে—দুরপনেয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ক্লাইব চরিত্রের বর্ণনায়, এদেশের ইতিহাস কিরূপ জ্বলন্ত অসত্যে পরিপুর্ণ হইয়াছে, কিরূপে ইংরাজ তাহাকে মহাপুরুষ সাজাইয়া ভারতবাসীকে ভুলাইয়া দিয়াছে, এবং নির্ব্বোধ ভারতবাসী কিরূপে রৌরবের লোককে গৌরবে ও সৌরভে সম্মান করে, এ প্রবন্ধে তাহাই বলিবার উদ্দেশ্য। ক্লাইবের সঙ্গে আর একটা লোকের প্রকৃত তত্ত্ব বাহির করিতে চাই; সেই লোকটার নাম—নেল্‌সন। আমাদের দেশের ছোট ছোট ছেলেরা ইংরাজি স্কুলে শিখিয়া আইসে, স্বার্থত্যাগ ও পরোপকার অথবা পরদুঃখকাতরতায় বীরবর নেল্‌সন্ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছিল। ইংরাজের লিখিত ইংরাজি গল্প-পুস্তকে তাহারা পড়ে যে, এক স্থলে সেনাপতি নেল্‌সন্ ভয়ানক যুদ্ধ করিতে করিতে আহত হইয়া শায়িত হয়েন এবং নিজের রক্তাক্ত কলেবর কিম্বা বেদনার দিকে লক্ষ্য না করিয়া আর একজন আহত সৈনিকের সেবা ও সুশ্রুষা করিতে থাকেন। তিনি মৃতপ্রায়াবস্থাতেও পরসেবায় কাতর হয়েন নাই। যদি এই ঘটনাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, অথবা যদি ইহা সত্যই হয়, তাহা হইলে আমাদের সমাজে ও শাস্ত্রে ইহার সমতুল্য এবং এতদপেক্ষা প্রবলতর স্বার্থত্যাগ ও পরদুঃখকাতরতার কি অগণ্য প্রমাণ নাই? নেল্‌সন কি প্রকৃতির ও কিরূপ চরিত্রের লোক ছিলেন, অনেকে তাহা অবগত নহেন। যদি ন্যায়, যুক্তি ও ধর্ম্মের পবিত্র মস্তকে পদাঘাত করা না যায়, তাহা হইলে পাঠক

দেখিবেন, নেল্সন প্রকৃত বীর ছিলেন না। শাস্ত্র যাহাকে প্রকৃত বীর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, নেল্সনের চরিত্রে তাহার অনুমাত্রও বিদ্যমান ছিল না। তাঁহার চরিত্র অতীব কলঙ্কিত ছিল। তিনি ধর্ম্ম, ন্যায়, বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম, বন্ধুতা, সতীত্ব, সাধুতা প্রভৃতির ঘোরতর বৈরী ছিলেন। আমি দেখাইব, নেল্সনের স্থান "গৌরবে" নাই, তিনি আছেন—"রৌরবে"। ইতিহাস ইহাঁর কুচরিত্রে কলঙ্কিত।

এইরূপে দেখান যাইতে পারে, ইউরোপীয় মহাপ্রভুদিগের কৃপায় এবং তাঁহাদের অদ্ভুত অভিমতাবলীর অনুবর্ত্তিগণের অনুকম্পায়, বঙ্গের ইতিহাসে—কেবল বঙ্গের নহে, সমগ্র ভারতের ইতিহাসে—রাশি রাশি অসত্য কথা প্রবেশ করিয়া, প্রকৃতকে অপ্রকৃত এবং অপ্রকৃতকে প্রকৃত করিয়া তুলিয়াছে। ইংরাজি বিদ্যালয়ে, এতদ্দেশীয় তরলমতি বালকেরা এইরূপে বাল্যাবস্থা হইতে রাশি রাশি অসত্য কথা কণ্ঠস্থ করিয়া চিরদিনের জন্য সত্যের শত্রু বলিয়া গণ্য হয়। Clive was a moral leper—ইহাই প্রকৃত ইতিহাসের অভিমত। Nelson was a worse type of humanity—ইহাই নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের অভিমত। ক্লাইব রাজ্য-স্থাপনোদ্দেশে যে সকল পাশব ক্রিয়া সমাধান করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভদ্র সমাজে বর্ণনা করিবার উপযুক্ত নহে। জগদ্বিখ্যাত ইংরাজঐতিহাসিক জেম্‌স্ মিল, মহাপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত জন ষ্টুয়ার্ট মিলের পিতা। ইনি তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন—Clive was a man to whom deception and dishonesty, when suited to his purpose, never cost a pang. মালিশন সাহেব লিখিয়াছেন—The wicked actions of Clive knew no bounds. The very contemplation of his wickedness makes and will always make the heart of an honest man burn with indignation. ইংরাজী স্কুলের তরুণ বিদ্যার্থিদিগের বীরবর নেল্সন সম্বন্ধে আমেরিকা দেশের ধার্ম্মিক লেখক জোনাথান সাহেব লিখিয়াছেন—Nelson was a downright traitor and an out and out miscreant. Anything immoral was consistent in that English soldier who was the author of England's naval power. অর্থাৎ ক্লাইব সাহেব অসাধুতা ও প্রবঞ্চনার জলন্ত মূর্ত্তি; তাহার দুষ্টতার সীমা ছিল না। নেল্সন সাহেব যেমন বিশ্বাসঘাতক তেমনি দুষ্টকার্য্যকারিগণের প্রধান নেতা। কোন প্রকার অসাধুতা নেলসনের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। (ক্রমশঃ।)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

গিরিয়ার যুদ্ধ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বাঁশলুই নদীর মোহানায় (বর্ত্তমান লাল খাঁর দিয়াড়ে) গিরিয়ার ২য় যুদ্ধ হয়। বাজিতপুরে সর্ব্বেশ্বরের মন্দিরের নিকট ২য় যুদ্ধ সম্বন্ধীয় একটী চিত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণ গিরিয়াকে মুর্শিদাবাদের পানিপথ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

নবাব সরফরাজ খাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি গৌস খাঁ ১৭৪১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার সমাধি ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে নদী গর্ভস্থ হইলে, মোমিনটোলা গ্রামের চাঁদপুর মৌজা হইতে ভাগীরথীর পশ্চিম পারস্থিত নবোনচোয়া গ্রামের নিকটবর্ত্তী নূতন চাঁদপুরে লইয়া গিয়া সামান্য দরগা নির্ম্মিত হইয়াছে। তৎকালে ছালঘাটী গঙ্গার মোহানা ছিল, এক্ষণে বিশ্বনাথপুর মোহানা।

বিজয় সিংহ যুদ্ধে নিহত হইলে, তদীয় নবম বর্ষীয় জালিম সিংহ নামক ক্ষত্রিয় বীর পুত্রকে নিষ্কোষিত অসি হস্তে পিতার দেহ রক্ষার জন্য দণ্ডায়মান দেখিয়া, আলিবর্দ্দী খাঁ তাঁহার নীচাশয় সৈন্যগণকে বালকবধ করিতে নিষেধ করিয়া, জালিম সিংহকে তাঁহার পিতৃদেহের সৎকার্য্যের আদেশ দেন। কতিপয় অনুচর সহ সৎকার্য্য সমাপনান্তে, পিতৃবিয়োগ অসহ্য হওয়ায়, ক্ষত্রিয় কুলতিলক জালিম সিংহ গঙ্গা বক্ষে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন। একবরপুরের নিকটবর্ত্তী "জালিম সিংহের মাঠ" তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

মিঠিপুর এবং সেকন্দ্রার মধ্যস্থিত "কানাপুকুর বা পানাপুকুর" পানীয় জলের নিমিত্ত অস্ত্র-সাহায্যে সরফরাজ খাঁর সৈন্যগণ কর্ত্তৃক খোদিত হয়। বর্ষাকাল ব্যতীত উহাতে জল দৃষ্ট হয় না, আম্রবাগান এবং জঙ্গলাদি এখনও ভীতি সঞ্চার করিয়া থাকে। দস্যুগণ মনুষ্য বধ করিয়া সর্ব্বস্বাপহরণ করিত, অদ্যাপি তথায় মাথার খুলি প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের পর, ভবানন্দ মজুমদারকে নদীয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া, চৌহান বংশীয় মহারাজ মানসিংহ ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারস্থিত বাদসাহী সড়ক দিয়া দিল্লী গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে কতিপয় অনুচর যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, মানসিংহ প্রভৃতি সকলেই বর্ত্তমান মিঠিপুরে বাস

করিতে লাগিলেন। মিঠিপুরের চৌহান বংশীয় ছত্রীগণ সকলেই মানসিংহের বংশধর বলিয়া পরিচিত।

ক্ষত্রিয় শব্দের সংক্ষিপ্ত কথা ক্ষত্রী, পাশ্চাত্য উচ্চারণ প্রথানুযায়ী ক্ষত্রী স্থানে ছত্রী হইয়াছে। পাশ্চাত্য ব্যক্তিগণ ক্+ষ্=ক্ষ, ষ, য প্রভৃতিকে যথাক্রমে ছ, খ এবং ইয় শব্দের ন্যায় উচ্চারণ করিয়া থাকেন। যথা;—লছ্মন (লক্ষ্মণ), দোখ (দোষ), শিখ (শিষ্য), ইত্যাদি। আবার অনেকে বলেন, (ছত্র+ইন্—অস্ত্যর্থে) ক্ষত্রিয়গণ ভারতের রাজছত্র অর্থাৎ রাজ সিংহাসন গ্রহণ জন্যই ছত্রী নামে অভিহিত। সে যাহাই হউক, ছত্রীগণ যে ক্ষত্রিয়, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সূর্য্য, চন্দ্র এবং নাগ বংশীয় ও অগ্নিকুল সম্ভূত ছত্রী বা ক্ষত্রিয়গণই শ্রেষ্ঠ।

প্রথম যুদ্ধের গ্রাম্য কবিতা।

সহর হইতে বাহির হইল নবাব সহর করে খালি।
দিনে দিনে সোনার বরণ হইয়া গেল কালী॥
মার লাগিল রে গিরিয়ার ময়দানে।
বাঁকে বাংলার সুবা গিরিয়ার ময়দানে॥ (১)
পূর্ব্বেতে করিল মানা নানা জাফর খাঁ।
ভাল মন্দ হবে নবাব সহর ছেড়না॥
নবাবের তাঁম্বু পড়িল ব্রাহ্মণের স্থলে। (২)
আলিবর্দ্দীর তাঁম্বু তখন পড়িল রাজমহালে॥
নবাবের তাঁবু যখন পড়িল দেয়াল সরাই।
আলিবর্দ্দীর তাঁম্বু তখন আইল ফরাক্কায়॥
নবাবের তাঁম্বু আইল যবে খামরা সরাইতে।
আলিবর্দ্দীর তাঁম্বু তখন সূতীর দরগাতে॥
নবাবের তাঁম্বু পড়িল গিরিয়ার মাঠেতে।
আলিবর্দ্দীর তাঁম্বু তখন পড়িল পিপিলাতে॥
গৌস খাঁ বলিল তখন শুন নবাব তুমি।
আলিবর্দ্দীর শির আনিয়া দিব আমি॥
শুন ওরে গৌস খাঁ পাঠানের জাতি।
ময়দানে পড়িল যেন মার আর কাটি॥
শুন ওরে গৌস খাঁ বলি যে তোমাকে।
আলিবর্দ্দী মিলিতে আসে লড়াই দিক কাকে॥ (৩)
খোজা বসন দুই ভাই ইমানের পোয়া।
জলদী করে খবর নেহ সূতীর দরগা গিয়া॥
লাখ টাকার সিন্নি পেয়ে ফকির দিল বর।
তোমার যুদ্ধ ফতে হবে কাল সোওয়া প্রহর॥
জলদী করে হুকুম দেরে নবাব জলদী করে।
ঘোড়া চড়ে যাব আমি সূতীর দরগাতে॥
সোওয়াসের আটার নোয়া পোওয়া ভার ঘী।
একা লবে গৌস খাঁ সকলের জী॥
গৌসখাঁর ঘোড়া দেখে পান তৈয়ার করিল।
সোওয়া শ টাকার সিন্নি গৌসখাঁরে দিল॥
হায় গো আল্লা বারিতালা, স্বপন দিল রেতে।
গৌসখাঁর হবে লড়াই আলিবর্দ্দী সাথে॥
মার মার করে গৌসখাঁ লড়াই করিল।
কলার বাগান যেন বুড়িতে লাগিল॥
একেলা গৌসখাঁ লড়ে আলিবর্দ্দী সনে।
দেখিয়া বীরত্ব, কাঁপিছে যত অস্ত্র পক্ষগণে॥

(১) ধুয়া; (২) ব্রাহ্মণের স্থলে বামনীয়া; (৩) চতুরতা ক'রে মিলিতে আসে।

তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলি পড়ে রহে।
একেলা করিল লড়াই গৌসখাঁ ঢাল মড়ি দিয়ে॥
ভাল ভাল কামান সাজিয়া করিল বিলি।
নবাবের কামানেতে ভরে ইট আর বালি॥
কালিয়া মেঘের আড়ে যেন মেঘ চিক্‌চিকে।
গৌসখাঁর তলোয়ার যেন বিজলী ছটকে॥
দশ কাঠা নিয়ে গৌসখাঁর ঘোড়া ফিরে।
হাজার হাজার পণ্টন কাটে এক এক চক্করে॥
হাজার হাজার পণ্টন কেটে সাফ ময়দান করিল।
ভাল ঘোড়ায় চড়ায়ে নবাবকে বিদায় দিল॥
হাতী পড়িল দুলদুলিতে ঘোড়া পড়িল রণে।
পাংখাদার ডুবাইল সাহাস বিলের ঘোনে॥

শ্রীকুঞ্জবিহারী লালা।

দুটি আখ্যায়িকা।

বৈদিকী ও পৌরাণিকী।

যম-নচিকেতা-সংবাদ ও যম-সাবিত্রী-সংবাদ।

রাজা বাজশ্রবস যজ্ঞফলার্থী হইয়া, আপনার সর্ব্বস্ব দান করিয়া ফেলিলেন—সর্ব্ববেদসন্দদৌ। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ড এখানে শেষ হইল, কর্ম্মের পূর্ণতায় জ্ঞানের আরম্ভ ইহাই প্রাচীন বিধি—নকর্ম্মনামনারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে। তাই বাজশ্রবসের পুত্র নচিকেতার অন্তরে শ্রদ্ধার আবির্ভাব হইল, কেন না, শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্।

বৈদিক যুগে যেমন ধর্ম্মকে কর্ম্ম ও জ্ঞান, এই দুই কাণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে, খৃষ্ট ধর্ম্মেও Law এবং Grace এই দুই Testament দেখিতে পাওয়া যায়। মুসার যে ব্যবস্থা তাহা Law আর যীশুর যে নূতন তত্ত্ব তাহা Grace. সেখানেও দেখি Lawএর পূর্ণ পরিতৃপ্তিতে Graceএর আরম্ভ। একদিন একজন ভদ্রলোক যীশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অনন্ত জীবন লাভের জন্য তাহার কি করা কর্ত্তব্য। যীশু তাহাকে মুসার আদেশ সকল পালন করিতে অনুজ্ঞা করিলেন। ভদ্রলোকটী বলিলেন যে তিনি আজীবন আদেশ সকল যথাযথ পালন করিয়াছেন। তখন যীশু তাহাকে সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া—যেমন বৈদিক আখ্যায়িকায় দেখিতে পাওয়া যায় বাজশ্রবস করিয়াছিলেন—তাঁহার অনুসরণ করিতে আদেশ করিলেন। এখানেও দেখি Grace এর ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে হইলে Lawএর ধর্ম্মের শেষ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠান করা চাই। এই যে কিছু করার ধর্ম্ম, তাহা বৈদিকই হউক আর বাইবেলিকই হউক, উহা সম্যক্ অনুষ্ঠিত না হইলে—সর্ব্বস্ব দানে অনুষ্ঠিত না হইলে—জ্ঞান বা Graceএর

অধিকার জন্মে না। অনেকেই আসে কিন্তু সকলেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, তাহারও কারণ এই। সেই জন্যই, বাইবেলোক্ত ভদ্রলোকটী "went away sorrowful." এখানে আরও একটী কথা এই যে, যীশু ভদ্রলোকটীকে হঠাৎ স্বর্গরাজ্যের প্রজা হইবার জন্য ডাকিলেন না, তাহার অধিকার হইয়াছে কিনা তাহা সম্যক্ পরীক্ষা করিলেন। উপনিষদেও দেখি তাই। নচিকেতা যখন যমের নিকট আত্মতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন—"এতৎ বিদ্যামনুশিষ্টস্তুয়াহর্হম্" তখন যম এই প্রশ্ন প্রত্যাহার করিবার জন্য নচিকেতাকে কত অনুনয় বিনয় করিলেন—'মা মোপরৎসীরতি মা সৃজৈনম্", পার্থিব ভোগ সুখের কত প্রলোভন দেখাইলেন—"যে যে কামা দুর্লভা মর্ত্ত্যলোকে সর্ব্বান্ কামাংশ্ছন্দতঃ প্রার্থয়স্ব" কিন্তু নচিকেতা যখন কিছুতেই স্বীয় সঙ্কল্প প্রত্যাহার করিলেন না, তখনই যম আত্ম তত্ত্বের উপদেশ করিতে সম্মত হইলেন।

যাহা হউক, নচিকেতা যমের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া, তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্মজ্ঞান আদায় করিলেন, কোনও পার্থিব বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করিলেন না। ইহাই স্বাভাবিক। যমের মত ধর্ম্মোপদেষ্টা কে? শ্মশানে মানুষ যে জ্ঞান লাভ করে, তাহা লইয়া সে যদি সংসার করিতে পারিত, তবে নিশ্চয়ই সংসার স্বর্গে পরিণত হইত, তাহার সাংসারিকতা থাকিত না। এ যুগেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই যমের দ্বারাই উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, শ্মশানেই তাঁহার ধর্ম্ম জীবন আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের পৌরাণিক আখ্যায়িকাটি ঠিক ইহার বিপরীত, কিয়ৎ পরিমাণে অস্বাভাবিক। মানুষ যমের কাছে আসিয়া সংসার ভিক্ষা করিয়া লইতেছে ইহা বাস্তবিকই কিঞ্চিৎ বিস্ময়জনক। ইহা পৌরাণিক যুগের অতিপ্রাকৃতিক ভাবের দিকে গতির দৃষ্টান্ত স্থল। ধর্ম্মকে মানবের স্বাভাবিক বৃত্তি সমূহের উপর স্থাপন না করিয়া অলৌকিক বিস্ময়জনক ভাবের উপর স্থাপন করিতে যাইয়া, এই অস্বাভাবিকতা উৎপন্ন হইয়াছে। যম-নচিকেতা সংবাদটি যেমন স্বাভাবিক, যমসাবিত্রী সংবাদটি তেমনই অস্বাভাবিক। নচিকেতা যমের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বলিলেন—

অজীর্য্যতাম মৃতানামুপেত্য
জীর্য্যন্ মর্ত্ত্যঃ কধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতি প্রমোদান
নতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত॥

নচিকেতার এই ভাবটি মানবজাতির সর্ব্ব সাধারণের একটি সাধারণ ভাব। এইটিই স্বাভাবিক অবস্থা। কিন্তু যম-সন্নিধানে সাবিত্রীর ভাবটি নিতান্তই অস্বাভাবিক। স্থান কাল পাত্রের অনুপযোগী। এই দুইটি আখ্যায়িকার আরও একটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, ধর্ম্মের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া অতি স্বাভাবিক ভাবে নচিকেতা যাহা যাহা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, সাবিত্রী সেই অবস্থায় সেই গুলিই যাজ্ঞা করিয়া লইলেন। এ কথা সত্য, যাহার দিনান্তে একমুষ্টি অন্ন মেলে না তাহার কাছে বৈরাগ্যের উপদেশ বৃথা, তাহার বৈরাগ্যের অধিকার হয় নাই, যদিও যম-সন্নিধানে—শ্মশানে সকলেরই বৈরাগ্যের উদয় হওয়াটাই স্বাভাবিক অবস্থা। "বিষয় সুখে মন তৃপ্তি কি মানে" একথাটা প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্রের মুখেই শুনায় ভাল এবং এই জন্যই এটা বৈরাগ্যের উপদেশ বলিয়া গৃহীত হইবার উপযুক্ত। সাবিত্রী রাজপুত্রী বলিয়াই, যম-সন্নিধানে তাঁহার এই সংসার প্রার্থনা নিতান্ত অস্বাভাবিক হইয়াছে, বিশেষতঃ উপনিষদের যম-নচিকেতা সংবাদের পরে। উপনিষদে যম নচিকেতাকে বলিলেন, "মহাভূমৌ নচিকেতস্ত্বমেধি," নচিকেতা কিন্তু "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো" বলিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ চাহিলেন। নচিকেতার ন্যায় সাবিত্রীকেও যম বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন, নচিকেতা চাহিলেন আত্মতত্ত্বের উপদেশ, কেননা, "বক্তা চাস্য ত্বাদৃগন্যো ন লভ্যঃ" কিন্তু সাবিত্রী যমের ন্যায় ধর্ম্মোপদেষ্টার নিকট হইতেও চাহিয়া লইলেন নচিকেতার পরিত্যক্ত রাজ্য—"হাতং পুরা মে শ্বশুরস্য ধীমতঃ স্বমেব রাজ্যং লভতাং স পার্থিবঃ"। যম, "শতায়ুষঃ পুত্র পৌত্রান্ বৃণীষ্ব" বলিয়া, নচিকেতাকে বর গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন, সঙ্কল্পে দৃঢ় নচিকেতা ব্রহ্মজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই লইলেন না,—"নান্যন্তস্মান্নচিকেতা বৃণীতে" সাবিত্রী কিন্তু তাহাই যাচিয়া লইলেন—

"মমাত্মজং সত্যবতস্তথোরসং ভবেদুভাভ্যামিহ যৎ কুলোদ্বহম্।
শতংসুতানাং বলবীর্য্যশালিনামিদং চতুর্থং বরয়ামি তে বরম্"॥

যম নচিকেতাকে বলিলেন "স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি," অথবা "বৃণীষ্ব বিত্তং চিরজীবিকাঞ্চ" নচিকেতা কিছুতেই ভুলিলেন না, কোনই পার্থিব সুখ ভোগে মুগ্ধ হইলেন না, "তবৈব বাহাস্তব নৃত্য গীতে" বলিয়া সব অগ্রাহ্য করিলেন, সাবিত্রী কিন্তু "বরং বৃণে জীবতু সত্যবানয়ং তবৈব সত্যং বচনং ভবিষ্যতি" বলিয়া এই পার্থিব জীবনই ভিক্ষা করিয়া লইলেন, নচিকেতার ন্যায় "যেয়ম্প্রেতে

বিচিকিৎসা মনুষ্যে” বলিয়া মৃত্যুর পরপারস্থ অমৃত জীবনের কোন খবরের জন্য কিছুই আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না।

এই দুইটি আখ্যায়িকা উপনিষদ ও পুরাণের স্থান অতি স্পষ্ট ভাষায় নির্দ্দেশ করিতেছে ও তাহাদের পার্থক্য বুঝাইয়া দিতেছে। পুরাণে যে ধর্ম্মের বিকাশ হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করা আমার উদ্দেশ্য নহে, সংসারকে হেয় প্রতিপন্ন করাও আমার অভীষ্ট নহে কিন্তু আমার কথা এই যে, উপনিষদকে ভিত্তি না করিয়া যে পৌরাণিক অভিব্যক্তি তাহা অভিব্যক্তি নহে, কিন্তু বিকৃতির নামান্তর মাত্র এবং ব্রহ্মজ্ঞানকে সম্বল না করিয়া যে সংসার তাহা সাংসারিকতা মাত্র।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

গঙ্গারাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ইহার পরদিন রাধানাথের নৌকা আসিয়া চকদিঘীর ঘাটে লাগিল। তখন অনেক রাত্রি। সুতরাং সে রাত্রি শ্যামা নৌকাতেই থাকিল।

পরদিন প্রাতঃকালে রাধানাথ কৌশলে ঘাটের লোকদিগের নিকট শ্যামার শ্বশুরের নাম জানিয়া লইয়া. তাঁহার নিকট পত্রসহ লোক পাঠাইয়া দিলেন। পত্রে লিখিলেন,—“আপনার পুত্রবধূ যে নৌকায় আসিতেছিলেন, দৈবক্রমে তাহা দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। কিন্তু ঈশ্বর আপনার পুত্রবধূকে রক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি আমার নৌকায় আছেন। আপনারা আসিয়া তাঁহাকে লইয়া যাইবেন।”

কিয়ৎক্ষণ পরে পত্রের উত্তর লইয়া লোক ফিরিল। শ্যামার শ্বশুর লিখিয়াছেন,—“যিনি ডাকাতদের নিকট তিন দিন তিন রাত্রি বাস করিয়াছেন, তাঁহাকে আর আমরা গৃহে লইতে পারিব না।”

পত্রপাঠে রাধানাথের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি শ্যামাকে পত্রের কথা না বলিয়া স্বয়ং তাহার শ্বশুরের নিকট গেলেন। সেখানে গিয়া তিনি বৃদ্ধকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই বুঝিলেন না; বুঝিলেও পুত্রবধূকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। দাসী আসিয়া বলিয়াছে যে, সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে, যমদূতের মত বার জন ডাকাত বৌকে তুলিয়া

লইয়া গিয়াছে। কথাটা সত্য না হইলেও ইহা সর্ব্বত্র রাষ্ট্র হইয়াছে, সকলেই বিশ্বাস করিয়াছে। সুতরাং বৃদ্ধ বলিলেন,—“যিনি ডাকাতদের সহিত তিন রাত্রি বাস করিয়াছেন বলিয়া রাষ্ট্র, তিনি সতী হইলেও পরিত্যজ্যা। তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া সমাজে কলঙ্ক কিনিতে পারিব না।”

রাধানাথ বুঝিলেন, বৃদ্ধের নিকট কোন আশা নাই। তখন তিনি গোপনে গোপীনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু গোপীনাথ পিতার আদেশের অন্যথাচরণ করিতে অক্ষম। রাধানাথ হতাশ চিত্তে নৌকায় ফিরিয়া আসিলেন।

শ্যামা তখন নৌকার গবাক্ষের নিকট বসিয়া অদূরদৃষ্ট একটা চিলে ছাদের দিকে চাহিয়াছিল। সে ছাদ শ্যামার পরিচিত। অনেকদিন সে সেই ছাদে বেড়াইয়াছে। একা নয়, জ্যোৎস্না-প্রফুল্ল যামিনীতে স্বামীর হাত ধরিয়া, ঐ ছাদে দাঁড়াইয়া আকাশের নক্ষত্র গণিয়াছে, কৌমুদীসম্পাতপ্রফুল্লা কংসাবতীর উন্মাদ প্রেমাভিসার দেখিয়াছে; দেখিতে দেখিতে কত সুখের রজনী অতি-বাহিত করিয়াছে। আজ সেই ছাদ দেখিয়া শ্যামার কত কথা মনে পড়িল। অতীতের সুখ-স্বপ্নপূর্ণ স্মৃতির উচ্ছ্বাস বুকে লইয়া পলকহীন দৃষ্টিতে সে ছাদের দিকে চাহিয়া রহিল। এমন সময় রাধানাথ বিষণ্নমুখে আসিয়া তাহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। শ্যামা দৃষ্টি না ফিরাইয়াই একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল,—“আমিও আগে এই ভয় করেছিলাম।”

রাধানাথ বলিলেন, —“এখন তবে ফিরিয়া চলুন।”

কম্পিত কণ্ঠে শ্যামা বলিল,—“কোথায় যাইব ?”

রা। পিত্রালয়ে।

শ্যা। পিতৃগৃহের দ্বার আমার পক্ষে চিররুদ্ধ।

রা। তবে উপায় ?

শ্যা। নিরুপায়। আপনি আমার জন্য অনেক করিয়াছেন। সে জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

রা। আমিই এক প্রকার আপনার সর্ব্বনাশ করিয়াছি।

শ্যা। আপনি করেন নাই, আমার অদৃষ্ট করিয়াছে। এখন আপনি ফিরিয়া যান, আমিও নিজের পথ দেখি।

রা। আপনি কোথায় যাইবেন ?

শ্যা। অদৃষ্ট যেখানে নিয়ে যায়।

রা। স্বামীগৃহে যাইবেন ?

শ্যা। না। আমার সতীত্বে সন্দেহ করিয়া যাহারা আমায় ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদের কাছে আর কোন্ মুখে যাইব ?

রা। তবে ?

শ্যা। দেশে ভিক্ষা মিলে।

রা। কিন্তু এমন রূপ—এমন বয়স লইয়া ভিক্ষা করা চলে না।

শ্যামা যেন একটু লজ্জিত হইল। একটু ভাবিয়া বলিল,—"তবে আপনি একবার আমাকে ডাকাতের হাত হ'তে বাঁচিয়েছেন, এবারেও একটা উপায় ক'রে দিন।"

রাধানাথ কিয়ৎক্ষণ ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন,—"আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তবে আপাততঃ আমার বাড়ীতেই চলুন। পরে যাহা হয় হইবে।"

শ্যামা বলিল,—"আপত্তি থাকিলেও এখন আমার আর অন্য উপায় নাই। বাড়ীতে আপনার কে আছে ?"

রা। মা আছেন, দাসদাসী আছে।

শ্যা। স্ত্রী ?

রা। আছে।

শ্যা। চলুন, আপনার সঙ্গেই যাই। কিন্তু আপনাকে একটা প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে।

রা। কি বলুন।

শ্যা। এই গঙ্গাগর্ভে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করুন, কখনও আমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবেন না।

রা। স্বীকার।

তখন রাধানাথ নৌকা খুলিতে আদেশ করিলেন। মাঝিরা নোঙ্গর তুলিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। শ্যামার দৃষ্টি তখনও সেই ছাদের দিকে। কিন্তু নৌকা ঘুরিতেই সে ছাদ অদৃশ্য হইয়া গেল। শ্যামা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুখ ফিরাইল। তখন নৌকা হেলিতে দুলিতে, নাচিতে নাচিতে কংসাবতীর বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়াছে। নীচে নদীর জল, রবির কিরণ গায়ে মাখিয়া, কল্ কল্ ছল্ ছল্ করিয়া, উচ্ছ্বাসের পর উচ্ছ্বাস তুলিয়া নাচিতে নাচিতে সাগরসঙ্গমে ছুটিয়াছে। শ্যামা স্থির দৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

শ্যামা! কংসাবতীর ঐ অগাধ অনন্ত জলরাশি ভাল, না সংসার ভাল ?

তুমি যদি কখন নৌকাপথে যাও, আর সেই নৌকায় কোন রূপযৌবন-সম্পন্না সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রমণী থাকে,—যাহার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু যাহার সুখের জন্য তুমি ব্যস্ত, ব্যাকুল; যাহার সম্মুখে যাইতে তুমি সাহসী নও, কিন্তু দূর হইতে যাহার কথাগুলি শুনিতে বড় ভালবাস; যাহার মুখের দিকে চাহিতে তুমি ভীত হও, কিন্তু যাহাকে সংসারের সার রত্ন বলিয়া ভাব, এমন কোন সদ্যঃপরিচিতা আধ-লজ্জা-সঙ্কুচিতা আধ-দৃষ্টিক্ষেপশালিনী রমণী যদি তোমার নৌকায় থাকে; আর সেই নৌকা যদি সান্ধ্যরবিকর-মণ্ডিত বীচিমালার উপর দিয়া নাচিয়া নাচিয়া যায়, তবে তাহা কেমন সুখের নৌকাযাত্রা বল দেখি? আবার সেই দেবশীর্ষস্থিত-কুসুমবৎ অস্পর্শনীয়া, ভুজঙ্গশিরোনিহিত মাণিক্যবৎ অনুপভোগ্যা সুন্দরী যদি নৌকার গবাক্ষপথে বসিয়া উদাস দৃষ্টিতে মেঘশূন্য ছিদ্রশূন্য নির্ম্মল নীলাকাশের দিকে চাহিয়া থাকে,—আর তুমি করসংলগ্ন কপোলে বসিয়া সেই উদাস দৃষ্টিটার মধ্যে বিশ্বের সমষ্টীভূত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাও, দেখিতে দেখিতে, মুগ্ধনেত্রে একবার সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যাধার দৃষ্টির দিকে, একবার দূরপ্রসারী অনন্ত নীলাম্বরের দিকে, আর বার অনন্তগামিনী তটিনীর দিকে চাহিতে থাক, চাহিয়া চাহিয়া অনন্ত কাল এই তিনটী সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে ইচ্ছা কর, তবে সে কেমন সুখের নৌকাযাত্রা বল দেখি?

তা' তুমি যদি রাধানাথের এই সুখের নৌকাযাত্রায় ঈর্ষান্বিত হইয়া, রাধানাথের মত খাজানার টাকা লইয়া নৌকা পথে যাইতে চাও, তবে আমি বলিয়া রাখি, নৌকায় উঠিবার আগে আপনার হৃদয়-নৌকা খানাকে বেশ শক্ত খোঁটায় বাঁধিয়া বাহির হইও। নতুবা সেই এক যাত্রায় সুখ ও দুঃখ রূপ দুইটী পৃথক্ ফলই পাইবে।

কি দেখিতেছ রাধানাথ-পতঙ্গ! অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে কি না, তাহাই পরীক্ষা করিতে চাহিতেছ? দেখ দেখ, অগ্নির কেমন রূপ, কেমন সৌন্দর্য্য, কেমন তাহার উন্মাদ আকর্ষণ! দৃষ্টি ফিরাইও না,—এক দৃষ্টিতে দেখ। দেখিতে দেখিতে ঐ রূপময়ী সৌন্দর্য্যময়ী আকর্ষণশালিনী বহ্নিশিখায় ঝাঁপাইয়া পড়। পুড়িয়া মরিবার ভয় করিও না। এমন করিয়া পুড়িয়া মরিবার সুযোগ কয়জন পায়? ভয় হয়, নীচে তো তরঙ্গভঙ্গচঞ্চলা রক্তরবিকরবিমণ্ডিতা কংসাবতী আছে, উহাতে ঝাঁপাইয়া পড়। সকল জ্বালা জুড়াইবে, সকল আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইবে, সকল আশা মিটিয়া যাইবে। পারিবে কি রাধানাথ?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যেখানে শ্যামার নৌকা লুঠ হইয়াছিল, তাহারই কিছুদূরে নদীতীরে জঙ্গলের ভিতর একটা ছোট ঘর। ঘরটা মাটীর, উপরে হোগ্‌লার ছাউনী। সে ছাউনীও পুরাতন। রোদে জলে হোগলা পচিয়া মাঝে মাঝে ছিদ্র হইয়াছে। সে ছিদ্র দিয়া দিনে একটু একটু আলো দেখা যায়, বৃষ্টি হইলে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ে। তা' ইহাতে গৃহবাসীদের বড় একটা ক্ষতি বা অসুবিধা ছিল না। কেন না তাহারা সর্ব্বদা সে ঘরে বাস করে না, মাঝে মাঝে দুই চারি দণ্ডের জন্য আসিয়া বসে।

ঘরের চারিদিকে আস্‌শ্যাওড়ার বন। সম্মুখে এক বহু প্রাচীন বটবৃক্ষ। আশে পাশে হিন্দোল, ডুমুর, বাব্‌লা, তেঁতুল প্রভৃতি ছোট বড় গাছ। তারপর ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের পর নদী। নদী নিতান্ত ছোট নয়; তবে বর্ষাকালেই তাহার প্রভাবটা কিছু বেশী; তখন স্রোত থাকে, আবর্ত্ত থাকে, গর্জ্জন থাকে। অন্য সময়ে ধীরা স্থিরা, মৃদুগামিনী কলনাদিনী। নদীর নাম কংসাবতী বা কাঁসাই।

একদিন অন্ধকার রাত্রিতে পূর্ব্বোক্ত ঘরের দাবায় কয়েকজন লোক বসিয়াছিল। তাহারা আলো জ্বালে নাই, অন্ধকারেই বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল, আর একটা আগুনের মালসা হইতে আগুন তুলিয়া মাঝে মাঝে তামাক খাইতেছিল। তাহাদের মধ্যে একজন, অপরকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছিল,—"সত্যি সর্দ্দার, সে দিন যে রকম মাছ জাল ছিঁড়ে পালিয়েছে, তেমন মাছ আর শীগ্‌গীর পাওয়া যাবে না।"

যে সর্দ্দার, সে বলিল,—"তো শালারা দেখ্‌ছি দিন দিন ভীতু হয়ে পড়ছিস্‌। তোদিকে নিয়ে আর দল রাখা চলে না।"

বক্তা বলিল,—"কি বল্‌বো সর্দ্দার, সাম্‌নে হ'তে গুলি ছুট্‌তে লাগলো। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দু' দু'টো ঘাল হয়ে গেল।"

সর্দ্দার। তোরা দলে ক'জন ছিলি?

বক্তা। বিশ জন।

স। নৌকায় কত লোক ছিল?

ব। কেউ না। দু'বেটা ভোজপুরী ছিল, তারা এক এক বোটের গুঁতো খেয়েই জলে পড়ল।

স। তবে তোরা এই বিশ জনে গিয়ে সাম্‌নের নৌকোয় ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে পারলি না?

ব। সে নৌকো হ'তে গুলি ছুট্‌ছিল যে।

স। দূর মুখ্যু, একবার বন্দুকে গুলি দিলে তো বিশটা আওয়াজ হয় না? ছি, ছি, মিছে দু'টো জান খুইয়ে এলি।

"তা' বটে, তা' বটে" বলিয়া বক্তা চুপ করিল।

সর্দ্দার বলিল,—"কিন্তু খবরদার, আর যেন না এ রকম হয়। আমাকে না ব'লে আর এ রকম কাজে হাত দিস্‌ না।"

তখন সকলে তামাক খাইতে লাগিল। তামাক খাইতে খাইতে অনেক বাজে কথা হাস্য পরিহাসও চলিল। তারপর সকলে উঠিয়া বলিল, "তবে সর্দ্দার আজ উঠি।"

সর্দ্দার বলিল,—"হাঁ, আস্‌চে অমাবস্যায় দুপুর রাতে চাক্‌সীর মাঠে দু'সতী-নের পুকুরে দেখা হবে।"

সকলে সর্দ্দারকে অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল। কেবল একজন সর্দ্দারের নিকট বসিয়া রহিল। তাহার বয়স কুড়ির বেশী হইবে না, আকারও ডাকাতের মত নহে, দেখিলে ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়াই বোধ হয়।

সকলে চলিয়া গেলে সে সর্দ্দারকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"আমায় এবার ছেড়ে দাও সর্দ্দার।"

সর্দ্দার একটু বিস্ময়ের সহিত বলিল,—"কেন রে রতা, তোর আবার কি হ'ল?"

রতা—ওরফে রতন বলিল,—"মাপ কর সর্দ্দার, আমি আর তোমার দলে থাক্‌বো না। তোমার দলে পাপ ঢুকেছে।"

সর্দ্দার হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। বলিল,—"পাপ,—পাপ কিরে রতা?"

রতন বলিল,—যে সে পাপ নয়, মেয়ে মানুষের উপর অত্যাচার।"

সর্দ্দারের হাস্যস্ফুরিত মুখখানা যেন একটু গম্ভীরভাব ধারণ করিল। ঈষৎ ভ্রূকুটী করিয়া বলিল,—"কি, মেয়ে মানুষের ওপর অত্যাচার—কলঙ্কের কথা বটে। তা' কোন্‌ শালা এমন কাজ করে?"

রতন বলিল,—"ক'জনের নাম করব। সেদিন অম্‌নি গুলি ছুটেনি সর্দ্দার, মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করাতেই গুলি ছুটেছিল।"

সর্দ্দার গম্ভীর কণ্ঠে বলিল,—"হুঁ।"

রতন বলিল,—"কেবল এটা ব'লে নয়, এমন আরও দু'একটা হয়ে গেছে। আজ প্রায় এক মাস তোমার দেখা নাই। দলে যার যা' ইচ্ছা তাই করে। আমি এতদিন চলে যেতাম, কেবল তোমার অপেক্ষায় আছি।"

সর্দ্দার গঙ্গারাম নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। তারপর অজগরশ্বাস তুল্য একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—"আর দিন কতক থাক্ রতন! যদি তাই হয়, যদি মেয়ে মানুষের ওপর অত্যাচার, গরীবের ওপর জুলুম হয়, তা' হলে কেবল তুই কেন, মা কালীর দিব্য করে বলছি, আমিও দল ছেড়ে দেব। কেবল দল নয়, এ কাজই ছেড়ে দেব।

রতন। তুমি কি বল্‌ছো সর্দ্দার, দল ছাড়বে? ছাড়্‌তে পারবে?

গঙ্গা। তবে শোন্ রতন, আমার এখন সময়ে সময়ে মনে হয়, আমি যেন ভুল পথে চলেছি। তুই জানিস্, আমি শুধু পয়সার লোভে এ কাজ করি না, ডাকাতিতে আমোদ আছে তাই ডাকাতি করি। কিন্তু এখন আর সে আমোদ টুকু পাই না। আগে একটা মানুষ মারতে পারলে কত আনন্দ, কত গর্ব্ব হ'ত, কিন্তু এখন যেন একটু কষ্ট হয়। আর যেন একাজ ভাল লাগে না। তা' ছাড়া আরও একটা কারণ আছে।

রতন। আর কি?

গঙ্গা। আমি এই একমাস ঘুরে দেখ্‌লাম, অনেক দুষ্ট লোক, আমার নাম করে লোকের উপর জুলুম আরম্ভ করেছে। একে দেশে রাজা নাই, বিচার নাই, আইন নাই, তার উপর এই অত্যাচার। দেশ যেন একবারে অরাজক হয়ে পড়েছে।

রতন। কিন্তু ডাকাতি ছেড়ে তুমি কি করবে?

গঙ্গা। কি করবো তা' এখনও ভাবি নাই। আর ডাকাতি একেবারেই ছাড়্‌ব কি না, তাও এখন ঠিক বল্‌তে পারি না। তবে আর এ রকমে দল চালাব কি না, তা' ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

গঙ্গারাম নীরবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। রতন উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। চতুর্দ্দিক নীরব নির্জ্জন গম্ভীর। আশে পাশে স্তূপে স্তূপে অন্ধকার; অন্ধকারের মধ্যে অবিশ্রান্ত ঝিল্লীধ্বনি। অন্ধকার আকাশতলে খণ্ড খণ্ড মেঘ; মেঘের অন্তরালে আশে পাশে নক্ষত্রের ক্ষীণ দীপ্তি। প্রকৃতি স্থিরা, প্রৌঢ়ার ন্যায় গম্ভীরা, যোগনিরতা বৃদ্ধার ন্যায় স্পন্দনহীনা।

গঙ্গারাম সেই অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া, খণ্ড মেঘাবৃত আকাশের দিকে

চাহিয়া চাহিয়া অনেক ভাবিল। তারপর সে উঠিয়া, জঙ্গলের ভিতর দিয়া নদীতীরে আসিল। নদীবক্ষ অন্ধকারাবৃত, নীরব। কেবল ঘুমন্ত বালিকার স্বপ্নগীতির ন্যায় মাঝে মাঝে অস্ফুটারাব তুলিতেছিল। গঙ্গারাম ধীরে ধীরে নদীগর্ভে নামিল; শীতল জলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া শব্দ করিল,—আঃ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কেন দেখিলাম? দেখিলাম তো মজিলাম কেন? মজিলাম তো পাইলাম না কেন? ধর্ম্ম গেল, ইহকাল পরকাল গেল, লজ্জা গেল না কেন? এক দিনের দেখা নয়,—দিন দিন দেখিয়াছি, একটু একটু করিয়া মজিয়াছি, তিল তিল করিয়া মরিয়াছি, কিন্তু শেষে হারাইলাম কেন? বুকভরা পিপাসা লইয়া সমুদ্রের কাছে গেলাম, তৃষ্ণা আরও বাড়িয়া উঠিল, কিন্তু সাগরকে স্পর্শ করিতে সাহস হয় না কেন? প্রাণভরা ভালবাসা তাহার পায়ে ঢালিয়া দিতে পারিলাম, কিন্তু মুখ ফুটিল না কেন? সর্ব্বস্ব হারাইয়া কেবল কাঁদিতে বাঁচিয়া রহিলাম কেন?

সান্ধ্যতপনরাগ-রঞ্জিত নীলাম্বরতলে মুক্ত ছাদের উপর দাঁড়াইয়া উন্মুক্ত-কুন্তলা বিস্রস্তবসনা বক্ষোনিবদ্ধবাহুযুগলা শ্যামা উদাস দৃষ্টিতে ধূসররেখাঙ্কিত দিগন্তের দিকে চাহিয়া কথাগুলা ভাবিতেছিল। শান্ত সমীরণ ধীরে ধীরে আসিয়া, তাহার কুন্তল দোলাইয়া, অঞ্চল নাড়িয়া, পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িতেছিল; পশ্চিম প্রান্ত হইতে একটা কনকরশ্মি আসিয়া তাহার চিন্তা-গম্ভীর মুখমণ্ডলে বিচ্ছুরিত হইতেছিল; মাথার উপর নীলাকাশবিহারী একটা ক্ষুদ্র পক্ষী বিরহ সঙ্গীতের করুণতানে সান্ধ্যগগন প্রতিধ্বনিত করিতেছিল।

শ্যামা সুন্দরী। পাঠক! তুমি কি কখন মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ড-কিরণমণ্ডিত বীচিবিক্ষোভিত তড়াগহৃদয়ে সম্পূর্ণাবয়বা পদ্মিনীর দীপ্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়াছ? যদি না দেখিয়া থাক, তবে একবার শ্যামার পানে চাহিয়া দেখ; দেখিবে, খরযৌবন-করোদ্দীপ্ত রূপসরসীর বুকে তাহার প্রফুল্ল পদ্মের মত মুখখানি কেমন ভাসিতেছে, হাসিতেছে। তুমি কি কখন বাসন্তীপুষ্পস্তবকবিভূষণা সহকারবিজড়িতা মাধবীলতার চঞ্চল নৃত্য দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছ? যদি না হইয়া থাক তবে একবার শ্যামার পানে চাহিয়া দেখ; তাহার লাবণ্য—কুসুম বিভূষিতা দেহলতা যৌবনের গাছ জড়াইয়া কামনার মৃদু বাতাসে

কেমন হেলিতেছে, দুলিতেছে; সে আন্দোলন দেখিয়া তুমি আত্মবিস্মৃত হইবে। তুমি কি কোন দিন নিবিড় কাদম্বিনীবক্ষে সপ্তবর্ণ-চিত্রিত ইন্দ্রধনুর মনোহর কান্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছ? ঐ দেখ, শ্যামার নবীন-জলদ-জাল তুল্য কুন্তলদামের অন্তরালে এক সঙ্গে কত ইন্দ্রধনুর উদয় হইয়াছে! তুমি কি কখন ভাদ্রের তরঙ্গ-ভরা গঙ্গার বুকে কৌমুদীসম্পাত-প্রফুল্লা বীচিমালার উন্মাদ নৃত্য দেখিয়াছ? যদি না দেখিয়া থাক, তবে একবার শ্যামার পানে চাও; দেখিবে, তাহার উচ্ছ্বসিত রূপগঙ্গার উপর যৌবনের দীপ্তরশ্মি পড়িয়া প্রতি অঙ্গে কেমন সৌন্দর্য্যের লহরী তুলিতেছে। সে উন্মাদ লহরী দেখিতে দেখিতে তুমি আত্মহারা হইবে; কামনার ঘড়া গলায় বাঁধিয়া সেই রূপের নদীতে—সেই যৌবন-কৌমুদী-প্লাবিত লহরীলীলার মধ্যে ডুবিয়া মরিবার জন্য উন্মাদের ন্যায় ছুটিবে।

শ্যামা বড় দুঃখিনী। সে স্বামী-সঙ্গ বর্জ্জিতা, আশ্রয়হীনা, দুরাশাতাড়িতা। তাহার রূপ আছে, কিন্তু সে রূপের আদর করিতে কেহ নাই; কামনা আছে, ভোগ্য নাই; ভক্তি আছে, সম্মুখে পূজ্য দেবতা নাই। তাহার দেহভরা যৌবন আছে, বুকভরা ভালবাসা আছে, হৃদয়ভরা প্রেম আছে, কিন্তু এ সকল উপহার গ্রহণ করিবার পাত্র নাই। তাহার ঐশ্বর্য্য আছে, সুখ নাই, জীবন আছে, আনন্দ নাই, মন্দির আছে, দেবতা নাই। সুতরাং সব থাকিতেও শ্যামা বড় দুঃখিনী। তোমরা দুরাশাতাড়িতা শ্যামাকে ক্ষমা করিবে কি? তাহার জন্য সহানুভূতির একবিন্দু অশ্রু ফেলিবে কি?

কিন্তু এত দুঃখেও তো শ্যামা এক রকম সুখে ছিল; তাহার মনে কোন অশান্তি ছিল না। এখন তাহার সে সুখটুকু—সে শান্তিটুকু নষ্ট করিল কে? রাধানাথ? রাধানাথ শত্রুরূপে তাহার সম্মুখে আসে নাই; মিত্ররূপেই আসিয়াছিল। তবে কি সে নিজে? সে তো ইচ্ছা করিয়া রাধানাথের নিকটে যায় নাই? ভাল বাসিবে বলিয়া, আপনার সর্ব্বস্ব তাহার চরণে ঢালিয়া ভিখারিণী সাজিবে বলিয়া, বহ্নিমুখ বিবিক্ষু পতঙ্গের ন্যায় রাধানাথের সম্মুখ-বর্ত্তিনী হয় নাই? তবে কি অদৃষ্ট? শ্যামা জানে না, তাহার এই দুঃখের—এই অশান্তির জন্য দায়ী কে?

না জানিলেও কিন্তু শ্যামা মজিল—মরিল। অতৃপ্ত বাসনা, উদ্দাম ভাল-বাসা, প্রাণফাটা পিপাসা লইয়া সে স্বামী সন্দর্শনে চলিল। কিন্তু স্বামীর পরিবর্ত্তে তাহার সম্মুখে পড়িল রাধানাথ;—স্বামীগৃহের পরিবর্ত্তে সে রাধা-

নাথের গৃহে আসিল। সেখানে আসিয়া রাধানাথের উদারতা, সহানুভূতি দেখিয়া, মিষ্ট কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইল। মনে মনে তাঁহার গুণের প্রতি আকৃষ্ট হইল। আকর্ষণে মোহ আসিল, মোহে বাসনা জন্মিল, বাসনা হইতে ভোগ প্রবৃত্তির উদ্ভব হইল। তখন তাহার চিরতৃষিত হৃদয় রাধানাথ-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়িল, চিররুদ্ধ বাসনা-স্রোত বাঁধ ভাঙ্গিয়া, মাঠ ঘাট প্লাবিত করিয়া উদ্দাম বেগে ছুটিল। এইরূপে শ্যামাপতঙ্গ ধীরে ধীরে বাসনার করাল বহ্নি-শিখায় আত্ম সমর্পণ করিল। ব্যাধের বাঁশরী শ্রবণে মুগ্ধা হরিণী অলক্ষ্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল।

কিন্তু শ্যামার পুড়িয়া মরাই সার হইল, সুখ তো মিলিল না? বাসনাই সার হইল, তৃপ্তিতো পাইল না? যাহার জন্য শান্তিপূর্ণ কুটীরে বাসনার আগুন জ্বালাইল, সে তো ফিরিয়া চাহিল না? শ্যামাও তো তাহাকে ডাকিতে পারিল না? লজ্জা আসিয়া তাহাকে বারণ করিল; আত্মমর্য্যাদা আসিয়া বাধা দিল; একটা অজ্ঞাত ভীতি আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল। তাই শ্যামা মরিতে বসিয়াও বাঞ্ছিতকে ডাকিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে তাহার সুখ শান্তি সব বাসনার অনলে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। শ্যামা শূন্য হৃদয়ে সেই ভস্মস্তূপের উপর বসিয়া রহিল। প্রাণ চলিয়া গেল, জড়দেহ পড়িয়া থাকিল; পাখী উড়িয়া গেল, শূন্য পিঞ্জর পড়িয়া হায় হায় করিতে লাগিল। তাই বলিতেছিলাম শ্যামা বড় দুঃখিনী।

আর রাধানাথ? রাধানাথের হৃদয়েও আগুন জ্বলিতেছিল; কিন্তু ধীরে ধীরে। তাঁহারও সর্ব্বস্ব পুড়িতেছিল, কিন্তু একে একে। রাধানাথও ভাল-বাসিয়াছিলেন, কিন্তু উন্মাদ হন নাই; মজিয়াছিলেন, কিন্তু মরেণ নাই। তাই এক নদীর দুই কূলে দাঁড়াইয়া দুইজনে পরস্পরের দিকে আকুল দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু নদী-ব্যবধান দূর করিয়া কেহ কাহারও নিকটবর্ত্তী হইতে পারে নাই। এক আকাশের দুই প্রান্তে দুই খানা বিদ্যুৎভরা মেঘ, কিন্তু প্রতিকূল পবনে উভয়কে মিলিত হইতে দেয় নাই।

শান্ত অপরাহ্নে নির্জ্জন ছাদের উপর দাঁড়াইয়া শ্যামা কত ভাবিল, কত কাঁদিল; কত ভাঙ্গিল, কত গড়িল। শেষে একটা বুকভাঙ্গা তপ্ত নিশ্বাস ফেলিয়া, চক্ষু মুছিয়া নীচে আসিল। তাহার এ অশ্রু কেহ দেখিল না, এ দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কেহ শুনিল না। কেবল কিছু দূরে উচ্চ ছাদে দাঁড়াইয়া একজন অনিমেষ দৃষ্টিতে তাহার এই নগ্ন দেহের দীপ্তসৌন্দর্য্য দেখিল; দেখিয়া মুগ্ধ হইল।

যিনি দেখিলেন, তিনি জমিদার রুদ্রনারায়ণ রায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

(৬৭)

শর্করা শত ভারেণ নিম্ব বৃক্ষ উপার্জ্জিতঃ।
পয়সা সিঞ্চিতো নিত্যং ন নিম্বো মধুরায়তে॥

ভাবার্থ—শতভার শর্করার দ্বারা,
নিম্ব বৃক্ষ করি' উৎপাদন।
সেচনিলে নিত্য ক্ষীর তাহে—
নিম্ব মিষ্ট না হয় কখন॥

(৬৮)

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি ভার্য্যা চাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্॥

ভাবার্থ—মাতৃশূন্য গৃহ, পত্নী কুভাষিণী যা'র,
অরণ্যে গমন করা শ্রেয়স্কর তা'র।
কেন না, তাহার পক্ষে বন বা আলয়,
উভয়েই তুল্য বলি' বিবেচিত হয়।

(৬৯)

অতি দানে বলির্ব্বদ্ধো অতি মানে চ কৌরবাঃ।
অত্যুগ্রো রাবণো নষ্টঃ সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতম্॥

ভাবার্থ—অতি দানে বলিরাজা হন বন্দীভূত।
অতি মানে কৌরবেরা সবে হয় হত॥
অতি উগ্রতায় নষ্ট সবংশে রাবণ।
অতি-বৃদ্ধি দোষাবহ,—শাস্ত্রের বচন॥

(৭০)

পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্।
কার্য্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা ন তদ্ধনম্॥

ভাবার্থ—গ্রন্থগতা যেই বিদ্যা
পর-হস্তগত যেই ধন।

কার্য্যকালে কেহ তা'রা
ফল নাহি দেয় কদাচন ॥

(৭১)

অতি রমণীয়ে কাব্যে দূষণ মন্বেষয়ত্যহো পিশুনঃ।
অতি রমণীয়ে দেহে ব্রণমিব মক্ষিকানাং নিকরঃ ॥

ভাবার্থ—পরম সুন্দর, শরীরে যেরূপ
ব্রণ-অন্বেষণ করে মক্ষিকার দল।
অতি রমণীয়, কাব্যে সেই মত
দোষের সন্ধান মাত্র করে যত খল ॥

(৭২)

একতঃ সকলা নীতিরেকতো মধুরং বচঃ।
মধুরং বচনং যস্য তেন ক্রীত মিদং জগৎ ॥

ভাবার্থ—একদিকে সমগ্র সুনীতি, অন্য দিকে মধুর বচন,
করিলে স্থাপন।
সুমধুর বচন যাহার, ক্রীত হয় নিকটে তাহার,
নিখিল ভুবন ॥

(৭৩)

জয়ন্তি তে সুকৃতিনো রসবৈদ্যাঃ কবীশ্বরাঃ।
নাস্তি যেষাং যশঃকায়ে জরামরণ জন্মভীঃ ॥

ভাবার্থ—জয় যুক্ত হোক এ সংসারে,
রস-বৈদ্য যত কবীশ্বর।
যাহাদের যশের শরীরে,
নাহি জন্ম-জরা-মৃত্যু-ডর ॥

(৭৪)

শ্রোত্রং শ্রুতেনৈব ন কুণ্ডলেন,
দানেন পাণি র্ন চ কঙ্কণেন।

আভাতি কায়ঃ করুণাপরাণাং,
পরোপকারেণ ন চন্দনেন ॥

ভাবার্থ—শ্রুতি শ্রবণেই কর্ণ-শোভা পায়,
নাহি শোভে কুণ্ডলে তেমন।
নাহি শোভে কর, কঙ্কণে সেরূপ,
দানে তাহা শোভয়ে যেমন ॥
কৃপা পরায়ণ, ব্যক্তির শরীর,
শোভে যথা পর-উপকারে।
সুগন্ধি চন্দন, মাখিলে প্রচুর,
সে প্রকার শোভা নাহি ধরে ॥

(৭৫)

যঃ সন্ধারয়তে মন্যুং যোঽতি বাদাস্তিতিক্ষতে।
যশ্চ তপ্তো ন তপতি দৃঢ়ং সোঽর্থস্য ভাজনম্ ॥

ভাবার্থ—সংযত করয়ে যেবা ক্রোধ আপনার।
সহ্য করে অনায়াসে নিজ নিন্দা-ভার ॥
সন্তপ্ত হ'য়েও,অন্যে তাপিত না করে।
পুরুষার্থ-পাত্র সে-ই হয় এ সংসারে ॥

(৭৬)

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃক্রোধস্তথালোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ ॥

ভাবার্থ—কাম, ক্রোধ আর লোভ—এই রিপুত্রয়,
আত্মার নাশক বলি' জানিবে নিশ্চয়।
ত্রিবিধ নরক-দ্বার-স্বরূপ ইহারা ;
অতএব ত্যজিবে এ তিন রিপু ত্বরা ॥

(৭৭)

যা রাকাশশিশোভনা গতঘনা সা যামিনী যামিনী।
যা সৌন্দর্য্যবিদগ্ধতা প্রণয়িণী সা কামিনী কামিনী ॥

যা কান্তস্য মুখে চিরায় বিরহে সা মাধুরী মাধুরী।
যা লোকদ্বয়সাধিনী তনু ভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী ॥

ভাবার্থ—পূর্ণশশি সুশোভিতা ঘনশূন্যা যামিনীই প্রকৃত যামিনী।
পরম সৌন্দর্য্যযুতা প্রণয়িণী কামিনীই প্রকৃত কামিনী ॥
চিরায়-বিরহ-দিগ্ধ কান্ত-মুখ-মাধুরীই প্রকৃত মাধুরী।
ইহ-পরলোকদ্বয় হিতকরী চাতুরীই প্রকৃত চাতুরী ॥

(৭৮)

মনস্যেকং বচস্যেকং কর্ম্মণ্যেকং মহাত্মনাম্ ।
মনস্যন্যদ্বচস্যন্যৎ কর্ম্মণ্যন্যদ্দুরাত্মনাম্ ॥

ভাবার্থ—মহাত্মাগণের, রহে যাহা মনে,
বাক্যে ও কার্য্যেও সেইরূপ হয়।
দুরাত্মাদিগের, দেখা যায় সদা,
মনঃ-বাক্য-কার্য্য একরূপ নয় ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ।

সার কথা।

রহে যদি গুণবান পতি প্রিয়তম,
স্বর্গ-সুখে কিবা প্রয়োজন ?
গুণ যদি রহে দেহে, সৌন্দর্য্য-সহিত,
আবশ্যক না হয় ভূষণ।
সরস মধুর বাণী, রহে যদি মুখে,
চন্দ্র-করে কিবা ফলোদয় !
হীনতা স্বীকার কৈলে, দুর্জ্জন-সদনে,
মরণের বাকি কিবা রয়।
ভিক্ষা করি' করে যদি জীবিকা নির্ব্বাহ,
অবশিষ্ট কি রহে ধিক্কার ?
ইষ্ট লাভ হয় যদি, বিনা প্রার্থনায়,
কল্পবৃক্ষে কিবা কাজ আর !

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

মা।

আহা! সংসারে মা নাম কি মধুর নাম, এমন নাম কি আর জগতে আছে? মায়ের স্নেহ, মায়ের ভালবাসা, মায়ের দয়া, মায়ের বাৎসল্য যে অনন্ত অপরিসীম, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। অধম সন্তান মাতৃ মহিমার কিছুই বুঝে না। সন্তান, জননী-গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই আগে মা চিনিয়া থাকে। আশৈশব সন্তান মাতৃস্তন্যে পোষিত, মাতৃস্নেহেই লালিত, মাতৃরক্তেই বর্দ্ধিত। মাতাই সন্তানের পালয়িত্রী ও রক্ষয়িত্রী। আমরা ভ্রান্ত, অজ্ঞান, তাই মাতার দয়া বুঝিতে পারি না।

এই অনন্ত কোটী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যিনি জননী তিনি মা—তিনি জগতের মা, জগতের প্রত্যেক জীবই সেই মাতার সন্তান। অধম সন্তান মাতৃনামের মহিমা, মাতৃনামের মাহাত্ম্য না বুঝিলেও, মাতার দয়া, মাতার স্নেহ, সন্তানের উপর চির জাগ্রত। জগৎ জননী মাতা সংসারের মূলীভূতা, প্রকৃতিরূপা বিশ্বপ্রসবিনী মায়ের কটাক্ষে মুহূর্ত্তেই অনন্ত কোটী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও লয় হইতে পারে। তিনি যুগ রূপে, বৎসর রূপে, মাস রূপে, দিবারাত্রি রূপে, জগতে বিরাজিতা। প্রাণ রূপে, আত্মারূপে অধিষ্ঠাত্রী হইয়া জগদ্ধাত্রী রূপে জগৎ পরিপালন করিতে-ছেন, এবং মহাকালী রূপে কালের বক্ষে পদ দিয়া, লোল রসনা বিস্তার পূর্ব্বক নর-মুণ্ড-মালা গলায় পরিয়া এক হস্তে বরাভয় অন্য হস্তে অসি ধারণ পূর্ব্বক জগতে নানা লীলা দেখাইতেছেন। আবার, জননী দশভূজা মূর্ত্তিতে দশ প্রহরণধারিণী হইয়া অসুর বিনাশ করিতেছেন। মা আমার বহু রূপা; সাধক তাঁহাকে যে মূর্ত্তিতে যে ভাবে আরাধনা করে, তিনি তাহাতেই সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। তিনি প্রভাত-অরুণের ন্যায় ঈষদ্ রক্তবাসপরিধৃতা হইয়া কুমারী রূপিণী, ব্রাহ্মী মূর্ত্তিতে সূর্য্য মণ্ডলে আসীন, মধ্যাহ্নে পীত কাষায় বসনা শ্যামবর্ণা যুবতি-রূপে গদাপদ্ম ধারণ পূর্ব্বক সূর্য্যাসন আশ্রয় করিয়া রহিয়াছেন। আবার সায়াহ্নে শুক্লাম্বরধারিণী বৃষভারূঢ়া বরদা মূর্ত্তিতে ত্রিলোকনাশী শূল ধারণ করিয়া সূর্য্যাসনে উপবিষ্টা রহিয়াছেন। মাগো তুমি প্রণব রূপিণী গায়ত্রী দেবী। তুমি ওঁকার স্বরূপা, দেবী মাহাত্ম্যে তোমায় তাই সর্ব্ব ভূতের আধারভূতা মহাশক্তি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। তুমি সর্ব্বশক্তি-ময়ী চিণ্ময়ী, তাই দেবী পুরাণে তোমায় বলিয়াছে—

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃ রূপেন সংস্থিতা।

মা তুমি দশ মহাবিদ্যা ; তুমি কখন ভৈরবী.কখন বগলা, কখন তারা, কখন কালী, কখনও ছিন্নমস্তা, দিগ্‌বসনা দিগম্বরী,আবার কখন পুরুষ, কখন প্রকৃতি ; তোমার অনন্ত মহিমা। মা তোমার লীলা বুঝা ভার। তুমি ভক্তি রূপে, প্রীতি রূপে, দয়া রূপে, ধর্ম্ম রূপে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত রহিয়াছ। জননী, যদিও আমরা তোমার অকৃতি সন্তান, যদিও আমরা মহাপাপী, তথাপি তোমার স্নেহময় ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন নহি। আমাদের যে এত যন্ত্রণা এত রোগ শোক এত দুঃখ দিতেছ সে সকলই আমাদের মঙ্গলের জন্য, তাই সাধক বলিয়াছেন—

"বারে বারে আমায় যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা
সে কেবল দয়া তব বুঝেছি মা দুঃখহরা
সন্তান মঙ্গল তরে, জননী তাড়না করে
তাই বহিতেছে সুখে শিরে দুঃখেরি পশরা।"

অজ্ঞান সন্তান তাই আমরা তোমার লীলা বুঝিতে পারি না। সময় সময়ে আমাদের সচেতন করিবার জন্য, আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গাইবার জন্য এই রোগ শোক সন্তাপ প্রদান করিতেছ। তুমি যোগমায়া রূপিণী,কুল কুণ্ডলিনী মহাশক্তি। সাধক, সাধনার বলে তোমাকে জাগ্রত করিয়া অভীষ্ট লাভ করিয়া থাকে। মা তুমি পাষাণের মেয়ে কঠোর হৃদয়া হইলেও সন্তানের দুর্দ্দশা দেখিলে—তাহাদের আর্ত্তনাদে তোমার পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়, ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ঐ শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান দাও। পাষাণী হইলেও তুমি করুণাময়ী, তোমার করুণার সীমা নাই। মাতৃগর্ভ-জরায়ু হইতে রক্ষয়িত্রীর ভার গ্রহণ করিয়া চিরদিনই রক্ষা করিয়া আসিতেছ। সন্তানকে রক্ষা করিবার জন্য মাতৃচক্ষু চির জাগরিত। তুমিই আমাদের সুখের জন্য, আমাদের ভোগের জন্য জগতে যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছ। রসনা তৃপ্তিকর কত আহার্য্য দিতেছ, আধিব্যাধি নিবারণের জন্য কত তরুগুল্ম ঔষধির সৃষ্টি করিয়াছ। তোমারই কৃপায় ধন ঐশ্বর্য্য পাইয়াছি। কিন্তু মা, তোমা হইতে সব পাইয়া আবার তোমারই যাদুকরি বিদ্যায়, তোমারই মোহিনী মায়ায় আবার তোমাকেই ভুলিয়া যাইতেছি।

চৈতন্য রূপিণী জননী আমাদের মোহজাল ছিন্ন কর মা! তোমার সেই শান্ত পবিত্রোজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগতের ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হও মা, আর অধম সন্তানদিগকে সেই আর্য্যযুগের পবিত্র মন্ত্র দানে তোমার উদ্বোধন করিতে

শিখাও; দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করিয়া যদি তোমার উদ্বোধন করিতে না পারিলাম, তোমার শরণাগত না হইলাম—মুক্তিমার্গের আশ্রয়ী না হইলাম, তবে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল হইল কৈ?

বহু লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর কর্ম্মফলের অবসান না হইলে আর মুক্তির আশা কৈ? তাই বলি মা মুক্তিবিধায়িনি, মোক্ষদায়িনি, তুমি দয়া না করিলে কেহ কি মুক্তি-পথের পথিক হইতে পারে? তুমি পরমা বৈষ্ণবী, বিষ্ণু-ভক্তি-প্রদায়িনী, তুমি ভক্তি না দিলে ভক্তি কোথা হইতে পাইব মা? তুমি বিদ্যা-জ্ঞান-দায়িনী, চন্দ্র সূর্য্য তোমার লোচনদ্বয়, দিবা-সন্ধ্যা তোমার আরম্ভ ও শেষ। আকাশ পাতাল তোমার মস্তক ও পদ। তোমার করাল বদনই সৃষ্টির অন্ত।

মা! তুমি নাদ-বিন্দু-স্বরূপিনী; তোমার পদকমলে আমাদের ভক্তি যেন চিরদিন অচলা থাকে। জননী তুমি জগতের আরাধ্যা; তোমার আরাধনা করিতে যেন সমর্থ হই। এই অধম সন্তানদিগকে পদে স্থান দাও মা।

শ্রীমতী "নীতিকবিতা" রচয়িত্রী।

স্বদেশী বৈদ্যক ও বনৌষধি।

(শাল্মলি।)

স্বনামখ্যাত বৃক্ষ। প্রচলিত ভাষায় ইহাকে শিমুল বলে। সংস্কৃতে ইহার আরও কয়েকটী পর্য্যায় আছে, যথা—চিরজীবী, রক্তপুষ্পা, কণ্টকদ্রুম, দীর্ঘ-পাদপা, স্থিরায়ু, নিস্মারা ইত্যাদি। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই বৃক্ষ জন্মে। দেশভেদে ইহা ভিন্ন ভিন্ন নামে আখ্যাত হইয়া থাকে; মহারাষ্ট্রে সাম্বর, গুজরাটে শেমল, কর্ণাটে যবলবদমর, তৈলঙ্গে রুগচেটু, উৎকলে বোন্‌রো, মলাক্কায় মল্লিলবু, ব্রহ্মে লেটপান, ইংরাজীতে Silk cotton Tree, লাটিনে বমবাকস্ মালা-বারিকম। এই বৃক্ষ উচ্চে প্রায় ৩০।৪০ হস্ত পরিমিত লম্বা হয়, এবং ২।৩ শত বর্ষ পর্য্যন্ত জীবিত থাকে, এজন্য ইহাকে স্থিরায়ু, চিরজীবী বলিয়া থাকে। ফুল দেখিতে লাল এবং রমনীয়, এজন্য ইহার নাম রক্তপুষ্পা ও রম্যপুষ্পা। চৈত্রমাসে ইহার পত্র গুলি ঝরিয়া যায় এবং ফুল ফুটিতে থাকে ও বৈশাখের

প্রারম্ভে ফল জন্মে। কোন কোন স্থলে কার্ত্তিক ও মার্গশীর্ষে ফুল এবং চৈত্রে ফল হয়। বৃক্ষে যে সময় ফুল ফুটে, তখন দূর হইতে ইহার দৃশ্য অতীব সুন্দর ও নয়নাভিরাম হয়। বনস্পতি শাস্ত্রে তিন জাতীয় ফুলের বর্ণনা দেখা যায়। শ্বেত, রক্ত ও পীত। পরন্তু, অস্মদ্দেশে শ্বেত ও হরিদ্রা বর্ণের পুষ্প বৃক্ষ একান্ত বিরল ; রক্ত জাতীয় বৃক্ষই প্রসিদ্ধ।

শিমুলের জড়, ছাল, ফুল ও আটা (গঁদ) সকলগুলিই ঔষধিরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। হল্যাণ্ড (Holland) প্রদেশে এই তুলায় এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়। বড় বড় বৃক্ষ জলে সহজে নষ্ট হয় না, এজন্য অনেকে বহু পুরাতন বৃক্ষ হইতে নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। বৃক্ষ হইতে লাল বর্ণের এক প্রকার আটা নিঃসারিত হয়, তাহাকে মোচরস বলে। বৈদ্যক শাস্ত্রে এতদ্ বিষয়ের বিশেষ গুণ বর্ণিত হইয়াছে।

"মোচাস্রাবো হিমোগ্রাহী স্নিগ্ধো বৃষ্য কষায়কঃ।
প্রবাহিকাতিসারাম কফপিত্তাস্রদাহনুৎ॥"

অপর এক প্রকার শিমুল বৃক্ষ আছে, তাহাকে কূটশাল্মলি বলে। বৃক্ষভেদে গুণেরও কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শাস্ত্রে উল্লেখিত আছে,—

"কূট শাল্মলিকস্তিক্তঃ কটুকঃ কফবাতনুৎ
ভেত্ত্যুষ্ণঃ প্লীহজঠর যকৃদ্ গুল্ম বিষাপহঃ

বৃক্ষের ছালের গুণ ;—স্তম্ভক, কফ্‌নাশক। ফল ও ফুল ;—স্বাদু, রূক্ষ এবং কফ পিত্ত ও রক্তদোষ নাশক। কন্দ ;—মধুর, শীতল, মলস্তম্ভক, দাহ, পিত্ত ও সন্তাপ নাশক। মোচরস ;—ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রদান করে, প্রত্যুত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে ইহা সর্ব্বরোগের, বিশেষতঃ পুষ্টিকারক মহৌষধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পুষ্টিকারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বলকারক, কান্তিবর্দ্ধক, শীতল, আয়ুঃবর্দ্ধক, রসায়ন, স্নিগ্ধ, বাতনাশক, গর্ভস্থাপক। সর্ব্ব প্রকার অতিসার, ব্রণ বিষদোষ, যোনিদোষ, পিত্ত দাহ, বেদনা প্রভৃতি নাশ কারক। ইহার মাত্রা বালকের পক্ষে ২০-৪০ গ্রেণ, যুবক ও বৃদ্ধের পক্ষে ৩-৪ মাষা।

অতঃপর, শাল্মলি যে আমাদের একটী পরম উপকারী ঔষধী বৃক্ষ ও ইহার যে কি বিশেষ গুণ আছে এবং কোন কোন পীড়ায় কিরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে তদ্বিষয়ে নিম্নে কিঞ্চিৎ উল্লেখিত হইল ;—

(১) শিমুলের জড়ের ছাল চূর্ণ চিনির সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়া মাত্রানুসারে সেবনে, শরীর পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হয়।

(২) মোচরস চূর্ণ ছয় মাষা, মিছরি ৪ তোলা, এক পোয়া গোদুগ্ধের সহিত পান, অথবা ৪ তোলা শিমুলের জড় কুট্টিত করিয়া রাত্রে এক পোয়া খাঁটি দুগ্ধে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন প্রাতে উত্তম রূপে নাড়িয়া, ছাঁকিয়া একতোলা মিছরির সহিত সপ্তাহকাল সেবন করিলে, শুক্র পুষ্ট হয় ও শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি করে।

(৩) মূত্রের সহিত শুক্র ও শর্করা পতন,শ্বেত শিমুলের ছাল কাঁচা গোদুগ্ধের সহিত বাটিয়া, উহার সহিত জীরা চূর্ণ এবং কাশীর চিনি মিশ্রিত করিয়া, একপক্ষ কাল, প্রাতে ও সন্ধ্যায়, নিয়মিত রূপে সেবন করিলে, উক্ত পীড়ার উপশম হয়।

(৪) শ্বেত শিমুলের ছাল চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা, ১ তোলা গব্য ঘৃত, জায়ফল চূর্ণ ২ রতি, মিছরি ছয় মাষা একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবন করিলে প্রমেহ ও তজ্জনিত পীড়া আরোগ্য হয়।

(৫) শিমুল ফুলের পাপড়ি, সৈন্ধব লবণ, ঘৃতে ভর্জ্জিত করতঃ সেবন করিলে, স্ত্রীলোকের কষ্টসাধ্য প্রদর, রক্তপিত্ত, কফ প্রভৃতি রোগের উপশম হয়। অথবা শিমুলের ছাল কিম্বা কণ্টক চূর্ণ চিনির সহিত জল দিয়া পান করিলেও প্রদর আরোগ্য হয়।

(৬) অতিসার রোগে শিমুলের ছালের রস পরম উপকারী।

(৭) জীর্ণাতিসারে মোচরস চূর্ণ ৩।৪ মাষা চিনির সহিত সেবন বিধি।

(৮) হৃদ্রোগাধিকারে, শিমুলের ছাল দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া মাসাবধি সেবন করিলে উক্ত পীড়ার উপশম হয়। ইহা একটী উৎকৃষ্ট রসায়ন, বল ও বীর্য্য কারক, বাতনাশক বহুদিন পর্য্যন্ত সেবন করিলে, সকল ব্যাধি বিনাশ করিয়া শরীরের শোভা ও কান্তি বর্দ্ধন করে।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহার সাধারণ গুণ—

"শাল্মলী শীতলা স্বাদ্বী রসে পাকে রসায়নী।
শ্লেষ্মলা পিত্ত বাতাস্র হারিণী রক্ত পিত্তজিৎ॥"

এতদ্ সম্বন্ধে আরও অন্যান্য গুণ বর্ণিত আছে, বাহুল্য ভয়ে এস্থলে সে সকলের উল্লেখ হইল না।

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

কর্ত্তব্য।

সুখের আলয় ছাড়ি এ পান্থ নিবাসে
কত কাল বল ওহে পথিক সুজন
কাটাইবে জীবনের দুঃখময় দিন।
দুর্লভ মানব জন্ম লভিয়া জগতে
কোন্ মোহে মুগ্ধ হ'য়ে ভুলিছ এখন
জীবনের মহোদ্দেশ্য—স্বধর্ম্ম পালন।
কর্ম্মময় এ জীবন—কর্ম্মভূমি ধরা
কার্য্য ব্যপদেশে জীব করে আগমন
এ মহী মণ্ডলে। কার্য্য-সমাধান্তে পুনঃ
কর্ম্মফল লভি' যে যায় আপন বাসে।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য রাম প্রবুদ্ধ গৌতম
শিখাইতে ভ্রান্ত-নরে কর্ম্মের মহিমা
যুগে যুগে অবতীর্ণ অবনি-মাঝারে।
কর্ম্মসক্তি পরিহার—নিষ্কাম করম
সমাজাদি ধর্ম্মরক্ষা—কর্ত্তব্য পালন
শাস্ত্রের বচন এই—বিধির বিধান।
তাই বলি হে সুধীর বৃথা কর্ম্ম ত্যজি'
কর্ত্তব্যের মহা পথে হও আগুয়ান
মাতৃভূমি ধরণীর দুঃখ কর দূর
ধর্ম্মপথে গতি স্থির কর মহাজন
সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান প্রজ্ঞার লক্ষণ।
ত্যজ দম্ভ অহঙ্কার মান অভিমান
আশ্রয় করহ সেই নিত্য নিরঞ্জনে—
তাঁহার কৃপায় হবে সর্ব্ব দুঃখ দূর
লভিবে অন্তিমে শান্তি দুর্লভ নির্ব্বাণ॥

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।



অঙ্কুর।

বীজাদঙ্কুরনিষ্পত্তিরঙ্কুরাদ্‌বৃক্ষসম্ভবঃ।
ফলপ্রদোভবেদ্‌বৃক্ষইত্থমাশাক্রমোমতঃ॥

২য় বর্ষ।] ভাদ্র, ১৩১৪। [৮ম সংখ্যা।

যোগ্যতমের জয়।

মহাত্মা ডারুইনের সময় হইতে "যোগ্যতমের জয়" (Survival of the fittest) কথাটী বিশেষ প্রচলিত হইয়াছে। এখন প্রায় সর্ব্ব বিষয়েই এই বাক্যটী পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইয়া থাকে। যখন প্রবল, দুর্ব্বলকে পীড়ন করিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা করে, তখন সে এই বাক্যের মাহাত্ম্য স্মরণ করিয়াই মনে করে যে, সে নৈসর্গিক নিয়ম-ই প্রতিপালন করিতেছে। ইহাতে তাহার যেমন আত্ম-প্রসাদ জন্মে, তেমনই পাপ-বোধেরও খর্ব্বতা হয়। অনেকেই এইরূপ বুঝিয়া বসিয়া আছেন যে, দুই-এর সংঘাতে, যে প্রবল, সে জয়ী হইবে; আর যে দুর্ব্বল সে পরাজিত হইবে;—ইহাই নৈসর্গিক নিয়ম। সুতরাং এই নিয়ম অনুসরণ করিয়া, দুর্ব্বলকে পদ-দলিত করিলে যদি নিজে জয়ী হওয়া যায়, তবে তাহাতে অধর্ম্ম নাই। এই নিষ্ঠুর দুর্নীতি পাশ্চাত্য প্রদেশকে এক্ষণে এক প্রকাণ্ড রণক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে; এবং ইউরোপীয়গণকে অন্য ভূ-ভাগের অধিবাসীদিগের নিষ্পীড়ন-কল্পে একবারে নির্ম্মম করিয়া তুলিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে আমরাও এই নীতি অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। আমরা ইহার নাম দিয়াছি, জীবন-সংগ্রাম; এবং এই সংগ্রামে একান্ত অনুরক্ত হইতেছি। এই সংগ্রামের প্রবর্ত্তক কারণ, প্রতিযোগিতা। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক কার্য্যের অধিকারী হইলেই প্রতিযোগিতা আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। এই হেতু এতদ্দেশীয় সমাজ, প্রাচীন কাল হইতেই

সে রূপ বিধানে চালিত হয় নাই। এতদ্দেশীয় সমাজে, কর্ম্ম বিভাগ প্রবর্ত্তিত হইয়া, প্রতিযোগিতা এবং জীবন-সংগ্রামকে যথাসাধ্য দূরে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, এই কর্ম্ম বিভাগ-ই, ক্রমে কর্ম্মের উৎকর্ষতা আনয়ন করিয়াছিল। কিন্তু এখন জীবন-সংগ্রাম-মন্ত্র অভ্যস্থ হওয়ায়, সে সকলই বিধ্বস্থ হইতে বসিয়াছে। এখন সমাজের যুগ নহে, এখন ব্যক্তির যুগ। প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বাধীনভাবে জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হইতে, এবং সেই সংগ্রামে জয়ী হইতে ইচ্ছা করে। ইহাতে, মানব যেন নিম্ন প্রাণিগণের আদর্শে গঠিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। সুতরাং এই "জীবন-সংগ্রাম" বাক্যটী কি, "যোগ্যতমের জয়" কথাটীর প্রকৃত ব্যাপ্তি কতদূর ; ইহা আলোচনা করা সঙ্গত বোধ হইতেছে। এ প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

জীবতত্ত্বে "জীবন-সংগ্রাম" এবং "যোগ্যতমের জয়" কথা দুইটী এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঐ বাক্যদ্বয়ের অর্থ এমন নহে যে, যে কোন প্রাণীদ্বয় পরস্পরের প্রতিযোগিতা করত একে অন্যকে পরাস্ত করিল, এবং সেই সূত্রে বিজয়ী প্রাণী লাভবান হইল। জীব-তত্ত্বে কেবল এইরূপ অর্থে এতদুভয় বাক্য ব্যবহৃত হয় না। যখন দুইটী কেরাণি-পদ-প্রার্থী এক-ই পদের জন্য প্রার্থনা করে, এবং একটী অধিকতর শিক্ষিত বিধায় সেই ব্যক্তি-ই ঐ পদ প্রাপ্ত হয়, অপর ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় না ; তখন তাহাকে ডারুইন-প্রচলিত "যোগ্যতমের জয়" বলা যাইতে পারে না। জীব-রাজ্যে যোগ্যতমের জয় এইরূপ :—প্রতিদ্বন্দ্বীগণের মধ্যে যে সর্ব্বপ্রকারে * কোন বিশেষ প্রাকৃতিক অবস্থার অধিকতর উপযোগী, সেই জীবিত থাকিয়া বংশ বৃদ্ধি করিবে ; যে তাদৃশ উপযোগী নহে, সে মরিয়া যাইবে। কোনও নির্দ্দিষ্ট ভূ-ভাগের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যদি সেই স্থানের প্রাণিগণের অবস্থাও উপযুক্ত রূপে পরিবর্ত্তিত হয়, তবে তাহারা ঐ পরিবর্ত্তিত অবস্থাতে জীবিত থাকিবার যোগ্য হইল। কিন্তু তাহাদিগের স্ব-শ্রেণীর মধ্যে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহার্থ প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইলে কি হইবে? হইবে, যোগ্যতমের জয়, আর অপরের মৃত্যু। যোগ্যতমের জয় অর্থেই অযোগ্যের মৃত্যু বোধ করে। জীব-রাজ্যে জীবন সংগ্রামের ফলে পরাজিতের মৃত্যু ভিন্ন অন্য পরিণাম নাই †।

* কেবল দেহের বলে নহে।

† In Nature's struggle for existence, death, immediate obliteration, is the fate of the Vanquished, whilst the only reward to the

কিন্তু এই জীবন-সংগ্রাম, বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত জীবগণের মধ্যে হয় না; উহা এক বংশীয়গণের মধ্যেই হইয়া থাকে। গরু ও মেষের সংগ্রাম জীবতত্ত্বের জীবন সংগ্রাম নহে; এক বংশজ ভ্রাতা ভগিনী ও নিকট কুটুম্বগণের মধ্যে যে জীবন সংগ্রাম, তাহাই জীবতত্ত্বের প্রতিপন্ন প্রকৃত জীবন-সংগ্রাম *। এই সংগ্রামে যে জয়ী হয় সে জীবিত থাকিয়া বংশ বৃদ্ধি করে, আর যে পরাজিত হয় সে মরিয়া যায়। ইহাই জীব-রাজ্যের নৈসর্গিক বিধান। এই বিধান অনুসারেই, জীব, ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছে। প্রকৃতি এই নির্ম্মম, কঠোর, এবং ধ্বংসাত্মক বিধান মতেই প্রাচীনতম কাল হইতে জীবরাজ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন।

কিন্তু জীবরাজ্য অর্থে কি সমস্ত জীবরাজ্যই বুঝিতে হইবে? মানবও কি এই নিয়মের বশবর্ত্তী? তবে এই গৌরবান্বিত জীবের বিশেষত্ব কোথায়? মানব যে চিরদিন এই ধরাপৃষ্ঠে বিদ্যমান ছিল না, ইহা নিশ্চিত। যদি তিন লক্ষ বৎসর মানবের আবির্ভাব ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে বেশী ভ্রম করা হইবে না। মানব Miocene যুগের পূর্ব্বে যে বিদ্যমান ছিল না, ইহা একরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, যে কঠোর বিধান অনুসারে প্রকৃতি মানবেতর জীবরাজ্য এতদিন নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতে-ছিলেন, মানবের আবির্ভাবের পরেও কি ঠিক সেই বিধানই অব্যাহতরূপে কার্য্য করিতেছে? মানবও কি সেই নিয়মই নতশিরে পালন করিতেছে? এই নিয়ম পালন করিলে ত তাহার শেষ পরিণতি অযোগ্যের মৃত্যুতে; মানব কি সেই পথেই অগ্রসর হইতেছে? এই প্রশ্নের মীমাংসা না করিয়া মানব কখনই স্থির থাকিতে পারে না।

আর্দ্রতা শুষ্কতা, শৈত্য উষ্ণতা, আলোক অন্ধকার—এই সকল লইয়াই প্রকৃতি চিরদিন খেলা করিতেছে। এই সকলের সাহায্যেই প্রকৃতি প্রাচীনতম কাল হইতে স্বকার্য্য-সাধন করিয়া আসিতেছে। সেই প্রাচীন কাল হইতেই জীব এই সকলের অধীনতা করিতেছে। কখনও দুরন্ত শীত, কখন বা

---

victors * * * is to carry on by heridity to another generation the specific qualities by which they triumphal. Ray Lankester's Nature and Man p. 15.

* The struggle for existence takes place, not * * between different species, but between individuals of the same species, brothers and sisters and cousins. ibid p 14.

অসহ্য গ্রীষ্ম, এই সকল সহ্য করিয়া যে জীব আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিল, এবং শত্রু-হস্ত হইতে আত্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হইল, সে বাঁচিল। যে জীব তাহা পারিল না, সে মরিয়া গেল। এরূপ, মৃত জীবের দেহ, অথবা দেহাংশ পৃথিবীর স্তরে স্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে। ইহারা কেহই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইতে পারে নাই। কিন্তু মানবের ইতিহাস এরূপ নহে। মানব দারুণ শীতে অথবা অত্যুষ্ণ তাপেও আত্মরক্ষা করিতে এবং আহার সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। দেহের উপযুক্ত পরিবর্ত্তন না হইলে এই সকল সময়ে মানবেতর জীব বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু মানব—দৈহিক পরিবর্ত্তন না হইলেও, বুদ্ধি-বলে আত্মরক্ষা করিতে পারে। চিরতুষারাবৃত মেরু প্রদেশে মানবেতর জন্তু দৈহিক পরিবর্ত্তন দ্বারা বিশেষরূপে সুরক্ষিত না হইলে বাস-ই করিতে পারে না। কিন্তু মানবের দেহ ঐরূপে পরিবর্ত্তিত না হইলেও, ঐ সকল দেশে মানব বুদ্ধি বলে আত্মরক্ষা করিতেছে। মানব কখনই প্রকৃতির তাড়না নতশীরে সহ্য করিতে সম্মত হয় না। প্রকৃতি যদি বলেন, "তুমি মর," মানব বলে "আমি মরিব না।" মানব প্রকৃতির অবাধ্য পুত্র *। সে সহজে অধীনতা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক হয় না; বরং প্রকৃতিকে পরাজিত করিয়া, আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করে। আর, মানব যদিও পরস্পরের প্রতি-যোগিতা করিয়া সময় সময় যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই, তথাপি তাহাতে পরাজিত পক্ষ একবারে সকলেই মরিয়া যায় না। অতি প্রাথমিক অবস্থাতেও, বোধ হয়, "অযোগ্যের পরাজয়ে" একবারে মৃত্যু ঘটে নাই। এখনকার উন্নত অবস্থায় ত তাহা হইতেই পারে না। প্রতিদ্বন্দ্বী মানব সমাজে, জয়ী ও জিত হয়ত পরস্পরের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়, নতুবা পরাজিত পক্ষ স্থানান্তর আশ্রয় করে; নচেৎ ঐ পরাজয়ের ফলে জিতের দেহ ও মন এরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হয় যে, তাহার মধ্য দিয়াই মানব ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। পরাজিতের অবনতি নির্দ্দিষ্ট সীমা প্রাপ্ত হইলে, তাহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ উন্নতি অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। সভ্যতায় কিঞ্চিন্মাত্র অগ্রসর হইয়া থাকিলেও, সে নির্ম্মূল হইতে কখনই সহজে স্বীকার করে না। এই রূপে, মানব, প্রকৃতির চিরন্তন বিধানকে পদে পদে বিপর্য্যস্ত করে। প্রকৃতি, অন্য জীব জন্তুর বিবর্জ্জনে যে কঠোর নিয়মানুসারে যুগ যুগান্তর হইতে কার্য্য

* Man is Nature's reble. * * * Her insurgent son. Nature and Man p 22-3

করিয়া আসিতেছিলেন তাহা মানবের নিকট প্রতি পদে ব্যর্থ হইতেছে। এই বিদ্রোহী সন্তান স্বীয় বুদ্ধি বলে প্রকৃতির চিরন্তন নিয়ম অব্যাহত রাখিতে দেয় নাই। সে, প্রকৃতিকে পরাজিত করিবার নিমিত্ত, প্রথম হইতেই চেষ্টা করিতেছে। তাহার ফলে এখন এমন অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, সে আর সেই চিরন্তন নিয়মের অধীনে ফিরিয়া যাইতে পারে না। সে, যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে, তাহাতে সে চিরাতীত কাল হইতে জয়ী হইয়াই আসিতেছে। এই দিগ্বিজয় কার্য্যে তাহার প্রধান সহায় মস্তিষ্ক। এই পদার্থ Tertiary যুগে জীবরাজ্যে অতি অল্পই ছিল। সে যুগে মানব ছিল না। মানবেতর জীবগণের মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র ছিল। কিন্তু, এই যুগের শেষ ভাগে অথবা miocene যুগের প্রথম ভাগে অন্যান্য জন্তুর সহিত মানবের পূর্ব্ববর্ত্তিগণেরও মস্তিষ্ক যুগপৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। এই সময়ে অনেক স্তন্যপায়ী জীব, যুগপৎ বর্দ্ধিতমস্তিষ্ক হইয়া গেল। ইহার কারণ যাহাই হউক, কিন্তু এই অবস্থার ফলেই মানবের আবির্ভাব। সে বর্দ্ধিতমস্তিষ্ক লইয়াই অবতীর্ণ হইল। সুতরাং প্রকৃতির অসহনীয় শীত-তাপের অধীনতা করিতে সে প্রথম হইতেই ন্যূনাধিক অস্বীকার করিতে লাগিল। এইরূপে সে কেবল যে জীবিত আছে, তাহা নহে; উত্তরোত্তর বংশ বৃদ্ধি করত ধরাতলে বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রকৃতির অবাধ্যতা করিয়া মানব অনেক বিপদ আপনি ডাকিয়া আনিয়াছে, তাহা সত্য; কিন্তু সে যে আর কোন কালেই প্রকৃতির চিরন্তন বিধান স্বেচ্ছায় স্বীকার করিবে, তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। যে অযোগ্য, তাহাকে সে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করে। তাহার আত্মরক্ষা বৃত্তি ক্রমে পরিবারে, স্বদেশে ও সমস্ত ধরাতলে প্রসারিত হইয়া তাহাকে বিবিধ সদ্‌গুণে ভূষিত করিয়াছে। দয়া, ধর্ম্ম প্রভৃতি উচ্চতম গুণে মানব অলঙ্কৃত হইয়াছে। ইহাই তাহার প্রধান গৌরব। ইহা সে কখনই সহজে পরিত্যাগ করিবে না। তাহার মস্তিষ্কের বৃদ্ধি এক্ষণে নিবৃত্ত হইয়াছে, সত্য *। প্রাথমিক অবস্থায় তাহার মস্তিষ্ক যেরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা আর হইতেছে না,

* Man, it would seem, at a very remote period attained the extraordinary development of brain which marked him off from the rest of the animal world; but has ever since been developing the powers and qualities of this organ without increasing its size. * * * *Man and Nature* p 20.

সত্য। কিন্তু মানব স্বীয় জীবন ব্যাপারের সুবিধার জন্য, এবং অন্যান্য উচ্চতর কারণে,মস্তিষ্কের ক্রিয়া শক্তির এতই উৎকর্ষ সাধন করিতেছে যে,তাহার সীমা নির্দ্দেশ করিবার উপায় নাই। মানবের বুদ্ধিবৃত্তির ক্রমে উৎকর্ষতা-সাধন হইতে হইতে, তাহার চিৎ-শক্তির এত উন্নতি হওয়া সম্ভব যে, অবশেষে তাহা অচিন্ত্যনীয় বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে। তখন মানব অনন্ত উন্নতির অধিকারী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই উপায়—সর্ব্ব প্রযত্নে প্রকৃতিকে পরাজয় করিবার চেষ্টা—প্রকৃতির অবাধ্যতা। কিন্তু প্রকৃতির অনুসরণ করাই যথার্থ অবাধ্যতা। শীত তাপ প্রভৃতি যে সকল দ্বন্দ্ব শক্তি লইয়া প্রকৃতি কার্য্য করেন, তন্মধ্যে একের অনুসরণ করত অন্যকে পরাজয় করাই একমাত্র পন্থা। প্রকৃতির নিয়ম অনুসরণ করিলেই প্রকৃতি আপনা হইতে পরাজয় স্বীকার করেন। প্রকৃতির পরাজয়েই মানবের উন্নতি। যে মানব, উন্নতি ইচ্ছা করে, সে সর্ব্বাগ্রে প্রকৃতিকে পরাজিত করিতে যত্নবান হইবে। ইহাতে গত্যন্তর নাই। উন্নতি নানাবিধ ; সুতরাং যে প্রকার উন্নতি লক্ষ্য করা যায়, তদনুরূপ যত্ন করাই সঙ্গত। যদিও মানবজীবনের যে কোন বিভাগেই উন্নতি হউক, অন্য বিভাগেও তাহার প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই, তথাপি ঈপ্সিত পথে একাগ্র চেষ্টাই উন্নতির প্রধান উপায়। দৈহিক ও মানসিক উন্নতি ইচ্ছা করিলে, যাহার উপর এতদুভয় নির্ভর করে, তৎপ্রতি মনোযোগ করা উচিত। জীবরাজ্যে দ্বিবিধ কারণ পরিবর্ত্তন সিদ্ধ করিয়া থাকে। ১ম পারিপার্শ্বিক অবস্থা ; ২য় বংশানুক্রম। পারিপার্শ্বিক অবস্থানুসারে যে পরিবর্ত্তন উৎপন্ন হয়, বংশ পরংপরাগত হইলে তাহার স্থায়ীত্ব বিধান হইয়া থাকে। সুতরাং মানব কোন নির্দ্দিষ্ট পথে উন্নতি ইচ্ছা করিলে, এই দুই উপায়ের আশ্রয় লওয়া অত্যাবশ্যক। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যাহাতে বাঞ্ছিত ফলের অনুকূল হয়, এবং যাহাতে সেই অনুকূলতা বংশানুক্রমে রক্ষিত হয়, তাহা করিতেই হইবে। নচেৎ, মানব কখনই সফল হইতে পারে না। এইরূপে প্রকৃতিকে জয় করিতে সময়ের আবশ্যক হইলেও, কি সামাজিক, কি রাজ-নৈতিক, সর্ব্ব প্রকার উন্নতিরই এই একমাত্র পথ। প্রকৃতিকে পরাজিত করিতেই হইবে। কিন্তু কথায় বলে 'বড় হবি ত ছোট হ"। তাই প্রকৃতির অনুগত হইয়াই তাহাকে পরাজয় করিতে হইবে। প্রকৃতির বিবিধ বিধান সমূহ যথাসম্ভব আয়ত্ব করিতে হইবে, তৎপরে একের অনুসরণ করত, অন্যকে প্রতিরোধ করিতে হইবে। প্রকৃতিকে বুঝিলেই তিনি আপনা হইতে পরাজয় স্বীকার করেন। তাঁহার এই মহত্ত্ব থাকাতেই মানব ক্রমে মানবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং পরিণামে অমরত্ব লাভ করিবে, তদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

শ্রীশশধর রায়।

সূর্য্যদেবী ও পরিমলদেবী।

[১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের বৈদেশিক বিভাগের সেক্রেটারী (Secretary to the Foreign Department) সার্ হেনরী ইলিয়ট মহোদয় তাঁহার বহুবর্ষের যত্ন ও পরিশ্রম প্রসূত "ভারতবর্ষের ঐতিহাসিকগণ কথিত ভারতবর্ষের ইতিহাস" History of India as told by its own Historians নামক গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করেন। ইহাতে আরব্য ও পারস্য ভাষায় লিখিত বহু সংখ্যক মুসলমান ঐতিহাসিক-লিখিত, বহু সময়কার ইতিহাস অনূদিত ও সঙ্কলিত আছে। কছনামা নামক একখণ্ডে আরবীয়গণ কর্ত্তৃক সিন্ধু বিজয় বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। মহম্মদ বিন্ কাশীম নামক যুবক, খলিফা ওয়ালিদের প্রধান সেনাপতি হাজ্জাজ কর্ত্তৃক ভারত বিজয়ের জন্য ৭১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রেরিত হন। উক্ত যুবক অসামান্য বীরত্বের সহিত সিন্ধু ও তৎ সন্নিহিত অনেকগুলি রাজ্য জয় করেন। সিন্ধু রাজ্যের ব্রাহ্মণ ভূপতি দাহীরও অসামান্য বীরত্বের সহিত শত্রুবধ করিতে করিতে রণক্ষেত্রে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। ঐ কছ্নামা হইতে বক্ষ্যমান প্রবন্ধ গৃহীত হইয়াছে।]

আলী আবুল হাসান হামাদানীর পুত্র মহম্মদ বলেন যে, যেদিন রাজা দাহীর যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন সেই দিনে তাঁহার অন্তঃপুর হইতে তাঁহার দুইটি অনূঢ়া কন্যা বিজেতৃগণ কর্ত্তৃক ধৃত হয়েন এবং মহম্মদ কাশীম তাহাদিগকে কয়েকজন নিগ্রো ক্রীতদাসের তত্ত্বাবধানে বাগ্দাদ নগরে পাঠাইয়া দেন। খলিফা তাহাদিগকে অন্তঃপুরের মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। এবং যতদিন তাহারা পথশ্রান্তি বশতঃ তাঁহার সম্মুখীন হইবার অনুপযুক্ত থাকে, ততদিন তাহাদিগকে যত্নের সহিত রাখিবার আদেশ প্রদান করিলেন। কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, তাহাদের বিষয় খলিফা সদ্দার মনে উদয় হইল এবং তিনি তাহাদিগকে রজনীযোগে আপনার নিকট আহ্বান করাইলেন। ওয়ালীদ আব্দুল মালীক ঐ কন্যা দুইটীর মধ্যে কোন্‌টি জ্যেষ্ঠ তাহা জানিবার জন্য দ্বিভাষীকে অনুজ্ঞা করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে জ্যেষ্ঠাকে সম্প্রতি নিজের নিকটে রাখেন এবং কনিষ্ঠাকে অপর কোন সময়ে আহ্বান করেন। দ্বিভাষী প্রথমতঃ তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। বড়টি বলিল, আমার নাম সূর্য্যদেও (সূর্য্যদেবী)। কনিষ্ঠা কহিল, আমার নাম পরমলদেও (পরিমল দেবী)। খলিফা বড়টিকে নিকটে ডাকিলেন এবং ছোটটিকে ফিরাইয়া দিয়া যত্নের সহিত রক্ষা করিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। যখন তিনি জ্যেষ্ঠাকে নিকটে বসাইলেন এবং সে তাহার মুখাবগুণ্ঠন উন্মোচন করিল, খলিফা তাহার প্রতি

দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তাহার অলৌকিক সৌন্দর্য্যে এবং রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইলেন। তাহার তীব্র অপাঙ্গ দৃষ্টিতে খলিফার হৃদয় হইতে ধৈর্য্য অন্তর্হিত হইয়া গেল। তিনি সূর্য্যদেবীর অঙ্গে হস্তার্পণ করিলেন এবং তাহাকে নিকটে আকর্ষণ করিলেন। কিন্তু সূর্য্যদেবী দণ্ডায়মান হইয়া উঠিল এবং বলিল, হে রাজন্ আপনি দীর্ঘজীবী হউন। আমি আপনার শয্যার উপযুক্তা নহি। কারণ, আপনার সৈন্যাধ্যক্ষ ইমাদুদ্দিন মহম্মদ কাশীম আমাদিগকে রাজকীয় প্রাসাদে প্রেরণের পূর্ব্বে তিনদিন নিজের নিকট রাখিয়াছিলেন। হইতে পারে এইরূপ প্রথা আপনাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু এরূপ অপমান রাজগণ কর্ত্তৃক সহ্য হওয়া উচিত নহে। খলিফা প্রণয় তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং ধৈর্য্যের বল্‌গা তাঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রোধের আতিশয্য বশতঃ তিনি ব্যাপারের যথার্থ অনুধাবন করিবার জন্য অপেক্ষা করিলেন না। তিনি কাগজ এবং কালী চাহিয়া পাঠাইলেন এবং স্বহস্তে একখানি চিঠি লিখিতে বসিলেন। চিঠি খানি মহম্মদ কাশীমের নামে লিখিত হইল, "তুমি যেখানেই থাক আপনাকে চর্ম্মপেটিকার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া সেলাই করাইয়া লইবে এবং সেই পেটিকা রাজধানীতে প্রেরণ করাইবে"। যখন মহম্মদ কাশীম এই পত্র প্রাপ্ত হন, তখন তিনি উধাফর (উদাপুর) নগরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি আপনার লোকদিগকে রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিবার জন্য আদেশ দিলেন; এবং তাহারা তাঁহাকে চর্ম্মের মধ্যে পুরিয়া সেলাই করিয়া ফেলিল; এবং সমস্তটাকে সিন্দুকে স্থাপিত করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করিল। এইরূপে মহম্মদ কাশীম তাঁহার আত্মাকে ঈশ্বরে সমর্পণ করিলেন। অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ স্ব স্ব স্থানে থাকিলেন, কিন্তু কাশীম সিন্দুকের মধ্যগত হইয়া খলিফার নিকট প্রেরিত হইলেন। যারওয়ালির পুত্র ওয়ালীদ আবদুল মালীকের অন্তঃপুর রক্ষক তাঁহার নিকট বিদিত করিলেন যে, মহম্মদ কাশীম সকিফী রাজধানীতে আনীত হইয়াছেন। খলিফা জিজ্ঞাসা করিলেন "সে মরিয়াছে না বাঁচিয়া আছে ?" উত্তর দেওয়া হইল "খলিফার জীবন, সৌভাগ্য এবং সম্মান চিরস্থায়ী হউক। যখন উধাফুরে রাজকীয় আজ্ঞা পৌছিল, মহম্মদ কাশীম তৎক্ষণাৎ বাদ্‌শাহের হুকুম অনুসারে আপনাকে কাঁচা চামড়ার মধ্যে সেলাই করিয়া লয়েন এবং দুই দিনের মধ্যেই আপনার আত্মাকে পরমেশ্বরে সমর্পণ করেন এবং অনন্তধামে চলিয়া যান। তিনি যে সকল দায়িত্ব পূর্ণ কর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহারা

তত্তৎস্থানে থাকিয়া রাজ্য রক্ষা করিতেছেন এবং খলিফার নামে খুত্‌বা (কোরাণের উপদেশ পূর্ণ প্রাত্যহিক ভজনা) পঠিত হইয়া থাকে। এবং সেই সকল কর্ম্মাধ্যক্ষ মুসলমানের প্রাধান্য রক্ষার জন্য সবিশেষ যত্নবান্ আছেন।"

খলিফা সিন্দুক খুলিয়া ফেলিলেন এবং পূর্ব্বোক্ত বালিকাদ্বয়কে নিজের সম্মুখে আসিতে বলিলেন। তাঁহার হস্তে একটি পুষ্প-কিসলয় ছিল, তিনি সেইটি মৃতের মুখের নিকট লইয়া কহিলেন, "দুহিতৃদ্বয় দেখ, আমার সুদূরাবস্থিত কর্ম্মচারিগণ পর্য্যন্ত আমার আজ্ঞা কিরূপ প্রতিপালন করে। যখন আমার আজ্ঞা কনোজে পৌঁছিল, এই ব্যক্তি ইহার অমূল্য জীবনকে আমার আজ্ঞার নিকট বলি দিল।" তখন ধর্ম্মপরায়ণা জান্‌কী (অর্থাৎ সূর্য্যদেবী) তাহার মুখ হইতে কাপড় সরাইয়া মস্তক ভূমিতলে স্থাপিত করিয়া বলিল "মহারাজের জীবন দীর্ঘ হউক এবং তাঁহার সৌভাগ্য এবং মহিমা বহুবর্ষ ব্যাপিয়া বাড়িতে থাকুক্, এবং তিনি পূর্ণজ্ঞানে বিভূষিত হউন। যাহা কিছু বাদ্‌সাহ মিত্র বা শত্রুর নিকট শোনেন, তাঁহার উচিত হয় যে, তাহা বিবেচনার নিকষ প্রস্তরের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লন; এবং কথা গুলি মনের মধ্যে উত্তমরূপে ওজন করিয়া দেখেন। এই সকল করার পরে যদি ঐ বাক্যগুলি সত্য এবং সংশয়-স্পর্শ শূন্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে, ন্যায়ের অনুমত আদেশ প্রদান করা উচিত। এইরূপ করিলে তিনি ঈশ্বরের ক্রোধভাজন হন না এবং মনুষ্য জিহ্বা কর্ত্তৃক অপবাদের বিষয় হয় না। সত্য বটে, আপনার আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে, কিন্তু আপনার বরণীয় অন্তঃকরণ বিবেচনা এবং ন্যায় বিচারে হীন বলিয়া অনুমিত হইতেছে। মহম্মদ কাশীম আমাদিগের সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল এবং আমাদিগের সহিত পুত্র অথবা ভ্রাতার ন্যায় ব্যবহার করিয়াছিল। এবং সে কখনই আপনার এই অধীনা-দ্বয়কে কামদূষিত হস্তে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু সেই ব্যক্তি হিন্দ্‌ এবং সিন্ধের অধিপতিকে বিনাশ করিয়াছে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের রাজ্য-ধ্বংস করিয়াছে, এবং আমাদিগকে রাজপদের মর্য্যাদা হইতে দাসী অবস্থায় উপনীত করিয়াছে। তজ্জন্য, বৈরনির্য্যাতন এবং এই সকল অনর্থের প্রতিহিংসা লইবার অভিপ্রায়ে, আমরা খলিফার সম্মুখে মিথ্যাকথা উচ্চারণ করিয়াছি এবং আমাদের অভিপ্রায় সংসাধিত হইয়াছে। এই কল্পিত বাক্য এবং প্রতারণা দ্বারা আমরা বৈরশুদ্ধি করিয়াছি। যদি খলিফা সহসা এরূপ ভীষণ আজ্ঞা প্রদান না করিতেন, যদি

তিনি তাঁহার বুদ্ধিকে ক্রোধের প্রাবল্যে নষ্ট করিয়া না ফেলিতেন, যদি তিনি বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যানুসন্ধান লওয়া যুক্তিসিদ্ধ মনে করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে এখন এরূপ অনুতাপ এবং তিরস্কারের পাত্র হইতে হইত না এবং যদি মহম্মদ কাশীম অন্ততঃ এতটা দূরদর্শিতা রাখিত যে পত্র প্রাপ্তি মাত্র আপনাকে বদ্ধ না করিয়া একদিনের পথ অতিক্রম করিয়া তারপর বদ্ধ করিত, তাহা হইলে, হয়ত এখন সে তদন্তের মুখে অব্যাহতি পাইতে পারিত এবং মরিত না।" খলিফা এই বিবরণে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং পশ্চাত্তাপের আতিশয্যবশতঃ কর-পৃষ্ঠ দংশন করিলেন। জানকী পুনরায় কিছু বলিবার উপক্রম করিল এবং খলিফার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সে বুঝিল যে খলিফার ক্রোধ যারপর নাই উত্তেজিত হইয়াছে। তখন সে বলিল "মহারাজ, একটি গুরুতর ভ্রান্তিজনক কার্য্য করিয়াছেন। আপনার উচিত ছিল না যে দুইটি বন্দিনীর জন্য এমন একব্যক্তির বধ-সাধন করা, যাহা কর্ত্তৃক আমাদের মত ধর্ম্মশালিনী অন্যূন এক লক্ষ কন্যা বন্দীকৃতা হইয়াছে। এবং যাহা কর্ত্তৃক হিন্দুস্থানে ও সিন্ধুদেশের অন্ততঃ সত্তর জন রাজা সিংহাসন হইতে রণক্ষেত্রে সমাহিত হইয়াছে এবং যাহা কর্ত্তৃক মন্দির সমূহ চূর্ণীকৃত হইয়া, তত্তৎ স্থানে মস্‌জীদ নির্ম্মিত হইয়াছে। যদি মহম্মদ কাশীম কোন সামান্য ত্রুটি বা অবহেলা বশতঃ অপরাধী হইয়া থাকে, তথাপি আমাদের কল্পিত কথায় তাহার প্রাণবধ করা আপনার উচিত ছিল না।" খলিফা দুই ভগিনীকেই প্রাচীরের মধ্যে গাঁথিয়া ফেলিতে হুকুম দিলেন। সেই দিন হইতে ইস্‌লামের পতাকা উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবে উড্ডীয়মান হইল এবং এখনও অগ্রসর হইতেছে।

মীর মাসুম নামক আর একজন ঐতিহাসিক মহম্মদ বিন কাশীমের মৃত্যু সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাও প্রায় উপর্য্যুক্ত বিবরণের সমান। কেবল তিনি এই টুকু লিখিয়াছেন যে, খলিফা ঐ কন্যাদ্বয়কে অশ্ব লাঙ্গুলে বদ্ধ করিয়া সমস্ত নগরময় রাজবর্ত্মের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার এবং পশ্চাৎ টাইগ্রীস নদীতে নিক্ষেপ করিবার হুকুম দেন। মীর মাসুম আরও লিখিয়াছেন যে, মহম্মদ বিন কাশীম দামাস্ক নগরে সমাহিত হন।

'ফুতুহুল বুল্‌জান' গ্রন্থের রচয়িতা আহাম্মদ বিন—ইহারা (সচরাচর বিলাজরী নামে বিখ্যাত) বগ্‌দাদের খলিফাদিগের প্রাবল্যের সময়ে তাঁহাদেরই রাজধানীতে, খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে, বাস করিতেন। তাঁহার গ্রন্থখানি সিন্ধুজয়ের নিতান্ত অধস্তন সময়ের নহে; এই জন্য বিশ্বাস্য বলিয়া সমাদৃত। উহাতে ঐ কন্যা

য়ের গন্ধ একেবারেই নাই। বিলাজুরীর মতে মহম্মদ বিন কাশীম খলিফা, ওয়ালীদের সময়ে মরেন নাই। ওয়ালীদের ভ্রাতা সুলেমানের সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়। সুলেমান মহম্মদ বিন কাশীমকে পুরস্কৃত করেন নাই, বরং পীড়নই করিয়াছিলেন, তাহার ফলে তাঁহার অকাল মৃত্যু ঘটে।

আমরা তিনখানি ইতিহাসের কিয়ৎ কিয়ৎ অংশ মাত্র উদ্ধৃত করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, ঘটনা-কাণ্ডে বাগ্‌দাদের নাম কেন আসিল? কারণ ওয়ালীদ ৭০৫ হইতে ৭১৫, খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ওমাইয় বংশীয় খলিফাদের রাজধানী দামাস্ক নগর এবং ওয়ালীদ ইহার ষষ্ঠ খলিফা। চতুর্দ্দশ খলিফা মেরোয়াঁ দ্বিতীয়ের সময়ে ৭৫০ খৃষ্টাব্দে আব্বাসীর বংশীয় আবুল আব্বাস সাফা কর্ত্তৃক ওমাইয় বংশের উচ্ছেদ সাধন হয়। আব্বাস সাফার পুত্র আবু জাফর আল্ মন্সুর, দামাস্ক এবং কুফা উভয় স্থানই নিরাপদ নহে জানিয়া, বোগদাদ নগরে ৭৬২ খৃষ্টাব্দে রাজধানী স্থাপন করেন। মহাত্মা সার উইলিয়ম মুয়র তাঁহার প্রসিদ্ধ "খলিফাদিগের ইতিহাস" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"Yet a splendid empire remained for the Abbassides. They carried their Court from Damascus where the memory of the late dynasty inconveniently survived its fall to the banks of the Euphrates. There Kufa too prove to be inflamed by alyite intrigue against the new line of Caliphs was finally abandoned as the seat of royalty. Another capital was founded by Abu Jafar second of the Abbassides at Bagdad 15 miles above Medain on the western bank of the Tigris." অতএব বুঝিতে হইবে বাগ্‌দাদ নগরে রাজধানী স্থাপিত হওয়া খলিফা ওয়ালীদের সময় হইতে অর্দ্ধশতাব্দী পরে সংঘটিত। আমরা সময় বুঝাইবার জন্য কয়েকটি প্রধান প্রধান ওমাইয় ও আব্বাসীয় খলিফার তালিকা নিম্নে দিলাম।

১।	মোয়াভীয়া	৬৬১—৬৭৯	খ্রীষ্টাব্দ
২।	ইয়েজীদ	৬৭৯—৬৮৩	"
৩।	মোয়াভীয়া দ্বিতীয়	৬৮৩—	"
৪।	মেরোয়াঁ প্রথম	৬৮৩—৬৮৪	"
৫।	আবদুল মালীক	৬৮৪—৭০৫	"
৬।	ওয়ালীদ প্রথম	৭০৫—৭১৫	"
৭।	সুলেমান	৭১৫—৭১৭	"

৮।	ওমর	৭১৭—৭২০	খ্রীষ্টাব্দ
৯।	ইয়েজীদ দ্বিতীয়	৭২০—৭২৪	„
১০।	হাসাম	৭২৪—৭৪৩	„
১১।	মেরোয়াঁ দ্বিতীয়	৭৪৪—৭৫০	„

আব্বাসীয় বংশ।

১।	আবুল আব্বাস সাফা	৭৫০—৭৫৪	খ্রীষ্টাব্দ
২।	আবু জাফর আল মনসুর	৭৫৪—৭৭৫	„
৫।	হারুন আল রশীদ	৭৮৬—৮০৯	„
৭।	আল মামুন	৮১৩—৮৩৩	„
	আলমোস্‌তাসিম	১২৫৮—	

মহাত্মা ইলিয়ট, তাঁহার অতুলনীয় গ্রন্থে অনেক সমস্যার মীমাংসা করিয়াছেন এবং অনেক অসামঞ্জস্যকে সমঞ্জসীভূত করিয়াছেন। কিন্তু ওমাইয় খলিফাদিগের সময়ে কেন বাগদাদের নাম উল্লিখিত হইল, ইহার কোনও মীমাংসাই করেন নাই। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ এই গল্প বর্ণনা কালে নিজ ইতিহাসে বোগ্‌দাদের নাম দেন নাই। তিনি দামাস্ক (ডামাস্কস্‌) নগরের উল্লেখ করিয়াছেন। এলফিনষ্টোনের অনেক পূর্ব্বে ইলিয়ট, কছ্‌নামা গ্রন্থে দামাস্কের সহিত একবার মাত্র এই বোগ্‌দাদ নাম কেন মিলাইলেন, বুঝিতে পারা যাইতেছে না। মীরমাসুম, কাশীমকে দামাস্কে কবর দিয়াছেন কিন্তু সিন্ধুরাজকন্যাদ্বয়কে টাইগ্রীসে নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। টাইগ্রীস বোগ্‌দাদের তলবাহিনী নদী দামাস্ক হইতে শতাধিক ক্রোশ দূরবর্ত্তী, মীর মাসুম যে এরূপ লিখিবেন আশ্চর্য্য নহে। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর লোক; কছ্‌নামাই তাঁহার প্রামাণ্য গ্রন্থ। এই সকল গোলমালের দরুণ কোন কোন ঐতিহাসিকের মত এই যে, গল্পটি অনৈতিহাসিক; ইলিয়ট নিজেই লিখিয়াছেন "the whole story certainly savours more of romance than of reality."

গল্পটীকে সত্য মনে করিতে গেলে, প্রথমে মনে করিতে হইবে যে, ওমাইয় বংশীয়ের রাজত্বকালে বোগ্‌দাদের অস্তিত্ব ছিল এবং ইহা রাজধানী না হউক, একটি প্রধান নগর ছিল এবং রাজারা কখন কখন এখানে আসিয়া বাস করিতেন এবং রাজকার্য্যও করিতেন। এতটা

মনে না করিলে কছ্‌নামার একথা সত্য হয় না যে, কাশীম কন্যাদ্বয়কে "বোগ্‌দাদে" খলিফার নিকট প্রেরণ করেন। ওমাইয় বংশীয় খলিফাগণ কখন বোগ্‌দাদে আসিতেন ইহার উল্লেখ অপর কোথাও নাই। তবে বোগ্‌দাদ যে পূর্ব্ব হইতেই একটী স্থান ছিল, তাহার প্রমাণ মুসলমান সম্প্রদায় একবাক্যে যাহা দেন, তাহা এই। মহম্মদের আবির্ভাবের শতবর্ষ পূর্ব্বে, পারস্যের অগ্নিউপাসক, সাসানীয় বংশীয় প্রসিদ্ধ সম্রাট নোসেরোঁয়া, তাঁহার রাজধানী মেদায়েন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিচারকার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য, উহার পনর মাইল উত্তরে বাগ্‌দাদ নামক স্থানে কখন কখন অবস্থিতি করিতেন। দাদ=ন্যায় এবং বাগ্=উদ্যান, বিচারের উদ্যান ইহাই বাগ্‌দাদ শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং এই জন্যই বাগ্‌দাদের উৎপত্তি। বহু ব্যবহারে বাগ্‌দাদ ক্রমশঃ বোগ্‌দাদ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু গীবনের ইতিহাসের পাদ টীকায় (Foot note) লেখা আছে,—যে বাগ্‌ডাড্ নামক একজন খৃষ্টান সন্ন্যাসী ঐ থানে থাকিতেন, তাহাতেই বাগ্‌ডাড্ নাম!

শ্রীমেঘনাথ ভট্টাচার্য্য।

প্রাণ সমর্পণ।

করি—সেই প্রেমময়ে—প্রাণ সমর্পণ,
বহে প্রেম-স্রোতঃ বিশ্বে, যাঁ'র করুণায়।
যাঁ'র প্রেম-নীরে জীব নিয়ত মগন,
প্রেমে বাঁধা বিশ্ব-স্বর্গে যাঁ'র মহিমায়।
জাগে জীব যাঁ'র নামে, পায় পরিত্রাণ,
হেরে—স্থির জ্ঞানে—সত্তা নাহি আপনার।
প্রাণের সুহৃদ জনে—কে হেন অজ্ঞান—
সঙ্কুচিত যেবা প্রাণ দিতে পদে তাঁ'র।
অনন্ত শান্তির পথে নিয়ত যে জন,
করেন চালিত নরে, জ্ঞানে বুঝা যায়।
জীবের জীবন যিনি নিত্য নিরঞ্জন,
ভাব চুরি তাঁ'র কাছে, এ কি দুরাশয়!
বেঁধেছেন প্রাণ মম, প্রেমে যেই জন,
করি প্রেম-বশে তাঁ'রে প্রাণ সমর্পণ।

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্যবসায় বাণিজ্য।

(২)

বঙ্গদেশের সমগ্র অন্তর্বাণিজ্য যখন কোম্পানীর ভৃত্য এবং এজেন্টগণ কর্ত্তৃক প্রত্যেক বড় জেলাতেই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, তখন তাহারা যে ভাবে শিল্প-ব্যবসায়ে ও কর্ম্মে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট হন, তাহাও তুল্যরূপ পীড়াদায়ক। এতদ্বিষয়, উইলিয়াম বোলট্ নামক জনৈক ইংরেজ বণিক, স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে তাহারই মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিলাম :—

"এক্ষণে নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, দেশের সমস্ত অন্তর্বাণিজ্য বর্ত্তমান সময়ে যে ভাবে পরিচালিত হইতেছে এবং য়ুরোপের জন্য কোম্পানী, ব্যবসায়-কার্য্যে যেরূপ বিচিত্র ভাবে নির্ব্বাহ করিতেছে, তৎসমুদয় এক নিরবচ্ছিন্ন উৎপীড়ন দৃশ্য; ইহার শোচনীয় পরিণাম দেশের প্রত্যেক তন্তুবায় এবং শিল্পীর হাড়ে হাড়ে অনুভূত হইতেছে;—প্রত্যেক উৎপন্ন দ্রব্যই একচেটিয়া হইয়া যাইতেছে। ইংরাজগণ তাহাদের মুৎসুদ্দি (Banyans) এবং কালো গোমস্তাগণের সহিত পরামর্শ করতঃ,প্রত্যেক শিল্পজীবী কি পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করিবে এবং তাহার মূল্যই বা কি পাইবে,—এতদ্বিষয় যথেচ্ছাচার ভাবে নির্দ্দিষ্ট করেন। * * * গোমস্তারা আড়ংএ উপস্থিত হইয়া, যে স্থানে বাসস্থান নির্দ্দেশ করে,তাহা 'কাছারী' নামে অভিহিত হয় ; তথায় সে নিজের পিয়ন এবং হরকরার দ্বারা দালাল, পাইকার এবং তৎসহ তন্তুবায়দিগকে তলপ দিয়া লইয়া যায়; পরে,স্বীয় প্রভুর প্রেরিত অর্থ প্রাপ্ত হইলে, তাহাদের দ্বারা একখানি খতে দস্তখত করাইয়া লয়; এই খতে-যে প্রকারের যে পরিমাণ দ্রব্য যে সময়ের মধ্যে যে মূল্যে সরবরাহ করিতে হইবে, তাহা লিখিত থাকে। অতঃপর তাহাদিগকে কিছু টাকা অগ্রিম দাদন করে। খতের লিখিত সর্ত্তানুসারে তন্তুবায়গণ কার্য্য করিতে সম্মত আছে কি না, তাহা সাধারণতঃ জানিবার প্রয়োজন হয় না ; কারণ, কোম্পানীর কার্য্য ব্যপদেশে গোমস্তারা নিযুক্ত থাকা সময়ে, নিজের ইচ্ছানুসারে যে কোন সর্ত্তে তন্তুবায়গণকে দস্তখত করাইতে পারে। কোনও দুর্ভাগ্য তন্তুবায় যদি তাহাতে অসম্মত হয় বা অগ্রিম দাদন লইতে অস্বীকার করে, তবে তাহার কোমরে দড়ি বাঁধিয়া বেত্রাঘাত করিতে করিতে, স্থানান্তরে লইয়া যাওয়া হয়। * * * এই তন্তুবায়দের অনেক গুলির নাম, কোম্পানীর

গোমস্তার রেজেষ্টারি বহিতে লেখা আছে, তাহারা অপরের নিমিত্ত কার্য্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হয় না; এবং পরবর্ত্তী গোমস্তার অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের বশবর্ত্তী থাকিয়া ক্রীতদাসের ন্যায় এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়। * * * এই বিভাগে যেরূপ শঠতা জুয়াচুরি (roguery) অনুষ্ঠিত হয় তাহা কল্পনাতেও আনা যায় না; কিন্তু সমস্তই সেই দরিদ্র তন্তুবায়গণকে ঠকাইয়া পরিসমাপ্ত হয়। কারণ, কোম্পানীর গোমস্তারা যাচেনদার (পরীক্ষক) দিগের সহযোগে দ্রব্যের যে মূল্য নির্দ্ধারণ করে, তাহা প্রকাশ্য বাজার বা হাটে স্বাধীন ভাবে বিক্রীত দর হইতে শত করা পনর টাকা এবং কখন কখনও চল্লিশ টাকা ন্যূন হইয়া থাকে। * * * কোম্পানীর এজেন্টগণ জোর করিয়া তন্তুবায়দিগের দ্বারা যে খতে দস্তখত করাইয়া লয় এবং যাহা বঙ্গদেশে মুচ্‌লকা নামে পরিচিত, তাহার সমস্ত সর্ত্ত পালন করিতে তাহারা অসমর্থ হইলে, তাহাদের জিনিষ পত্র ক্রোক করতঃ সেই স্থলেই বিক্রয় করিয়া ক্ষতি পূরণ করিয়া লওয়া হয়। নাগোদী (যাহারা কাঁচা রেশম জড়ায়) দিগের প্রতিও এইরূপ অবিচার করা হইয়া থাকে;— কয়েকটী ঘটনা জানা গিয়াছে, তাহাতে তাহাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া দেওয়ার কথা প্রকাশ।" *

কেবল শিল্প ব্যবসায় নহে, বঙ্গ দেশের কৃষিকার্য্যও এই প্রণালীর অধীনে অবনতির গর্ভে অবতরণ করে; কারণ, দেশের শিল্পীরাই আবার অনেক স্থলে কৃষক রূপে কার্য্য করিয়া থাকে।

"কারণ, রায়তগণ সাধারণতঃ জোতদার এবং শিল্পব্যবসায়ী। গোমস্তাদের মাল-সরবরাহের উৎপীড়নে বিব্রত হইয়া প্রায়শই জমীর উন্নতি সাধন করিতে অক্ষম হইত; এবং এমন কি জমীর কর দিতেও সমর্থ হইত না। পক্ষান্তরে তজ্জন্য রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক তাহারা তিরস্কৃত হইত; ইহাতে সময় সময় খাজানা পরিশোধের নিমিত্ত তাহারা নিজের সন্তান সন্ততি বিক্রয় করিতে, বা দেশত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইত।" (†)

ইহাই যথেষ্ট,—আর উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। নানা দিক হইতে— একজন ইংরেজ শাসনকর্ত্তার, কউন্সিলের একজন ইংরেজ সদস্যের এবং এক জন ইংরেজ বণিকের পত্র এবং লেখা হইতে এবং তৎসঙ্গে স্বয়ং নবাবের

* Considerations on Indian Affairs.

† Ibid.

অভিযোগ, একজন মোসলমান কালেক্টরের রিপোর্ট এবং একজন মোসলমান ঐতিহাসিকের রচনা হইতে প্রচুর উদ্ধৃত করা গিয়াছে; এই সকল রচনাতেই সেই একই শোচনীয় ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। বঙ্গবাসীদের উপর দিয়া নানারূপ অত্যাচার অবিচার বহিয়া গিয়াছে, কিন্তু এরূপ দৃঢ় বিধ্বংসি উৎপীড়ন—যাহা প্রত্যেক পল্লী-বিপনীতে এবং প্রত্যেক শিল্পীর তাঁতের গোড়ায় পর্য্যন্ত প্রসারিত, সেরূপ অত্যাচারের অধীনে তাহারা কখনও বাস করে নাই। তাহাদিগকে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের স্বেচ্ছাচারের অধীন হইতে হইলেও এমন কোনও নিয়মের অধীন হইতে হয় নাই, যদ্দ্বারা তাহাদের ব্যবসায়, পেশা এবং জীবন এত শঙ্কটাপন্ন হয়। তাহাদের শিল্প ব্যবসায় উৎস নিরুদ্ধ হয় এবং ধনাগমের পন্থা কণ্টকাকীর্ণ হইয়া পড়ে।

তৎকালে বঙ্গদেশে দুইটী ইংরেজ ছিলেন, যাঁহারা এবম্প্রকার কার্য্যের গতিরোধ করিতে সচেষ্ট হন। তাঁহাদের এক জনের নাম হেনরী ভ্যান্‌সিটার্ট এবং অপর জনের নাম ওয়ারেন হেষ্টিংস্। তাঁহারা নবাব মীরকাসিমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপোষে নিষ্পত্তি করিতে মুঙ্গেরে গমন করেন। মীরকাশিম এক জন স্বেচ্ছাচারী নরপতি হইলেও দূরদর্শী ছিলেন। তিনি নিজেকে ক্ষমতাশালী এবং স্ব-ইচ্ছা পালনক্ষম ব্যক্তি বলিয়া প্রমাণিত করিলেও ভাল করিয়া বুঝিতেন যে, কোম্পানীর বিরুদ্ধে কার্য্য করিবার তাঁহার কোন ক্ষমতাই নাই এবং তাঁহার মনে হয় যে, ভ্যান্সিটার্ট এবং হেষ্টিংসই কেবল তাঁহার বন্ধু। যে স্থানে স্বার্থ ত্যাগ করা প্রয়োজন হইল, সে স্থানে তদনুরূপ করিয়া তাঁহারা তিন জনে একটী চুক্তি করিলেন। এই চুক্তি-পত্রে নয়টী দফা লিখিত হয় *, তন্মধ্যে প্রথম তিনটী অতি প্রয়োজনীয়। তদ্‌যথা,—

১। জল পথে আমদানী রপ্তানী সমস্ত ব্যবসায়েই কোম্পানীর দস্তক মঞ্জুর করা হইবে এবং তাহা নির্ব্বিঘ্নে এবং বিনা শুল্কে যাইতে পারিবে।

২। দেশের অভ্যন্তরে এক স্থান হইতে অপর স্থানে, দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের সর্ব্ব প্রকার ব্যবসায়ে, কোম্পানীর দস্তক মঞ্জুর করা হইবে।

৩। যে সকল দ্রব্য বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট এবং যাহার তালিকা এই চুক্তি পত্রের সহিত গ্রথিত হইল, সেই সকল দ্রব্যের দর অনুসারে শুল্ক আদায় করা হইবে।

এতদপেক্ষা অধিকতর ন্যায়সঙ্গত কোন চুক্তি হইতে পারে না, তথাপি

* See Mongheer Treaty.

ইহা হইতে কলিকাতায় এক মহা ঝটিকা প্রবাহের সঞ্চার হয়। ১৭৬৩ অব্দের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে অমিয়ট, হে এবং ওয়াট্‌স্ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন —"তাঁহার (ভ্যান্সিটার্টের) প্রস্তাবিত সর্ত্ত সমূহ, আমাদের—ইংরেজদের পক্ষে অসম্মান জনক এবং সরকারী বেসরকারী সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়ের উচ্ছেদ-সাধন মুখী।" ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সাধারণ সভা আহুত হয় এবং ১লা মার্চ্চ তারিখের অধিবেশনে এতৎ বিষয়ের গভীর আলোচনান্তে ভ্যান্সিটার্ট এবং হেষ্টিংস্ ব্যতীত অপরাপর সভ্যগণ মীমাংসা করেন যে, কোম্পানীর কর্ম্মচারিবৃন্দের বিনা শুল্কে অন্তর্বাণিজ্য করিবার অধিকার আছে। কেবল নবাবের প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শন নিমিত্ত, ভ্যান্সিটার্টের স্বীকৃত সমস্ত দ্রব্যের উপর শতকরা নয় টাকা হারে শুল্ক প্রদানের পরিবর্ত্তে, একমাত্র লবণের উপর শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে শুল্ক দেওয়া যাইবে।

নিজের স্বার্থের জন্য, সংগ্রামশীল, স্বার্থপর, ব্যক্তিগণের ইহাই মীমাংসা হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ এতদ্ বিরুদ্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেন, তাহা সুচিন্তা-পরায়ণ সদ্বিচারকেরই উপযোগী। তাঁহার হেতুবাদের একটী অংশ উল্লেখ-যোগ্য এবং স্মরণীয়;—

"যেহেতু আমি পূর্ব্বে একটী ক্ষুদ্র স্থানে, দেশীয় লোকদিগের মধ্যে বাস করিয়াছি, যে সময়ে আমরা দেশের রাজার এক রকম অধম আশ্রিতের ন্যায় ছিলাম এবং রাজকর্ম্মচারী ও জমীদারগণের নিকট হইতে বিশেষ অনুগ্রহ এবং এমন কি সম্মানও প্রাপ্ত হইতাম, যেহেতু আমি অধিকতর দৃঢ়তার সহিত এই নির্দ্ধারণের যৌক্তিকতা অস্বীকার করি। এবং আরও বলি, আমাদের লোকেরা যদি আপনাকে দেশের অধিপতি এবং উৎপীড়করূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস না পাইয়া, উপযুক্ত সদ্ব্যবসায়ে আবদ্ধ থাকে এবং দেশের রাজার আইন সঙ্গত ক্ষমতা স্বীকার করিয়া চলে, তাহা হইলে তাহারা সর্ব্বত্রই আদৃত ও সম্মানিত হইবে, এবং তাহা হইলে, ইংরাজ নামও ঘৃণার পাত্র না হইয়া সর্ব্বত্র সম্মানের জিনিষ হইবে। এদেশবাসিগণ আমাদের বাণিজ্যের সুফল কর্ত্তন করিবে এবং ইংরেজদিগের ক্ষমতা, জুজুর ন্যায় দুঃস্থ অধিবাসীদিগের ভীতি উৎপাদনের যন্ত্র হওয়ার পরিবর্ত্তে, একটী মহান্ দেবাশীর্ব্বাদ এবং আশ্রয়-স্থল রূপে তাহাদের মনে হইবে।"*

" * * and the power of the English, instead of being made a bugbear to frighten the poor inhabitants into submission to injury and

কলিকাতায় ইংরেজ কউন্সিল কর্তৃক পূর্ব্বোক্ত চুক্তিসর্ত্ত অগ্রাহ্য করার কথা এবং ঐ সর্ত্তানুসারে যে রাজাজ্ঞা প্রচারিত হয় তৎ পালনে রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রতিবন্ধকতা করার কথা নবাব মীর কাশিম শুনিতে পাইলেন। ইহার প্রতিবিধান কল্পে, অতঃপর, তিনি যে মহৎ কার্য্যের অবতারণা করেন, তাহা প্রাচ্যদেশের কোনও সম্রাট বা শাসনকর্ত্তা কখনও করেন নাই। তিনি নিজের রাজস্বের মমতা ত্যাগ করিয়া অন্তর্বাণিজ্যের সমস্ত শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রজাবৃন্দ, কোম্পানির ভৃত্যদিগের ন্যায় একই নিয়মে অন্ততঃ ব্যবসাটা চালাইতে সমর্থ হয়।

বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না, তত্রাচ ইহা সত্য কথা যে, শুল্ক হ্রাসের এই সংবাদ অবগত হইয়া, কলিকাতার ইংরেজ কউন্সিলের ভ্যান্সিটার্ট এবং হেষ্টিংস্ ব্যতীত অপরাপর সভ্যগণ ইহাকে ইংরাজ জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা (breach of faith towards the English nation !) বলিয়া তীব্র প্রতিবাদ করেন! জেম্‌স্ মিল তাঁহার 'ভারত ইতিহাসে' লিখিয়াছেন, "স্বার্থের তাড়নায় সমস্ত বিচারবুদ্ধি এবং লজ্জা তিরোহিত হইয়া যায়,—ইহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগের এই উপলক্ষের কার্য্যকলাপ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়।" (the conduct of the company's servants upon this occasion, furnishes one of the most remarkable instances upon record of the power of interest to extinguish all sense of justice, and even of shame.) উইল্‌সন্ মহোদয় বলিয়াছেন,—"There can be no difference of opinion, on the procedings. The narrow sighted selfishness of Commercial cupidity had rendered all members of the council with the two honourable exceptions of Vansittart and Hastings, obstinately unaccessible to the plainest dictates of reason, justice and policy." বাণিজিক লালসায়, ক্ষুদ্র স্বার্থবশে ভ্যান্সিটার্ট এবং হেষ্টিংস্ ব্যতীত কউন্সিলের অন্যান্য সভ্যগণ সাধারণ বিবেক বুদ্ধি, বিচার-ক্ষমতা এবং কার্য্য-তৎপরতা প্রভৃতিতে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন।

প্রতিবাদকারী ভ্যান্সিটার্ট এবং হেষ্টিংস্ মহোদয় অতি প্রত্যক্ষভাবে

---

oppression, will be regarded by them as the greatest blessing and protection."—Fourth Report of the House of commons committee, 1773.

এবং যুক্তি-তর্ক-সহকারে তাঁহাদের অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—"যদিও আমাদেরই স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া স্থিরীকৃত হয় যে, সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায় বাণিজ্য আমাদের হস্তেই আবদ্ধ থাকিবে, আমরা আমাদের নিজের লোকদিগকে লবণ প্রস্তুত কার্য্যে নিযুক্ত করিব, দেশের উৎপন্ন সমস্ত জিনিষই দেশ হইতে লইয়া যাইব * * * তত্রাচ আশা করিতে পারা যায় না যে, দেশীয় বণিকদিগের ব্যবসায় নষ্ট করিবার নিমিত্ত নবাব আমাদের এই উদ্দেশ্যে যোগদান করিবেন।" এতদ্দ্বারা আমাদের আলোচ্য বিষয় পরিস্ফুট হইতেছে। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ গোপনে ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র হইবার আকাঙ্ক্ষায়, একটী উন্নত এবং সুসভ্য দেশের অধিবাসীবৃন্দের ধনাগমের পন্থা,—যাহা তাহারা ভাল এবং মন্দ উভয় প্রকার শাসনের অধীনে থাকিয়াই একাল পর্য্যন্ত উপভোগ করিয়া আসিতেছিল এবং পৃথিবীর সমুদয় সুসভ্য সম্প্রদায় অবাধে প্রস্তুত ও ক্রয় বিক্রয়ের যে স্বাধীনতা উপভোগ করে, তাহাদের সেই স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্রতা বিলোপ সাধন করিবার উদ্দেশ্যে চেষ্টিত হন। কোম্পানীর ভৃত্যগণ কেবল দুই একটী বাণিজ্য দ্রব্যের একচেটিয়া অধিকার লাভের নিমিত্ত ইচ্ছুক হন না, পরন্তু সমস্ত পণ্য দ্রব্য-বিষয়ে দেশীয় বণিকদিগের ব্যবসায় বাণিজ্যের ও নিজেদের ব্যবসায় বাণিজ্যের মধ্যে একটী স্বাতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং তদ্দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজের একটী অতি সাধারণ অধিকার হইতে বঙ্গবাসীদিগকে বিচ্যুত করিতে প্রয়াস পান। একটী বৃহৎ এবং অসংখ্য অধিবাস' পূরিত প্রদেশের সমগ্র ব্যবসায় বাণিজ্য স্বহস্তে লইবার অভিপ্রায়ে, বিদেশীয় বণিকগণকে তরবারির সাহায্যে এরূপ গুরুতর দাবী দাওয়া করিতে ইতিহাসে সম্ভবতঃ আর একটীও উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায় না।

নবাব মীর কাশিমের শাসন সময়ে হেন্‌রী ভ্যানসিটার্ট ১৭৬০ হইতে ১৭৬৫ অব্দ পর্য্যন্ত, কলিকাতার শাসনকর্ত্তা পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ শাসনকাল সম্বন্ধে তাঁহার অভিমতের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ :—

"নবাব মীরকাশিম, কোম্পানীর দেনা এবং সৈন্য বিভাগের বিপুল বকেয়া বাকী পরিশোধ করেন, নিজ দরবারের ব্যয় বাহুল্য—যাহাতে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের সমস্ত রাজস্বই একরূপ নিঃশেষিত হইত, তাহা প্রচুর পরিমাণে হ্রাস হয়, এবং জমীদারদিগের ক্ষমতা খর্ব্ব করতঃ রাজ্যের মধ্যে

নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। এই জমীদারগণই সদা সর্ব্বদা দেশের মধ্যে অশান্তি ও উপদ্রব উৎপাদন করিতেন। এই সকল ব্যবস্থা দেখিয়া আমি সন্তুষ্টই হইয়াছি; কারণ, আমার ধারণা, নবাব আমাদের সাহায্য যত কম প্রার্থনা করিবেন, ততই কোম্পানীর ব্যয়-ভার লাঘব হইবে এবং ততই তাহারা নিজের অধিকৃত স্থানের উন্নতির দিকে অধিক মনোযোগ দিতে সমর্থ হইবে। অপিচ, কোনও সাধারণ শত্রুর বিপক্ষে আমরা তাঁহার প্রতি একজন বিশ্বাসী এবং কার্য্যনিপুণ বন্ধু বলিয়া নির্ভর করিতে পারিব। আমার প্রতীতি হয় যে, আমরা নবাবের অধিকার উল্লঙ্ঘন বা তাঁহার শাসন-কার্য্যে প্রতিবন্ধকতা না করিলে, তিনি কখনই ইচ্ছা করিয়া আমাদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইবেন না। প্রকৃতপক্ষে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য, তিনি এতই সতর্কতাবলম্বন করেন যে, আমাদের হস্তে অর্পিত প্রদেশে কোনও লোক পাঠান বা আমাদের ব্যবসায়ের কোনও দ্রব্য বিনাশ সাধন করিবার একটী উদাহরণও পাওয়া যায় না। আমাদের গোমস্তাগণের অন্যায় অপহরণ এবং আমাদের গোপন ব্যবসায়ের নূতন অধিকার প্রাপ্তির দাবী দাওয়া করার নিমিত্ত তিনি যে প্রতিবাদ ও আপত্তি উত্থাপন করেন, সেই সময় পর্য্যন্ত, এবং এমন কি আমাদের কলহের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া যখন সমর বিঘোষিত হয়, তৎকালেও প্রত্যেক স্থানে নিরুপদ্রবে কোম্পানীর ব্যবসায় বাণিজ্য পূর্ব্ববৎ চলিতেছিল। কেবল মিঃ ইলিস্ কর্ত্তৃক সোরার ব্যবসা বিষয়ে একটী কি দুইটী অতিরঞ্জিত অভিযোগ উত্থিত হয়। এই নবাবের বিরুদ্ধে যে সকল ভদ্র মহোদয় দলবদ্ধ হন, তাঁহাদের চরিত্র কি বিচিত্র! তাঁহার মসনদে উপবেশনের দিন হইতে কদাচিত এমন একটী দিন অতিবাহিত হইয়াছে, যে দিন অতি তুচ্ছ কাল্পনিক ঘটনা হইতে তাঁহার শাসনক্ষমতা পদদলিত, তাঁহার কর্ম্মচারিগণকে ধৃত এবং কটুবাক্য প্রয়োগ ও ভীতি প্রদর্শন দ্বারা অপমানিত করা হয় নাই। এই সকল ঘটনার উদাহরণ দিতে আমি ইচ্ছা করি না, তবে এই আখ্যায়িকার প্রতি পত্রেই তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।" *

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে মীরকাশিমের সহিত কোম্পানীর যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহা ক্ষণকালের নিমিত্ত বিস্মৃত হওয়া যায় না। কিন্তু, কোম্পানীর সামরিক অভিযানাদির উল্লেখ বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য না হওয়ায়, তৎসমুদয়ের বর্ণনা

* Narrative, Vol. III. P. 381.

হইতে ক্ষান্ত থাকিলাম। উক্ত যুদ্ধ ব্যাপার, মীরকাশিম যেরূপ দক্ষতার সহিত পরিচালন করেন, দেশীয় কোনও নরপতি বা সেনানী বঙ্গদেশে তাহা হইতে অধিকতর সুন্দররূপে সমর-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। তত্রাচ, তিনি ঘেরিয়াতে এবং পরে উদয়নালায়, ইংরেজ-সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হন। নবাব রাগ বশতঃ, পাটনা দুর্গে রক্ষিত ইংরেজ বন্দীদিগকে হত্যা করিতে অনুজ্ঞা প্রচার করেন এবং তৎপর চিরদিনের তরে রাজ্যপাট ত্যাগ করিয়া প্রস্থিত হন। ১৭৬০ অব্দে যাহাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া মীরকাশিম নবাবী সনন্দ প্রাপ্ত হন, সেই বৃদ্ধ মীরজাফর পুনরায় নবাব হন। কিন্তু অনতিবিলম্বে তিনি মৃত্যু-মুখে পতিত হওয়ায় তাঁহার জারজ পুত্র নাজিম-উদ্দৌলাকে তাড়াতাড়ি ১৭৬৫ অব্দে নবাবী সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

প্রত্যেক বারই যখন নূতন নবাবকে মস্‌নদে খাড়া করা হয়, তখন প্রাচ্যের চির-প্রখ্যাত কল্পবৃক্ষকে একবার করিয়া নাড়া দিবার সুযোগ ঘটে। ১৭৫৭ অব্দে পলাসীযুদ্ধের অবসানে মীরজাফর যখন প্রথম নবাব হন, তখন ইংরেজ কর্ম্মচারী ও সৈনিকবৃন্দের ১,২৩৮,৫৭৫ পাউণ্ড লাভ হয়, তন্মধ্যে একা ক্লাইভই নগদ ৩১,৫০০ পাউণ্ড এবং বঙ্গদেশে একটী বৃহৎ জায়গীর প্রাপ্ত হন। ১৭৬০ অব্দে মীরকাশিম নবাব হইলে ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগের লাভের পরিমাণ ২০০, ২৬৯ পাউণ্ড নির্দ্ধারিত হয়, এতন্মধ্যে ভ্যান্সিটার্ট ৫৮,৩৩৩ পাউণ্ড গ্রহণ করেন। ১৭৬৩ অব্দে মীরজাফর যখন দ্বিতীয় বার নবাবী মস্‌নদে আরোহণ করেন, তখন ৫০০, ১৬৫ পাউণ্ড মুদ্রা উপহার প্রদত্ত হয়। এবং অবশেষে নাজিম-উদ্দৌলা ১৭৬৫ অব্দে নবাব হইলে আরও ২৩০, ৩৫৬ পাউণ্ড মুদ্রা উপহার প্রদান করিতে হয়। আট বৎসরের উপহার প্রদত্ত এই ২,১৬৯,৬৬৫ পাউণ্ড মুদ্রা ব্যতীত আরও ৩,৭৭০,৮৩৩ পাউণ্ড দাবী করা এবং পরে আদায় করা হয়। *

হাউস্ অব্ কমন্‌স্ কমিটীর নিকট এই টাকা দেওয়ার বিষয় বা গ্রহণ করার বিষয় প্রমাণিত হয়। ঐ কমিটী ১৭৭২-৭৩ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবস্থা বিষয়ে অনুসন্ধান করে। ক্লাইভ নিজেই নিজের কার্য্য সমর্থন করেন। ক্লাইভ বলেন,—"আমি কখনও ইহা গোপন করিতে চেষ্টা করি নাই, ইণ্ডিয়া ডাইরেক্টর দিগের গুপ্ত কমিটীর(Secret Committee)নিকট পত্রে এ বিষয় প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিয়াছিল, নবাবের সদাশয়তায় আমি সহজে ভাগ্যলক্ষ্মীর সন্ধান পাইয়াছি এবং

* House of Commons Committee's Third Report.

এক্ষণে আমার ভারতবর্ষে অবস্থান করার একমাত্র উদ্দেশ্য—কোম্পানীর উন্নতি সাধন করা। * * *" অতঃপর তিনি নিজের কৃতকার্য্যের বড়াই করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের ভাষাতেই শ্রবণ করুন,—"What pretence could the company have to expect, that I, after having risked my life so often in their service, should deny myself the only opportunity ever offered of acquiring a fortune without prejudice to them, who it is evident would not have had more for my having had less." * ক্লাইভের মনে কখনই স্থান পায় নাই যে, ঐ অর্থ কোম্পানীরও নহে বা তাঁহার নিজেরও নহে, পরন্তু দেশের সাধারণ সম্পত্তি, এবং তাহা দেশের অধিবাসীদিগের হিত-কল্পেই ব্যয়িত হইত।

এস্থলে বলিতে হইবে যে, উপহারের নাম করিয়া যে টাকা জোর জবরদস্তিতে আদায় হইত তাহার সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোনই সংস্রব ছিল না; বরং,কোম্পানী তজ্জন্য এবং তাহার কর্ম্মচারিগণের দ্বারা বঙ্গদেশে যে অন্তর্বাণিজ্য চালিত হইত, তাহার বিরুদ্ধে তীব্র অভিমত প্রকাশ করে। ১৭৬৫ অব্দে কোম্পানী উপহার গ্রহণের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করে এবং ইতঃপূর্ব্বে নিষিদ্ধ কোম্পানীর ভৃত্যগণের অন্তর্বাণিজ্যের গতিরোধের নিমিত্ত আর একবার ক্লাই-ভকে প্রেরণ করে। যথা সময়ে কোম্পানীর আদেশ-লিপি বঙ্গদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়; শীঘ্রই একরারনামায় কোম্পানীর কর্ম্মচারীদিগকে দস্তখত করিয়া পাঠাইতে হইবে। কাজেই আর সময় নষ্ট করা যায় না দেখিয়া, কলিকাতা কউন্সিলের সভ্যবৃন্দ তাড়াতাড়ি নাজিম-উদ্দৌলাকে মস্‌নদে স্থাপিত করিয়া উপহারের শেষ কমলটী কাটিয়া লইলেন। †

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল।

---

* House of Commons Committee's First Report, 1772, p. 148.

† R. C. Dutt's Indian Trade.

রাজকন্যা ও শৃগালের কথা।



আত্মচ্ছিদ্রং ন জানাসি পরচ্ছিদ্রানুসারিণী।
জারস্যার্থে পতিং হত্বা জলে তিষ্ঠসি নগ্নিকা॥

ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন একটী জনপদের রাজকন্যা ইন্দুমালা অসামান্যা রূপবতী ছিলেন। তিনি উপযুক্তরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে যশস্বিনী হইয়াছিলেন। কিন্তু, যৌবনসুলভ ইন্দ্রিয়-চাপল্যে, রমণীর সর্ব্ব প্রধান সতীধর্ম্ম-সংরক্ষণে সমর্থা হন নাই। উপযুক্ত সময়ে বিবাহিতা হইলেও, এই বিষম দোষ-পরিহারে সমর্থা হন নাই। একান্ত রূপ-মুগ্ধা হইয়া, রাজকন্যা ইন্দুমালা, তদ্দেশীয় রাজ কোটালের চরণ প্রান্তে আপনার যৌবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, এবং সেই কোটালের প্রতি এতদূর অনুরাগিণী হইয়াছিলেন যে, কোটালকে এক দিন মাত্রও দর্শন করিতে না পাইলে, একেবারে বিচলিতা হইয়া পড়িতেন। পূজার ভান করিয়া, এই চতুরা রমণী, প্রত্যহ মধ্য-রাত্রে, রাজোদ্যান-মধ্যস্থিত দেবাদিদেব এক লিঙ্গের মন্দির মধ্যে প্রবেশ করতঃ, কোটালের সহিত সুখ-বিহার করিতেন। রাজান্তঃপুরের জনৈকা প্রৌঢ়া পরিচারিকা ব্যতীত অপর কেহই এ গূঢ় রহস্যের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত ছিল না। অর্থ-বশীভূতা দাসী, রাজকুমারীর কলঙ্ক-কাহিনী কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না। রাজকন্যা-প্রদত্ত অর্থই তাহাকে মুগ্ধা করিয়াছিল। বড় ঘরের কুৎসার কথা জানিতে পারিলেও, কেহই তাহা সহসা প্রকাশ করিতে সাহস করে না। রাজকন্যা ইন্দুমতী প্রত্যহ নিশাযোগে শিবমন্দির মধ্যে প্রবেশ করতঃ, কোটালের সহিত, পরমানন্দে বিহার করেন। এক দিবস রাজকন্যার পতির শুভাগমন হইলে, কন্যা যৎপরোনাস্তি চিন্তিতা হইলেন, এবং কিরূপে এই বিপদ হইতে উত্তীর্ণা হইবেন তাহার উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বুদ্ধিমতী ও কুচরিত্রা নারীর ছল-বল-কৌশলের অসদ্ভাব থাকে না। কোন রূপ ছল করিয়া, আপন পতিকে ভুলাইয়া রাখিলেন। পতি নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রিত হইলে পর, রাজকন্যা কোটালের উদ্দেশে মন্দিরে গমন করিলেন। কিন্তু, অদ্য শিবমন্দিরে গমন করিতে অপেক্ষাকৃত বিলম্ব হওয়ায়, রাজকোটাল ইন্দুমতীর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া

তাঁহাকে নানা প্রকার ভৎর্সনা করিতে লাগিল। রাজকন্যা বিনয়-নম্র বচনে, অতীব বিনীত ভাবে, কোটালের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিল, "আমার দোষ মার্জ্জনা কর, অদ্য আমার পতি এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাকে নিদ্রিত না করিয়া আমি কিরূপে এখানে আসিব? অতএব আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক বিলম্ব করি নাই। আমি তোমাকেই আমার জীবন যৌবন সমর্পণ করিয়াছি; অতএব তুমি ক্ষমা না করিলে এ দাসীর আর গতি নাই।" এই বলিয়া রাজকুমারী কোটালের পদতলে লুণ্ঠিতা হইল। তখন কোটাল কহিল—"তুমি যদি যথার্থই আমাকে ভাল বাসিয়া থাক এবং প্রকৃতপক্ষে আমাতেই আত্মসমর্পণ করিয়া থাক, তাহা হইলে আমার সুখের নিমিত্ত, আমার শত্রু বিনাশ কর; আমার সুখের পথ নিষ্কণ্টক কর। যাও, তুমি এখনই গৃহে ফিরিয়া যাও, এবং অবিলম্বে তোমার নিদ্রিত পতির মস্তকচ্ছেদ করিয়া এস্থানে আনয়ন কর। যদ্যপি তুমি এ কার্য্যে অসমর্থা হও, তাহা হইলে, আর আমি কদাচ তোমার মুখ-দর্শন করিব না। যদি আমাকে পাইতে বাসনা কর, তাহা হইলে আমার কথা শুন; যাও, এই মুহূর্ত্তেই এখান হইতে চলিয়া যাও। তোমার নিদ্রিত পতির মস্তক স্বহস্তে ছেদন করিয়া আমার নিকট আনয়ন কর।"

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ সরলা ও কোমলা। কিন্তু ভ্রষ্টা রমণীদিগের প্রকৃতি তদ্বিপরীত হইয়া থাকে। তাহারা করিতে না পারে, এরূপ কার্য্য জগতে নাই। ভ্রষ্টা রমণীগণ আপন প্রাণাধিক পুত্রেরও প্রাণ বিনাশে কাতর হয় না। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ তাহারা সকল প্রকার দুষ্কর্ম্মই অনায়াসে করিতে পারে। ভ্রষ্টা রমণী, রাক্ষসী বা পিশাচীর স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই তাহাদের মনে স্থান প্রাপ্ত হয় না। এই রাজকুমারীও, তাহার উপপতির মনস্তুষ্টির নিমিত্ত, এই ভীষণ ব্যাপারে সম্মতা হইল, এবং গৃহে প্রতিগমন পূর্ব্বক নিরপরাধ নিদ্রিত পতিকে স্বহস্তে নিহত করণান্তর, তাহার মস্তকটী উপপতির নিকট আনিয়া সংস্থাপিত করিল। রাজকুমারীর ঈদৃশ ভীষণ কার্য্য পরিদৃষ্টে, কোটাল সভয় চিত্তে মনে ভাবিল "উঃ! কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!! ভ্রষ্টা নারীর অসাধ্য কর্ম্ম জগতে নাই।" কোটালের হৃদয় কাঁপিল, ভয়ের উদ্রেক হইল। প্রকাশ্যে কহিল—"রাজকুমারি! এ দেশে, আর তিলার্দ্ধ অবস্থান করাও যুক্তিযুক্ত নহে। তাহা হইলে আমরা উভয়েই রাজ-কোপে পতিত হইয়া, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইব। চল, এই দণ্ডেই, আমরা

উভয়েই, এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া অপর দেশে গিয়া প্রাণ রক্ষা করি। রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই আমরা কোনও দূর দেশে উপনীত হইতে পারিব। এবং তথায় নিশ্চিন্ত মনে কাল হরণ করিতে পারিব।” এইরূপ যুক্তি করিয়া, উভয়েই স্বদেশ পরিত্যাগ করিল। রজনীর অবসান না হইতেই, তাহারা বহু দূর অতিক্রম করিলে পর, তাহাদিগের সম্মুখ ভাগে একটী ক্ষুদ্রা নদী পরিদৃষ্ট হইল। তদ্দর্শনে কোটাল কহিল “অয়ি রাজকুমারি! অগ্রে তোমার হীরকাদি খচিত বহুমূল্যের অলঙ্কারাদি নদীর অপর পারে লইয়া গিয়া রাখিয়া আসি, পরে তোমাকে স্কন্ধে করিয়া নদী পার হইব। তুমি ক্ষণকালের নিমিত্ত এই স্থানে অপেক্ষা কর।” এই বলিয়া সেই সুচতুর কোটাল, রাজকন্যাকে বিবস্ত্রা করতঃ, তাহার বহু মূল্যের বসন খানি ও মহা-মূল্যের অলঙ্কাররাশি পোট্টলী করিয়া নদী পার হইয়া গেল। তখনও রাত্রি-প্রভাত হইতে অতি অল্প ক্ষণ বাকি ছিল। রাজকন্যা নাভিমগ্ন জলে অবতরণ পূর্ব্বক দণ্ডায়মানা রহিলেন। কোটাল বহু কষ্টে নদীর পর পারে উপনীত হইয়া, তথা হইতে উচ্চকণ্ঠে রাজকুমারীকে সম্বোধন করিয়া কহিল “রাজ-কুমারি! তুমি যখন উপপতির তৃপ্তি সাধনার্থ স্বীয় পতিকে স্বহস্তে বিনাশ করিতে পারিয়াছ, তখন তোমার অসাধ্য কার্য্য জগতে নাই। আবশ্যক হইলে, তুমি সকল কর্ম্মই সমাধা করিতে পার। তোমাকে আমার প্রয়োজন নাই। তুমি যথায় ইচ্ছা গমন করিতে পার। তোমার সহিত আমার এই শেষ সাক্ষাৎ; আমি চলিলাম।” রাজকুমারীকে নানা প্রকার ভৎ‍র্সনা করতঃ কোটাল অন্যত্র চলিয়া গেলে, নিশাবসান হইল দেখিয়া, রাজকুমারীর বিষাদের সীমা রহিল না। তাহার মস্তক ঘুরিয়া গেল। চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতে লাগিলেন। শোক-দুঃখে তাঁহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আত্মকৃত দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত যেন প্রাণটি তাঁহার দেহ হইতে বহির্গত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। রাজকুমারী নতমুখী হইয়া বক্ষঃমগ্ন জলে গিয়া দাঁড়াইলেন। ইত্যবসারে একটী শৃগাল, একখণ্ড মাংস মুখে করিয়া, যেমন সেই নদী-তীরে আসিল, অমনি সে দেখিতে পাইল যে, একটী ক্ষুদ্র মৎস্য নদী-জলে ভাসিয়া যাইতেছে। সেই ভাসমান মৎস্য দর্শনে লুব্ধ হইয়া, শৃগাল নিজ মুখস্থিত মাংস খণ্ড খানি, তীরে রাখিয়া, সন্তরণ পূর্ব্বক যেমন মৎস্যের নিকট উপস্থিত হইল, তৎক্ষণাৎ সেই ভাসমান মৎস্যটী জল-মধ্যে নিমগ্ন হইল, আর তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। এমন

সময়ে একটী নকুল আসিয়া, শৃগাল-রক্ষিত নদী-তীর-স্থিত সেই মাংসখণ্ড গ্রহণ করতঃ, তথা হইতে শীঘ্র প্রস্থান করিল। লুব্ধ শৃগালের উভয় দিকেই ক্ষতি হইল দেখিয়া, নদী-গর্ভস্থিতা বক্ষঃমগ্না জলে দণ্ডায়মানা নগ্না রাজকন্যা ইন্দুমালা শৃগালকে ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "ওহে শৃগাল! তুমি এরূপ লোভ-পরায়ণ কেন? নিজ করতল গত ধন (মাংসখণ্ড) অন্যত্র রাখিয়া লোভ-পরবশে যেমন তুমি অনিশ্চিতের আশায় গিয়াছিলে, তেমনই তোমার এদিক ওদিক, দুই দিকই নষ্ট হইল। লোভীর অদৃষ্টে এই রূপই ঘটিয়া থাকে।" রাজকন্যা ইন্দুমালার ব্যঙ্গ বাক্যে দুঃখিত হইয়া শৃগাল উপরোক্ত শ্লোকটী রাজকন্যাকে কহিয়াছিল। শ্লোকটী অতি উপাদেয় ও উপদেশপূর্ণ। উহার ভাবার্থ এই, "হে রাজকন্যা! তুমি আত্মছিদ্র দেখিতেছ না, কিন্তু অন্যের ছিদ্র অন্বেষণ করিতেছ। তুমি, তোমার উপপতির নিমিত্ত, পতিকে বিনাশ করিয়া, এক্ষণে উলঙ্গিনী অবস্থায় জল-মধ্যে অবস্থিতি করিতেছ। তুমি রাজকন্যা, তোমাকে শত ধিক! অগ্রে নিজের ছিদ্র না দেখিয়া পরের ছিদ্রানুসন্ধান করা কদাচ উচিত নহে।"

এই বলিয়া শৃগাল প্রস্থান করিল। রাজকন্যা তদবস্থায় রহিলেন।

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

রত্নমালা।

(৭৯)

বরং গহনদুর্গেষু ভ্রান্তং বনচরৈঃ সহ।
ন মূর্খজনসংসর্গঃ সুরেন্দ্রভবনেষ্বপি॥

ভাবার্থ—বরম্ গহন দুর্গে, ল'য়ে বনচরবর্গে,
বিচরণ শ্রেয়স্কর হয়।
তথাপি সুরেন্দ্রালয়ে, জ্ঞানহীন মূর্খে ল'য়ে
বাস করা যুক্তিকর নয়॥

(৮০)

কবিতা বনিতা চৈব সুখদা স্বয়মাগতা।
বলাদাকৃষ্যমাণা চেৎ সরসা বিরসায়তে॥

ভাবার্থ—কবিতা বনিতা দোঁহে, সমাগতা হইলে স্বয়ম্,
অতি সুখ প্রদায়িনী উভয়েই হয়।

প্রয়োগ করিয়া বল, আনয়ন করিলে দু'টীরে,
না রহে সরসা, হয় বিরসা নিশ্চয় ॥

(৮১)

যস্য প্রসাদে পদ্মাস্তে বিজয়শ্চ পরাক্রমে।
মৃত্যুশ্চ বসতি ক্রোধে সর্ব্বতেজোময়ো হি সঃ ॥

ভাবার্থ—সম্পদ—প্রসাদে যা'র, আর পরাক্রমে হয় জয়।
মৃত্যু ঘটে রোষে যা'র, সেই জন সর্ব্বতেজোময় ॥

(৮২)

পরোক্ষে কার্য্যহন্তারং প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
বর্জ্জয়েত্তাদৃশং মিত্রং বিষকুম্ভং পয়োমুখম্ ॥

ভাবার্থ—অসাক্ষাতে কার্য্য-হানী করে যেই জন,
প্রত্যক্ষে কহিয়া থাকে সুপ্রিয় বচন;
বিষকুম্ভ পয়োমুখ তাদৃশ দুর্জ্জন
মিত্রজনে অবশ্যই করিবে বর্জ্জন।

(৮৩)

গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণোগুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বত্রাভ্যাগতোগুরুঃ ॥

ভাবার্থ—অগ্নি ব্রাহ্মণের গুরু; দ্বিজ গুরু সকল বর্ণের।
পতি নারীজাতি-গুরু; অভ্যাগত গুরু সকলের ॥

(৮৪)

ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্ব্বান্ পুরুষার্থান্ সমশ্নুতে ॥

ভাবার্থ—গৃহ, গৃহ বলি' পরিগণিত না হয়।
গৃহিণীকে বস্তুতঃই লোকে 'গৃহ' কয় ॥
পুরুষ, গৃহিণী-সহ হ'য়ে সমন্বিত।
সর্ব্ব পুরুষার্থ ভোগ করয়ে নিয়ত ॥

(৮৫)

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রস্তু স্থবিরেকালে স্ত্রিয়ো নাস্তি স্বতন্ত্রতা॥

ভাবার্থ—স্ত্রী জাতির স্বাধীনতা কোন কালে নাই।
বাল্যকালে পিতা,
যুবাকালে ভর্ত্তা,
বৃদ্ধ কালে পুত্র রক্ষা করয়ে সদাই॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ

গঙ্গারাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রুদ্রনারায়ণ রায় প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল, কোষে অর্থ ছিল। তাঁহার শক্তি ছিল, সৈন্য ছিল, অস্ত্র শস্ত্র, কামান বন্দুক ছিল। তখন ইংরাজ রাজত্বের আবির্ভাব কাল মাত্র। সুতরাং তখনও অনেক জমিদারই ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। রুদ্রনারায়ণও তাঁহাদের মধ্যে একজন। এজন্য ইংরাজের সহিত তাঁহার মধ্যে মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল; নবাবের সৈন্য সহায়ে ইংরাজ তাঁহাকে বশীভূত করিবার জন্য দুই একবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা সফল হয় নাই। রুদ্রনারায়ণ, নবাবকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিতেন, নিয়মিত রাজকর পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করিতেন না; অধিকন্তু আপনার জমিদারীর মধ্যে ইংরাজ বণিকগণের অবাধ বাণিজ্যেও বাধা দিতেন। এজন্য কলিকাতার সভা হইতে তাঁহাকে দমনের নিমিত্ত বিশেষরূপ আয়োজন হইতেছিল। রুদ্রনারায়ণও নিশ্চিন্ত ছিলেন না।

রুদ্রনারায়ণের আকৃতি দীর্ঘ, গঠন বলিষ্ঠ, দেহ মাংসল। দেখিতে সুপুরুষ না হইলেও একবারে কুৎসিৎ দর্শন নহেন। বয়ঃক্রম দ্বাত্রিংশদ্বর্ষ। তাঁহার স্ত্রীর নাম নবদুর্গা। নবদুর্গার সহিত আমাদিগের এ আখ্যায়িকার কোন সম্বন্ধ নাই।

রুদ্রনারায়ণের বাড়ী গড়বন্দী। গড়ের পূর্ব্ব ও উত্তর দিকে কংসাবতীর একটী শাখা প্রবাহিত। অন্য দুই দিকে গভীর খাদ। খাদের মুখ নদীর

সহিত সংযুক্ত। গড়ের দক্ষিণ ভাগে খাদের উপর এক প্রকাণ্ড কাষ্ঠময় সেতু ছিল। তাহাই গড় হইতে বাহিরে যাইবার ও বাহির হইতে ভিতরে আসিবার একমাত্র পথ। সেতুর মুখে সর্ব্বদা প্রহরী থাকিত। তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা প্রায় দুই হাজার ছিল। সৈন্যেরা গড়ের ভিতরে থাকিত না। বাহিরে থাকিয়া চাষ বাস করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। তাহারা বেতনের পরিবর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট ভূমি ভোগ করিত। যুদ্ধ সম্ভাবনায় রুদ্রনারায়ণ সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছিলেন।

মধ্যাহ্নকালে বাহিরের এক নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়া রুদ্রনারায়ণ ধূমপান করিতেছিলেন, আর অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে কল্পনায় একখানা সৌন্দর্য্য-পূর্ণ ছবি প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছিলেন। এমন সময় কক্ষের দ্বার দেশে দাঁড়াইয়া জনৈক বৈষ্ণবী খঞ্জনীতে আঘাত করিয়া মৃদু মধুর স্বরে গাহিল,—

শ্যাম সোহাগিনী রাই বিনোদিনী কাহে গরবিনী রে।

নয়ন উন্মীলন করিয়া রুদ্রনারায়ণ ডাকিলেন—"মঞ্জরি!"

বৈষ্ণবী হেলিতে দুলিতে গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহে গিয়া, মধুর হাস্যের সহিত একটা মৃদু কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মধুর কণ্ঠে গাহিল,—

তুয়া পদ'পরি লুঠত মুরারি কাহে উদাসিনী রে।

রুদ্রনারায়ণ বলিলেন,—"গান রাখ, কি হ'ল বল।"

বৈষ্ণবী বলিল,—"কিছুই না।" রুদ্র। কিছুই না?

বৈ। কিছুই না। রুদ্র। গিয়েছিলে? বৈ। গিয়েছিলাম।

রুদ্র। তার পর? বৈ। তার পর আর কি?

বলিয়া বৈষ্ণবী আবার গান ধরিল,—

কাহে লো মানিনী হেন গরবিনী না পুছহি শ্যামধনে রে।
আপনা খাইয়া সরম লাগিয়া রতন ঠেলত চরণে রে।

রুদ্র। তুমি যাও নাই। বৈ। তবে তাই।

রুদ্র। তুমি মিথ্যাবাদিনী। বৈ। হুজুর মালিক, শাস্তি দিন।

রু। রহস্য রাখ মঞ্জরি, কি ক'রে এলে বল।

মঞ্জরী একটু হাসিয়া বলিল,—"বড় উঁচু ডালের ফুল।"

রুদ্রনারায়ণ বলিলেন,—"কিন্তু এ ফুল পাড়্‌তেই হবে।"

মঞ্জরী বলিল,—"চেষ্টা করে দেখ্‌বো। তবে ভয় হয়, পাছে হাত পা ভাঙ্গে।"

মঞ্জরী খঞ্জনী বাজাইয়া গাহিল,—

উঁচু ডালে ফুটে ছিল সোণার চাঁপা ফুল,—
গো সখি সোণার চাঁপা ফুল।
হাত বাড়িয়ে তুল্‌তে গেলাম ফুট্‌লো মাছির হুল।

রুদ্রনারায়ণ উঠিয়া বসিলেন,—একটু কর্কশ স্বরে বলিলেন,—"সকল কথাতেই তোমার রহস্য। আগে কাজের কথা বল।"

ঈষৎ হাসিয়া মঞ্জরী বলিল,—"কাজের কথাতো বলেছি, চেষ্টা দেখ্‌বো।"

রু। তবে এখনও দেখ নাই?

ম। এক আধটু দেখেছি। কিন্তু আমার একটা কথা শুন্‌বেন?

রু। কি বল। ম। তার আশা ছেড়ে দিন!

রু। তা' পারবো না। ম। কেন?

রু। এমন যে আর কখনও দেখি নাই। ম। এত সুন্দর?

রু। বড় সুন্দর। ম। আমার চেয়েও? রু। তুমি মর।

ম। সেটা কি এখনও বাকী আছে?

রু। মঞ্জরী, এই আমার প্রথম ও শেষ আশা। এ আশা তোমায় পূর্ণ করতে হবে।

ম। মঞ্জরী বৈষ্ণবী ছাড়া আর কি লোক পেলেন না?

রুদ্রনারায়ণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "যে কথা ভাবতে গেলেও বুক কেঁপে উঠে, সে কথা কি অপরের কাছে সাহস করে বলা যায়?"

ম। তবে আমার কাছে কেমন করে বল্‌লেন?

রু। তুমি—তোমা ছাড়া আমার প্রাণের ব্যথা আর যে কেউ বুঝবে না মঞ্জরি?

মঞ্জরীর বুকটা একটু কাঁপিয়া উঠিল। প্রকাশ্যে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আজ তো নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমান, তার পর যা হয় হ'বে।"

রু। কাল আস্‌বে?

ম। যদি কিছু করতে পারি।

মঞ্জরী বাহিরে আসিল। তখন সে খঞ্জনীতে মৃদু আঘাত করিয়া মৃদুমধুর কণ্ঠে গাহিতে গাহিতে চলিল,—

কি রূপ পেখনু সই যমুনাকূলে।
যমুনাকূলে——কদম্ব মূলে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাধানাথ ডাকিলেন,—"শ্যামা!" শ্যামা তাঁহার সম্মুখে গিয়া বলিল,—'কি?'

রাধা। সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

শ্যা। সর্ব্বনাশ?

রা। হাঁ সর্ব্বনাশ। বোধ হয় আমাকে দেশত্যাগ কর'তে হ'বে।

শ্যা। কেন?

রাধানাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—"তোমার উপর জমিদার বাবুর নজর পড়েছে।"

শ্যামা শিহরিয়া উঠিল; বলিল,—"কে বলিল?"

রাধানাথ বলিলেন,—"আমি তাঁর কথার ভাবে বুঝেছি।"

একটু ভাবিয়া শ্যামা বলিল,—"কিন্তু সে জন্য আপনাকে দেশত্যাগ করতে হবে কেন?"

রা। তুমি আমার আশ্রয়ে আছ।

শ্যা। যদি না থাকি?

রাধানাথ বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে শ্যামার মুখের দিকে চাহিলেন। শ্যামা বলিল,—"যদি আমি এখানে না থাকি, তা'হলেও কি আপনাকে দেশ ত্যাগ করতে হ'বে?"

রা। না; কিন্তু তুমি কোথায় যা'বে?

শ্যা। এত বড় পৃথিবীতে একটা লোকের জায়গার অভাব নাই।

রা। কিন্তু পৃথিবীতে রুদ্রনারায়ণেরও অভাব নাই। কে তোমাকে আশ্রয় দিবে?

শ্যা। কেউ না দেয়, মা গঙ্গা আছেন।

রা। সে কি, আত্মহত্যা করিবে?

শ্যা। সহজে নয়। তবে নিতান্ত নিরুপায় হ'লে তাই বটে।

রা। কেন শ্যামা, আমার আশ্রয় কি তোমার প্রার্থনীয় নয়?

শ্যা। আশ্রয় প্রার্থনীয়, কিন্তু আপনার বিপদ প্রার্থনীয় নয়।

রা। যতই বিপদ হোক, আমি তোমাকে মরণের মুখে ছেড়ে দিতে পারবনা।

শ্যা। না ছাড়লে রক্ষা করতেও পারবেন না।

রা। না পারি, আমিও দেশ ত্যাগ করব।

শ্যা। আপনি কেন আমার জন্য বৃথা দেশ ত্যাগ করবেন?

রা। তুমি আমার আশ্রিত। জীবন দিয়াও তোমাকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য।

শ্যা। আর আমারও কর্ত্তব্য জীবন দিয়া আশ্রয়দাতার বিপদ নিবারণ করা।

রা। তবে কি তুমি আমায় ছেড়ে যেতে চাও?

শ্যা। যদি আপনার বিপদ দেখি।

একটু ভাবিয়া রাধানাথ বলিলেন,—"না শ্যামা, জীবন থাকতে আমি তোমায় একা ছেড়ে দেব না।"

শ্যা। তবে কি করিবেন?

রা। চল, গোপনে আমরা এখান হ'তে চলে যাই।

শ্যা। গোপনে কেন?

রা। প্রকাশ্যে গোলযোগ হ'তে পারে।

শ্যা। কোথায় যাবেন?

রা। যা'বার স্থান অনেক আছে।

শ্যা। কিন্তু এত সুখ, এত ঐশ্বর্য্য সব ছেড়ে যাবেন?

রা। সব ছাড়বো।

শ্যা। রুক্মিণী'ক ছাড়বেন?

রা। ছাড়বো।

শ্যা। মনিবের কাজ, দেশের কাজ?

রা। সব ছাড়্‌ব।

শ্যা। কেন এতটা করবেন?

রা। তোমার জন্য।

শ্যা। আমি আপনার কে?

রা। তুমি—বল্‌তে পারিনা তুমি আমার কে?

শ্যামার হৃদয়ে তখন সপ্ত সমুদ্রের তুফান উঠিতেছিল, পড়িতেছিল। আর বাহিরে হাস্যময়ী মুখরা প্রকৃতি জ্যোৎস্নার আবরণে মুখ ঢাকিয়া হাসিতেছিল।

রাধানাথ ঈষৎ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"শ্যামা—যাবে?"

শ্যামা দৃঢ়স্বরে বলিল,—"আপনি যান, আমি যাব না।"

আর কোন কথা না বলিয়া রাধানাথ ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেলেন।

এই খানে আমরা রাধানাথের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব। রাধানাথ,

রুদ্রনারায়ণের জমিদারীর দেওয়ান। তাঁহার পিতাও এই সংসারে দেওয়ানী করিয়া যথেষ্ট সম্পত্তি করিয়া গিয়াছেন। পিতার মৃত্যুর পর, রাধানাথও সেই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া দক্ষতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। রাধানাথ সুশীল, সচ্চরিত্র, বিশ্বাসী; রাধানাথ বলিষ্ঠ, যোদ্ধা, কর্ম্মক্ষম, মেধাবী। প্রজামহলে এবং সৈন্যগণের নিকট রাধানাথের যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি। সকলেই তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করে। রাধানাথ কেবল দেওয়ান নহেন, তিনি একজন সৈন্যাধ্যক্ষ, জমিদারীর সর্ব্বেসর্ব্বা। রাধানাথ, রুদ্রনারায়ণের বাল্যবন্ধু, পরামর্শদাতা, সকল কার্য্যেই তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ।

রাধানাথের বাড়ীটা বড়, কিন্তু সংসারটী ছোট। সংসারে বৃদ্ধা মাতা, আর স্ত্রী রুক্মিণী। তা' ছাড়া দুই চারিজন দাসদাসী। রাধানাথ দেখিতে সুপুরুষ, বয়ঃক্রম ত্রিংশদ্বর্ষ।

বহু গুণশালী হইলেও রাধানাথের অধঃপতন হইল। যাহার যে বিষয়ে অভাব, সেদিকে তাহার চিত্ত সহজেই আকৃষ্ট হয়। বাহিরে রাধানাথের কোন অভাব না থাকিলেও ভিতরে তাঁহার একটু অভাব ছিল। সে অভাব—যৌবন-জাত স্বাভাবিক রূপতৃষ্ণা, প্রণয়লালসা। রাধানাথ, পত্নী রুক্মিণীর নিকট এই দুইটীর একটিও পান নাই। সুতরাং তাঁহার অধঃপতন হইতে বড় বিলম্ব হইল না।

কুক্ষণে শ্যামা পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছিল। কুক্ষণে রাধানাথ তাহাকে দেখিয়াছিলেন; কুক্ষণে তাঁহাকে গৃহে আনিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

উৎসর্গ।

কখন জেগেছে বিশাল ধরণী,
ফুটে গেছে কবে ফুল;—
আমি ত ছিলাম ঘুমের আবেশে,
পূজাটী হয়েছে ভুল।
আগে আগে তা'রা সকলি যে মোর
নেছে তুলে ফুল না হইতে ভোর;

করিতে অর্চ্চনা ও চরণ তোর,
দিয়ে শ্যাম দুর্ব্বাদল;
আমি ত কিছুই পাইনি;—এসেছি
কেঁদে, নিয়ে আঁখিজল।

তা'রা ত পেয়েছে করুণা তোমার
পূজিয়া চরণ দু'টী;

আমি আঁখি নীরে, পূজিয়া তোমারে
কাঁদিয়া যা'ব কি ছুটি' ?
তোমারি মহিমা গাহিয়া গাহিয়া
পাখী গুলি গেছে কখন উড়িয়া ;
আমি ত ছিলাম ঘুমেতে ডুবিয়া ;
—মোহের বাঁধন টুটি—
সমগ্র তোমারে, না জাগিতে আমি
নিয়েছে কখন লুটি' ।

সুখময়ী উষা ফুটায়েছে ফুল
তোমারি পূজার লাগি' ;
স্নিগ্ধ নিরমল মৃদু সমীরণ,
সারা-দিন-রাতি জাগি' ।
অনন্ত আকাশ, বিশাল ধরণী,
সাগর অপার, দূর অরণ্যাণী,
গহন, কানন, দরি, তরঙ্গিণী
তোমারি করুণা মাগি',
কখন পেয়েছে করুণা তোমার ;—
আমি যে কাঁদিছি জাগি' ।

আর ঘুমা'বনা অলসের মত,
উঠিব ভোরের বেলা ;
মানস-কানন হইতে কুসুম
তুলিয়া গাঁথিব মালা ।
লও, আজিকার এই অশ্রুভার,
বিষাদে আসিতে দিবনাকো আর ;
খুলিয়া রুদ্ধ হৃদয়-দুয়ার
করিব পূজার মেলা ;
রচিব আসন হৃদয়' পরে
পূজিয়ে করিব খেলা !

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ।

সমালোচনা।

ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী ৩য় খণ্ড। গ্রন্থের নামোল্লেখেই পাঠকগণ বুঝিয়াছেন যে, এই সদুপদেশ পূর্ণ, সুখপাঠ্য গ্রন্থখানি বঙ্গীয়-সাহিত্য-ব্রজধামের রাখালরাজ শ্রীমদ্ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী প্রণীত। এই গ্রন্থমধ্যস্থিত প্রবন্ধ গুলিন পূর্ব্বে নানা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে সেই সকল প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলীর ১ম, ও ২য় খণ্ড আমাদের হস্তগত হয় নাই। তৃতীয় খণ্ডের মধ্যে যে সকল প্রবন্ধ আছে, তাহার একরূপ সমালোচনা পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। যে যে পত্রে তাঁহার প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সেই পত্রিকার সমালোচন কালে, তাঁহার প্রবন্ধেরও সমালোচনা হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এক্ষণে নূতন করিয়া বলিবার অবশিষ্ট নাই। এক একটি প্রবন্ধ সাহিত্য-কুঞ্জের এক একটী সুগন্ধি কুসুম। প্রত্যেকেরই সৌরভ বিভিন্ন রূপ এবং প্রত্যেকটিই মনোহর। বাস্তবিক, বলিতে কি, এই গ্রন্থকারের ন্যায়, সর্ব্ব বিষয়ের প্রবন্ধ লেখক, বঙ্গীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিরল, কি ইতিহাস, কি দর্শন, কি বিজ্ঞান, কি শিল্প, কি অর্থনীতি, কি রাজনীতি, সকল বিষয়েরই ইনি সুলেখক। প্রত্যেক প্রবন্ধেই গ্রন্থকারের অগাধ বিদ্যা, প্রগাঢ় জ্ঞান ও গভীর গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, দুই এক জন অতি সঙ্কীর্ণমনা ব্যক্তি ইঁহার লেখার দোষের অনুসন্ধান করিতে গিয়া, বিফল চেষ্টাও হাস্যাস্পদ হন। সেরূপ পল্লবগ্রাহী সমালোচকের সমালোচনায় মহাভারতী মহাশয়ের সম্মান বৃদ্ধিই হইয়া

থাকে। ইঁহার প্রত্যেক প্রবন্ধই যে শিক্ষাপ্রদ, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই উর্ব্বর মস্তিষ্ক ও উদার হৃদয় এবং উচ্চমনা লেখক,বঙ্গ সাহিত্যে যে সকল মহারত্ন রাখিয়া যাইতেছেন তাহা চিরকালেরজন্য বঙ্গ-সাহিত্য-সেবীদিগের উপকারে আসিবে। যত দিন বঙ্গ ভাষার চর্চ্চা থাকিবে ততদিন কেহই এই প্রবীণ লেখক "ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী" মহাশয়ের নাম বিস্মৃত হইবে না।

ভরসা করি, প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই এই পুস্তকের এক এক খণ্ড ক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। এই গ্রন্থ পাঠ না করিলে তাঁহাদিগের সাহিত্য-পাঠ অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে, সন্দেহ নাই। তৃতীয় খণ্ডের মূল্য ১।৹ মাত্র। এই গ্রন্থকারের সমুদায় গ্রন্থই গুরুদাস লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

অঞ্জলি। গীতি কাব্য। শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্র কুমার দত্ত প্রণীত; মূল্য ৷৹ আনা মাত্র। বর্ত্তমান বিজ্ঞান-যুগে কবিতার আদর ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। কবিতার আদরাভাবে কবিকুলেরও লোপ হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে, পূর্ব্বের ন্যায় সুকবির একান্ত অভাব হইয়া পড়িতেছে। বঙ্গদেশ যে একেবারে কবিশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহা নহে। পরন্ত, সুকবির সংখ্যা অতি বিরল। আজি কালি মাসিক পত্র—পত্রিকায়, অনেক ব্যক্তিই নানা বিষয়িণী কবিতা লিখিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকৃত স্বভাবকবির সংখ্যা নিতান্তই অল্প। জীবেন্দ্র বাবুর এই গীতি কাব্য খানিতে ভক্তিরসের ৯টী, প্রীতির ৫টী, প্রেমের ৬টী, এবং সম্মিলন প্রভৃতির ৩০টী,সর্ব্বসমেত৫০টী ক্ষুদ্র কবিতা আছে। এই পুস্তক খানির সকল কবিতাই সরল, সরস, মধুরভাবাপন্ন ও হৃদয়গ্রাহিণী। সরল ভাষায় লিখিত এরূপ সুমধুর কবিতা আমরা অনেক দিন পাঠ করি নাই। প্রকৃত কবির কবিতায় যে কি এক অপার্থিব ভাব থাকে, তাহা কেবল মাত্র পাঠ করিলেই অনুভূত হইয়া থাকে, লোক-মুখে শুনিয়া সে ভাব হৃদয়গত করা যায় না। বাস্তবিক, বাক্য-দ্বারা সে ভাব, সে মাধুর্য্য বুঝান যায় না। এই স্বভাবকবি জীবেন্দ্র কুমারের সকল কবিতাতেই সেই অপার্থিব মাধুর্য্য, সেই স্বর্গীয় ভাব ও অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। সকল কবিতাতেই চিত্ত আকুলিত হয়—প্রাণ মাতিয়া উঠে, মানস-পটে আনন্দ রেখা অঙ্কিত হয়। এই উদীয়মান কবির কবিতা গুলিন যে কিরূপ উপাদেয় হইয়াছে,তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিবেন ও লেখককে শত ধন্যবাদ দিবেন। ভবিষ্যতে,এই কবি, কবিগণ-মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন সন্দেহ নাই। তাঁহার আসন অতি উচ্চে প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই পুস্তক খানি যে প্রথম শ্রেণীর গীতিকাব্য, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই। কবির, স্বদেশ-প্রীতি, স্বজাতি প্রেম, সকল জাতির প্রতি সহানুভূতি ও উচ্চ হৃদয়ের ভাব, অনেক কবিতায় দেখা যায়। স্থল বিশেষে ভাষার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিলেও, গুণ-বাহুল্যে তাহা ঢাকা পড়িয়া আছে। পুস্তক খানি সোনার দরে বিক্রিত হইলেও তাহা সুলভ বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিব। জীবেন্দ্র কুমার বাবু ভারতীর বর পুত্র। তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া, বঙ্গভাষার ও বঙ্গীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন করুন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

কুঞ্জকালী। গীতিনাট্য—শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।৹ আনা। শ্রীমতী রাধিকার কলঙ্ক ভঞ্জন লইয়া রচিত। এই গীতিনাট্য খানি পাঠ করিয়া আমরা যারপর নাই

মুগ্ধ হইয়াছি। কি ভাবে, কি ভাষায়, কি শব্দ সন্নিবেশে, কি মাধুর্য্যে, সকল বিষয়েই আমরা বিমোহিত হইয়াছি। একে রাধাকৃষ্ণের প্রেম ভক্তির কথা, তাহাতে সুরস ও সরল গদ্যে রচিত হওয়ায়, পুস্তক খানি আবাল বৃদ্ধ বনিতার সুখপাঠ্য, সুতরাং বড়ই আদরের বস্তু হইয়াছে। এই ভক্তি-রস প্রধান পুস্তক খানি সম্পূর্ণরূপে অশ্লীল ভাব বিবর্জ্জিত। ইহার গীত গুলিও যারপরনাই সুললিত ও মধুর হইয়াছে। এই পুস্তক খানি তুলসীর ন্যায় পবিত্র, মলয় সমীরণের সদৃশ মধুর ও জ্যোৎস্নার ন্যায় শীতল। জগদীশ্বর গ্রন্থকর্ত্তাকে দীর্ঘজীবী করুন, ইহার দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যের প্রভূত উপকার সংসাধিত হইবে।

স্বদেশ মাতা।

প্রণমি জননী-রূপা স্বদেশ তোমায়;
সুশ্যামলা বঙ্গ ভূমি তোমার চরণে নমি
তুমি মাত্র জননী গো একান্ত আশ্রয়।
প্রণমামি দয়াময়ী স্বদেশ তোমায়।
প্রণমি গো মাতৃরূপা স্বদেশ জননী।
তোমার স্নেহের কোলে তোমার বিমল জলে
চিরপুষ্ট এই দেহ হয়েছে জননী
স্বর্গাদপি গরীয়সী তুমি জন্মভূমি।
প্রণমি জননী রূপা স্বদেশ তোমায়।
রত্ন প্রসবিনী তুমি পুণ্যময়ী বঙ্গভূমি
রত্নপ্রসূ নাম মাগো তোমার ধরায়।
নমি মাগো বঙ্গভূমি জননী তোমায়।
প্রণমি জননী মোর স্বদেশ তোমায়।
তোমার কোলেতে নাচি, তোমার শস্যেতে বাঁচি
তোমার শীতল জলে তৃষ্ণা দূর হয়
মধুমাখা জন্মভূমি তুলনা কোথায়?
প্রণমি মা জন্মভূমি তোমারে স্বদেশ।
কত ফল ফুলে ভরা হয়ে আছ মনোহরা
ধরিয়াছ জননী গো কতই সুবেশ।
কত স্নেহ তব বুকে নাহি তার শেষ।
প্রণমি মা দয়াময়ি স্বদেশ তোমারে।
প্রভাত তপনালোকে কত পাখি উঠে ডাকে
কত ফুল ফুটে উঠে, অঙ্গেতে তোমার
কত সুখে উঠে জেগে এ হৃদি আমার।
প্রণমি মা তব পদে স্বদেশ জননী।
পুণ্যতোয়া ভাগিরথী পদ্মা ব্রহ্মা পুত্র আদি
বিরাজিত তব অঙ্গে পবিত্র রূপিণী।
ভোগবতী ভাগিরথী সুর মন্দাকিনী।
সুমেরু মলয় বিন্ধ্য উচ্চ হিমালয়।
মেখলার সম রঙ্গে বেড়িয়াছে তব অঙ্গে
সদর্পেতে উচ্চশীর করিয়া উন্নত।
গাহিছে বিজয় গীতি তোমার নিরত।
তব পদ ধৌত করি যমুনা জাহ্নবী।
তুলি কুলু কুলু তান গাহে তব যশোগান
সাগর সদনে গিয়া ঘোষে তব খ্যাতি
পুণ্যময়ী জন্মভূমি তুমি গো ভারতী।
প্রণমি মা মাতৃরূপা তোমার পদেতে।
দেবধ্বনি নিনাদিত যজ্ঞহোমে প্রপূরিত
তোমার এ আর্য্যাবর্ত্ত, নিত্য এ জগতে
সাহিত্য বিজ্ঞান জ্ঞান পূর্ণ এ মরতে।
নমামি জননী রূপা স্বদেশ তোমায়।
তোমারি জঠরে কত জন্মে ছিল শত শত
বররুচি কালিদাস হর্ষ ভবভূতি
বরাহ বেতাল ভট্ট নব রত্ন আদি।
পুণ্যময়ী জন্মভূমি তোমারি উদরে
মহারথী ভীমার্জ্জুন জন্মেছিল বীরগণ,
বীরপ্রসূ বীর মাতা তুমি গো সংসারে।
বীর মাতা বলি' খ্যাতা ছিলে চরাচরে।
তোমারি গর্ভেতে কত ভারত ললনা,
দময়ন্তী সতী সীতা ছিল কত পতিব্রতা
ছিল মা গো একদিন সবে অতুলনা।
খনা লীলা গার্গী আদি বঙ্গের ললনা।
প্রণমি মা জন্মভূমি স্বদেশ তোমায়।
রেখ মা চরণে মোরে স্থান দিও তব কোলে
চিরদিন তব পদে; প্রার্থনা আমার।

শ্রীমতী "নীতি-কবিতা" রচয়িত্রী।

অঙ্কুর।

বীজাদঙ্কুরনিষ্পত্তিরঙ্কুরাদ্বৃক্ষসম্ভবঃ।
ফলপ্রদোভবেদ্বৃক্ষইত্থমাশাক্রমোমতঃ॥

২য় বর্ষ।] আশ্বিন, ১৩১৪। [৯ম সংখ্যা।

ইংরাজ ও সিরাজ।

আলিবর্দ্দী খাঁ ১৭৪০ হইতে ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব ছিলেন। আলিবর্দ্দী খাঁর ঘেসেটী ও আয়মানা নাম্নী দুইটী কন্যা ছিল। ঘেসেটীর সহিত হোসেন কুলীখাঁর এবং আয়মানার সহিত জৈনুদ্দীনের বিবাহ হয়। সিরাজের পিতা জৈনুদ্দীন জনৈক আফগান কর্ত্তৃক হত হইলে, সিরাজের মাতা আয়মানার সহিত হোসেন কুলীখাঁর অবৈধ প্রেম জন্মে। আলিবর্দ্দীখাঁ মৃত্যুকালে সিরাজের হস্তে কোরাণ দিয়া এই শপথ করাইয়া লইয়া ছিলেন যে, "তুমি মদ্যপান করিবে না এবং অর্থলোলুপ, বিশ্বাসঘাতক ইংরাজদিগকে ভারত হইতে তাড়াইয়া দিয়া রাজ্যে শান্তি-স্থাপন করিবে।" সিরাজ নবাব হইয়াই মাতামহের আদেশানুসারে নিজ মাতার সহিত অবৈধ প্রেমে প্রেমাসক্ত হোসেন কুলীখাঁকে নিহত করিলে, হোসেনের স্ত্রী ঘেসেটী বেগম ও জহরা সিরাজ-বধের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইরেজখাঁর কন্যা লুৎফউন্নেসার সহিত সিরাজের বিবাহ হয়। মোহনলাল নামক পশ্চিম-দেশীয় জনৈক কায়স্থের ফৈজী নাম্নী নর্ত্তকী ভগ্নী ছিল, তাহার প্রেমে সিরাজ মুগ্ধ হন। ফৈজী সিরাজের ভগ্নীপতি সৈয়দ আহাম্মদখাঁর প্রেমে আসক্তা হইলে, সিরাজ কর্ত্তৃক হত হয়। সে যাহা হউক মোহনলাল সিরাজকে স্বীয় ভগ্নী উপহার দিয়া ক্রমে ক্রমে একজন বিশ্বাসী সেনাপতি হইয়াছিলেন।

আলিবর্দ্দীখাঁর আমলে রাজবল্লভ নামক এক ব্যক্তি ঢাকার নায়েব নাজিমের সহকারী হইয়া, প্রজাপীড়ন দ্বারা প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা নবাবী পাইবার কয়েকদিন পরেই ঐ অর্থ আত্মসাৎ

করিবার চেষ্টায় আছেন জানিয়া, রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস সপরিবারে সমস্ত সম্পত্তিসহ কলিকাতায় ইংরাজদিগের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এদিকে ইংরাজেরা সিরাজের বিনানুমতিতে দুর্গাদিও মেরামত করিতেছিলেন, কাজেকাজেই সিরাজ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বিরক্ত হইয়া কলিকাতার গভর্ণর ড্রেক সাহেবকে পত্র লিখিলেন যে, "কালবিলম্ব না করিয়া কৃষ্ণদাসকে আমার হস্তে সমর্পণ কর এবং দুর্গাদি ভাঙ্গিয়া ফেল।" ড্রেক সাহেব সিরাজের কথায় কর্ণপাত না করায়, তিনি পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধা লইয়া ইংরাজদিগের একশত সত্তর জন সৈন্যের বিরুদ্ধে কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সিরাজ সর্ব্বপ্রথমে কাশিমবাজারের কুঠি লুট করিয়া তৎপরে কলিকাতা অধিকার করিয়া লইলেন। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে যে অন্ধকূপহত্যা ঘটে, তাহা অমূলক।

কলিকাতার দুর্ঘটনার সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে, ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন একদল সেনাসহ কয়েকখানি রণপোত লইয়া কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সিরাজউদ্দৌলা মাণিকচাঁদকে কলিকাতা রক্ষার ভার দিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইংরাজদিগের কামানের শব্দ শুনিয়াই মুর্শিদাবাদ অভিমুখে পলায়ন করিলেন। ফরাসীগণ ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দিবার নিমিত্ত নবাবের সহিত মন্ত্রণা করিতেছিলেন। ইংরাজেরা কলিকাতা অধিকার করিয়া ফরাসীদিগের চন্দননগর অধিকার করিয়া লইলেন। নবাব ফরাসীদিগকে সাহায্য করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না, কাজেকাজেই নবাব ভীত হইয়া ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন (১০ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৭)।

সিরাজউদ্দৌলা যখন দেখিলেন ইংরাজেরা সন্ধিভঙ্গ করিয়া অন্যায়াচরণ করিতেছে, তখন তিনি পিতামহের আদেশ অনুসারে ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দিয়া দেশে শান্তি-স্থাপন করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র হইতেছে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। শেঠ ভবনে মুরশিদকুলীখাঁর সাত কোটী টাকা গচ্ছিত ছিল, সিরাজ তাহার জন্য অনেক পীড়াপিড়ি করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এই টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করায় শেঠগণ নবাবের প্রতি রাগান্বিত হইলেন। শেঠগণ, ঘেসেটী বেগম, জহরা, ক্লাইব প্রভৃতি সপ্তদশ বর্ষীয় নবাব সিরাজ-উদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে নবাব করিবার মানসে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। রাজা দুর্লভরাম, রাজা রামনারায়ণ, রাজা

রাজবল্লভ, কৃষ্ণদাস মীরজাফর, ইয়ার লতিফখাঁ, নন্দকুমার প্রভৃতি সকলে শেঠ ভবনের গুপ্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন। জগৎ শেঠের প্রতিনিধি উমিচাঁদ কর্ত্তৃক ক্লাইব, ড্রেক, ওয়াট্‌সন প্রভৃতি ষড়যন্ত্রকারীদিগের নিকট চিঠি পত্রাদি প্রেরিত হইত। উমিচাঁদ এই গুপ্ত সভার কার্য্য বিবরণাদি প্রকাশের ভয় দেখাইলে জালিয়াৎ ক্লাইব তাঁহাকে একখানি জাল অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন।

ইংরাজসেনাপতি ক্লাইব নয় শত ইউরোপীয় সৈন্য, একুশ শত সিপাহী ও নয়টী কামান লইয়া চন্দননগর হইতে, নবাবের পঞ্চাশ হাজার পদাতিক, কুড়ি হাজার অশ্বারোহী, তিপান্নটী কামান ও পঞ্চাশ জন ফরাসী গোলন্দাজের বিরুদ্ধে, মুর্শিদাবাদাভিমুখে বহির্গত হন। পলাশী ক্ষেত্রে, উভয় পক্ষ, ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন] বৃহস্পতিবার বেলা আট ঘটিকার সময় সম্মুখীন হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মধ্যস্থলে ফরাসী গোলন্দাজ, বাম দিকে নদী ও দক্ষিণ দিকে বিশ্বাসঘাতক মীর্জাফর। ফরাসী সেনাপতি সিন্‌ফ্রের অধীনস্থ গোলন্দাজগণ গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে ইংরাজেরাও গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। বিশ্বাসঘাতক মীর্জাফর পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান্ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। ক্লাইব কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। মীর্জাফর যদি যোগ না দেন তবে হয়ত সকলকে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইবে; মীর্জাফর যোগ দিলেও মীরমদন ও মোহন লালের নিকট আমাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। ক্লাইব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। মধ্যাহ্নকালে অজস্র বৃষ্টিপাত হওয়ায় নবাবের বারুদ সিক্ত হইয়া অব্যবহার্য্য হইলেও নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি মীরমদন অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ শত্রুপক্ষেরা গোলার আঘাতে বীরশ্রেষ্ঠ মীরমদনের প্রাণবায়ুর অবসান হইলে মোহনলাল সেনাপতি হইয়া পুনঃ যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। বিশ্বাসঘাতক মীর্জাফরকে তখনও পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান দেখিয়া সিরাজউদ্দৌলা বলিলেন, "আমার এই মুকুট দিতেছি, মীর্জাফর! গ্রহণ করিয়া যথাসাধ্য যুদ্ধ কর। আমি নবাবী করিতে লালায়িত নহি, তবে ইংরাজগণকে বিতাড়িত করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য।" ইংরাজগণের আর প্রাণের আশা নাই দেখিয়া মীর্জাফর বেলা পাঁচ ঘটিকার সময় নবাবকে কুমন্ত্রণা দিয়া সেই দিবসের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে বলিলে, সৈন্যগণের উৎসাহ ভঙ্গ হইয়া গেল এবং যে যে দিকে পাইল পলায়ন করিল। এমন সময়ে যেসেটী

বেগম আসিয়া বলিল, "নবাব! তুমি কাহার জন্য যুদ্ধ করিতেছ? এতক্ষণ তোমার ধনাগার শূন্য প্রায়।" ঘেসেটী বেগমের প্রতারণায় এবং সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ ও বারুদ অব্যবহার্য্য হওয়ায়, যুদ্ধ করা নিষ্ফল মনে করিয়া নবাব রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ইংরাজদিগের কেবল মাত্র ৭০ জন হতাহত হইয়াছিল। অতএব বিনা যুদ্ধেই পৃথিবীবিখ্যাত পলাশী ক্ষেত্রে সুচতুর, জালিয়াৎ, প্রবঞ্চক ইংরাজদিগের জয় হইল। সিরাজ মুর্শিদাবাদাভিমুখে অগ্রসর হইলে, বিশ্বাসঘাতক মীর্জাফর ইংরাজদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হইলেন।

করিমের পরামর্শানুযায়ী সিরাজ সমস্ত পোষাক পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া পতিপ্রাণা সহধর্ম্মিণী লুৎফউন্নেসা ও একমাত্র কন্যাসহ ভগবানগোলাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ভগবানগোলার প্রসিদ্ধ বন্দরে যাইয়া তথা হইতে নৌকাযোগে গন্তব্য স্থানে যাইবেন, এই আশায় তথায় পৌছিলে সিরাজ কর্ত্তৃক কর্ত্তিতকর্ণ দানসা ফকির একমাত্র পাদুকা সন্দর্শনে চিনতে পারিয়া, ধরাইয়া দিলে, হতভাগ্য সিরাজ জাফরগঞ্জের বাটীতে কারারুদ্ধ হন। মীরজাফরের পুত্র মীরণ, পিতাকে কোন কিছু জানিতে না দিয়া স্বয়ং সিরাজকে বধ করিবার আদেশ দিলে. পুরস্কারের লোভেও কেহ তাঁহাকে বধ করিতে সম্মতি প্রদান করিল না। অবশেষে সিরাজের মাতামহ আলিবর্দ্দীর অন্নে প্রতিপালিত মহম্মদী বেগ, সিরাজ-বধে সম্মতি দান করিল। সিরাজ, কারাগারে আপন মনে কত কি ভাবিতেছেন, এমন সময়ে সহসা দ্বারোদ্ঘাটন শব্দ শ্রুত হইল। সিরাজ আনন্দিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "মহম্মদী বেগ! আমাকে কি মুক্তি দিতে আসিয়াছ?" পাষণ্ড মহম্মদী বেগ উত্তর দিল, "হাঁ, তোমাকে এই তরবারি সাহায্যে চিরমুক্তি দিতে এসেছি." সিরাজ বলিতে লাগিলেন, "আমি মাতৃ-হরণকারী হোসেনকুলী খাঁকে হত্যা করিয়া যে মহাপাপ করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ অদ্য আমার হনন বাঞ্ছনীয়; অতএব আমি এ পাপদেহ ধারণ করিতে ইচ্ছুক নহি। আমি ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হইতেছি, আমাকে হত্যা করিয়া পাপের উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে আর কাল বিলম্ব করিও না।" ধ্যানমগ্ন সিরাজের স্কন্ধে নিষ্ঠুর মহম্মদী বেগ তরবারির আঘাত করিলে, "হোসেনকুলী! আর না—আর না—খুব হয়েছে" বলিয়া ৩রা জুলাই চিরদিনের জন্য, ন্যায়পরায়ণ সিরাজ চির বিদায় গ্রহণ করিলেন। একমাত্র ঘেসেটী বেগম ও জহরা ব্যতীত সকলেই যে অতিশয় দুঃখিত হইয়া-

ছিলেন, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যাবজ্জীবন, সিরাজ-পত্নী লুৎফউন্নেসা, পতির কবর প্রত্যহ পুষ্প এবং প্রথানুযায়ী প্রদীপে সুশোভিত করিয়া, পতি-চরণ-পার্শ্বে চির নিদ্রায় নিদ্রিতা হন। অদ্যাপি খোসবাগ, গোর-স্থানের জন্যই দর্শনীয়। সিরাজের মাতা আয়মানা, হোসেন-পত্নী ঘেসেটী বেগম এবং আলিবর্দ্দীর বেগম ঢাকায় চির নির্ব্বাসিতা হন।

সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

১। সিরাজউদ্দৌলা—পিতৃহীন বালক সিরাজ, মাতামহ আলি-বর্দ্দীখাঁ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন। আলিবর্দ্দীখাঁ একমাত্র উত্তরাধিকারী সপ্তদশ বর্ষীয় বালক সিরাজকে ১৭৫৬ খৃঃ ৯ই এপ্রিল বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যার নবাবীপদ প্রদান করিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। সিরাজ ১৭৫৭ খৃঃ ২৩শে জুন পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রবঞ্চক ক্লাইব এবং জগৎশেঠ সিরাজকে বধ করিবার জন্য মীর্জাফরের নিকট প্রার্থনা করিলে, তদীয় পুত্র নিষ্ঠুর মীর-ণের আদেশে মহম্মদী বেগ ৯ই এপ্রিল রাত্রিতে, হতভাগ্য সিরাজকে হত্যা করে।

আলিবর্দ্দী খাঁ মৃত্যুকালে কোরাণ সহ সিরাজকে প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন যে, "যাবজ্জীবন মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না এবং প্রবঞ্চক ও ধনলোলুপ ইংরাজ-দিগকে তাড়াইয়া দেশে শান্তি-স্থাপন করিবে।" সিরাজ উক্ত আদেশ পালন করিয়াছিলেন। সিরাজ মরণকালে কেবলমাত্র মাতৃহরণকারী বধকেই মহাপাপ স্বীকার করিয়াছিলেন; লোকে কখনই ইহা পাপ মনে করিবেন না। অতএব সিরাজ যে নিষ্পাপ তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না, তবে দানসা ফকির, দলনী বেগম, ঘেসেটী বেগম, মীরজাফর, ক্লাইব, প্রভৃতি ভারতের জঞ্জালগণ যে নিষ্পাপ সিরাজকে কলঙ্কিত করিয়াছেন তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি।

সিরাজ, মাতৃ-হরণকারী হোসেনকে আলিবর্দ্দীর সময়ে হত্যা করিলে, তদীয় পত্নী ঘেসেটী ও জহরা বেগম সিরাজ বধের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অনেক সৈন্য রাখিতে লাগিলেন, অর্থ দিয়া সিরাজের পক্ষীয় ব্যক্তিগণকে বশী-ভূত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা স্বয়ং ও দানসা ফকির দ্বারা, "সিরাজ নানা প্রকার লোককে জলমগ্ন করিয়া আনন্দানুভব করে, এক মাস হইতে বার মাস গর্ভবতী প্রত্যেক স্ত্রীর গর্ভ চিরিয়া দর্শনান্তর আনন্দ প্রকাশ করে, মীরমদন ও মোহনলাল সুন্দরী স্ত্রীদিগকে আনিয়া দিয়া নবাবকে সন্তুষ্ট করে, নবাব সর্ব্বদা উন্মত্ত, ইত্যাদি," প্রচার করিতেন। দানসা ফকির উক্ত কারণে ধৃত হইলে,

নবাব কর্ত্তৃক তাহার কর্ণ কর্ত্তিত হয়। দানসা ফকির ভগবানগোলায় সিরাজকে ধরাইয়া দিয়া, কর্ণ ছেদনের প্রতিশোধ লইয়াছিল। অতএব উক্ত প্রচারিত বাক্য গুলি যে অমূলক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আজিমগঞ্জের রাণী ভবানীর কন্যা তারা সুন্দরী একদা বরাহনগর প্রাসাদের উপর আলুলায়িত কেশদাম রৌদ্রে শুষ্ক করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভাগিরথী বক্ষ হইতে তারার অসামান্য রূপলাবণ্য সিরাজের নয়ন গোচর হইলে, তিনি তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিতে মনস্থ করেন। পরপারস্থিত সাধুবাগে রাণী ভবানীর ক্রন্দন ধ্বনিতে ধ্যানভঙ্গ জনৈক যোগী সমস্ত জ্ঞাত হইলে, "ভদ্রে! তোমার কন্যার কোন বিপদ ঘটিবেনা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক," বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলে তিনি বাটী প্রত্যাগমন করেন। অসংখ্য সৈন্যসহ সিরাজ উক্ত যোগী কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, অথবা অনেকের মতে পথিমধ্যে পীড়া বশতঃ ফিরিয়া আসেন। বাঙ্গালা,বিহার ও উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলা সামান্য যোগী-ভয়ে ভীত হইয়া, অথবা পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া যে বাঞ্ছিত বিষয় ত্যাগ করিবেন, তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। তারার সঙ্গে সিরাজের কখনই সাক্ষাৎ হয় নাই। আর ভাগিরথী হইতে রাণী ভবানীর বাটী দেখাও কখনই সম্ভবপর নহে : অতএব ইহা যে কৃত্রিম,তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল শ্বেতাঙ্গ ঐতিহাসিক মহাপুরুষগণ নহে, পরন্তু তাহাদের পদলেহনকারী ভারত কুলাঙ্গারগণও তিলকে তাল করিয়া স্বভাবতঃ এতদ্দেশীয় মহাপুরুষগণের নামে অযথা কলঙ্ক দিয়া নিজকে গৌরবান্বিত মনে করেন। বাহুল্য ভয়ে আর নবাবের অযথা কলঙ্কাদির উল্লেখ করিলাম না। তবে, তিনি যে নিষ্পাপ তাহা কে অস্বীকার করিবেন ?

সিরাজের ন্যায় ন্যায়পরায়ণ, স্বদেশের জন্য প্রাণোৎসর্গকারী, বলবান্, সুশ্রী, পরিশ্রমী ও সাহসী নবাব অতি বিরল।

২। ক্লাইব—রিচার্ড ক্লাইবের পুত্র লর্ড ক্লাইবের ১৭২৫ খৃঃ অব্দে শ্রপসায়ারে জন্ম হয়। ইনি সামান্য লেখা পড়া শিখিয়া ১৮ বৎসর বয়সে প্রথমে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরাণী, তৎপরে সৈনিককর্ম্মে নিযুক্ত হন। ইনি ১৭৫১ খৃঃ অব্দে দ্বিতীয় কর্ণাট যুদ্ধে বিলক্ষণ সাহস ও বিক্রমের পরিচয় দিয়া ইংলণ্ড গমন করিলে, কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ ইহাঁকে মাদ্রাজের গভর্ণর করিয়া, ১৭৫৫ খৃঃ ভারতে পাঠাইয়া দেন। মীরজাফরকে ১৭৬০ খৃঃ অব্দে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দ্বিতীয় বার ইংলণ্ড যাত্রা করিলে পুনঃ ভারতে প্রেরিত হন। বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে স্বীকৃত হইয়া নবাব সুজাউদ্দৌলার নিকট হইতে কোম্পানীর

নামে১৭৬৫ খৃঃ অঃ১২ই আগষ্ট বাঙ্গালা,বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী সনন্দ গ্রহণ করেন। ইনি ১৭৬৭ খৃঃ অব্দে তৃতীয় বার ইংলণ্ড যাইলে, ইহাঁর বিরুদ্ধে অনেক জালাদি-অভিযোগ উপস্থিত হয়। সাত বৎসর বিচারের পর, তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অভিযোগ হইতে বহু কষ্টে নিষ্কৃতি পাইলে, নিজাপমান অসহ্য হওয়ায় ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে আত্মহত্যা করেন। ভারতীয় স্বাধীনতা লোপকারী জালিয়াৎ ক্লাইবের কলুষিত চরিত্র ইংরাজগণ ভুলিলেও ভুলিতে পারে কিন্তু ক্লাইবের জন্ম স্থান সেই ইংলণ্ড, সোডম ও গোমরার দশাপ্রাপ্ত হইলেও ভারতবাসিগণ উহা ভুলিবেন না।

৩। মীর্জাফর।—আলিবর্দ্দী খাঁর বৈমাত্রেয় ভগিনী সাথানমের সহিত ইহাঁর বিবাহ হয়। সিরাজের প্রধান সেনাপতি মীর্জাফর জালিয়াৎ ক্লাইবের মিষ্ট বাক্যে, বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক প্রভুর বিনাশ সাধন করিয়া ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নবাবীপদে আসীন ছিলেন। ইংরাজের দেয় টাকার মধ্যে ৩৩৮৮৫৭৫০৲ টাকা প্রাপ্ত হন। মীর্জাফর সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে না পারায়, তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, তদীয় জামাতা মীরকাশিমকে ইংরাজ নবাবী পদ প্রদান করেন। পুনঃ ১৭৬ হইতে ১৭৬৫ খৃঃ জানুয়ারী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন। বর্ত্তমান নবাব ইহাঁরই বংশধর। মীর্জাফরের পুত্র নাজিমউদ্দৌলা বার্ষিক ৫৩৮৬১৩১৷৵০ টাকা বৃত্তি পাইতেন, কিন্তু বর্ত্তমান নবাব বার্ষিক প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা বৃত্তি পান।

৪। মীরকাশিম।—ইংরাজগণ ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে মীর্জাফরকে নবাবীপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মাশুল ব্যতীত, মাত্র তিন হাজার টাকা কর দিয়া এদেশে বাণিজ্য করিতেন। কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণও কোম্পানী-চিহ্নিত নিশান দেখাইয়া, বিনা মাশুলে বাণিজ্য করিতেছে দেখিয়া, মীরকাশিম একেবারে সকলের মাশুল উঠাইয়া দিলে ইংরাজদিগের ইহাতে ক্ষতি হওয়ায় বিবাদ উপস্থিত হয়। ইংরাজের ক্রীড়াপুতুল হইয়া থাকিতে অসমর্থ হইয়া, তিনি ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দিতে সঙ্কল্প করিলেন—গোপনে কার্য্য-সিদ্ধির মানসে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক পাশ্চাত্য প্রণালী মতে সৈন্যগণকে শিক্ষিত করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার জন্য যে ষড়যন্ত্র হইতেছে, তাহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। গিরিয়া, উধুয়ানালা এবং মুঙ্গেরের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলে, তাঁহার আশা ভরসা

একেবারে লোপ প্রাপ্ত হয়। জাফরগঞ্জের নবাব ইহাঁরই বংশধর। ফয়জালি খাঁ মেহেদী হোসেন খাঁ বার্ষিক ৬০ হাজার টাকা বৃত্তি পাইতেছেন।

৫। মীরণ—মীর্জাফরের পুত্র মীরণ সাহআলমের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া, সিরাজপত্নী-প্রার্থিত বজ্রাঘাতে হত হইয়া রাজমহালস্থ বর্ত্তমান সরিফাবাজারে সমাহিত হন। বর্ত্তমান নবাবের তত্ত্বাবধানে থাকিলেও উক্ত সমাধি ভগ্ন দশায় পরিণত। মীর্জাফরের পূর্ব্বেই মৃত্যু হওয়ায় ইহাঁর দ্বিতীয় পুত্র নাজিমউদ্দৌলা নবাবীপদ পান।

৬। নন্দকুমার—যে মহারাজ নন্দকুমার নিমন্ত্রিত লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই ব্রাহ্মণকুলতিলকের বিরুদ্ধে পাপীষ্ঠ হেষ্টিংস ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন জাল মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, তাঁহার পরম বন্ধু প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পে ৭০ বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ নন্দকুমারকে নিতান্ত অবিচার পূর্ব্বক ১৬ই জুন ফাঁসী দেন। দৌহিত্র-বংশীয় বর্ত্তমান কুমার দেবেন্দ্র নারায়ণ রায়ের বাটীতে উক্ত ধূলি এবং কাষ্ঠাসন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। জঙ্গিপুরের নিকট বহী অকুর গ্রামে ইহাঁরা পূর্ব্বে বাস করিতেন।

৭। জগৎশেঠ—বাদসাহ ফেরোক শাহের নিকট হইতে ১৭১৫ খৃঃ অব্দে মাণিক চাঁদ "শেঠ" উপাধি এবং তৎপুত্র ফতেচাঁদ ১৭২৪ খৃঃ অব্দে "জগৎশেঠ" উপাধি পাইয়া বাঙ্গালায় পেষকার হন। ইহাঁদের দ্বারা রাজকার্য্য পরিচালিত হইত।

৮। হাজার দুয়ারী—জেনেরাল ম্যাকলিওডের তত্ত্বাবধানে দেশীয় মিস্ত্রী দ্বারা দশ বৎসরে প্যালেস নির্ম্মিত হয়। কার্য্য ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে শেষ হয় এবং ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

৯। পলাশী—ভাগিরথী তীরস্থ পলাশী ক্ষেত্র, মুর্শিদাবাদের ১৮ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। পলাশী যুদ্ধে ইংরাজদিগের মাত্র ৭০ জন হতাহত হইয়াছিল। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে পলাশীর শেষ বৃক্ষটীর শুষ্ক মূলোত্তোলন করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। গ্রানাইট প্রস্তরের বিজয়স্তম্ভে লিখিত আছে ;—

PLASSEY.

"Erected by the Bengal Government, 1883."

১০। ভগবানগোলা—ভগবানগোলা বাঙ্গালা দেশের একটী সুবিখ্যাত প্রধান বন্দর ছিল। জলপথে যাতায়াত করিতে হইলে একমাত্র

ভগবানগোলা ব্যতিরেকে আর কোন উপায় ছিল না। ইহার বাজার হইতে বার্ষিক ৩০ লক্ষ টাকার কর আদায় হইত। ইহার উন্নতাবস্থার কথা শুনিয়া ভাস্কর পণ্ডিত ও আলিভাইয়ের অধীনস্থ মহাট্টাগণ ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত স্থান তিন চারি বার আক্রমণ করিয়া অর্থাদি লুণ্ঠন ও গৃহদাহান্তর ফিরিয়া যান। বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক সিরাজকে ধরাইয়া দেওয়ার পরে ভারতপ্রসিদ্ধ উক্ত বন্দর যে শোচনীয় দশায় পরিণত হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। আড়াই ক্রোশ দূরে অবস্থিত আলাতনীকে নূতন ভগবানগোলা বলে। বিশপ হীবার ১৮২৪ খৃঃ অব্দে ২রা আগষ্ট, ভগবানগোলার রমণীয়তায় মুগ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত কবিতাটী রচনা করেন।

"If thou wert by my side, my love !
How fast would evening fail,
In green Bengala's palmy grove,
Listening the nightingale !" etc."

(*Heber's Narative of a journey. Vol. I*)

অর্থাৎ—

এ সময়ে প্রিয়তমে রহিলে নিকটে,
সুখময় সন্ধ্যাকাল সুখে যেত চলি,
শ্যামল বঙ্গের শোভা তালবন মাঝে,
কলকণ্ঠ বিহগের শুনিয়া কাকলী॥

১১। মুর্শিদাবাদ—কেবল মুর্শিদাবাদের নহে, ভারতেরও ইতিহাস জানিতে হইলে নিম্ন লিখিত ইতিহাস গুলি পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

1. Holwell's India Tract, 2. Orme, 3. Malleson's Lord Clive, 4. Scrafton's reflection, 5. Bolt's consideration of Indian affairs, 6. Malleson's Decisive battles of India, 7. Holwell's Interesting Historical Events, 8. Stewart's History of Bengal, 9. Sheir Mutaqherin, 10. Gastrell's Statistical Account of Murshidabad, 11. Nikhil Babu's History of Murshidabad.

শ্রীকুঞ্জবিহারী লালা।

উজির জাফর বরমকী।

ইস্লাম সাম্রাজ্যের আদি খলিফা মহাত্মা আবুবক্কর হইতে বর্ত্তমান খলিফা তুরুস্কাধিপতি মহামাননীয় সম্রাট সোলতান আবদুল হামিদ খান পর্য্যন্ত সপ্তনব্বই জন খলিফা হইয়াছেন। তন্মধ্যে চতুর্ব্বিংশ খলিফা বোগ্দাদের অত্যুজ্জ্বল সূর্য্য মহামতি সম্রাট হারুন অল্ রশিদ সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁহার রাজত্ব কালে ইস্লাম সম্রাজ্যে উন্নতির এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারই সিংহাসনারোহণ সময়ে মুসলমানগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়া বিশ্ববাসীর চক্ষে ধাঁ ধাঁ লাগাইতে সমর্থ হইয়াছিল। হারুন অল রশিদের ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত, ধার্ম্মিক, ধীমান, বিদ্যোৎসাহী, দাতা ও দয়ালু এবং সর্ব্বগুণান্বিত সম্রাট ইতঃপূর্ব্বে এবং পরে ইসলাম রাজ্যে অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার সুবৃহৎ খণ্ড সমূহে তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পৃথিবীতে যত প্রকার ভাষায় গ্রন্থাদি আছে, দেশ-বিদেশ হইতে তৎসমস্ত গ্রন্থ আনয়ন করিয়া, তাহা আরবী ভাষায় অনুবাদ করাইয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। আরব্য উপন্যাসে তাঁহার বহুবিধ কীর্ত্তি কাহিনী পাঠকের নয়ন গোচর হয়। তাঁহার পঞ্চ জন মন্ত্রী ছিলেন, মন্ত্রিগণও সম্রাটের যাবতীয় গুণ গ্রামে বিভূষিত ছিলেন। অদ্য উক্ত সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী জাফর বরমকীর মহানুভবতা ও উদারতার দুই একটী ঐতিহাসিক গল্প "অঙ্কুরের" পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিতেছি। বৈদেশিক মুসলমান নরপতির একজন মন্ত্রীর আলোচনায় পাঠকের চিত্ত-বিনোদন করিতে পারিবে কিনা জানি না।

খলিফাকুল ধুরন্ধর সম্রাট হারুন অল রশিদের প্রধান মন্ত্রী জাফর বর-মকীর সহিত মিশরের শাসনকর্ত্তার নানা কারণে বিশেষ মনোমালিন্য উপ-স্থিত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জিঘাংসানলে উভয়ের হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল, কোন মতেই তাঁহাদের মনোমালিন্যের নিরাকরণ হইল না। কতক দিন পর্য্যন্ত উভয়ে উভয়ের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া অতঃপর ক্লান্ত হইয়া, একটু শান্তভাব ধারণ করতঃ, বিগত বিবাদ বিসম্বাদ ও আত্ম কলহের জন্য অনুতপ্ত হইলেন। অগ্র-বর্ত্তী হইয়া পুনঃ সদ্ভাব স্থাপনে উভয়েই লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইতে লাগি-লেন। ইত্যোমধ্যে অকস্মাৎ বোগ্দাদবাসী এক ব্যক্তি জাফরের হস্তাক্ষরের

অনুরূপ এক খানি জাল পত্র প্রস্তুত করিয়া মিশর গবর্ণমেণ্টের সমীপে লইয়া গেল। বলা বাহুল্য তাহাতে ঐ ব্যক্তির স্বার্থোদ্ধারের জন্য মন্ত্রীবর জাফরের কথিত অনেক অনুরোধ উপরোধ লিপিবদ্ধ ছিল। মিশর গবর্ণমেণ্টের নিকট ঐ ব্যক্তি, পত্র সহ উপস্থিত হইলে, মিশর গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া যৎপরোনাস্তি আদর অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, প্রধান মন্ত্রী জাফরের সহিত দীর্ঘকাল যাবৎ নিতান্ত অমঙ্গলকর যে জিঘাংসানল প্রজ্বলিত হইয়া উভয়ের হৃদয়কে দগ্ধীভূত করিতেছিল, যাহার জন্য দিবারাত্র আমাকে শঙ্কিত ও ত্রাসিত থাকিতে হইত, এই ব্যক্তির দ্বারাই বোধ হয় তাহাতে শান্তিবারি বর্ষিত হইল। এই ভাবিয়া মন্ত্রীবরের পত্র খানি মিশর গবর্ণমেণ্ট দুর্লভ রত্নের ন্যায় বারংবার দেখিতে লাগিলেন। দুই এক দিন পর ঐ পত্রের প্রকৃততা সম্বন্ধে তাঁহার বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। অবিলম্বে জনৈক হরকরা দ্বারা পত্র খানির সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ জন্য বোগ্দাদে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহার বোগ্দাদস্থ প্রতিনিধিকে লিখিলেন যে মন্ত্রীপ্রবর জাফরের নিকট এই পত্র পেশ করিয়া পত্রের প্রকৃততা সম্বন্ধে সত্বর রিপোর্ট করেন। পত্র মিশরের প্রতিনিধির হস্তগত হওয়া মাত্রই জাফরের নিকট পেশ করিলেন। মন্ত্রীবর জাফর পত্র দর্শন মাত্রই বুঝিতে পারিলেন যে এই পত্র তাহার কর কমলাঙ্কিত নহে, নিশ্চয় কোন 'জালিয়াত' জাল করিয়াছে। তাঁহার সভাসদ্‌গণকে পত্র খানি দেখাইয়া, তাহাদিগকেও পত্রের প্রকৃততা সম্বন্ধে তদ্বিক করিতে বলিলেন। সকলে একবাক্যে বলিল এই পত্র কখনই উজ্জারতপানার হস্তলিপি নহে, নিশ্চয় কোন দুর্ব্বৃত্ত জালিয়াৎ ইহা জাল করিয়াছে। মহাভাগ জাফর বলিলেন আচ্ছা, যে ব্যক্তি তাহার নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমার পরম শত্রুর নিকট এরূপ জাল পত্র লইয়া গিয়াছে তাহাকে কি করা উচিত? কেহ বলিলেন এমন ব্যক্তিকে নিশ্চয়ই হত্যা করা উচিত, তাহাতে অন্যান্য লোক জানিবে যে, বাদসার উজিরের নামে জাল করিলে এইরূপ শাস্তি ভোগ করিতে হয়। কেহ বলিলেন এমন ভয়ানক জালিয়াতের দক্ষিণ হস্ত কর্ত্তন করা উচিত। কেহ বলিলেন এমন পাপিষ্ঠকে গদাঘাতে জর্জ্জরিত এবং নাসিকা কর্ণ ছেদন করা উচিত। উপস্থিত মোসাহেবগণের মধ্যে যিনি নিতান্ত দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন তিনি বলিলেন, উজ্জারতপানা! এই ব্যক্তিকে পদব্রজে মিশর হইতে বোগ্দাদে আসিতে আদেশ করুন। কেননা এই ব্যক্তি স্বার্থলাভাশায় বোগ্দাদের গবর্ণমেণ্টের নিকট

গিয়াছে, কত বৃহৎ আকাঙ্ক্ষাই না হৃদয়ে পোষণ করিতেছে, এখন যদি কোন সুফল প্রাপ্ত না হয়, স্বার্থসিদ্ধ না হয়, এবং রিক্ত হস্তে ফিরিতে হয়, তবে তাহা হইতে আর কষ্টের বিষয় কি আছে? আশায় নিরাশ, বহুদূর দূরান্তর রাস্তা পর্য্যটনই ইহার পক্ষে যথেষ্ট শাস্তি হইবে। জাফর চুপ করিয়া তাহাদের মতামত শুনিতেছিলেন। যখন সকলের বক্তব্য শেষ হইল, তখন মহানুভব জাফর বলিতে লাগিলেন—কি! তোমাদের মধ্যে সৎজ্ঞানী ও উদার হৃদয় ব্যক্তি কি কেহ নাই? ভাল মন্দ বিচার করিতে পারে এমন ব্যক্তি কি তোমাদের মধ্যে বিরল? তোমরা সকলেই জান মিশর গবর্ণমেণ্টের সহিত আমার কি পরিমাণ শত্রুতা ও মনোমালিন্য চলিয়া আসিতেছে। শুধু আমার আত্মম্ভরিতা ও উদাসীনতা বশতঃই এত দিন তাঁহার সহিত আমার বিবাদের নিষ্পত্তি হয় নাই। সর্ব্বশক্তিমান বিধাতা এখন এই ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়া, তাঁহা কর্ত্তৃক আমাদের শত্রুতা দূর হইয়া মিত্রতার সৃষ্টি হইল। মনঃপ্রাণ দগ্ধকারী ভীষণ জিঘাংসানলে শান্তির সুশীতল বারি-সেচন হইল। তোমরা কি এমন মহৎ ব্যক্তিকে এতাদৃশ কঠিন শাস্তি প্রদান করিতে বল? এই বলিয়া জাফর সেই পত্র খানির পৃষ্ঠে লিখিতে লাগিলেন।

মহাত্মন! বিধাতা আপনার প্রতি প্রসন্ন হউন। আপনি কিরূপে অনুভব করিলেন যে এই লিপিকা অপ্রকৃত ছিল। ইহা আমার নিজ হস্তের লিখা এবং পত্র বাহক আমার একজন অকৃত্রিম ও বিশ্বস্ত বন্ধু। আশা করি আপনি তাহার সহিত ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করিবেন এবং যত শীঘ্র হইতে পারে তাঁহাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহার অদর্শনে আমি নিতান্ত ব্যস্ত আছি। সত্বর সাক্ষাৎ করিতে আমার একান্ত বাসনা।

আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী জাফর।

এই পত্র খানি পুনরায় মিশর গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইল। পত্রের পৃষ্ঠের লিখা দেখিয়া মিশর গবর্ণমেণ্ট নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং আমূল বৃত্তান্ত ঐ ব্যক্তিকে বলিলেন। পর দিন প্রাতে বিপুল অর্থরাশী প্রদান করিয়া রাজকীয় যানে ও হেফাজতে তাহাকে বোগদাদে পাঠাইয়া দিলেন। অতুল ধনরত্নাদি সহ ঐ ব্যক্তি বোগদাদে প্রত্যাগমন করিয়াই মন্ত্রীপ্রবর জাফরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, ভক্তিরসাপ্লুত চিত্তে তাঁহার পদবিলুণ্ঠিত হওতঃ অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। জাফর হৃষ্টচিত্তে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, তোমাকে মিশরপতি কি দিয়াছেন? সে অকপট

চিত্তে বলিল, মিশরাধিপতি আমাকে এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। তখন জাফরও তাঁহার ধনাগার হইতে আরও এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করিয়া বলিলেন, যাও! এখন গিয়া পরমানন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাক। পাঠক! দেখুন, প্রাচ্য নরপতির একজন মন্ত্রীর উদারতা ও মহানুভবতার জ্বলন্ত চিত্র দেখুন। বর্ত্তমান সময়ে কেহ কোন রাজ প্রতিনিধির সহিত এরূপ প্রবঞ্চনা ও দুষ্টামী করিলে তাহাকে মহারাজ নন্দকুমারের দশা প্রাপ্ত হইতে হইত না কি?

(ক্রমশঃ)

সৈয়দ নুরুল হোসেন।

ললাট লিপি।

ভোজনং যত্র তত্রৈব শয়নং হট্টমন্দিরে।
মরণং গোমতী তীরেহ্ পরং বা কিং ভবিষ্যতি॥

পূর্ব্বকালে বাচস্পতি মিশ্র নামা জনৈক জ্যোতির্ব্বিৎ ব্রাহ্মণ নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া, অবশেষে পুণ্যতোয়া গোমতী নদী তীরবর্ত্তী কোন এক স্থানে আসিয়া সহসা দেখিতে পাইলেন যে, একটী মৃত মনুষ্যের মস্তক নদী-সৈকতে নিপতিত রহিয়াছে। নরমুণ্ডের নিকটবর্ত্তী হইয়া, জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত দেখিলেন যে, তাহার ললাটদেশে সংস্কৃত ভাষায় (সংস্কৃত দেব-ভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধ) উপরোক্ত শ্লোকটী লিখিত রহিয়াছে। মৃত-মনুষ্য-মুণ্ডে লিখিত শ্লোকটীর ভাবার্থ এই যে, জীবিতাবস্থায় এই মনুষ্যটীর যথায় তথায় ভোজন, হট্টমন্দিরে শয়ন, এবং গোমতী-নদী-তীরে মৃত্যু হইবে। তৎপরও এই ব্যক্তির অদৃষ্টে যে আরও কি ঘটিবে, তাহা বলা যায় না। জ্যোতির্ব্বিৎ ব্রাহ্মণ এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া, মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, উক্ত মৃত ব্যক্তির যাহা ঘটিবার তাহা ত সমস্তই ঘটিয়াছে। মৃত্যুর পর আর অধিক কি ঘটিতে পারে। অতঃপর ইহার অদৃষ্টে অধিক আর কি অশুভ-সংঘটন হইতে পারে? যাহা হউক, এই ব্যক্তির ললাট-লিপির ফলাফল পরীক্ষা করিতে হইবে। দেখা যাউক, ভবিষ্যতে এই নরমুণ্ডের ভাগ্যে আরও বা কি ঘটে। মনে মনে এইরূপ বিচার করতঃ, ব্রাহ্মণ উক্ত নরমুণ্ডটী গোমতী-বেলা হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক, তাহা স্বীয় বসন-মণ্ডিত করিয়া, স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং বস্ত্রাবৃত অবস্থায়, নরমুণ্ডটীকে

স্বগৃহের কোন এক স্থানে লুক্কাইত করিয়া রাখিলেন। এবং কত দিনে বিধাতার অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে, কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে, একদিবস উক্ত ব্রাহ্মণ স্নান হেতু নদীতীরে গমন করিলে পর, তাঁহার সহধর্ম্মিণী গৃহকার্য্য করিতে করিতে সহসা দেখিতে পাইলেন যে, শয়ন প্রকোষ্ঠের কোন এক স্থানে বস্ত্রপোট্টলী-মধ্যে একটী কি পদার্থ রহিয়াছে। কৌতূহলাক্রান্তা হইয়া, ব্রাহ্মণ-গৃহিণী তৎক্ষণাৎ সেই পোট্টলীর বসন উন্মোচন করিলেন, এবং তন্মধ্যে মৃত মানবের একটী মুণ্ড সন্দর্শনে চকিত ও যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন। নারী জাতি স্বভাবতঃই সন্দেহমনা। এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে ব্রাহ্মণ-পত্নী মনে মনে অনুমান করিলেন যে, তাঁহার স্বামীর কোন প্রণয়িণী নায়িকার মৃত্যু হইয়াছে; ব্রাহ্মণ সেই রমণীর প্রণয়-পাশে বিশেষরূপে আবদ্ধ ছিল, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। ভালবাসার বস্তু সহজে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়াই, সেই মৃতা প্রণয়িণীর মস্তকটী অতীব যত্ন সহকারে, ও অতি সংগোপনে আপনার শয়ন-মন্দিরে আনিয়া রাখিয়াছে। ইহা ব্যতীত, আর কিছুই সম্ভবপর হইতে পারে না। হিংসাপরতন্ত্রা রমণী ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, নারী-জাতি-সুলভ রোষ-পরবশে সেই নরমুণ্ডটীকে তৎক্ষণাৎ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, বিষ্ঠা-কুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। অভিমান বশতঃ, এ সকল বৃত্তান্ত স্বামীর নিকট প্রকাশ না করিয়া, আপাততঃ ইহা গোপন রাখিলেন।

অনন্তর, কোনও সময়ে এই ঘটনা প্রকাশ পাইলে, তৎকালে, জ্যোতির্ব্বিৎ ব্রাহ্মণ জানিতে পারিলেন, সেই মৃত মানবের ললাটদেশে যে 'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি' লিখিত ছিল, এতদিনে তাহার ফল ফলিয়াছে।

এই গল্পটীর তাৎপর্য্য এই যে, দেবতার লিখন কখনও ব্যর্থ হয় না। পুরুষার্থ দ্বারা কদাচ দৈব লঙ্ঘন করা যায় না। পুরুষার্থবাদী যাহাকে পুরুষকার মধ্যে গণনা করিয়া থাকে, তাহাও দৈব-নিয়ন্ত্রিত, তাহাতে আর কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই।

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

রত্নমালা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(৮৬)

উত্তমস্যাপি বর্ণস্য নীচোঽপি গৃহমাগতঃ।
পূজনীয়ো যথাযোগ্যং সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ॥

ভাবার্থ—নীচ ব্যক্তিও কখন, উচ্চ জাতির সদন
অতিথি স্বরূপ কৈলে আগমন ;
সেই ব্যক্তি সে সময়, যথাযোগ্য পূজ্য হয়।
সর্ব্বদেবময় অতিথি যে জন॥

(৮৭)

বালো বা যদি বা বৃদ্ধো যুবা বা গৃহমাগতঃ।
তস্য পূজা বিধাতব্যা সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥

ভাবার্থ—কি বালক, বৃদ্ধ কিংবা হয় যুব জন,
যেই হোক, যদি গৃহে করে আগমন ;
পূজা বা সম্মান করা উচিত তাঁহার ;
যেহেতু অতিথি হন গুরু সবাকার॥

(৮৮)

অধিষ্ঠাতাতিথির্গেহে সন্তুতং সর্ব্বদেবতাঃ।
তীর্থান্যেতানি সর্ব্বাণি পুণ্যানি চ ব্রতানি চ॥

ভাবার্থ—অতিথি গৃহস্থ-গৃহে হ'লে অধিষ্ঠিত।
নিখিল দেবতা তথা' হন উপস্থিত॥
সমুদায় তীর্থ আর ব্রতাদির পুণ্য।
হয় লাভ গৃহস্থের ;—হয় গৃহী ধন্য॥

(৮৯)

শ্লাঘ্যঃ স একো ভুবি মানবানাং, স উত্তমঃ সৎ পুরুষঃ স ধন্যঃ।
যস্যার্থিনো বা শরণাগতা বা, নাশা বিভঙ্গা বিমুখাঃ প্রয়ান্তি॥

ভাবার্থ—জগতে,—মনুষ্য-মধ্যে—সেই মাত্র শ্লাঘ্য, সৎ,
উত্তম ও ধন্য সুনিশ্চয়।

যাঁহার নিকট হ'তে প্রার্থী ও শরণাগত
নিরাশ ও বিমুখ না হয়॥

(৯০)

জনং জনপদা নিত্যমর্চ্চয়ন্তি নৃপার্চ্চিতম্।
নৃপেণাবমতো যস্তু স সর্ব্বৈরবমন্যতে॥

ভাবার্থ—রাজানুগৃহীত জনে, দেখা যায় এ সংসারে,
সবে করে উপাসনা।
রাজ-কৃত তিরস্কৃত, যেই জন,—সর্ব্বে তা'রে
করয়ে অবমাননা॥

(৯১)

অনাহূতো বিশেদ্যস্তু অপৃষ্টো বহু ভাষতে।
আত্মানং মন্যতে প্রীতং ভূপালস্য স দুর্ম্মতিঃ॥

ভাবার্থ—আহূত না হইয়াও যদি কোন জন।
কাহারো সমীপে কভু করয়ে গমন॥
জিজ্ঞাসিত না হ'য়েও বহু কথা কয়।
রাজ-প্রিয় নিজে,—যা'র এ ধারণা হয়॥
জানিবে তাহার নাহি কিছু মাত্র বোধ।
ভব-মাঝে, সে দুর্ম্মতি নিতান্ত নির্ব্বোধ॥

(৯২)

নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রা ময়ূরা মেঘদর্শনে।
সাধবঃ পরসম্পৎসু খলাঃ পরবিপত্তিষু॥

ভাবার্থ—ভোজনে ব্রাহ্মণ, মেঘ হেরি' শিখীগণ,
অন্যের সম্পদে সাধু,
পরঃ-বিপদে অসাধু,
স্বভাবতঃ মনানন্দে করয়ে কুর্দ্দন॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ।

গঙ্গারাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

রাধানাথ চলিয়া গেলে শ্যামা কিয়ৎক্ষণ স্পন্দহীনার ন্যায় সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর আপনার কক্ষে গিয়া শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে মনে মনে বলিল,—"হে ভগবান, হে মা কালী, হে মা দুর্গা, আমাকে বাঁচাও—আমার বুকে বল দাও।"

কাঁদিতে কাঁদিতে, ভাবিতে ভাবিতে শ্যামার কত কথা মনে পড়িল। শৈশবের কথা, কৈশোরের কথা, যৌবনোদয়ের কথা মনে পড়িল। মাতার স্নেহের কথা, পিতার আদরের কথা, স্বামীর সোহাগ সম্ভাষণের কথা মনে পড়িল। স্বামীর কথা মনে পড়ায় তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। হায়,সেই স্বামী—যাঁহার আদরে, যাঁহার স্নেহে, যাঁহার সোহাগে শ্যামার দুইটী সুখের বৎসর জলের মত কাটিয়া গিয়াছে, দুই বৎসরের মধ্যে যিনি তাহাকে একদণ্ডের জন্যও চক্ষের আড় করেন নাই, সেই দেবতুল্য প্রেমময় দয়াময় স্বামী এত নিষ্ঠুর হইলেন কেন? বিনাদোষে বিষলতার ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন কেন? সেই যে একদিন এমনই জ্যোৎস্না-প্রফুল্ল নিশীথে চন্দ্রকর-প্লাবিত ছাদের উপর দাঁড়াইয়া, তাহার অধরে সোহাগের চুম্বন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'শ্যামা, সব ভুলিব, কিন্তু তোমাকে ভুলিতে পারিব না।' তবে আজ তিনি ভুলিলেন কেন? দুই হাতে বুক চাপিয়া শ্যামা অশ্রুপ্রবাহে উপাধান সিক্ত করিতে লাগিল। গবাক্ষ পথ প্রবাহী শান্ত কৌমুদীরশ্মি তাহার শয্যার উপর আসিয়া পড়িল; স্নিগ্ধ নৈশ সমীরণ তাহাকে বীজন করিতে লাগিল। শ্যামা কাঁদিয়া কাঁদিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া অনিদ্রায় রজনী অতিবাহিত করিল।

শেষ রাত্রিতে একটু তন্দ্রা আসিল। কিন্তু সে তন্দ্রা কেবল স্বপ্নময়। শ্যামা স্বপ্নে দেখিল, যেন এক দেবকান্তি পুরুষ আসিয়া, ধীরে ধীরে তাহার শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইল। শ্যামা চিনিল, সে পুরুষ তাহার স্বামী। শ্যামাকে সম্বোধন করিয়া পুরুষ মধুর স্বরে বলিলেন,—"এস।"

শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় যাইব?"

পুরুষ বলিলেন,—"আমার কাছে।"

শ্যা। তোমরা যে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ?

পু। তখন আমরা তোমাকে পাপিষ্ঠা ভাবিয়াছিলাম।

শ্যা। আর এখন? পু। এখন বুঝিয়াছি, তুমি শুদ্ধা।

শ্যা। না, তা নয়। পু। তবে কি?

শ্যা। তখনই আমি শুদ্ধা ছিলাম। পু। এখন?

শ্যা। এখন আমি পাপিষ্ঠা।

পুরুষ ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া বলিলেন,—"কেন তোমার এ কুমতি হ'ল?"

শ্যামা বলিতে যাইতেছিল, কেন তোমরা আমায় ত্যাগ করিলে? কিন্তু তাহা না বলিয়া বলিল,—"আমার অদৃষ্ট।"

পু। আমি বুঝিতেছি, এখনও তোমার সম্পূর্ণ অধঃপতন হয় নাই। পারতো এখনও ফিরে এস।

শ্যা। না। পু। কেন?

শ্যা। এ কলুষিত হৃদয় লইয়া আর তোমার কাছে যাইতে পারিব না।

পু। তবে কোথায় যাইবে? শ্যা। অদৃষ্ট যেখানে লইয়া যায়।

পু। সে কোন্ স্থান জান কি? শ্যা। না।

পু। আমি জানি; দেখিবে? শ্যা। দেখিব।

তখন পুরুষ অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"ঐ দেখ।"

শ্যামা চাহিয়া দেখিল। দেখিল কি ভীষণ দৃশ্য! তাহার এই কুসুম-সুকোমল শয্যার নিম্নদেশে বিশাল সমুদ্র তরঙ্গ গর্জ্জন করিতেছে। সে সমুদ্রে জল নাই, জলের পরিবর্ত্তে রক্তবর্ণ লেলিহমান হুতাশন গর্জ্জন করিয়া বেড়াইতেছে, তরঙ্গে তরঙ্গে বহ্নির করাল শিখা উঠিয়া ব্যোম স্পর্শ করিতেছে, গর্জ্জনে বিশ্ব বিদীর্ণ হইতেছে; শব্দায়মান বহ্নি-তরঙ্গ ভেদ করিয়া হাহাকারের ভীম কল্লোল উত্থিত হইতেছে। শ্যামা ভয়ে চীৎকার করিতে গেল, কিন্তু কণ্ঠস্বর বাহির হইল না। কে যেন গলা চাপিয়া ধরিয়াছে। তখন সে সভয়ে কম্পিত হৃদয়ে স্বামীর দিকে চাহিল; কিন্তু দেখিল, তথায় আর সেই দেবকান্তি পুরুষ নাই। তাঁহার পরিবর্ত্তে আর এক ভীষণদর্শন বিকৃতকায় পুরুষ তথায় দণ্ডায়মান। শ্যামা চিনিল, সে পুরুষ রাধানাথ। রাধানাথ, শ্যামার দিকে চাহিয়া সহাস্য বদনে বলিল,—"শ্যামা, এস।"

কাঁপিতে কাঁপিতে শ্যামা বলিল,—"না, আমি যাব না।"

কিন্তু রাধানাথ সে কথা শুনিল না। সে উভয় বাহুদ্বারা শ্যামাকে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া ধরিল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাকে লইয়া সেই গর্জ্জনশীল বহ্নি-

সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িল। শ্যামা চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল।

শ্যামা কাঁপিতে কাঁপিতে ঘর্ম্মাপ্লুত দেহে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। চাহিয়া দেখিল, প্রভাত-সূর্য্য-রশ্মি গবাক্ষপথে আসিয়া তাহার শয্যা চুম্বন করিতেছে। বাহির হইতে কে বলিতেছে,—"ভয় পেয়েছ দিদি ?"

শ্যামা দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। দেখিল, দ্বার সম্মুখে রুক্মিণী দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছে।

নবম পরিচ্ছেদ।

সেইদিন মধ্যাহ্নকালে নির্জ্জন কক্ষে একা বসিয়া শ্যামা ভাবিতেছিল। সুমতি ও কুমতির বাদানুবাদ ছলে আমরা তাহার চিন্তার কিয়দংশ এস্থলে প্রকাশ করিতেছি।

সুমতি বলিল,—"যা হবার হয়েছে, এখনও স্বামীর কাছে ফিরে চল।"

কুমতি বলিল,—"বাহবা, আমি কি ইচ্ছা ক'রে যাই নাই ? তারাই তো আমাকে ত্যাগ করেছে।"

সু। ত্যাগ করলেও সেখানে যেতে হবে।

কু। এত গরজ কেন ? সু। সে যে স্বামীর ঘর।

কু। স্বামী যে পর করে দিয়েছে তার কি ?

সু। পর করলেও স্বামীই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি।

কু। তাতো বুঝলাম, কিন্তু সেখানে গেলেও তারা যে ঘরে নেবে না ?

সু। ঘরে না নেয়, বাহিরেই থাকবে। দাসীবৃত্তি করবে।

কু। ছি ছি, দাসীবৃত্তি ? সু। দোষ কি ?

কু। তোমার মুখে ছাই। তার চেয়ে ভিক্ষা ক'রে খাব।

সু। এ হ'তে কি ভিক্ষা ভাল ?

কু। যে গৃহের আমি সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, সেখানে দাসীবৃত্তি করা অপেক্ষা ভিক্ষা লক্ষ গুণে ভাল।

সু। কিন্তু ভিক্ষা করতে পারবে কি ?

কু। তা' এখন ঠিক বলতে পারি না। ভিক্ষায় বেরুলে বলব।

সু। তার চেয়ে মর না কেন ?

কু। সংসারে যার মা নাই, বাপ আশ্রয় দেয় না, স্বামী তাড়িয়ে দিয়েছে, তার আর মরণের বাকী কি ?

সু। যেটুকু বাকী আছে, সেটুকুও আর থাক্‌বে না।

সুমতি কুমতি চুপ করিল। এমন সময় বাহিরে খঞ্জনীর তালে তালে কে গাহিল,—

বিজন বিপিনে যমুনা পুলিনে শ্যাম নটবর রে।
হই উতরোলি রাধা রাধা বলি ফুকারে মুরলী রে।

স্বরটা গায়িকার। গায়িকার কণ্ঠটাও বড় মিষ্ট। শ্যামা গায়িকাকে ডাকিয়া আনিতে দাসীকে আদেশ করিল। গায়িকা আসিল। আসিয়া শ্যামার উপর মৃদু হাস্য পূর্ণ একটা কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া খঞ্জনীর মৃদু তালে আবার গান ধরিল,—

ইতি উতিরায় বাঁশরী বাজায় সজল নয়ান বয়ান রে।
তু নিঠুর হিয়া সোহি পাশরিয়া কৈছে রাখব পরাণ রে।

শ্যামা জিজ্ঞাসিল,—"তুমি কে গা?"

"আমি বৈষ্ণবী" বলিয়া গায়িকা গাহিতে লাগিল,—

কাহেলো নাগরী কানু বিসরই কেমন কঠিন পরাণী রে।
তুহার লাগিয়া নাগর কালিয়া রোয়ত দিবস যামিনীরে।

শ্যামা বলিল,—"কানুর কথা পরে হবে। এখন তোমার নামটী কি বল দেখি?"

বৈষ্ণবী বসিল। বসিয়া বলিল,—"আমার নাম রসমঞ্জরী, লোকে আমাকে মঞ্জরী ব'লে ডাকে।"

শ্যামা বলিল,—"এতো লোকের কম অন্যায় নয়, একবারে রসটাকেই ফেলে দিয়েছে?"

ঈষৎ হাসিয়া মঞ্জরী বলিল,—"অরসিকের হাতে রসের এমনই দুর্গতি।"

শ্যামাও একটু হাসিল। বলিল,—"তুমি কি কর?"

ম। গান গাই, ভিক্ষা করি। শ্যা। ভিক্ষা মিলে?

ম। অভাব কি? শ্যা। তুমি থাক কোথায়?

ম। ঠিক নাই। শ্যা। তবু?

ম। যখন যেখানে ভিক্ষা মিলে। শ্যা। তোমার আর কে আছে?

ম। কেউ না। শ্যা। একা থাক?

ম। সঙ্গী জোটে না। শ্যা। জোটে না, না জুটাও না?

ম। দুইই বটে। শ্যা। তোমার একা থাকতে ভয় করে না?

ম। কিসের ভয়? শ্যা। চোর ডাকাতের?

ম। যাদের ধন আছে, তাদেরই চোর ডাকাতের ভয় হয়, আমার কি আছে যে চোর ডাকাতে নেবে? শ্যা। যা আছে।

মঞ্জরীর বয়সটা কাঁচা, প্রাণটাও হাল্‌কা। সুতরাং সে শ্যামার উপর মৃদু কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—"এত হীরে মাণিক প'ড়ে থাক্‌তে এ কাণা কড়ির জন্য কে আসবে?"

শ্যামা বুঝিল, জবাবটাও ঠিক হইয়াছে। সে একটু হাসিয়া বলিল,—"যদিই আসে?"

ম। ঘরের দরজা শক্ত থাকলে হাজার ডাকাতেও কিছু করতে পারে না।

শ্যামা ভাবিল, কথাটা ঠিক। বলিল,—"তুমি বৈষ্ণব করনা কেন?"

ম। করেছিলাম। শ্যা। তারপর?

ম। সে আমাকে পছন্দ করলে না।

শ্যা। তার চোক নাই।

ম। চোক না থাকলে কাণা কড়ি ফেলে হীরে মাণিক কুড়ুতে যাবে কেন?

শ্যা। তা' তুমি তার কাছেই থাক না কেন?

ম। সে যখন আমাকে চায় না, তখন আমি যেচে তার কাছে থাকব কেন?

কুমতি, সুমতিকে বলিল,—"শুন্‌লি মাগি?"

সুমতি বলিল,—"আর দিন কতক পরে শুন্‌ব।"

শ্যামা বলিল,—"তুমি আমাকে সঙ্গে নেবে?"

মঞ্জরী হাসিয়া বলিল,—"বৈষ্ণব ক'রে নাকি?"

শ্যা। না, বৈষ্ণবী ক'রে। ম। ভয় হয়।

শ্যা। কিসের ভয়?

ম। পয়সা কড়ি সঙ্গে থাকলেই ডাকাতে ধরে।

শ্যা। আমি কি পয়সা কড়ির মধ্যে?

ম। তা' হলেও তো বাঁচতাম। এ যে হীরে মাণিক।

শ্যা। তুমি মর। ম। যদি পুরুষ হ'তাম।

তারপর মঞ্জরীর সহিত শ্যামার আরও অনেক কথা, অনেক হাস্য পরিহাস হইল। সে সকল কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই।

মঞ্জরীর কথা শুনিয়া শ্যামা বুঝিল, সে যেমন মুখরা, তেমনই চতুরা।

মঞ্জরী উঠিল। বলিল,—"আজ আসি।"

শ্যামা বলিল,—"কাল আবার আস্‌বে ?"

মঞ্জরী বলিল,—"আস্‌ব।"

শ্যামা বলিল,—"তোমাকে তো ভিক্ষা দেওয়া হ'লো না ?"

মঞ্জরী বলিল,—"যে ভিক্ষা পেয়েছি, অনেক রাজা রাজড়াও এমন ভিক্ষা পায় না।"

মঞ্জরী হাসিল, শ্যামাও হাসিল। তারপর মঞ্জরী খঞ্জনীতে আঘাত করিয়া আপন মনে গাহিতে গাহিতে চলিল,—

বিজন বিপিনে যমুনা পুলিনে শ্যাম নটবর রে।

মঞ্জরী চলিয়া গেলে শ্যামা আপন মনে বলিল,—"তাই ভাল।"

দশম পরিচ্ছেদ।

এখন আমরা মঞ্জরীর একটু পরিচয় দিব। মঞ্জরী কাহার মেয়ে, তাহা আমরা জানি না, বিল্বগ্রামের লোকেরাও জানে না। তাহার বয়স যখন সাত কি আট বৎসর, তখন সে এক বৃদ্ধ বৈষ্ণবের সহিত বিল্বগ্রামে আসিয়াছিল। সেখানে আসিবার কিছুদিন পরে বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। তদবধি মঞ্জরী বিল্বগ্রামেই আছে। সে অনেকদিনের কথা। এখন মঞ্জরীর বয়স পঞ্চদশ কি ষোড়শ।

মঞ্জরী তত সুন্দরী নয়। তাহার গায়ের রংটা একটু ময়লা, দেহটা একটু খর্ব্বাকৃতি। নীল পদ্মের উপর যদি রাঙ্গা মেঘের ছায়া পড়ে, আর কোন চিত্রকর যদি তাহাকে আর একটু পীত—আর একটু গোলাপী রঙ্ দিয়া চিত্রিত করিতে পারে, তবে আমি তাহার সহিত মঞ্জরীর রূপের তুলনা করিতে পারি। তাহার মুখখানি চাঁদের মত না হইলেও বেশ ছোট খাট, মানান-সই। যদি কোন শিল্পী, দেবী প্রতিমার মুখখানিকে আর একটু চাঁচিয়া, চক্ষু দু'টীকে আর একটু ছোট করিয়া, নাসিকাটীকে আর একটু স্থূলাগ্র করিয়া গড়িতে পারে, তবে আমি বলিতে পারি, মঞ্জরীর মুখখানি ঠিক দেবী প্রতিমার মুখের মত। প্রাবৃটের জাহ্নবী যদি এত কুলপ্লাবিনী, এমন তরঙ্গ-ভঙ্গ-চঞ্চলা, এমন উচ্ছ্বাসময়ী না হইত, তাহা হইলে আমি তাহার সহিত মঞ্জরীর শান্ত যৌবন-তরঙ্গের তুলনা করিতে পারিতাম। শরতের অপরাহ্নের মেঘ যদি এত রাঙ্গা না হইত, তাহার কোলে স্ফুরিত বিদ্যুৎ যদি এতক্ষণ স্থায়ী না হইত

তবে আমি বলিতাম, মঞ্জরীর মৃদু-হাস্য-স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে বিদ্যুদ্দাম শোভিত সান্ধ্য-শারদ-মেঘচ্ছটা বিরাজিত। সুকোমল পদ্মনাল যদি আর একটু স্থূলকায় আর একটু অভঙ্গুর হইত, যদি তাহার গায়ে কাঁটা না থাকিত, তবে মঞ্জরীর সুগোল ভুজদ্বয়কে মৃণালভুজ বলা যাইত। গজেন্দ্র যদি আর একটু অধীর গতি বা খঞ্জনা আর একটু ধীরগতি হইত, তবে আমি তাহাদের সহিত মঞ্জরীর গতির তুলনা করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতাম। কিন্তু যাহা হইবার নহে, যাহা অস্বাভাবিক, তাহার সহিত তুলনা করিয়া ফল কি। তবে আমি কিরূপে তোমাদিগকে মঞ্জরীর সৌন্দর্য্য বুঝাইয়া দিব? মঞ্জরী ভিখারীর মেয়ে ভিখারিণী। ভিখারিণীর যতটুকু রূপ—যতটুকু সৌন্দর্য্য কল্পনা করিলে তোমাদের গৃহ-কলহের সম্ভাবনা না হয়, তোমরা ততটুকুই কল্পনা করিয়া লইও।

সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, মঞ্জরীর কথাগুলি। কিন্তু চাঁদে কলঙ্ক আছে, মৃণালে কণ্টক আছে, মধুচক্রে মক্ষিকার হুল আছে। তাই মঞ্জরীর সেই মিষ্ট কথা-গুলার ভিতরেও এক একটা শ্লেষের হুল থাকে। তবে এই হুল না থাকিলে বোধ হয়, তাহার কথাগুলা এত মিষ্ট হইত না। যেখানে মক্ষিকার দংশন ভয় নাই, সেখানে মধুও থাকে না।

বয়সে যুবতী হইলেও ব্যবহারে মঞ্জরী বালিকা। তাহার যুবতীর মত লজ্জা বা সঙ্কোচ নাই, গর্ব্ব বা গাম্ভীর্য্য নাই। সে যখন নাসাগ্রে একটী সূক্ষ্ম তিলক কাটিয়া, শুভ্রবাসে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, গলায় তুলসী কাঠের এক ছড়া মোটা মালা ঝুলাইয়া, খঞ্জনীর তালে তালে মধুর কণ্ঠে কীর্ত্তনের সুরে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা গান করে, তখন যে তাহাকে দেখে, যে তাহার গান শুনে, সেই মুগ্ধ হয়।

রুদ্রনারায়ণ, দূতীরূপে মঞ্জরীকে শ্যামার নিকট পাঠাইয়াছেন বলিয়া তোমরা যেন ভাবিও না, মঞ্জরীর ইহাই ব্যবসা। অন্য কেহ এমন কথা বলিলে মঞ্জরী তাহার জন্য সদ্যঃ চিতানলের ব্যবস্থা না করিয়া ছাড়িত না। কিন্তু রুদ্রনারায়ণের কথা স্বতন্ত্র। আসল কথা, চঞ্চলা হরিণী এই খানেই ধরা পড়িয়াছিল। কিরূপে যে কি হইয়াছিল, তাহা আমরা জানি না। তবে মঞ্জরী যখন বালিকাবস্থায় জমিদার বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে আসিত, তখন রুদ্রনারায়ণ তাহাকে সম্মুখে বসাইয়া তাহার গান শুনিতেন; গান শুনিয়া তাহাকে পয়সা, খাবার দিতেন। কখন বা বাগানে লইয়া গিয়া, ভাল ভাল ফুল

পাড়িয়া তাহার খোঁপায় পরাইয়া দিতেন। তারপর যে কি হইল,—চম্পক-গুচ্ছের ভিতর বসিয়া কন্দর্প ঠাকুর কখন যে মঞ্জরীর ছোট বুকখানিকে লক্ষ্য করিয়া একটা ফুলবান নিক্ষেপ করিলেন, তাহা বলিতে পারি না। তবে মঞ্জরী বুঝিল যে, রুদ্রনারায়ণ তাহার পর নহে; আর রুদ্রনারায়ণ বুঝিলেন যে, তাঁহার জন্য যদি কেহ জীবন দিতে পারে তবে সে মঞ্জরী।

গ্রামের প্রান্ত ভাগে একখানি ছোট কুটীর। তাহাতে মঞ্জরী একা থাকিত। ক্ষুদ্র হইলেও কুটীর খানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। তাহার সম্মুখে একটী তমাল গাছ। একটী মালতী লতা আসিয়া তাহাতে উঠিয়াছিল। বর্ষাকালে যখন ঝির্ ঝির্ করিয়া বৃষ্টি পড়িত, শীতল বায়ু প্রবাহ মালতী ফুলের গন্ধ মাখিয়া মঞ্জরীর কুটীরের সম্মুখ দিয়া বহিয়া যাইত, তখন মঞ্জরী কুটীরের ভিতর বসিয়া মালতী ফুলের মালা গাঁথিত। মালা গাঁথিয়া, কখন তাহা নিজের গলায় পরিত, কখন বা তমালের ডালে ঝুলাইয়া দিত।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

শ্যামার নিকট হইতে আসিয়া অবধি মঞ্জরী বড় ভাবনায় পড়িল। ক্ষুদ্র কুটীর খানির মধ্যে পড়িয়া পড়িয়া সে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ভাবিল। কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিল না। তখন সে মনে মনে আপনিই প্রশ্ন করিতে লাগিল, আপনিই তাহার উত্তর দিতে লাগিল।

প্রশ্ন। কেন এমন কাজটা করিতেছ মঞ্জরী?

উত্তর। কি কাজ?

প্রঃ। শ্যামাকে ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা।

উঃ। রুদ্রনারায়ণের জন্য।

প্রঃ। রুদ্রনারায়ণ তোমার কে?

উঃ। কেউ নয়।

প্রঃ। তবে কেন একটা রমণীর সর্ব্বনাশে উদ্যত হইয়াছ?

উঃ। রুদ্রনারায়ণের সন্তোষের জন্য।

প্রঃ। তার সন্তোষে তোমার লাভ কি?

উঃ। তার সন্তোষেই আমার লাভ।

প্রঃ। কিন্তু রুদ্রনারায়ণেরই কি এটা উচিত কাজ হচ্চে?

উঃ। মানুষ কি সকল সময়েই উচিত অনুচিত বুঝে কাজ করতে পারে?

প্রঃ। না পারলে, যে তার হিতৈষী, তার সেটা বুঝিয়ে দেওয়া উচিত।

উঃ। সে বড় লোক, বুঝাতে গেলে শুনবে কেন ?

প্রঃ। যাতে শুনে সেই রকম কাজ করা চাই।

উঃ। তার ক্ষমতা আছে। সে জোর করে ইচ্ছামত কাজ করতে পারে।

প্রঃ। তার জোর আছে, আর তোমার কি কৌশল নাই? এক কাজ করনা কেন ? উঃ। কি কাজ ?

প্রঃ। শ্যামাকে এখান হ'তে সরিয়ে দাওনা কেন ?

উঃ। সে কি যাবে ?

প্রঃ। তার কথার ভাবে বুঝতে পার না ?

উঃ। কিন্তু রুদ্রনারায়ণ বড় রাগ কর্‌বে।

প্রঃ। তার রাগে তোমার ক্ষতি কি ?

উঃ। লাভই বা কি ?

প্রঃ। মর পোড়ারমুখী, তাকে অধঃপাতে দিলে তোমার লাভ ছিল, আর অধঃপাত হ'তে রক্ষা করতে পারলে লাভ নাই ?

উঃ। আচ্ছা, লাভ লোকসানটা ভাল করে বুঝে দেখি।

ভাবিতে ভাবিতে মঞ্জরী ঘুমাইয়া পড়িল।

ইহার পর কয়েকদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। মঞ্জরী প্রায় প্রত্যহ শ্যামার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিল।

তারপর একদা গভীর রাত্রিকালে মঞ্জরী আসিয়া রাধানাথের বাটীর পশ্চাদ্বারের নিকট দাঁড়াইল। মৃদু কণ্ঠে গাহিল—বিজন বিপিনে—

ধীরে ধীরে বাটীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। শ্যামা কম্পিত পদে বাহিরে আসিল। তারপর গভীর অন্ধকার ভেদ করিয়া শ্যামা ও মঞ্জরী দ্রুতপদে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল। মঞ্জরী আগে, শ্যামা পশ্চাতে চলিল।

ক্রমে উভয়ে গ্রাম পার হইয়া মাঠে পড়িল। মাঠের পর আবার গ্রাম, গ্রামের পর আবার মাঠ। এইরূপে দুই তিনটী গ্রাম ও মাঠ পার হইয়া উভয়ে চাকসীর মাঠে পড়িল। মাঠটা খুব বড়। সে দিন অমাবস্যা। নিবিড় অন্ধকারে মাঠ সমাচ্ছন্ন। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলিতেছিল, কিন্তু তাহাতে পৃথিবীর অন্ধকার দূর হয় নাই। মাঠ নীরব, নির্জ্জন, গম্ভীর। সেই গম্ভীরতা ভেদ করিয়া অবিরাম ঝিল্লীধ্বনি উঠিতেছিল, নৈশ-বায়ু-প্রবাহ উদাসী পথিকের মত মাঠময় ছুটিয়া বেড়াইতেছিল। সেই ঝিল্লীধ্বনি মুখরিত নৈশ বায়ু শব্দিত মাঠের অন্ধকার বক্ষ ভেদ করিয়া শ্যামা ও মঞ্জরী নীরবে দ্রুতপদে

চলিতেছিল। অন্ধকারে বহুক্ষণ থাকিলে একটু আলোক পাওয়া যায়। সেই আলোকে একটা পথ ধরিয়া উভয়ে যাইতেছিল।

এইরূপে তাহারা যখন মাঠের প্রায় অর্দ্ধেকটা পার হইয়া গেল, তখন সহসা বিপরীত দিক হইতে দুইটা বিকটাকার লোক লাঠির উপর ভর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে একবারে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিবা মাত্র মঞ্জরী চীৎকার করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। শ্যামা ছুটিতে পারিল না, চীৎকার করিতেও পারিল না। সে ভয়ে অচেতনের ন্যায় হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

১ম খণ্ড সমাপ্ত।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

শরৎ।

(১)

সুখদ শরৎ পুনঃ আশ্বিনের সনে,
আসি' উপজিল বঙ্গে—প্রাবৃটের পরে।
ঘুচিল অম্বর-বারি, বারিদ-হুঙ্কার,
থামিল মণ্ডুক-রব, চাতক-চিৎকার;
উদিল শারদ ইন্দু, নির্ম্মল গগনে,
ভাতিল বিমল-স্নিগ্ধ-কোমল কৌমুদী;
বিকসিল জলে স্থলে পদ্ম কত শত।
স্থলজ কুসুম কত ফুটিল বিপিনে;
ঝঙ্কারিয়া প্রেমোল্লাসে আসি' উপজিল,
দলে দলে অলিকুল—প্রসূন-সদনে।
হরি' নানা পুষ্প-রেণু—মাখি' নিজ গায়
বিহরিল বনে বনে প্রজাপতি কত।
গাহিল বিহঙ্গ গান,—মাতাইয়া প্রাণ;
ধরিল সুন্দর শোভা শরতে প্রকৃতি;
দেখা দিল হাস্য-রেখা প্রবাসী-বদনে,
সুখ-সম্মিলন-আশে, দীর্ঘ দিন পরে,
শারদীয় মহোৎসব সন্নিকট হেরি'।

উঠিল আনন্দ-উৎস হৃদয়-কন্দরে ;
হইল আকুল হিয়া, ব্যাকুল মানস,
হ'ল বিচলিত প্রাণ—একান্ত অধীর—
স্মরিয়া কলত্র নিজ, পুত্র-কন্যাগণে।
মায়ার শৃঙ্খল কেবা পারে ভাঙ্গিবারে,
সংসারী মানবে—এই প্রেমের সংসারে ?
কেবল 'বিধুর' জানে প্রেমের প্রতাপ ;
হানে কিবা তীক্ষ্ণ শেল মায়াবদ্ধ জীবে।
সুধাংশুবদনা প্রিয়া পড়ে যবে মনে,—
পড়ে যবে মনে, সেই বিদায় কালের
বিশুষ্ক বদন, অশ্রু-সিক্ত দু-নয়ন,
নীরব প্রার্থনা,—প্রাণ-চাঞ্চল্য প্রিয়ার ;
গুপ্ত মনোভাব তা'র প্রকাশিত মুখে,
ফিরে যায়, পিছু চায় দণ্ডে শতবার,
মৌনবতী মহিলার নয়ন-ইঙ্গিত,
কে আছে সংসারে হেন জিতেন্দ্রিয় বীর
পারে সম্বরিতে যেবা নিজ চিত্ত-বেগ !

(২)

সুখের সাগরে হিয়া ভাসে পুনর্ব্বার,
সুখের ভবনে, সুখ-সম্মিলন-কালে।
দারুণ প্রবাস-ক্লেশ হয় অপগত,
প্রণয়-সলিলে ফুটে সুখের কমল ,
হয় দাবদগ্ধ বনে বসন্ত সঞ্চার,—
শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয় অবহেলে ;
মরু স্থলে স্রোতস্বতী বহে সুবিমল ;
উজ্জ্বলে মধুরে মিলে—সুখের ভবনে।
আইসে প্রবাসী ঘরে ' দুর্গা ' আগমনে,
উথলে উল্লাস হৃদে—দম্পতী-মিলনে।

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

মুক্তাবাই।

(ঐতিহাসিক গল্প)

(১)

দাসবংশ-সম্ভূত গয়স্থদ্দীন বুলবন্ যে সময় পরলোকগত হন, তৎকালে তাঁহার পুত্র বকেরা খাঁ বাঙ্গালার সুবেদার-পদে নিযুক্ত থাকায়, পৌত্র কিকোবাদ দিল্লীর সিংহাসনে আরূঢ় হন। অষ্টাদশ বর্ষীয় তরুণ যুবক সহসা এ রাজপদে অধিষ্ঠিত হওয়ায়, তাঁহার মন অসীম আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তিনি রাজকার্য্য ভার স্বহস্তে গ্রহণ করত, নবোৎসাহে সুচারুরূপে, রাজ-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বার্থান্বেষী ও নীচ-স্বভাব সম্পন্ন উজীর নিজাম উদ্দীনের অসৎ প্ররোচনায় এই তরলমতি নবীন অধীশ্বরের মন ক্রমশঃ পাপ পথে প্রধাবিত হইতে লাগিল। নিত্য অভিনব আমোদ প্রমোদ ও যুবজনপ্রিয় বিলাসিতায় প্রমত্ত হইয়া, তিনি রাজ-ধর্ম্ম পরিপালনে অবহেলা করিতে লাগিলেন; এবং ইন্দ্রিয় পরবশ হইয়া,—অপরিমিত মাদক সেবনে অনুরক্ত হইলে, তাঁহার মনের সৎবৃত্তি গুলিন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। এই কু-অভ্যাস দোষে অবশেষে তিনি রাজ-কার্য্য পরিচালনেও অসমর্থ হইয়া পড়িলেন। ইহাতে নিজামের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। তিনি রাজ্য পরিচালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া, যথেচ্ছাচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার ঘোর অত্যাচারে প্রজাবর্গ বিষম বিরত হইয়া পড়িল। সুন্দরী রমণী লইয়া এ রাজ্যে বাস করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল, সুতরাং প্রজাগণের মধ্যে অনেকেই আত্ম মর্য্যাদা সংরক্ষণার্থে নিজাম উদ্দীনের রাজ্য পরিত্যাগ করত অন্যত্র পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

ক্রমে এই সকল অত্যাচার কাহিনী সুরঞ্জিত হইয়া, কিকোবাদের পিতা—বকেরা খাঁর শ্রুতিগোচর হইল। বকেরা খাঁ নিজামকে বিলক্ষণ জানিতেন; এবং তৎকর্ত্তৃক যে এই রাজ্য ও রাজ্যেশ্বরের এরূপ দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে, তিনি তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন এবং ইহার প্রতীকারার্থ অনতিবিলম্বেই দিল্লী অভিমুখে অভিযানের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

(২)

দিল্লীর বিরাম কক্ষে আজ মহোৎসব। চারিদিকে বসোরা দেশজাত গোলাপ-কুসুম সদৃশ সুন্দরী বারবিলাসিনীগণ মনোমুগ্ধকর নৃত্য ও গীতে

সকলের মনোরঞ্জন করিতেছে। সভার মধ্যস্থলস্থিত সুরম্য মসনদে দিল্লীর নবীন সম্রাট কিকোবাদ; তৎপার্শ্বে দুরাচার উজীর নিজাম উদ্দীন উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

যে বিরাম কক্ষে, এক সময় গয়সুদ্দীন বুলবন মধ্য এশিয়ার পঞ্চদশ সম্রাট ও অন্যান্য সুধীবৃন্দ পরিশোভিত হইয়া, কক্ষটীকে গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, আজ তাহা চাটুকার, মদ্যপ বয়স্য ও বারাঙ্গনা পরিবৃত হইয়া বিলাস কক্ষরূপে পরিণত! চিরদিন কখন সমভাবে অতিবাহিত হয় না। একের অভ্যুদয়ে অপরের পতন অবশ্যম্ভাবী।

সুবাসিত সিরাজ মদিরার মাদকতা শক্তি প্রভাবে সম্রাটের কোমল মস্তিষ্ক বিচলিত, তদুপরি বারাঙ্গনাগণের সুকোমল-কর-পল্লব-সংস্পর্শ-জনিত সুখানুভব করিতে করিতে ক্রমে তিনি চৈতন্য হীন হইয়া পড়িলেন। আনন্দ-সিন্ধুর খর স্রোত পূর্ণ মাত্রায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। এমন সময়ে, অদূরে সহসা ভেরীনাদে আনন্দের উত্তাল তরঙ্গের বেগ মন্দীভূত হইল। কারণ নির্ণয়ার্থে উজীর বহির্দ্দেশে আগমন করিলেন এবং প্রকৃত বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া একান্ত বিষণ্ণ ভাবাপন্ন অন্তঃকরণে ত্বরিত পদে বিরাম কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে সম্রাট সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন এবং চারিদিক নিস্তব্ধ দর্শনে অর্দ্ধ বিজড়িত স্বরে বলিলেন, "চালাও"।

উজীর।—"সাওয়ান সাহ! এ নৃত্য গীতের সময় নহে, মহা বিপদ সম্মুখে।"

সম্রাট কিছুই বোধগম্য করিতে সমর্থ না হইয়া বলিলেন, "দিল্লীর সম্রাট কিকোবাদের বিপদ! হাঃ হাঃ হাঃ সীরাজি লে আও"।

উজীর।—"কাবলে আলম্! এ বিপদ উপেক্ষার বিষয় নহে। সম্রাটের পিতা অসংখ্য সৈন্যসহ নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছেন।"

সম্রাট। "তাহাতে চিন্তার কারণ কি উজীর? পিতা, পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন, তাহাতে আশঙ্কার বিষয় কি হইতে পারে?"

নিজাম নিজের মনোভাব গোপন করিয়া বলিলেন, "সত্য, পিতা পুত্রের সম্মিলন স্বতঃই আনন্দজনক, কিন্তু আমার বিবেচনায় এ সাক্ষাৎ বড় শুভ ফলপ্রদ হইবে বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, গোলামের প্রার্থনা, সম্রাট একটু সাবধানে থাকিবেন।"

(৩)

একটি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠ মধ্যে সম্রাট কিকোবাদ গভীর চিন্তায় দুর্ম্মনা হইয়া

একাকী পদচারণ করিতেছেন। গত বিষয়ের অনুশোচনা করিয়া বড়ই ম্রিয়মাণ হইয়াছেন; কিছুতেই শান্তি পাইতেছেন না। এমন সময় নিজাম গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং যথাবিধি সম্মান সহকারে সম্রাটকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন।

সম্রাট সমুৎসুক ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মন্ত্রিন্! এ আসন্ন বিপদে কি উপায় অবলম্বন করা যুক্তিসিদ্ধ"? নিজাম ব্যঙ্গভাবে বলিলেন "আলম্! সৎ-পুত্রের কর্ত্তব্যানুযায়ী, সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া অবনত মস্তকে পিতার পদানত হওয়া।"

সম্রাট নিজামের এই ব্যঙ্গোক্তি বুঝিতে পারিয়া রুষ্ট হইলেন, এবং ভৎর্সনা পূর্ব্বক বলিলেন, "নিজাম! যদ্যপি কর্ত্তব্য বিষয়ে সৎযুক্তি দানে তুমি একান্ত অসমর্থ হও, তাহা হইলে তোমার নিস্তব্ধ থাকাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।" নিজাম তখন ধীর ও গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "সম্রাট! এ দাস সতত দিল্লীশ্বরের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকে, অতএব যদি গোলামের তক্সির মাফ্ হয়, তাহা হইলে আমার মত এই যে, বকেরা খাঁ যখন দিল্লীশ্বরের অধীন তখন রাজ ধর্ম্মানুসারে তাঁহার সহিত দেওয়ান-আমে সাক্ষাৎ করা যুক্তিসিদ্ধ। অনন্তর যখন তিনি সম্রাটের বিনা অনুমতিতে বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, সে স্থলে মোস্‌লেম আইন অনুসারে তাঁহার প্রতি কঠোর রাজ দণ্ডাজ্ঞা বিধেয়।"

সম্রাট তাঁহার ঈদৃশ বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন, "নিজাম! জানিও দিল্লীশ্বর কিকোবাদের অন্তর তোমার ন্যায় নীচ নহে; আবশ্যক হইলে কিকোবাদ একদিন পিতার সহিত রণক্ষেত্রে উন্মুক্ত অসি হস্তে সাক্ষাৎ করিতে পারে; কিন্তু তোমার এই অযুক্তিকর পরামর্শ আমার নিকট ঘৃণিত। এক্ষণে তুমি কার্য্যান্তরে গমন করিতে পার।"

"এক্ষণে আমার পক্ষে ইহাই শ্রেয়ঃ" বলিয়া নিজাম সে প্রকোষ্ঠ হইতে নিস্ক্রান্ত হইলেন।

(৪)

সম্রাট কিকোবাদ উজীর ও পারিষদে পরিবেষ্টিত হইয়া দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন; সম্মুখে তাঁহার পিতা, বকেরা খাঁ, অতি দীন, অপরাধী সৈনিকের ন্যায় দণ্ডায়মান, বদন মণ্ডলে বিষাদের চিহ্ন পরিলক্ষিত। তিনি স্নেহপূর্ণ নয়নে মধ্যে মধ্যে পুত্রের প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন। হায়! স্নেহের এমনই অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণী শক্তি যে, এরূপ কোমলতা বিবর্জ্জিত ও উদ্ধত সম্রাটের

মন, তাঁহার এই দৃষ্টিতে দ্রবীভূত হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অধীর হইয়া, সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিতৃ চরণে নিপতিত হইলেন, এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে, পূর্ব্বাপরাধের জন্য শত বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

নিজামের নিকট এই দৃশ্য বড়ই বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইল। ক্রোধে ও ঘৃণায়, দন্তে দন্ত নিষ্পেষিত করিতে করিতে, তিনি সভাগৃহ হইতে তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া গেলেন।

অতঃপর, পিতা পুত্রে একটী নিভৃত কক্ষে বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নানা বিষয়ে কথা বার্ত্তা কহিলেন। পরিশেষে বকেরা খাঁ স্বীয় পুত্রকে স্নেহালিঙ্গন পূর্ব্বক মস্তক চুম্বন করিয়া, নিজ শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

* * * * *

নিজাম নিজ প্রকোষ্ঠে বসিয়া কিরূপে কিকোবাদ কৃত অপমানের প্রতিশোধ লইবেন তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কিসে পিতা পুত্র মধ্যে বিরোধ সংঘটিতি হয়, কিসে বকেরা খাঁ পুত্রের চক্ষুর অন্তরাল হয়, ইহাই তাঁহার চিন্তার প্রধানতম বিষয়। যদিও তিনি জানিতেন যে নবীন সম্রাটকে তাঁহার করতলস্থ করা বিশেষ কষ্ট-সাধ্য নহে তথাপি যে পর্য্যন্ত না বকেরা খাঁ দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করেন তাবৎ সম্রাটকে নিজ-বশে আনয়ন করা সুদূরপরাহত জ্ঞান করিলেন। কিন্তু, তিনি অতি অল্প কাল মধ্যেই এই সমস্যা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, নিশ্চিন্ত হইলেন।

নিজাম জানিতেন যে, বকেরা খাঁর শিবিরে একটি পিতৃ মাতৃহীনা, হিন্দুবালিকা অবস্থান করে। ঐ বালিকা তাঁহারই নিয়োজিত এক রাজপুত কর্ম্মচারীর প্রতি আসক্তা; বকেরা খাঁ তাহা জানিতেন, এবং ভবিষ্যতে যাহাতে তাহারা উভয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয় তদ্বিষয়ে তিনি সচেষ্ট ছিলেন।

এই বালিকাটীর নাম 'মুক্তাবাই'। মুক্তাবাই এক্ষণে সম্পৃক্ত যৌবনা, সুরূপা ও বহুগুণসম্পন্না কিশোরী। যাহাতে, এই বালিকাকে কোনরূপে হস্তগত করিতে পারেন, ইহাই নিজামের একান্ত বাসনা। সুতরাং তিনি নিত্য, নবীন সম্রাটের নিকটে এই সর্ব্বগুণময়ী সুলোচনা ললনার অসামান্য রূপ গুণ বর্ণনা করিয়া তাঁহার মনকে মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, এক দিবস প্রাতঃকালে সম্রাট, উজীর ও কতিপয় সৈন্য সমভিব্যাহারে, যমুনার উপকূল দিয়া স্থানান্তরে গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহারা সহসা দেখিলেন যে, সুনীল যমুনা জলে, একটি অর্দ্ধবিকসিত

সজীব সরোরুহ, সুললিত লহরীমালার মৃদুল সঞ্চালনে ধীরে ধীরে দুলিতেছে। নিজামের ক্রুর, তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাহাকে পরিচিত করিতে অপেক্ষা করিল না; সুতরাং সম্রাটেরও জানিতে বাকী রহিল না। সম্রাট উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন, পাপ লালসা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, অন্তরের ভাব ওষ্ঠে ব্যক্ত হইল:—

"আগর আঁন্ তুর্ক শিরাজী বদেস্তারদ্ দিলেমারা
বখালে হিন্দুএস্ বক্ষম্ সমরকন্দ বোখারারা"।

তিনি উচ্চৈস্বরে সৈন্যগণকে বলিলেন, "হয় ঐ সুন্দরী, না হয় তোদের শির।" তখন আর কি রক্ষা আছে; মুহূর্ত্ত মধ্যে মুক্তাবাই, তাহার সকল চেষ্টা, অনুনয় ও বিনয় সত্বেও, সম্রাটের বেগম মহলে বন্দীনা হইল।

বকেরা খাঁ, পুত্রের এতাদৃশ ঘৃণিত ব্যবহারের বার্ত্তা অবগত হইয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন। আশ্রিতা বালিকাকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি স্বয়ং, পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল; সম্রাট তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। অপমানে ব্যথিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি প্রত্যাগমন করিলেন, এবং প্রতিশোধ লইবার জন্য, স্বীয় পুত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু অপরাপর সৈনিকবর্গের, বিশেষতঃ সেই রাজপুত কর্ম্মচারীর অনুরোধে,—একটি সামান্য বালিকার জন্য বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত করা অযুক্তিকর, ইত্যাদি কারণ প্রদর্শন করায়, অগত্যা তিনি ইহাতে বিরত হইলেন। অনন্তর বকেরা খাঁ ঘৃণায় ও লজ্জায় অবিলম্বেই দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

উল্লিখিত ঘটনার কিয়ৎকাল পরে একদা সম্রাট গভীর চিন্তায় দুর্ম্মনা হইয়া নিজ কক্ষে বসিয়া আছেন; তাঁহার নিকটে নিজামের নব-নিয়োজিত একটি হিন্দু কর্ম্মচারী, ভিন্নাসনে উপবিষ্ট। এই কর্ম্মচারীটী দেখিতে বলিষ্ঠ এবং সুশ্রী, অধিকন্তু সুভাষী ও কর্ম্মপটু এজন্য নিজামের নিকট তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল; এবং সম্রাটও তাহাকে বিশেষ যত্ন করিতেন ও ভাল বাসিতেন। কোন বিশিষ্ট কার্য্য সমাধা করিবার আবশ্যক হইলে, সম্রাট, সে কার্য্য ভার তাহারই উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত রহিতেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, সম্রাট এই কর্ম্মচারীটীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'যুবক! আমি সত্যই তোমার ব্যবহার ও সদ্‌গুণে বিশেষ সন্তুষ্ট ও বাধ্য হইয়াছি, কিন্তু, দুঃখের বিষয়, তুমি আমার নিজ কর্ম্মচারী না হইয়া নিজামের কর্ম্মে নিরত রহিয়াছ।

যুবক। 'জাঁহাপনা! এ দাস দিল্লীশ্বরেরই অধীন, যে হেতু নিজাম স্বয়ংও সম্রাটের কিঙ্কর'।

সম্রাট। তথাপি তুমি তৎ কার্য্যে নিয়োজিত আছ। আমার একান্ত ইচ্ছা যে, তুমি সর্ব্বদা আমারই নিকট অবস্থান কর। তোমার ন্যায় উপযুক্ত লোক-দ্বারা আমার বহু উপকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা। সম্প্রতি আমি তোমার উপর একটি বিশেষ কার্য্যভার অর্পণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। যদ্যপি তোমার দ্বারা আমার কোন অনিষ্টের আশঙ্কা না থাকে, অর্থাৎ তুমি বিশ্বাস-ঘাতকতা না কর, তাহা হইলে, আমি নিশ্চিন্ত হইয়া তোমায় একটী গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত করি।

যুবক। সাওয়ান সা বাদশাহ! গোলাম কখন নিমকহারামী জানে না; যদ্যপি সম্রাটের তাহাতে প্রত্যয় না হয়, তাহা হইলে, গোলামের শির ইহার উত্তর দিবে। এই বলিয়া যুবক স্বীয় উন্নত মস্তক নত করিল। সম্রাট তাহার ঈদৃশ বাক্যে মুগ্ধ হইয়া, পুরস্কার স্বরূপ এক মোড়ক আস্‌রফি প্রদান করিয়া বলিলেন, 'কার্য্য সমাধানান্তে ইহার দশগুণ অধিক পুরস্কৃত হইবে। কিন্তু অতি সাবধানে এ কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে। আমি জানি হিন্দুজাতি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ এবং সত্যপ্রিয়; এজন্য ভরসা করি এ গূঢ় রহস্য চিরদিনই অপ্রকাশিত থাকিবে।

যুবক তরবারি দ্বারা নিজ মস্তক স্পর্শ করত দণ্ডায়মান রহিল। সম্রাট তখন ধীর ও গম্ভীর স্বরে তাহাকে কহিলেন, "এ জগতে প্রণয় ও প্রভুত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চির ঈর্ষান্বিত, সুতরাং নিজামের নাম এ জগৎ হইতে লুপ্ত হইবে। ইহাই আমার উপস্থিত আজ্ঞা।"

যুবক ভূমিতে নিজ উষ্ণীব স্পর্শ করিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

* * * * *

যথা সময়ে নিজামের মৃত্যু সংবাদ চারিদিকে প্রচার হইয়া পড়িল। তাঁহার হঠাৎ মৃত্যুর কারণ কি তাহা কেহই উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, সকলেই বিশেষ দুঃখিত ও উৎকণ্ঠিত হইল। সম্রাটও অন্তরের ভাব গোপন রাখিয়া প্রকাশ্য ভাবে দুঃখ প্রকাশ করত, নিজামের পরিবারবর্গের শোক-সহানুভূতি জানাইলেন।

এদিকে এই হিন্দু যুবকের পদ-মর্য্যাদা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সম্রাট ক্ষণেকের জন্যও তাহাকে আপন কাছ ছাড়া করেন না। ক্রমে তিনি

যুবকের সরস ও মধুর বাক্য কৌশল এবং বিনম্র ব্যবহারে তাহার এরূপ বশীভূত হইয়া পড়িলেন যে, তিনি, তাহার পরামর্শ ব্যতীত, কোন কর্ম্মই স্বয়ং নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন না। রাজ কার্য্যের ভার একরূপ এই কর্ম্মচারীর উপরই ন্যস্ত করিয়া, সম্রাট আমোদ প্রমোদে প্রমত্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিতে সমর্থ হইলেন না। শত শত সুন্দরী বার-বনিতাগণের প্রাণস্পর্শী সুমধুর প্রেম সম্ভাষণে তাহাদের বিলোল কটাক্ষ-সন্ধানে, সম্রাটের মন আজ মুগ্ধ নহে। তাঁহার তৃষ্ণা আজ সেই অবরুদ্ধ-রাজ-পুত্ররমণীর রূপ সাগরে প্রধাবিত। তাঁহার মন মুক্তাবাই-এর চিন্তায় আবিষ্ট। ঘোর পাশব কার্য্য চিন্তায় ক্রমে তিনি এরূপ অধীর হইয়া পড়িলেন যে, অগত্যা তাঁহাকে হিন্দু যুবকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। তিনি অতি কাতর ভাবে তাহার নিকট নিজের মনোভাব অকপটে জ্ঞাপন করিলেন। যুবক তাঁহার এরূপ কাতরোক্তিতে কৃত্রিম দয়ার্দ্র হইয়া স্বীয় স্বভাব-সুলভ বিনয় নম্র বচনে বলিল, 'সম্রাট! এ দাস সর্ব্বদাই আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনে যত্নবান। যদ্যপি অপরাধ মার্জ্জনা হয়, তাহা হইলে গোলামের নিবেদন এই যে, হিন্দুললনা স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা, প্রকাশ্যভাবে হিন্দু রমণী সম্রাটের সহিত প্রেমালাপ করিতে নিতান্তই কুণ্ঠিতা হইবে। নচেৎ, এমন কোন্ রমণী আছে যে দিল্লীশ্বরের প্রেমাঙ্গিনী হইতে অভিলাষিনী না হয়? আমার বিবেচনায়, যদ্যপি সম্রাটের অভিমত হয়, তাহা হইলে, তাহাকে আপনার যমুনা পুলিন সন্নিহিত সুরম্য প্রমোদ-মন্দিরে লইয়া গেলে সম্রাটের এ বাসনা পূর্ণ হইতে পারে।

এই যুক্তি সমীচীন বিবেচনা করিয়া সম্রাট তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন; এবং যাহাতে এই কার্য্য অতি সত্বর ও নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ের ভার তাহারই উপর অর্পণ করিলেন।

(৫)

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গিয়াছে। আকাশও তমসাচ্ছন্ন। মধ্যে মধ্যে চঞ্চলা চপলা ক্ষণেকের জন্য চমকিয়া পুনরায় অম্বর অঙ্কে লুকায়িত হইতেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। এমন সময় যমুনার উপকূলস্থিত 'প্রমোদ মন্দিরের' একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে দিল্লীর নবীন সম্রাট পালঙ্কোপরি অর্দ্ধশায়িত। মাদকদ্রব্যের অদ্ভুত শক্তি প্রভাবে তাঁহার শরীর এতদূর অসুস্থ যে, তিনি উত্থানশক্তিরহিত প্রায় হইয়াছেন। তথাপি তাঁহার কলুষ চিন্তার বিরাম নাই। মধ্যে মধ্যে তিনি মস্তকোন্নত করিয়া কক্ষের চারিদিক নিরীক্ষণ করিতেছেন, পরক্ষণেই,

ঈপ্সিত বিষয়ের একান্ত অভাবে, বিষাদে উপাধানে স্বীয় অস্থির মস্তক রক্ষা করিতেছেন। প্রকোষ্ঠে কেবল মাত্র চারিজন পরিচারিকা সম্রাটের অলঙ্ঘ্য আজ্ঞা প্রতিপালনের নিমিত্ত প্রস্তুত ও সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে। বহির্ভাগে পূর্ব্বোক্ত হিন্দুকর্ম্মচারি দ্বারা নিয়োজিত কয়েক জন প্রহরী, প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে সংরক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে।

অনন্তর, কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে, হিন্দুকর্ম্মচারী প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করিল। সম্রাট তাহার আগমনে সোৎসুক ভাবে পর্য্যঙ্কোপরি উঠিয়া বসিলেন; এবং যুবকের পশ্চাতে বিদ্যুল্লতাসদৃশ, তাঁহার চিরবাঞ্ছিত, হৃদয়ানন্দদায়িনী, মুক্তাবাইকে সন্দর্শন করিয়া, তাঁহার হৃদয় পুলকে আপ্লুত হইয়া উঠিল। মুক্তাবাই আজি প্রসূনাভরণে সুভূষিতা। এই সকল-ললাম-ভূতা ললনার লাবণ্যময়ী মূর্ত্তিতে,তাহার হাবভাববিজড়িত নয়ন-কটাক্ষে সম্রাটের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইয়া গেল। নীচ প্রবৃত্তির উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া সম্রাট উন্মত্তভাবে তাহাকে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর হইলেন। মুক্তাবাই অমনি পৌরুষোচিত কঠোর ও তীব্র স্বরে বলিল, "দুরাত্মন্"!

মুহূর্ত্তমধ্যে ৩।৪ জন অস্ত্রধারী পুরুষ সেই প্রকোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করত ভীষণভাবে দুরাচার সম্রাটকে আক্রমণ করিল। সহসা এরূপ ব্যাপারে ভীত ও চমকিত হইয়া সম্রাট তাহাদের প্রতি সশঙ্কদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, এবং সম্মুখে হিন্দু যুবককে শস্ত্র-সজ্জিত দেখিয়া ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে উচ্চৈস্বরে বলিলেন, 'সয়তান! তোর এই কাজ! তোর প্রতি আমার গাঢ় বিশ্বাসের কি এই পরিণাম?'

যুবক ঘৃণা-ব্যঞ্জক স্বরে বলিল,—'লম্পট-যবন! যে পাষণ্ড, এই রাজপুত সৈনিকের হৃদয়-উদ্যান পদদলিত করিয়া তাহার একমাত্র হৃদয়রঞ্জন প্রসূনকে বৃন্তচ্যুত করিবার চেষ্টা করে, জঘন্য পাপলালসা পরিতৃপ্তির জন্য, সতী রমণীর সতীধর্ম্ম বিনষ্ট করিতে কিছুমাত্রও কুণ্ঠিত না হয়, এইরূপ প্রতিহিংসাই তাহার উপযুক্ত পুরস্কার'। এই বলিয়া, সেই রাজপুত বীর সম্রাটের কলুষিত হৃদয়ে আমূল অস্ত্র বিদ্ধ করিয়া দিল। সম্রাট তন্মুহূর্ত্তেই সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

অতঃপর যুবক তাহার একমাত্র অবলম্বন, চিত্তবিনোদিনী প্রাণময়ী মুক্তাবাই-এর হস্তধারণ পূর্ব্বক প্রকোষ্ঠ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল; এবং পূর্ব্বনিয়োজিত যমুনা জল ভাসিতা তরিরোহণে উভয়েই একযোগে চিরদিনের মত দিল্লী হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।

অনুরোধ।

এখনো আমার করবীর গাছে
থলো থলো ফুল-কলি ;
বৃন্ত টুটিয়া ফেলনা ধরায়
যেয়োনা চরণে দলি।
ভেব'না তাহার গিয়াছে সময়,
গেছে বসন্ত চলি ;
তাহার তপন উদেনি এখনো
ভেব'না পড়েছে ঢলি'।

(২)

আমার শ্যামারে দি'ওনা উড়ায়ে
ভেব'না উহারে মূক।
প্রেম-অমিয়ায় ভরে আছে সখা
ওর অতটুকু বুক।
আজো মধুগান জাগে নাই ওর
ঘুমাইছে বুকে পড়ি',
ভেব'না ভেব'না মদালস শিষ
অকালে গিয়াছে ঝরি।

(৩

আমার হাতের প্রথম ছবিটী
ঘৃণা করিওনা দেখে
ভাষার তুলিকা—হৃদয়ের ছবি
ফোটা'তে পারেনি এঁকে।
ধরিতে পারে'নি এখনো যাহারে
ছুটিয়াছে পিছে যার,
এ যে শোভাহীন, দূর ছায়া-ছবি
সে মোহিনী প্রতিমার।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

অঙ্কুর।

বীজাদঙ্কুরনিষ্পত্তিরঙ্কুরাদ্বৃক্ষসম্ভবঃ।
ফলপ্রদোভবেদ্বৃক্ষইত্থমাশাক্রমোমতঃ॥

২য় বর্ষ।] কার্ত্তিক, ১৩১৪। [১০ম সংখ্যা।

পরলোক।

আজিকার এই স্নিগ্ধ প্রভাতের মত
মনে হয় পরলোক সুখদ সুন্দর;
তরুণ অরুণ রূপে দেব মহেশ্বর
প্রদানেন হেম-রশ্মি তথা অবিরত।
পুণ্যাত্মা প্রসূন-সম স্তরে স্তরে স্তরে
ফুটে আছে অপরূপ সুধা-গন্ধ-রূপে;
প্রীতি প্রেম বিহঙ্গম তুষি' বিশ্বভূপে
গাইছে ভৈরব রাগ প্রফুল্ল-অন্তরে!
নবীন চেতনা ল'য়ে পূত-প্রভঞ্জন
সুখ-শান্তি-তৃপ্তি সবে করিছে বিধান;
সর্ব্ব দুঃখ শোক ভুলি আনন্দে মগন
মর জগতের যত সন্তাপিত প্রাণ!
তিলেক বিচ্ছেদ নাই, অনন্ত মিলন
গড়িয়া তুলি'ছে শুধু অনন্ত জীবন!!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

প্রজাশক্তি ।

অধুনা দেশব্যাপী যে একটা ভীষণ উত্তেজনার ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার মূল, শক্তিসংঘর্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বীতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাজশক্তির সহিত প্রজাশক্তির সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, তাহার যে ফল হয়, তাহা, ইতিহাস-পাঠকগণের অবিদিত নাই। যে ইংরেজ জাতি একদিন অত্যাচারী রাজার অপ্রতিহত প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, অত্যাচারী রাজার শিরশ্ছেদ করিয়াছিল; সেই জাতিই যে, আজ রাজ্যমদে মত্ত ও ক্ষমতাগর্ব্বে অন্ধ হইয়া, তাহাদের নিজেদের কর্ত্তৃক প্রমাণিত ঐতিহাসিক সত্য বিস্মৃত হইয়া ও তাহার অবমাননা করিয়া, প্রজাশক্তি নিপীড়িত, ও তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে ইহা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয়। ইংরেজ জাতি, যে অত্যাচারী রাজার শিরশ্ছেদ করিয়াছিল, তাহার জীবনী আলোচনা করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই হতভাগ্য, মূর্খ, ক্ষমতাগর্ব্বান্ধ, অত্যাচারী রাজার জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে, রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি এতদুভয়ের সংঘর্ষের যে কি পরিণাম তাহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

১৬২৫ খৃষ্টাব্দে ষ্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা প্রথম চার্লস্ ইংলণ্ডের সিংহাসনাধিরোহণ করেন। সুন্দর চেহারা, মার্জ্জিত ও রাজোচিত আদবকায়দার জন্য তিনি প্রজাসাধারণের শ্রদ্ধার ও ভালবাসার পাত্র হইয়াছিলেন। প্রজাগণের মতের বিরুদ্ধে, তিনি ফরাসী সম্রাটের কন্যা রোমান ক্যাথলিক মতাবলম্বী হেনরিটা মেরিয়াকে বিবাহ করিলেন। তাহাতে, তাঁহার উপর প্রজাসাধারণের আর পূর্ব্বের ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভালবাসা রহিল না।

কোন একজন ফরাসী, তাহার প্রধান বন্ধু ও মন্ত্রী ডিউক্ অব্ বাকিংহামকে অপমান করিয়াছে, এই কারণে ডিউক্ তাহাকে ফরাসীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত করিল। যাহা হউক অবশেষে ডিউক্ পোর্টস্‌মাউথে একজন আততায়ীর হস্তে নিহত হয়; নতুবা হয়তো চার্লস্‌কে অকারণে অনেক যুদ্ধ করিতে হইত।

সিংহাসন অধিরোহণের পর, চার্লস্ উপর্য্যুপরি কয়েকবার পার্লামেণ্ট মহাসভা আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রত্যেক বারই পার্লামেণ্টের সহিত তাঁহার মতানৈক্য হয়।

বাকিংহামের মৃত্যুর পর সকলে মনে করিল, এবার রাজকার্য্য নির্ব্বিবাদে পরিচালিত হইবে। কিন্তু কাজের বেলা সেরূপ হইল না। চার্লস্ টনেজ ও পাউণ্ডেজ নামক অবৈধ টেক্স, প্রজাদিগের উপর নির্দ্ধারণ করিলেন ও যাহারা উক্ত টেক্স দিতে অস্বীকৃত হইল তাহাদের মালপত্রাদি বাজেয়াপ্ত করিলেন। পর বৎসর পার্লামেণ্ট মহাসভায় স্যার্ জন ইলিয়ট্ ঐ সকল অবৈধ টেক্সের বিরুদ্ধে বক্তৃতা প্রদান করিলেন। চার্লস্, জন ইলিয়ট্ ও তাঁহার মত-সমর্থনকারিদিগের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিলেন।

ইহার পরবর্ত্তী এগার বৎসর, চার্লস্, পার্লামেণ্ট ব্যতীত রাজ্য শাসন করিলেন। পার্লামেণ্ট থাকা সত্বেই চার্লস্ যে প্রকার অত্যাচার, অবিচার করিয়াছিলেন তাহাতে পার্লামেণ্ট ব্যতীত কিভাবে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন তাহা পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন।

অমিতব্যয়িতার জন্য চার্লসের সর্ব্বদাই অর্থের অভাব হইত, এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি নিতান্ত অবৈধ উপায় অবলম্বন করতেন। স্যাক্সন রাজত্বকালে ইংলণ্ডে সিপ্‌মানি নামক এক প্রকার টেক্স প্রচলিত ছিল। মাত্র সাগরকূলবাসিদেরই এই টেক্স দিতে হইত, কিন্তু চার্লস্ ইংলণ্ডবাসী সকলের উপরেই এই টেক্স ধার্য্য করিলেন। জনসাধারণের প্রতিনিধিস্বরূপ জন হ্যাম্পডেন এই টেক্সের বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করিলেন। ফলে—হ্যাম্পডেন ধৃত হইলেন ও বিচারার্থ প্রেরিত হইলেন।

চার্লসের রাজত্বকালে যে শুধু ইংলণ্ডেই এই প্রকার গোলযোগ হইতেছিল, তাহা নহে; স্কটল্যাণ্ডেও তদনুরূপ গোলযোগ হইতেছিল।

চার্লস্ অর্থাভাবে পড়িয়া, দীর্ঘ একাদশ বৎসর পরে পুনর্ব্বার পার্লামেণ্ট আহ্বান করিলেন। এই পার্লামেণ্টের অধিকাংশ সভ্যই চার্লসের বিরুদ্ধে ছিল। তাহারা তাঁহার অত্যাচারের প্রধান সহায় ওয়েণ্টওয়ার্থ ও লডের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করিল ও তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া চার্লসের অনিচ্ছা সত্বেও তাহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিল.

লড ও ওয়েণ্টওয়ার্থের প্রাণদণ্ডের পর, চার্লসের অপ্রতিহত ক্ষমতা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। অবশেষে, উপায়ান্তর না দেখিয়া চার্লস লণ্ডন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। চার্লসের লণ্ডন পরিত্যাগের পর অচিরে ইংলণ্ডে পৌর-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই পৌর-যুদ্ধে ইংলণ্ডবাসিগণ রাজপক্ষ ও পার্লামেণ্ট পক্ষ,

উভয় পক্ষেই যোগদান করিল। এই যুদ্ধের প্রথম ভাগে রাজপক্ষই জয় লাভ করিতে লাগিল, কিন্তু অবশেষে পার্লামেণ্ট পক্ষ জয়লাভ করিল।

যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, চার্লস ওয়েলসে পলায়ন করিলেন। এবং অনতি-বিলম্বেই স্কট্‌ দিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। স্কট্‌গণ ষাটলক্ষ টাকার পরিবর্ত্তে তাঁহাকে পার্লমেণ্টের হস্তে সমর্পণ করিল। চার্লসের বন্দী অবস্থায়ও তাঁহার প্রতি রাজোচিত সম্মান প্রদর্শিত হইত এবং তাঁহার সুখ ও সুবিধার নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার যত্ন লওয়া হইত।

একদিন সুযোগ পাইয়া চার্লস ওয়াইট্‌ দ্বীপে পলায়ন করিলেন; কিন্তু পুনর্ব্বার ধৃত হইয়া বিচারার্থ লণ্ডনে আনীত হইলেন। বিচারে তাঁহার প্রাণ-দণ্ডের আদেশ হইল। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী স্বাধীন ইংলণ্ডের, স্বাধীন রাজা চার্লস, ক্ষমতা-গর্ব্বে অন্ধ হইয়া প্রজাশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিতে যাইয়া, সাধারণ চোর ডাকাতের ন্যায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন; ও বধ্যভূমিতে ঘাতক-হস্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। অবশেষে প্রজাশক্তির জয় হইল।

শ্রীধীরেন্দ্র লাল সেন।

প্রাচীন ভারতে কৃষি।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি" ইহা একটী প্রাচীন পবিত্র বচন। এক সময়ে আর্য্য হিন্দুগণ এই সনাতন বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া, আপন আপন সুখসচ্ছন্দতা উপভোগ ও দেশের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া মাতৃ-স্বরূপিনী জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিয়া গিয়াছিলেন—সেই পবিত্রোজ্জ্বল আর্য্যযুগ আজ কালের অবিরাম গতিতে নিপতিত হইয়া অতীতের অন্ধতামস গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আজ আমরা সেই আর্য্য-সন্তানগণের বংশধর হইয়া, সেই পবিত্র ঋষি বাক্য অবহেলা করিয়া নানারূপ কষ্ট উপভোগ করিতেছি। এই সকলের প্রকৃত কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইলে আমাদিগকে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে না। জ্ঞানী মাত্রেই ইহা স্বীকার করিবেন যে, বিলাসিতাই ইহার মূল কারণ। আমরা বিলাসের মহা সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া আপাততঃ মধুর সুখ সিন্ধুর খরস্রোতে গা ভাসাইয়া তাহাতেই মুগ্ধ হইয়া আছি, সুতরাং আমরা সেই সনাতন বাক্যের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে অসমর্থ, সেই জন্যই আজ আমরা এত হীনবীর্য্য ও স্বল্পজীবি হইয়া পড়িয়াছি।

পূর্ব্বে আর্য্য সন্তানগণ যে সকল উপায়ে দীর্ঘ জীবন, ধর্ম্মার্থ কাম-মোক্ষাদি চতুর্ব্বর্গ, লাভ করিতে সক্ষম হইতেন, জীবনে সুখ শান্তি উপভোগ করিতেন, তাহার মূলীভূত কারণ—আহার্য্য-বস্তু। স্বাস্থ্যকর আহার্য্য বস্তুর দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে, সদ্বৃত্তি নিচয়ের প্রস্ফুরণ ও মানসিক প্রফুল্লতা সম্পাদন করিয়া থাকে, অতীতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করিলে ইহার প্রচুর প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়।

কৃষিজাত দ্রব্যাদিই আমাদের জীবন ধারণের প্রধান উপাদান। এজন্য প্রাচীন কালে আর্য্য সন্তানগণ কৃষি কার্য্যের বিশেষ সমাদর করিতেন। এমন কি ব্রাহ্মণাদি সম্ভ্রান্ত রাজণ্যবর্গও কৃষি কার্য্যকে কোনরূপে ঘৃণিত বা অসম্মানের কার্য্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন না, পরন্তু, বিশেষ যত্নের সহিত তাহার সৌকর্য্য সাধনে নিরত থাকিতেন। বশিষ্ট, জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ তাহার আদর্শ স্থল। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণাদি কোন বর্ণের পক্ষেই কৃষি কার্য্য নিষিদ্ধ ছিল না, বরং ইহা শাস্ত্রানুমোদিত বলিয়া বিশেষরূপে আদৃত হইত। পরাশর-সংহিতায় "ষটকর্ম্ম নিরতো বিপ্রঃ কৃষি কর্ম্মাণি কারয়েৎ" এরূপ দৃষ্টান্তও দেখা যায়। মনুসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ যদ্যপি শাস্ত্রোক্ত স্বকর্ম্ম দ্বারা নিজের জীবিকার্জ্জনে অসমর্থ হন, তাহা হইলে তিনি ক্ষত্রিয়োচিত কর্ম্ম, তাহাতেও অপারগ হইলে, বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন।*

ঋগ্বেদেও উক্ত মতের পোষকতা দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ যাহারা ধর্ম্ম ক্রিয়া সাধনে অসমর্থ, তাহারা কৃষিকর্ম্ম বা তন্তুবায়ের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং পূর্ব্বকালে, কৃষিকর্ম্ম যে কাহার মধ্যে নিষিদ্ধ ছিল না তাহা এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়।

বৈদিক কালে আর্য্য হিন্দুগণ কৃষিকার্য্যের উন্নতি কল্পে, এমন কি সূচাগ্র ভূমির জন্য সময়ে সময়ে, অনার্য্যদিগের সহিত সংগ্রাম সাধিতে পশ্চাৎপদ হইতনা। তাহারা ঐ সকল অনার্য্যদিগের নানাবিধ অত্যাচার ও উপদ্রব সত্ত্বেও আপনাদিগের বাসস্থান, সিন্ধু ও শতদ্রুর মধ্যস্থলে, উর্ব্বর সৈকত কূলে, কৃষিকার্য্যের বিস্তার করিতে, এবং স্থানে স্থানে নগর ও পত্তন স্থাপন করিয়া আর্য্য গৌরব রক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হইতনা। তৎকালে বণিকগণ বাণিজ্যার্থে আনন্দোৎসাহে সমুদ্র পথে গমন করিতেন, স্বদেশীয় দ্রব্য সম্ভার বিদেশে বিক্রয়

* "লৌহ কর্ম্ম তথা রত্নং গবাঞ্চ প্রতিপালনম্, বানিজ্যং কৃষিকর্ম্মাণি বৈশ্য বৃত্তিরুদাহৃতা"।

করিয়া বিদেশার অর্থে, আপনাদিগের ধন ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেন। আর্য্য ঋষিগণও, সে সময় কেবল মাত্র ধ্যান ও তপস্যায় নিজের জীবনযাপন করিতেন না, পরন্তু বিষয়ী লোকদিগের ন্যায়, কৃষিকার্য্য, গো পালন, পরিজন প্রতিপালন প্রভৃতি সৎকার্য্যানুষ্ঠানে আপনাদিগকে নিয়োজিত রাখিতেন।

হিন্দুগণ চিরদিনই ধর্ম্মপরায়ণ, ধর্ম্মই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন, সুতরাং ধর্ম্ম প্রবণতা প্রযুক্ত তাঁহারা সকল শুভানুষ্ঠানে দেবতাদিগকে আহ্বান করিতেন, দেবতাদিগকে সাক্ষ্য করিয়া সকল কার্য্যে অগ্রসর হইতেন। ক্ষেত্র কর্ষণকালে, ক্ষেত্রে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে ক্ষেত্রজাত দ্রব্যাদি উৎপন্ন হয়, তজ্জন্য কৃষি কার্য্যের অধিষ্ঠাতৃ দেবগণের স্তুতি করিতেন, পর্জ্জন্য পশিত পবিত্র জলধারায় যাহাতে পৃথিবী সিক্ত হয়, তজ্জন্য তাঁহারা ইন্দ্রাদি দেবগণের আরাধনা করিতেন। সিন্ধু ও শতদ্রুর সঙ্গম স্থলে, হল হস্তে দণ্ডায়মান হইয়া যখন তাঁহারা অভ্রভেদী স্বরে চিত্ত বিমোহন স্তুতি করিতেন,—

"ক্ষেত্রস্য পতে মধুমংতমূর্ম্মিং ধেনুরিব পয়ো অস্মাসু ধুক্ষ্ব।
মধুশ্চুতং ঘৃতমিব সুপূতমৃতস্য নঃ পতয়ো মৃলয়ংতু॥"

*　　*　　*

অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বন্দামহে ত্বা
যথা নঃ সুভগাসসি যথা নঃ সুফলাসসি
ইন্দ্রঃ সীতাং নিগৃহ্লাতু তাং পূষানু যচ্ছতু
সা নঃ পয়স্বতী দুহা মুত্তরামুত্তরং সমাং
শুনং নঃ ফালা বি কৃষাংতু ভূমিং শুনং
কীনাশা অবিযংতু বাহৈঃ
পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা শুনমস্মাসু ধত্তং॥

দেবগণ তাঁহাদের সেই হৃদয়-দ্রবকারী সুমধুর স্তবে মুগ্ধ ও তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের কার্য্যে সুফল প্রদান করিতেন। ফলতঃ দেবতার আশীর্ব্বাদে ও অনুগ্রহে তাঁহাদিগের কোন বিষয়েরই অভাব হইত না; ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে আহার্য্য বস্তু উৎপন্ন হইত, সুতরাং মাতৃভূমি বসুন্ধরা তৎকালে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ছিলেন।

কিন্তু হায়! আজ আমরা সেই জগন্মান্য আর্য্য সন্তানগণের বংশধর হইয়া, দেবতা ও ধর্ম্মে অনাস্থা প্রযুক্ত, প্রাচ্য কালের পবিত্র নির্ম্মাল্য দূরে নিক্ষেপ করতঃ, স্বেচ্ছায় পাশ্চাত্য কুশিক্ষারূপ শৃঙ্খলসূত্র পরিধান করিয়া, সামান্য অন্নের

জন্য পরমুখাপেক্ষী হইয়া পরপদ লেহন করিয়া, বহ্নিমুখ পতিত পতঙ্গের ন্যায় দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া অশেষ যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছি। হায়! পবিত্র আর্য্যযুগের সেই একদিন আজ আমাদের কপাল ও কর্ম্মদোষে কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে। যে কৃষিকার্য্য দ্বারা আর্য্যগণ একদিন ভারতমাতার মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, ভারতবাসিগণ যে কৃষি দ্বারা উন্নতির অত্যুচ্চ সোপানে আরূঢ় ছিলেন, আজ আমরা তাহা, ক্ষণিক বিলাসের বশবর্ত্তী হইয়া আত্মধনে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছি। সৌভাগ্য লক্ষ্মীর সুপ্রসাদে ভারতভূমি চিরদিনই রত্ন প্রসবিনী। যে ভারতভূমির কৃষি ও পণ্যজাত দ্রব্য সমুদ্রপথে সুদূর প্রদেশে বাণিজ্যার্থে প্রেরিত হইত, যে ভারতের রত্নরাজি বিদেশীয় বণিক্‌গণ স্বদেশে লইয়া গিয়া, স্বদেশের গৌরব গরিমা বৃদ্ধি করিত. আজ আমরা সেই কামদুঘা ভারতমাতার সন্তান হইয়া আত্মধনে বঞ্চিত হইয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া রহিয়াছি।

আর্য্যশাসন কালে বঙ্গদেশে ও তৎসংশ্লিষ্ট অপরাপর পত্তন সমূহে, কৃষি ও শিল্প নৈপুণ্যের বিশেষ সমাদর ছিল, তদ্দ্বারা দেশের শোভা ও সমৃদ্ধির যথেষ্ট বিস্তার ছিল। খৃঃ পূঃ ৩১৭ অব্দে গ্রাকদূত মেগাস্থনিস্ ঐ সকল দেশ সমূহের উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী অবস্থা অবলোকন করিয়া বিশেষ বিস্মিত ও বিমোহিত হইয়াছিলেন। তৎকালে স্বদেশীয় শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য নিবহে ভারতের ধন ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ছিল। হুগলী ও তন্নিকটবর্ত্তী সপ্তগ্রামে ও সুবর্ণগ্রামে যে সকল সূক্ষ্ম রেশমী বস্ত্র, রজত-কাঞ্চন দ্রব্য সম্ভার সমুৎপন্ন হইত, সেই সকল গৌড় রত্নরাজি বক্ষেঃ ধারণ করিয়া এই অধঃপতিত বঙ্গদেশ সমৃদ্ধি গৌরবের উচ্চ সোপানে সমারূঢ় হইয়া ছিল। আর্য্য বণিকগণ ঐ সকল রত্মরাজি বিক্রয়ার্থে সুদূর চীন, তাতার, ট্রয়, ভিনিস্ প্রভৃতি দেশ সমূহে বাণিজ্যের জন্য যাত্রা করিতেন। বিদেশীয় বণিকগণও এদেশে আগমন করিয়া ঐ সকল মহামূল্য দ্রব্যাদি আপন আপন দেশে লইয়া যাইতেন। তৎকালে এই সকল নগর, বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল বলিয়া পরিগণিত ছিল। চীন পর্য্যটক ফা-হিয়েন ও হুয়েন্থসাঙ্গ প্রভৃতি পর্য্যটকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠেও ভারতের তাৎকালীক উন্নত অবস্থার বিষয় সম্যক অবগত হওয়া যায়। বেশী দিন গত হয় নাই—খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে সময় ভারতবর্ষ পাঠানদিগের শাসনাধীন ছিল—রাজ্য ও অধিকার বিস্তারের জন্য যখন হিন্দু ও পাঠানদিগের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ বিগ্রহ সংঘটিত হয়, সে সময়েও ভারতে কৃষি বা বাণিজ্যের উন্নতির কিঞ্চিন্মাত্র হ্রাস হয় নাই, পরন্তু অধিকতর বৃদ্ধিই হইয়াছিল। তৎকালেও ইতালীয় ভ্রমণকারী

মার্কপোলো, ভারতের এরূপ সমৃদ্ধিশালী অবস্থা দেখিয়া, খাদ্য দ্রব্যের প্রাচুর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া, বিমুগ্ধ হইয়া ছিলেন। প্রজাগণ তৎকালে নানারূপ নির্য্যাতন সহ্য করিলেও তথাপি তাহাদের অর্থের অথবা খাদ্য দ্রব্যের কোনরূপ অভাব হইত না। কারণ সে সময়ে তাহারা বিশেষ শ্রম সহিষ্ণু ছিল; দেশের উন্নতি কল্পে মাতৃভূমিকে সুজলা সুফলা করিবার জন্য বিশেষ যত্নপরায়ণ ছিল, এখনকার মত তৎকালে মানবগণ বিলাসের মোহ মদিরায় মগ্ন থাকিত না, এখনকার মত, সে সময়ে তাহারা, মার্জ্জিত রুচি ও বিশিষ্ট শিক্ষিত না হইলেও, তাহাদের মধ্যে কর্ত্তব্য জ্ঞান যথেষ্ট ছিল, জীবিকা অর্জ্জনের জন্য স্বহস্তে কৃষি কার্য্য প্রভৃতি কার্য্য করিতে তাহাদের মর্য্যাদার (prestige) লাঘব হইত না, ফলতঃ তখন কৃষি ও শিল্প নৈপুণ্যের যথেষ্ট সমাদর ছিল এবং তদ্দ্বারা তাহারা কোন অভাবই অনুভব করিত না। এইরূপ কিম্বদন্তি যে,তৎকালে গৌড় প্রভৃতি দেশে অনেকেই সুবর্ণপাত্রে পান ভোজন করিত, এবং সুন্দর সুন্দর অট্টালিকায় বাস করিত। বিদেশীয় পণ্যে ও অর্থে তাহারা আপনাদিগের অর্থ বৃদ্ধি ও ভাণ্ডার পূর্ণ করিত। এতদ্দ্বারা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে কৃষি ও বাণিজ্যই তাহার একমাত্র কারণ। ধনপতি ও চাঁদসওদাগর তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তাঁহারা যেরূপে তরণী সাজাইয়া বহির্বাণিজ্যে বহির্গত হইয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারা বিদেশীয় অর্থে ও সম্পত্তিতে আপনাদিগের ধন ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন, তত্তদবিষয়ের বিশেষ বিবরণ কবিকঙ্কন কাব্যে পরিলক্ষিত হয়।

প্রাচীন কালের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, পূর্ব্বে এমন কি নীচ জাতীয় শ্রমজীবিগণও সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া দিনান্তে বিশুদ্ধ বিলাস ও সুখ স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিত। এখনকার ন্যায় তাহাদের দৈহিক ও শারীরিক অবস্থা এতদূর হীন ছিল না অথবা মনেরও সঙ্কীর্ণতা ছিল না, স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি কল্পে পরস্পর পরস্পরের সহায়তা করিত, সুতরাং তাহাতে কাহার কোন বিষয়ের অভাব হইত না, পরন্তু স্বাধীন ভাবে, সুখ স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। এখনও ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে বিশেষতঃ পাঞ্জাব প্রদেশে পঞ্চকৃষ্ট জাতির বংশধরগণের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তৎকালে কৃষিকার্য্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিত, তাহাদের অপরাপর কার্য্য থাকিলেও কৃষিকার্য্যকে তাহারা মুখ্যরূপে গণ্য করিত। আর্য্য ঋষিগণও সকল কার্য্যের মধ্যে কৃষি কার্য্যকে, জীবের জীবন ধারণের প্রধান উপায় বোধে, শ্রেষ্ঠ কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। "কৃষির্ধন্যা কৃষির্ম্মেধ্যা জন্তুনাং জীবনং কৃষিঃ" ফলতঃ তৎকালে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে কৃষি-

কার্য্যের সমাদর বিশিষ্টরূপেই ছিল। পুণ্যময় প্রাচীন কালের পুরাবৃত্তের পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তৎকালে আমাদের দেশের এরূপ হীনাবস্থা ছিল না, কৃষককুলও সাধারণের নিকট বিশেষ আদৃত হইত। সুতরাং তৎকালে তাহারা পরমসুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ভারতেতিহাসের সেই সুবর্ণযুগ এখন লোকলোচনের অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে—বহুকাল বিস্মৃত স্বপ্ন কথায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। অদৃষ্টের দোষে অথবা কর্ম্ম-দোষে সে সুখরবি এক্ষণে অস্তমিত। প্রাচীন কালে যে দেশে নৃপতি হইতে ইতরপ্রাণী পর্য্যন্ত এমন কি আর্য্য ঋষিগণ পর্য্যন্ত স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, আমরা সেই আর্য্যদিগের বংশধর হইয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে হস্তে হল ধারণ করিয়া ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে অবমাননা বোধ করি। স্বাধীন-ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের সুগম পন্থা অবলম্বনে, স্বদেশের ও স্বজাতির উন্নতি সাধনে, পরাঙ্মুখ রহিয়াছি। বিদেশীয় বিভব ও বিলাসের বশবর্ত্তী হইয়া, আমাদের সনাতন ধর্ম্ম কর্ম্ম ভুলিয়া বসিয়াছি; একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি না যে, সেই একদিন—যে দিন জগন্মান্য আর্য্য হিন্দুগণ পবিত্র আর্য্য প্রদেশে পাঞ্জাবীয় পঞ্চনদের উপকণ্ঠে সমবেত হইয়া তারস্বরে গাহিয়াছিলেন,——

"মধুমতীরোষধীর্দ্যাব আপো
মধুমন্নো ভবত্বংতরিক্ষং
*   *   *
ক্ষেত্রস্য পতির্ম ধুমান্নো
পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ
শুনাসীরা শুনমস্মাসু ধত্তং"॥

সেই এক সুখের দিন আজ অতীতের অন্ধ তামসগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আজ এই বিংশ শতাব্দীর অভ্যুদয়ে ভারতের সে সৌভাগ্য তপন অস্তমিত হইয়াছে।

আজ কাল ইংরাজরাজের সুপ্রসাদে দেশীয় যুবকগণের সুশিক্ষার অভাব নাই। অপর কোন বিষয়ে হউক আর নাই হউক, মানবগণ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিচারক্ষম হইয়াছে, অতএব এই সকল ব্যক্তিবর্গ যদ্যপি স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন, এবং সমাজের, দেশের ও স্বজাতির উন্নতি কামনার জন্য সবিশেষ চেষ্টিত হন, পরমুখাপেক্ষী না থাকিয়া যদ্যপি আত্ম শ্রমলব্ধ স্বদেশের রত্নরাজিদ্বারা

নিজ ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে ইচ্ছা করেন,তাহা হইলে তাঁহারা অবশ্যই অতি অল্পকাল মধ্যে,স্বদেশের,সমাজের ও স্বজাতির উন্নতি সাধন করিয়া ভারতমাতার মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইবেন। অধুনা আমাদের সমাজের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে কৃষিসম্বন্ধে জ্ঞান বিজ্ঞানের যতই আলোচনা হয় ততই মঙ্গলের বিষয়। ইংলণ্ড, আমেরিকা,চীন,জাপান প্রভৃতি প্রদেশ সমূহ যে আজ এত উন্নতি লাভ করিয়াছে, কৃষিকার্য্যই তাহার প্রধান কারণ। অতএব, এক্ষণে কি করিলে দেশের কৃষক কুলের অবস্থার উন্নতি হয়, শিক্ষিত জনসাধারণ দাসবৃত্তি পরিহার পূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে নিজের জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ হয়, তদ্বিষয়ে চেষ্টাকরা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

অতঃপর, আমরা এই স্থলে প্রাচীন কৃষি সম্বন্ধে কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব। বহুকাল হইতে, কৃষি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, সাধারণতঃ সেইগুলি খনার বচন বলিয়া প্রসিদ্ধ। খনা একজন অদ্বিতীয় বিদূষী রমণী ছিলেন, সুতরাং তৎকথিত বহুকাল ব্যাপী প্রবাদগুলি যে বিশেষ জ্ঞানগর্ভ ও সাধারণের বিশেষ উপকারী, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। প্রাচীন কালে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে কৃষি বিষয়ক তাবতীয় তত্ত্ব অপরিজ্ঞাত ছিল না। নৈসর্গিক লক্ষণ দর্শনে, জলবায়ুর লক্ষণ নির্ণয় অনেকেই করিতে পারিতেন; বঙ্গ, বিহার, পশ্চিম প্রভৃতি প্রদেশের কৃষককুলের মধ্যে ঐ সকল প্রবাদ বাক্য বলিয়া প্রচলিত ছিল; কিন্তু অনুশীলন অভাবে সেই সকলের একান্তই অসদ্ভাব হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা সাধারণের অবগতির জন্য, এস্থলে তৎসম্বন্ধে বিষয়ের কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। আমাদের স্বদেশহিতৈষী শিক্ষিত মহাত্মাগণ যদ্যপি ঐ সকল প্রবাদ বাক্যগুলির গূঢ়ার্থ অবগত হইয়া আপনাদিগের মধ্যে, দেশের কৃষকদিগের মধ্যে পুনঃ প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা হইলে যে, দেশের ও দশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। প্রাচীন কালে ভারতের অধিবাসীরা কৃষিকার্য্যের উপকারিতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়া ছিলেন, এই জন্য তাঁহারা ইহার সবিশেষ সমাদর করিতেন। অধুনা, আমাদের দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে আমরা যদ্যপি তৎপ্রতিবিধানের কোন সুগম পন্থা অবলম্বন না করি, অর্থাৎ যদ্যপি আমরা কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ না করি, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা আরও কত শোচনীয় হইবে তাহা সামান্য চিন্তাশীল মানব সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। যাহা হউক এতদ্ সম্বন্ধে অধিক

আলোচনা না করিয়া পূর্ব্বে আমাদের দেশে কৃষি পদ্ধতি কিরূপ প্রচলিত ছিল তাহাই দেখান আবশ্যক। তৎকালে নৈসর্গিক লক্ষণ দর্শনে জল বায়ু ও কৃষি-কার্য্যারম্ভ করিবার সময় কিরূপে নিরূপিত হইত, তদ্বিষয়ের যৎসামান্য এই স্থলে উল্লেখিত হইল।

(১) "চাঁদের সভার মধ্যে তারা,
বর্ষে পানি মুষল ধারা।"

(২) "কি কর শ্বশুর লেখা জোখা,
মেঘেই বুঝবে জলের লেখা।
কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা,
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা।
কৃষককে বলগে বাঁধতে আল,
আজ না হয় হবে কাল।"

(৩) "বেঙ ডাকে ঘন ঘন,
বৃষ্টি হবে শীঘ্র জান।"

(৪) "খনা বলে শুন কৃষকগণ,
হাল লয়ে মাঠে যাবে যখন।
শুভক্ষণ দেখে করবে যাত্রা,
পথে যেন না হয় অশুভ বার্ত্তা।
মাঠে গিয়ে আগে দিক্ নিরূপণ,
পূর্ব্বদিক হ'তে কর হল চালন।
তাহলে তোর সকল আশয়,
হইবে সফল নাহিক সংশয়।"

(৫) "আষাঢ়ের পঞ্চ দিনে রোপয়ে যদি ধান,
সুখে থাকে কৃষিবল বাড়য়ে সম্মান।"

(৬) "পূর্ণিমে অমায় যে ধরে হাল,
তার দুঃখ সর্ব্বকাল।"

(৭) "কার্ত্তিকের উন জলে,
দুনো ধান খনা বলে।"

প্রাচীনকালে আর্য্যগণ যথা রীত্যনুসারে কর্ষণাদি কার্য্য সমাধা করিয়া,

সমাহিত চিত্তে ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্মরণ করিয়া, ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতেন। শান্ত ও শুদ্ধান্তকরণে পূর্ব্বমুখী হইয়া বসুমতীর উদ্বোধন করিতেন।

"বসুধে হেম গর্ভাসি বহু শস্য ফলপ্রদে
বসুপূজ্যে! মনস্তভ্যং বসুপূর্ণাস্তমে কৃষিঃ
রোপরিষ্যামি ধান্যানাং বৃক্ষ বীজানি প্রাবৃষি
সুস্থা ভবন্তু কৃষকা ধনধান্য সমৃদ্ধিভিঃ।"

অনন্তর ইন্দ্রকে স্মরণ করিয়া বলিতেন,

"বাসবো নিত্যবর্ষা স্যানিত্য বর্ষাস্তু তোয় দা।
শস্য সম্পত্তয় সর্ব্বাঃসফলাসন্তু নীরুজা।"

বাস্তবিকই আমাদের ভারতভূমি এই বসুন্ধরা হেমগর্ভা, চিরদিনই রত্ন প্রসবিনী। এ ভারতে ধান্য ছড়াইয়া দিলে সুবর্ণ উৎপন্ন হয়, কিন্তু পরিতাপের বিষয় আমরা বিকৃত রুচি হইয়া মহাজন বাক্য উপেক্ষা করিয়া ভিক্ষাকেই শ্লাঘনীয় বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। কিরূপে স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করিতে হয়, তদ্বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন। কৃষি, শিল্প,বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থোপার্জ্জনের সুগম পন্থার প্রতি সম্পূর্ণ দৃষ্টি হীন; এক্ষণে যদ্যপি আমাদের শিক্ষিত ও ধনী ভদ্রলোকগণ, অশিক্ষিত কৃষককুলের উপর একবারে সকল ভার ন্যস্ত না করিয়া, অর্থাৎ তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া, আত্মপরিশ্রমে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাহায্যে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রণালীর সমন্বয়ে, কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করেন,কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধনে যত্নবান হন তাহা হইলে অবশ্যই জননীর আশীর্ব্বাদে, আর্য্যদিগের বহুকাল লুপ্ত সেই পূর্ব্ব গৌরব আবার ফিরিয়া আসিবে,ভারতে সৌভাগ্যতপন উদিত হইয়া আবার মাতৃভূমি বসুন্ধরার মুখোজ্জ্বল করিবে। অতএব "উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"

শ্রীআনন্দগোপাল ঘোষ।



স্বপ্নকুমারীর প্রতি।

(১) এসেছ কি তুমি ছুটে
স্বপনের দেশ হ'তে ;
সাথে নিয়ে স্বরগের
পবিত্রতা অতর্কিতে ?
সেথা কি কুসুমচয়
সতত ফুটিয়া রয় ;
সুবাস ভাসিয়া বয়
সমীরের পরশনে ;
সেথা কি জ্যোৎস্নাধারা
উথলিয়া যায় প্রাণে ?

(২) ছিলে ওগো তুমি যবে
নিতান্ত স্বপন মত,
প্রাণের ত আশাগুলি
আছিল অপ্রতিহত ;
তখন ত অপরাধ
আনিত না অবসাদ,
প্রফুল্ল প্রাণের 'পরে।—
আজি কিবা বিবর্ত্তন !
স্বরগে মরতে বুঝি
বৈচিত্র্যের বিঘটন !

(৩) অতীতের কোলাহল
সেথা কি পশে গো সখি ?
সেথা কি স্মৃতির আছে
নিরমল উকি ঝুকি ?
সেথা কি হিল্লোল বয়
হৃদয়ের কথা কয়
সরমে সহিয়া রয়
প্রাণের বেদনা ক্ষত ;
বিশ্ববাসী জনে তাহা
দেয় না জানিতে তত।

(৪) পৃথিবীর পরিচিত
প্রপীড়িত প্রাণগুলি ;
সেথা কি স্বপনাবেশে
আপনা যায়গো ভুলি' ?
দূর হ'তে চেয়ে চেয়ে,
মুখখানি বাঁকাইয়ে,
পথখানি যায় বেয়ে
অচেনা দেবতা-মত,
তথাকার অধিবাসী
প্রায় অর্ব্বাচীন যত ?

(৫) নিরুপম সৌন্দর্য্যের
সেথা কি আদর নাই ;
এসেছ—থাকিলে কেন
নামি হেথা ; ভয় পাই ?
সেথা কি পাখীর তান
ঝালা পালা করে কান ;
বিস্মৃতির অভিমান
ক্ষণেকে যায়গো টলি'?
সেথা কি প্রাণের আশা
আশঙ্কা যায় না দলি' ?

(৬) জীবনের অসন্তোষ
অসম্পূর্ণ আশাগুলি,
তোলে কি হৃদয় 'পরে
সুধামাখা কুতূহলী ?
সুমধুর কম্পমান,
বাঁশরীর মৃদু তান,
বেজে উঠে করি' গান ;—
যশ-ফুল উঠে ফুটি'?
রহিলে সকলি ভাল,
কাঁদে কেন আঁখি দুটী ?

(৭) আপনার ধারণার
প্রতিকূলে এক কথা,
যদিবা কখন আসে
পরাণে বাজা'তে ব্যথা;
তখনই মনে হয়
তেয়াগিয়া লাজ ভয়,
ওই স্বপনের দেশে
তোর সাথে ছুটে যাই ;
সাংসারিক অব্যাহতি
যেন গো পাইতে পাই।

(৮) সংসারের রন্ধ্রহীন
অন্ধকার যবে আসে,
আঁধারের মাঝে পড়ি'
আপনা হারাই ত্রাসে ;
তখনই চিৎময়ী
আমারি এ মৃণ্ময়ী
হৃদিখানি যেও নিয়ে
স্বপনের সেই দেশে ;
মরণের পরপারে
দুঃখ নিয়ে যা'ব হেসে

(৯) জীবনের সন্ধ্যা—যবে
বিষাদ আঁধার নিয়ে,
এই মনঃ-রাজ্যখানি
দেয় একা মিলাইয়ে ;
তখনই মনে করি,
আপনারে ভাঙ্গি গড়ি'
প্রতিষ্ঠা বাঁধিয়া দিয়ো
সুখের স্বরগ ধামে ;
স্বপ্ন-দেবি, দিও মেখে
শান্তি—ও নিশীথ যামে

(১০) সংসারের গীতগুলি
মরণ-স্বপনে ঢাকা,
লইয়া বিষাদরাশি
তথায় দিবেনা দেখা।
তথায় একেলা বসি'
আপনারে ভাল বাসি'
সাধে আপনার মনে
গাইব নূতন গান ;
সংসারের কোলাহলে,
বিষাদে দিবনা কান।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

ত্রিদেহ।

পরমার্থতঃ জগৎ চৈতন্যময়; তথাপি ব্যবহারতঃ আমরা চেতন এবং অচেতনে প্রভেদ স্বীকার করিয়া থাকি। দেহ কি? এই স্থূলদেহ চেতন, না জড়? যদি চেতন হয়, তবে ইহা পৃথক চৈতন্য, কি জীবাত্মার অধীন? কথাটা অন্য ভাবে বলি। জীবদেহ বহুসংখ্যক কোষের সমষ্টি মাত্র। ইহারা প্রত্যেকেই জীববস্তুতে* পূর্ণ। জীববস্তু চেতন পদার্থ অর্থাৎ ইহার বৃদ্ধি, জরা ও মরণ আছে †। সুতরাং দেহের প্রত্যেক কোষই চেতন। এই কোষস্থ চৈতন্যকে সংক্ষেপে কোষ চৈতন্য বলিব। কোষ চৈতন্য জীবাত্মা হইতে পৃথক অথচ তাহার অধীন? কি উহা জীবাত্মারই অংশমাত্র? প্রত্যেক কোষ চৈতন্য সমষ্টিকৃত জীবাত্মা নামে অভিহিত হয়? কি জীবাত্মা পৃথক? এই প্রশ্ন অতি দুরূহ, কিন্তু দেহস্থ কোষ চৈতন্য যে অনেক সময় জীবাত্মার অধীনতা স্বীকার করেনা, কেন সম্পূর্ণ পৃথক ভাবে কার্য্য করে, ইহা কখন কখন প্রত্যক্ষ করা যায়। এ সকল ঘটনার প্রকৃত অর্থ কি? ইহা বুঝিতে পারিলেই ত্রিদেহ ‡ তত্ত্বও বুঝাইবে।

সকলেই জানেন, যদি কেহ কাহারও চক্ষের নিকট অঙ্গুলি লইয়া আঘাত করিবার ন্যায় ভাব দেখায়, তাহা হইলে চক্ষুর পাতা আপনা হইতে মুদিত হয়। আমি জানিতেছি যে, ঐ ব্যক্তি আমার চক্ষে কখনই আঘাত করিবে না। হয়ত সে আমার নিতান্ত প্রিয় পাত্র, এবং আমাকে বলিয়াই, আমার অনুমতি লইয়াই ঐরূপ আঘাত করার ন্যায় ভাণ করিতেছে, কিন্তু নিশ্চয়ই আঘাত করিবেনা। তথাপি আমার চক্ষের পাতা পড়িয়া গেল, ইহার অর্থ কি? জীবাত্মা নিশ্চয় জানিতেছেন যে, দেহের কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি চক্ষু বিপদাশঙ্কা করে কেন? পাতাই বা চক্ষুকে রক্ষা করিতে যত্নবান হয় কেন? চক্ষের পাতার কি পৃথক চেতনা আছে? সে কি

---

* Protoplasm. † এস্থলে লক্ষ্য করিবেন যে আমি বৃদ্ধি, জরা ও মরণের কথা বলিলাম; কিন্তু জন্মের কথা বলিলাম না। জীববস্তু অঙ্গার, অম্লজান, যবক্ষারজান ইত্যাদি কতিপয় পদার্থে গঠিত। উহাদিগকে ব্যবহারতঃ জড় বলা হয়; কিন্তু উহাদিগের রাসায়ণিক সংমিশ্রনেই জীব বস্তু জাত হয়। সুতরাং জীববস্তুকে জড়ের সংমিশ্রনে উৎপন্ন হওয়া বলিতে হয়। ইহা একটী মহা তর্কিত কথা। জীব যে জড় হইতে উৎপন্ন ইহা অনেকে স্বীকার করেন না। এই নিমিত্ত আমিও নীরব রহিলাম।

‡ বেদান্তমতে দেহ ত্রিবিধ, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহ।

জীবাত্মার সহিত পৃথক ভাবে কর্ম্ম করে? জীবাত্মা বলিতেছে, ভয় নাই? সে যে ভয় আশঙ্কা করে, ইহা ত পৃথক ভাবে কর্ম্ম করার ন্যায়ই বোধ হয়; কেহ কেহ এইরূপ আপাততঃ জীবাত্মার নিরপেক্ষ দৈহিক কর্ম্মকে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া * বলেন। কিন্তু সে কেবল একটা ব্যবহারিক কথা মাত্র; উহাতে ব্যাপারটা বুঝিবার কোন সাহায্য করে না। ডারউইন একদিন পশু-শালাতে এই বিষয় পরীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি সর্পের ঘরের নিকট দাঁড়াইয়া ছিলেন। ঐ ঘর এরূপ দৃঢ় কাচ প্রাচীরে বেষ্টিত যে সর্প তাহা কিছুতেই ভাঙ্গিতে, কি ভেদ করিতে সক্ষম নহে। ডারউইন তাহা জানিতেন। তিনি কাচ প্রাচীরের সহিত মুখ ঠেকাইয়া দাঁড়াইলেন। সর্প তাঁহাকে দংশন করিবার নিমিত্ত কাচের অপর দিকে আঘাত করিল। কিন্তু তিনি বারম্বার চেষ্টা করিয়াও দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিয়াও, মুখ না সরাইয়া থাকিতে পারিলেন না। প্রতিজ্ঞা করিলেন মুখ সরাইবেন না,মুখ সে প্রতিজ্ঞা শুনিল না। মুখ কি জীবাত্মার অবাধ্য? মুখ যে সকল কোষের সমষ্টি তাহারা কি জীবাত্মার মতানুগামী নহে? তারপর ভেকের সেই শিরঃশ্ছেদের বৃত্তান্ত স্মরণ করুন। ভেকের মাথা কাটিয়া ফেলিলেও তাহার দেহ বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ম্ম করিয়াছিল। একটি ভেকের মাথা কাটিয়া ফেলা হইয়াছিল; সুতরাং বলিতে হয় যে ভেকটি মরিয়া গেল। কিন্তু তাহার পর উহার এক উরুতে এক ফোটা তীব্র যবক্ষারাম্ল † দেওয়া হইল। তখন উহার অপর পা উঠিয়া আসিয়া যেখানে যবক্ষারাম্লবিন্দু ছিল, ঠিক সেই স্থানেই পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ করিয়া বিন্দুটিকে ফেলিয়া দিবার ন্যায় চেষ্টা করিতে লাগিল, উহার অপর পা কেমন করিয়া জানিল যে কোথায় ঐ যবক্ষারাম্লের বিন্দু ফেলা হইয়া ছিল? আর ঐ বিন্দুটীকে ঘষিয়া ফেলিয়া দিতে পারিলেই সে নিরাপদ হইতে পারে, ইহাই বা ঐ অপর পা কিরূপে বুঝিতে পারিল? ভেক মরিয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহার জীবাত্মা নাই, স্বীকার করিতে হয়। তথাপি অপর পায়ের কোষ গুলি কি নিজেই ঐরূপ চেষ্টা করিল? দেহ কোষ কি জীবাত্মার নিরপেক্ষ ভাবে কর্ম্ম করিতে পারে? তবে জীবাত্মার প্রাধান্য কোথায়?

এস্থলে, স্বতন্ত্র শ্রেণীর একটী ঘটনার উল্লেখ করিব। আমরা অনেকেই মেস্‌মেরাইজ ‡ করার কথা শুনিয়াছি, কেহ কেহ বা চক্ষেই দেখিয়াছি। এ

---

* Reflex action.

† Nitric Acid.

‡ Mesmerize.

ব্যাপারটী কি? একজন আমার চখের সম্মুখে কয়েকবার হস্ত সঞ্চালন করিলেন; অথবা গায়ে কয়েকবার হাত বুলাইলেন। আর আমি তখনই অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম। দেহস্থ কোষ সকল পূর্ব্ববৎ স্ব স্ব কর্ম্ম করিতেছে। দেহের তাপ, রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। দেহ যন্ত্র সকল পূর্ব্ববৎ ক্রিয়া করিতেছে। তথাপি অজ্ঞান হইলাম কেন? অচেতন হই নাই; কিন্তু আমার আত্ম-চৈতন্য নাই, আমার জীবাত্মা যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। যিনি আমাকে অজ্ঞান করিলেন, আমি সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার বশ হইয়া গেলাম। তিনি যাহা বলেন তাহাই করি; নিতান্ত অসম্ভব বা অপ্রিয় হইলেও তাহাই করি। তিনি মিষ্ট খাইতে দিয়া তিক্ত বলিলে আমি তিক্ত আস্বাদন পাওয়ার ন্যায় মুখ বিকৃত করি। অথচ যখন আমার এই অজ্ঞান ভাব কাটিয়া যায়, তখন কিছুই মনে থাকে না, আমি যেন কিছুই করি নাই। এ কি? এস্থলে দেহকোষ সকল ক্রিয়া করিতেছে, কিন্তু আমার জীবাত্মার অধীনে নহে। সম্পূর্ণরূপে আমার জীবাত্মার নিরপেক্ষ ভাবে কর্ম্ম করিতেছে।

এই সকল বৃত্তান্ত এবং অপরাপর বহুসংখ্যক বৃত্তান্ত হইতে বুঝা যায় যে, দেহের যেন একরূপ পৃথক চেতন ভাব আছে; উহা সর্ব্বকালে ঐ দেহধারীর জীবাত্মার বা সমষ্টি চৈতন্যের অধীন হইয়া কর্ম্ম করে না। উহার যেন (কিছু) স্বাধীন ভাবও আছে।

দেহস্থ কোষ সকলেই চেতন, কারণ উহারা প্রত্যেকেই জীব বস্তুতে পূর্ণ। ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। ইহারা অনেক সময় পৃথক ভাবে কর্ম্ম করে, যেন প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। দেহের একাংশের কোষ পীড়িত কি বিকল হইলেও, অপরাংশের কোষ সকল সুস্থ ভাবে থাকিয়া স্ব স্ব কর্ম্ম নিষ্পন্ন করে। একাংশের কোষ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেও, অপরাংশের কোষ সকল সজীব থাকে। ইহা হইতেও দেখা যায় যে, যে সকল কোষ সমষ্টিতে দেহ গঠিত, তাহারা যে কেবল জীবাত্মার অনধীন, (অর্থাৎ সময়ে সময়ে জীবাত্মা হইতে পৃথক রূপে কর্ম্ম করে) তাহা নহে; ঐ কোষ সকল পরস্পর হইতে পৃথক ভাবেও ক্রিয়া করিতে থাকে। যেন কেহ কাহারও অধীন নহে; কেহ কাহারও অপেক্ষা করে না। তথাপি ঐ দেহধারী জীব এক ব্যক্তি, বহু ব্যক্তি নহে। এই মহা বিস্ময়কর ব্যাপারের প্রকৃত রহস্য কি? আমি কি বহু? পরমার্থতঃ এক হইলেও, ব্যবহারতঃ আমি কি একাধিক? এই প্রশ্নের বিজ্ঞান সম্মত উত্তর দিতে হইলে, একদিকে যেমন হতাশ হইয়া পড়িতে

হয়, অন্যদিকে তেমনই আত্মবিশ্লেষণ আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত হয়। কিন্তু এই আত্মবিশ্লেষণ করিতেই হইবে। নচেৎ আমাকে বুঝিতে পারি না। আমাকে না বুঝিলেও জগতে কিছুই বুঝা হইল না। "আত্মানং বিদ্ধি" ইহাই সর্ব্বকালের মহোপদেশ। কিন্তু ইহা এক দিনের আলোচ্য নহে, কল্পান্ত আলোচনার বিষয়।

ক্রমশঃ।

শ্রীশশধর রায়।

রত্নমালা।

(৯৩)

যঃ সমুৎপতিতং ক্রোধং নিগৃহ্লাতি হয়ং যথা।
স যন্তেত্যুচ্যতে সদ্ভির্ন যো রশ্মিষু লম্বতে॥

ভাবার্থ—উদ্দীপ্ত ক্রোধকে যিনি অশ্বের সমান,
নিগ্রহ করিতে সদা সুসমর্থবান;
তাহাকেই সাধুজনে,
সারথি বলিয়া গণে।
নতুবা বল্‌গা মাত্র করিলে ধারণ,
সারথি বলিয়া গণ্য নাহি কেহ হন।

(৯৪)

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥

ভাবার্থ—সম্বন্ধ বিষয়-সনে সত্বর জনমে তা'র,
ভাবে যেবা বিষয়—নিয়ত।
বিষয়-সম্বন্ধ হতে, কামের উদ্ভব হয়,
মানবের মানসে সতত॥
বিষয়-বাসনা হ'তে, জনমে দুর্জ্জয় ক্রোধ,
দহে যাহে দেহ অবিরত।
অসার বিষয়ে তাই, ধার্ম্মিক সুবোধ নরে
নাহি কভু রহেন নিরত॥

(৯৫)

অহিংসকস্য দান্তস্য ধর্ম্মার্জ্জিত ধনস্য চ।
নিত্যঞ্চ নিয়মস্থস্য সদা সানুগ্রহা গ্রহাঃ॥

ভাবার্থ—হিংসায় বিরত সদা দানে রত,
যিনি হেন ধার্ম্মিক সুজন,
ধর্ম্মপথে ধন করেন অর্জ্জন,
নিয়ম-আচারী নিত্য হন;
এমন যে জন, ধর্ম্ম পরায়ণ—
তাঁ'র প্রতি গ্রহ সমুদয়
সদা তুষ্ট রয় রুষ্ট কভু নয়;
রহে অনুকূল সুনিশ্চয়।

(৯৬)

যদি কৃষ্ণপদে চিন্তা ভক্তিস্তৎ পদপঙ্কজে।
বিষমে দুর্গমে বাপি কা চিন্তা মরণে রণে॥

ভাবার্থ—যদি কৃষ্ণ-পদে চিন্তা রহে অবিরত।
রহে ভক্তি তাঁ'র পদকমলে নিয়ত॥
তা' হ'লে বিষমে, রণে, দুর্গমে, মরণে।
বিন্দু মাত্র শঙ্কা কভু নাহি হয় মনে॥

(৯৭)

আলোচ্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
পুণ্যং পরোপকারঃ স্যাৎ পাপঞ্চ পরপীড়নম্॥

ভাবার্থ—শাস্ত্র সমুদয়, করি' আলোচনা,
পুনঃ পুনঃ করিয়া বিচার।
বুঝিয়াছি স্থির,— পুণ্য—পর-হিত,
পাপ—যাহা পর-অপকার।

(৯৮)

পরোঽপি হিতবান্ বন্ধুর্বন্ধুরপ্যহিতঃ পরঃ।
অহিতো দেহজো ব্যাধির্হিতমারণ্যকৌষধম্॥

ভাবার্থ—দেহস্থ হ'য়েও, ব্যাধি—যে প্রকার,
হ'য়ে থাকে অহিতজনক।

আর, মহৌষধ বনজ হ'য়েও,
হয় সদা মহোপকারক ॥
সেইরূপ পরঃ, হ'লে হিতকারী,
মিত্র-মধ্যে নিত্য গণ্য হয়।
আর,—বন্ধু জন, হ'লে অপকারী,
হ'য়ে থাকে পরঃ সুনিশ্চয় ॥

(৯৯)

দানং ভোগো নাশস্তিস্রো গতয়ো ভবন্তি বিত্তস্য।
যো ন দদাতি ন ভুঙ্‌ক্তে তস্য তৃতীয়াগতির্ভবতি ॥

ভাবার্থ—ধনের ত্রিবিধ গতি—জানিবে নিশ্চয় ;
দান, ভোগ, আর গতি নাশ।
না করে যে দান, ভোগ, হয় অবশেষে,
সে মূঢ়ের ধনের বিনাশ ॥

(১০০)

কতি বা সরিতঃ সন্তি কতি বা সন্তি সাগরাঃ।
কিন্তু জীবতি জীমূত চাতকস্তব পাথসা ॥

ভাবার্থ—কত নদী আছে ভবে, কতই সাগর ;
না করে চাতক পান, সে সবার জল ;
জীমূত-জীবন পানে তৃপ্ত সে কেবল ;
তাহাতেই রত সে-ই হেরি নিরন্তর ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ

লোক চরিত্র।

(ক্ষুদ্র গল্প)

স্মর চেলাটকং গ্রামং স্মর গোদাবরী নদীম্।
স্মর মাদ্রীং চ ভদ্রীং চ স্মর বাসঃ শুষুঃ শুষুঃ ॥

পবিত্রসলিলা, বেগবতী স্রোতস্বতী গোদাবরী-তীরে চেলাটক একখানি গণ্ডগ্রাম। গ্রামখানিতে উল্লেখযোগ্য কোন বস্তুই নাই, কেবল মাত্র দুই চারিটী সামান্য প্রাচীন দেবালয়, আর একটী বহু প্রাচীন, বিশালকায়, বটবৃক্ষ, প্রায়

শত হস্ত পরিসর ভূমি অধিকার করিয়া, নীরবে, আপন ভাবে আপনি মগ্ন হইয়া আছে, পরিদৃষ্ট হয়। গাছটীর উচ্চ শাখা-প্রশাখায় এবং কোটরে নানা জাতীয় পক্ষী পরম সুখে বাস করে। চেলাটকে ব্রাহ্মণের বাস অল্প। তথাকার অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষিজীবী। প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তির সময়ে, অষ্টাহকাল, এই স্থানে একটী মেলা হইয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রাম হইতে অনেক ব্যক্তি, সেই সময়ে, এই মেলা দর্শনে আগমন করিয়া থাকে। এই ক্ষুদ্র মেলায় শিল্পজাত সামগ্রী অল্পই আমদানী হইয়া থাকে; কিন্তু পণ্যদ্রব্যের প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়। এ অঞ্চলে ধনবানের সংখ্যা বিরল।

এই চেলাটক গ্রামটীর পশ্চিম-উত্তর প্রান্তে রঘুবীর নামা জনৈক কিশোর-বয়স্ক রজক বাস করিত। মাদ্রী ও ভদ্রী নাম্নী তাহার দুইটী গর্দ্দভী ছিল। রঘুবীর প্রত্যহ প্রভাতকালে সেই গর্দ্দভী দুইটীর পৃষ্ঠদেশে বসনরাশি বোঝাই করিয়া, প্রফুল্লচিত্তে গোদাবরী নদীতটে গমন পূর্ব্বক, তথায় সেই সকল বসন-রাশি প্রক্ষালন করিত। বালকটী অত্যন্ত পরিশ্রমী, ক্লেশসহিষ্ণু, কার্য্যনিপুণ ও সুন্দরদর্শন ছিল। গোদাবরী নদীতটে, যেস্থলে সে ব্যক্তি বস্ত্রাদি ধৌত করিত, তাহার অনতিদূরে গদাধর সংযমী নামা জনৈক প্রসিদ্ধ অধ্যাপকের একটী চতুষ্পাঠী ছিল। অনেক গুলিন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ছাত্র সেই চতুষ্পাঠীতে, সাহিত্য, ব্যাকরণ, দর্শনশাস্ত্র ও অলঙ্কারশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিত। গদাধর সংযমী, অতীব যত্ন সহকারে, শিষ্যগণকে শিক্ষাদান করিতেন। ছাত্রগণের সুশিক্ষা বিষয়ে ইঁহার বিলক্ষণ লক্ষ্য ছিল। সকল শিষ্যকেই সমভাবে স্নেহ ও যত্ন করিতেন। ছাত্রবৃন্দও, তাহাদিগের শিক্ষাগুরুকে যথোচিত সম্মান ও ভক্তি করিত। উক্ত বালকমণ্ডলীকে প্রতিদিন যত্ন সহকারে বিদ্যাশিক্ষা করিতে দেখিয়া, রজককুমার রঘুবীরের মনে, বিদ্যাশিক্ষার বাসনা বিলক্ষণ বলবতী হইয়া উঠিল। সে ব্যক্তি উপর্য্যুপরি কয়েক দিবস উক্ত অধ্যাপকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া, বিনয়নম্রবচনে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিল। অধ্যাপক মহোদয়, যাহাতে তাহাকে রজক বলিয়া ঘৃণা না করেন, এবং যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা দেন, তাহার জন্য সে বিশেষ মিনতি করিতে লাগিল। অধ্যাপক, প্রথমতঃ রজক বালকের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। কিন্তু রঘুবীরের কাতরতা ও বিদ্যাশিক্ষায় বিশেষ আগ্রহ দৃষ্টে, পরিশেষে তাহার প্রস্তাবে সম্মত, এবং তাহাকে শিক্ষা-দান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অধ্যাপক গদাধর

সংযমীর অপার করুণায়, রঘুবীরের হৃদয়ে অসীম আনন্দপ্রবাহ প্রবাহিত হইতে লাগিল। পরম উল্লাসে উল্লসিত হইয়া, রঘুবীর আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিল। রঘুবীরের শিক্ষা আরম্ভ হইল। তাহার বিলক্ষণ মেধা ছিল, এবং অতীব যত্ন ও মনোযোগ সহকারে, সে ব্যক্তি, গুরুদেবের নিকট পাঠশিক্ষা করিতে লাগিল। অধ্যাপক, রজক বালকের অধ্যবসায়, শ্রম, যত্ন ও বিনয়াদি গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে অতিশয় যত্ন সহকারে নানা শাস্ত্র শিখাইলেন। এই রূপে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলে, রঘুবীর সর্ব্বশাস্ত্র শিক্ষা করতঃ, একজন অসাধারণ পণ্ডিত হইয়া উঠিল। গ্রামের সকল লোকেই রঘুবীরের পাণ্ডিত্যে চমৎকৃত হইতে লাগিল। ক্রমেই, রঘুবীরের বিদ্যা বুদ্ধি ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কাহিনী, পুষ্পসৌরভের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতি লাভ করিল। শ্রম ও যত্ন সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে দেখিয়া, অধ্যাপক যৎপরোনাস্তি সুখ ও প্রীতি লাভ করিলেন; এবং সর্ব্বত্র প্রিয় শিষ্যের যশঃ-ঘোষণা করিতে লাগিলেন। রঘুবীর সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ হইল বটে, কিন্তু নীচ জাতীয় ব্যক্তি বলিয়া, সে, জনসমাজে, তাদৃশ সমাদর প্রাপ্ত হইল না। চেলাটক ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের ব্যক্তিবৃন্দ রঘুবীরের গুণের যথেষ্ট সুখ্যাতি করিতে লাগিল বটে, কিন্তু রজক বলিয়া কেহই তাহাকে উচ্চ জাতির সম্মান প্রদান করিল না। তজ্জন্য, সে ব্যক্তি বড়ই সন্তপ্তচিত্তে কাল যাপন করিতে লাগিল। রঘুবীর যখন দেখিল যে, তাহার স্বদেশবাসিগণ, এ অবস্থাতেও তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টি করিতেছে, তখন সে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেশ গমনের সংকল্প করিল। এবং কাল-বিলম্ব না করিয়া, আপনার জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চন্দ্রকোট রাজ্যে গমন করিল। এবং অতি অল্প দিবসের মধ্যেই চন্দ্রকোট নগরাধিপতি, প্রভুনারায়ণ সিংহের জনৈক সভাসদ রূপে তথায় নিযুক্ত হইল। চন্দ্রকোটাধিপতি, প্রভুনারায়ণ সিংহ এক জন গুণগ্রাহী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। রজক বালক স্বীয় বিদ্যাবলে ও বুদ্ধি কৌশলে অনতিবিলম্বেই নরপতির অতি প্রিয় পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল। বাস্তবিক, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, চন্দ্রকোটাধি-পতি, এই নবীন সভাসদের গুণে একান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। রাজসভার পণ্ডিতমণ্ডলীও বুঝিতে পারিলেন যে, নবাগত ব্যক্তি এক জন অসাধারণ পণ্ডিত, বিলক্ষণ বুদ্ধিজীবী, এবং কার্য্যকুশল পুরুষ। রাজা প্রভুনারায়ণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। রঘুবীর আত্মজাতি গোপন করিয়া, ক্ষত্রিয় পরিচয়ে রাজ-সংসারে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

ক্রমে, দিন যতই অতিবাহিত হইতে লাগিল, রঘুবীরের প্রতিপত্তি তত পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। সে রাজ্যের, সকল লোকেই, রঘুর বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য ও কার্য্যদক্ষতায়, মুগ্ধ হইয়া পড়িল। রাজা প্রভুনারায়ণ সিংহও তাহাকে যথেষ্ট যত্ন ও আদর করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে রাজকার্য্যের ভারও বহুল পরিমাণে তাহার উপর অর্পণ করিলেন। এই ভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইলে, রঘুবীর দেখিল যে, তাহার যশঃ, মান, ও সমাদর বৃদ্ধির আর অবশিষ্ট নাই; সে ব্যক্তি রাজার দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

রাজা প্রভুনারায়ণ সিংহের একটী মাত্র পরম গুণবতী ও রূপবতী দুহিতা ব্যতীত, আর কোনও পুত্রকন্যা ছিলনা। সেই সুন্দরী কুমারীর বিবাহ কাল উপস্থিত হইলে, রাজা রঘুবীরের সহিত আপন দুহিতার বিবাহ দিলেন। শুভ দিনে, শুভ লগ্নে, শুভ বিবাহ (?) অতি সমারোহে সম্পন্ন হইল। এই বিবাহ-উপলক্ষে,রাজা বাহাদুর বহু সংখ্যক দীন দরিদ্র ব্যক্তিকে বহু অর্থ দান করিলেন। বহু ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূমি দান করা হইলে, তাহারা বৃদ্ধ রাজা ও নব দম্পতীকে শত শত শুভাশীর্ব্বাদ করিতে করিতে আনন্দ মনে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। এ বিবাহে কাহাকেও নিরাশ হইতে হয় নাই। সকলেই উপযুক্ত রূপ উপহার প্রাপ্ত হইয়াছিল। রঘুবীর এক্ষণে রাজ-জামাতা হইয়া, পরম পরিতুষ্ট হইল এবং স্বীয় অদৃষ্টকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিল। আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিল। সে এক্ষণে পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। তাহার পূর্ব্বাবস্থা মনে পড়িলে, সে শিহরিয়া উঠিত বটে, কিন্তু প্রবঞ্চনা প্রকাশের আশঙ্কাকে মনোমধ্যে স্থান দিত না। জাতি প্রকাশের আশঙ্কা যত বার তাহার মানসক্ষেত্রে উপস্থিত হইত, রঘুবীর সাহস-সহায়ে ততবারই সেই আশঙ্কাটীকে তথা হইতে দূর করিয়া দিত। ক্রমে সে আশঙ্কা তাহার মনোমধ্যেই বিলীন হইল, আর তাহাকে দেখা গেল না। রজকের মনে যথেষ্ট দৃঢ়তা ছিল।

রাজা প্রভুনারায়ণ সিংহের পুত্র বা অপর কোনও উত্তরাধিকারী না থাকায়, অন্তিম দশা উপস্থিত হইলে, তিনি স্বীয় জামাতৃ করেই বিপুল রাজ্য সমর্পণ পূর্ব্বক, ভবসংসার হইতে চির দিনের তরে বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাজ-জামাতা, রঘুবীর রজক, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অমাত্য ও পারিষদবর্গ সাহায্যে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিল। কিন্তু, সে ব্যক্তির নীচজাতি-সুলভ

নিকৃষ্ট স্বভাবের কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না। রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই, রঘুবীর, প্রজাগণের প্রতি অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। সে ব্যক্তি কর্ত্তৃক এতদূর প্রজাপীড়ন হইতে লাগিল যে, প্রজাসমূহ নবাধিপতির ঘোর অত্যাচারে কাতর হইয়া, দিবারাত্র আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। সুনীতি ও সুশাসন অভাবে রাজ্য-মধ্যে নানা প্রকার অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সমগ্র রাজ্যমধ্যে অত্যন্ত অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে দর্শন করিয়া, রাজপুরোবাসিগণও চিন্তিত হইল।' সভাসদবৃন্দের সুমন্ত্রণা ব্যর্থ হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলেরই পীড়ন আরম্ভ হইল। রাজকন্যাও এ বিষম দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিল না। তাহাকেও পতি-প্রহার-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল। রাজ দুহিতা একান্ত কাতর হইয়া জীবন্মৃতাবস্থায় দিন যামিনী যাপন করিতে লাগিল; তথাপি নিষ্ঠুর পতির অত্যাচারের পরিমাণ হ্রাস হইল না; বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। ঘোর যন্ত্রণায় অতীব অস্থির হইয়া,রাজকুমারী সর্ব্বদাই পরমপিতা পরমেশ্বরকে আপন মনোবেদনা জানাইতে লাগিল। ঘোর চিন্তায়, মনোকষ্টে, অনাহারে বা অল্পাহারে, অতি কষ্টে তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল।

এই ভাবে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে পর, রজকযুবকের শিক্ষাগুরু, গোদাবরীনদীতীরবাসী অধ্যাপক গদাধর সংযমী একদিন হঠাৎ রাজভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নব অধিপতিকে দর্শন করিবা মাত্রই তিনি তাহাকে তাঁহার পূর্ব্ব শিষ্য 'রঘু রজক' বলিয়া চিনিতে পারিলেন। বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও সংযমী অধ্যাপক, সে সময়ে রজকের সম্মুখে না আসিয়া, এবং কোন ব্যক্তিকেই আত্ম পরিচয় প্রদান না করিয়া, কেবল মাত্র দৈবজ্ঞ পরিচয়ে, রাজ অন্তঃপুর-প্রাঙ্গনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজ অন্তঃপুরের কোন এক পরিচারিকা দ্বারা, রাজকুমারীকে আপন সমীপে আহ্বান করতঃ, সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। এই অধ্যাপককে প্রকৃত উদাসীন ও দৈবজ্ঞ জ্ঞান করিয়া, রাজকুমারী, ইঁহার নিকট, সকল বিষয়ই, অকপটে প্রকাশ করিয়া কহিল—"প্রভো! আমার মত হতভাগিনী, বোধ হয়, জগতে আর নাই। আমি রাজদুহিতা হইয়া বাল্যকালাবধি অতীব আদর ও যত্নে প্রতিপালিতা হইয়াছি। কখনও কোন প্রকার ক্লেশ বা যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় নাই। কিন্তু, এক্ষণে, নিষ্ঠুর ও দুরাচার স্বামীর করে নিপতিত হইয়া, আমাকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইতেছে। পিতৃদেব আমার স্বামীর জাতি কুল সবিশেষ না জানিয়া, কেবল মাত্র স্বামীর কথাই প্রত্যয় করিয়া, তাঁহাকে জামাতৃপদে বরণ করিয়া গিয়াছেন। আমার

শ্বশুরালয় যে কোথায় তাহা কেহই জ্ঞাত নহে। আমার স্বামী, বহু বিদ্যায় সুপণ্ডিত হইলেও, তাঁহার স্বভাব ইতর ব্যক্তির ন্যায় অসৎ। তাঁহার অন্তঃকরণও উদার নহে। এই নিষ্ঠুর স্বামীর হস্তে পড়িয়া, আমাকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা-ভোগ করিতে হইতেছে। আমার মনোকষ্টের সীমা নাই। আপনি দৈবজ্ঞ, সর্ব্বজ্ঞ, সকল বিষয়ই বিদিত আছেন ;—কৃপা করিয়া একবার আমার কররেখা গুলিন পরিদৃষ্ট করিয়া বলুন, আর কতকাল আমাকে এরূপ কঠিন ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে। যদি কোনরূপ দৈব ক্রিয়ার দ্বারা আমার এ দুর্গতি দূর করিতে পারেন, তাহা হইলে সে কার্য্যে ব্রতী হউন। আমি বহু অর্থ ব্যয় করিতেও প্রস্তুত আছি।" অধ্যাপক গদাধর সংযমী সকল বিষয়ই পরিজ্ঞাত হইলেন। ব্যাপার বুঝিতে আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। সংযমী মহাশয় আত্ম সংযমী বলিয়া, কোন কথাই প্রকাশ করিলেন না। বাস্তবিক, কোন গুরুতর বিষয় সহসা প্রকাশ করিতে বুদ্ধিমান মাত্রেই সঙ্কুচিত হয়। সংযমী মহাশয় যদি সহসা এই গুরুতর বিষয়ের বিবরণ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে, রাজ্যমধ্যে মহা গণ্ডগোল পড়িয়া যাইত। রজক যুবার প্রাণ রক্ষা করা দুষ্কর হইত। অধ্যাপক দেখিলেন—যখন এই দুষ্কর কার্য্য সংসাধিত হইয়া গিয়াছে, তখন আর উপায় নাই। এক্ষণে প্রকাশ করিলে অনর্থক মহা অনিষ্ট সংঘটিত হইবে।

অধ্যাপক কহিলেন—"মা! আমি দৈবজ্ঞ; আমার গুরুদেবের অপার কৃপায়, আমি সকল বিষয় অবগত আছি। তোমার হাত দেখিতে হইবে না। আমি বুঝিতে পারিতেছি, এত দিনে তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াছে; আর তোমার চিন্তা নাই। তোমার সুখের দিন উপস্থিত; আর বৃথা বিলাপ করিও না। যাহা অদৃষ্টে ছিল তাহা ঘটিয়াছে। নিয়তির গতি রোধ করা অসম্ভব। অতঃপর তোমাকে কিছুমাত্রও ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে না। বিধাতা কাহাকেও চিরদিন সমভাবে সুখ বা দুঃখ দেন না। দুঃখের দিন অতিবাহিত হইলে, সুখের দিন সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়। দেখ, যে আকাশে অমাবস্যা হয়, সেই আকাশেই আবার পূর্ণিমার উদয় হইয়া থাকে। শিশিরঋতু গত হইলেই, সর্ব্বসুখকর বসন্ত, আপনা হইতেই আসিয়া থাকে, তাহাকে আহ্বান করিবার প্রয়োজন হয় না। বসন্ত আসিলে প্রাণী মাত্রেই সুখানুভব করিয়া থাকে, শীতের কষ্ট ভুলিয়া যায়। তোমার দুঃখ নিশার অবসান ও সুখের সুমধুর প্রভাতের আবির্ভাব হইয়াছে। রোদন সংবরণ

কর। আমি তোমাকে একটী মন্ত্র শিখাইয়া দিতেছি, তাহার প্রভাবে তোমার সমুদায় ক্লেশ বিনষ্ট হইবে। যৎকালে, তোমার নিষ্ঠুর পতি, তোমাকে প্রহার করিতে সমুদ্যত হইবে, তৎক্ষণাৎ তুমি এই সিদ্ধ মন্ত্রটী উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়া তাহাকে শুনাইবে। তাহা হইলে তোমার পতি আর কখনও তোমাকে প্রহার করিবেনা। মন্ত্রটী সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিয়া তোমার পতিকে শুনাইবে।" এই বলিয়া, অধ্যাপক গদাধর সংযমী, রাজ দুহিতাকে এই প্রস্তাবের শিষোক্ত কবিতাটী শিখাইয়া দিয়া, তথা হইতে ধীরে ধীরে অপসৃত হইলেন। শ্লোকটীতে চন্দ্রকোট রাজ্যের নব অধিপতির জাতি ও পূর্ব্বাবস্থার বিষয়, অতি সুকৌশলে কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া হইয়াছে। উহার ভাবার্থ এই যে,—"তোমার পূর্ব্ব নিবাস চেলাটক গ্রাম খানিকে একবার স্মরণ কর; গোদাবরী নদীটীকেও ভালরূপ স্মরণ কর; মাদ্রী ও ভদ্রী নাম্নী গর্দ্দভী দুইটীকেও একবার স্মরণ কর এবং শুস্ শুস্ শব্দ উচ্চারণ করিয়া, যে, সহস্র জাতির মলিন বসন প্রক্ষালন করিতে, তাহাও একবার স্মরণ কর। এক্ষণে, রাজ্যপদ প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হইওনা।"

রাজকুমারী, উক্ত শ্লোকটী, উত্তমরূপে কণ্ঠস্থ করিল বটে, কিন্তু, ইহার অভ্যন্তরে যে নিগূঢ় অর্থ নিহিত আছে, তাহার কিছুমাত্রও বোধগম্য করিতে সমর্থা হইল না।

অনন্তর, এক দিবস, রাজা রঘুবীর তাহার স্ত্রীকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, রাজকুমারী তৎক্ষণাৎ অধ্যাপক-প্রদত্ত উক্ত শ্লোকটী উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিল। রাজকুমারীর মুখ হইতে এই অদ্ভুত শ্লোকটী শ্রবণ করিবামাত্রই, রজক বাহাদুর সেই মুহূর্ত্তেই প্রহারে নিরস্ত হইল। তাহার মনে বিষম বিস্ময় ও অত্যন্ত শঙ্কার সঞ্চার হইল, বদন বিশুষ্ক হইয়া গেল। সে ব্যক্তি মন্ত্রমুগ্ধ অহিরাজের ন্যায় অবিচলিত ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়া, পরিশেষে, ধীরে ধীরে, অতি নম্রভাবে ও সুমিষ্ট বচনে স্বীয় পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি এই শ্লোকটী কাহার নিকট হইতে পাইয়াছ?" রাজনন্দিনী দেখিল যে, ঔষধটী বেশ ধরিয়াছে, ইহার এক মাত্রাতেই রোগ আরোগ্য হইবে। রাজকুমারী তাহার স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে কহিল—"এক জন পরম জ্ঞানী সন্ন্যাসী, এই শ্লোকটী

আমাকে শিখাইয়া দিয়াছেন। তিনি সময়ান্তরে, পুনর্ব্বার আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া গিয়াছেন। তিনি আমাকে তাঁহার পরিচয় প্রদান করেন নাই। তিনি পুনর্ব্বার এখানে আসিলে তোমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে।” রাজকুমারীর উত্তরে রঘুবীর সমুদায় বৃত্তান্ত সবিশেষ বুঝিতে পারিল। কিছুমাত্রও কালবিলম্ব না করিয়া, রঘুবীর একাকী অতি সংগোপনে গোদাবরী নদীতীরে সেই অধ্যাপকের নিকট আসিয়া উপনীত হইল। সে ব্যক্তি স্বীয় গুরুদেবের চরণযুগল ধারণ পূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে সকাতরে কহিল—“প্রভো! এ দাসানুদাসের অপরাধ ক্ষমা করুন। এ হতভাগ্যকে জন্মের মত নষ্ট করিবেন না। আমার গুরুতর অপরাধ হইয়াছে। সামান্য রজক হইয়া ক্ষত্রিয় কন্যা বিবাহ করিয়াছি, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। রাজ-জামাতা হইয়া রাজ্যলাভও করিয়াছি। কিন্তু, এক্ষণে আর ফিরিবার উপায় নাই। যাহা হইবার হইয়াছে। এখন নিরুপায়। আপনি আমার পরম গুরু। আমাকে ক্ষমা করুন। এ সকল বিষয় প্রকাশিত হইলে আমার মস্তক দেহচ্যুত হইবে। এতদিনে আমার চৈতন্যোদয় হইয়াছে। আপনার পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি, আর আমি নিষ্ঠুরতাচরণ করিব না। সর্ব্বদা ধর্ম্মলক্ষ্য করিয়া কার্য্য করিব। রাজ্যের ও প্রজাবর্গের যাহাতে হিত হয়, তদ্বিষয়ে প্রাণপণে চেষ্টা করিব। আর কখনও কোন অন্যায় কার্য্য করিব না। আপনি এইবার মাত্র আমাকে ক্ষমা করুন।” রজকের কাতরতায় অধ্যাপক গদাধর সংযমীর মনে করুণা সঞ্চার হইল। ব্রাহ্মণ কহিলেন—“আমি, রাজকুমারীর সদনে তোমার জাতি কুল বা অবস্থার কথা কিছুই প্রকাশ করি নাই। তাহা হইলে এতক্ষণ তুমি জীবিত থাকিতে না। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে; কিন্তু সাবধান! অদ্য হইতে তুমি আর কখনও অধর্ম্ম বা দুষ্কর্ম্মের পথে পদার্পণ করিও না। যাহাতে সকল প্রাণীর মঙ্গল হয়, সর্ব্বদাই তাহার চেষ্টা করিবে। অমাত্য ও সভাসদ্ বর্গকে একান্ত সুহৃদ ও মিত্র জ্ঞান করিয়া, তাহাদের সহিত সর্ব্বদা সদ্ব্যবহার করিবে। এই মুহূর্ত্ত হইতে তুমি, কি স্ত্রী, কি দাস দাসী, কি অপর কোন ব্যক্তি, কাহাকেও প্রহার করিবে না। কাহাকেও উৎপীড়িত, এবং অকারণে কাহারও প্রতি কোন রূপ অসদাচরণ করিও না। দয়া ও ধর্ম্মকে কদাচ উপেক্ষা করিও না। সর্ব্বদা আত্মসম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিবে। যদি পুনর্ব্বার শুনিতে পাই যে, তুমি কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়াছ, তাহা হইলে আমি সর্ব্বত্রই

তোমার জাতি কুলের বিষয় প্রকাশ করিয়া দিব। কোন ক্রমেই তুমি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। পরিণামে তোমার ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত হইবে।" অতঃপর অধ্যাপক ব্রাহ্মণ এই শ্লোকটী পাঠ করিয়া রজককে শুনাইলেন। যথা—

যঃ স্বভাবো হি যস্য স্যাৎ তস্যাসৌ দুরতিক্রমঃ।
শ্বা যদা ক্রিয়তে রাজা স কিং নাশ্নাত্যুপানহম্॥

এই শ্লোকটীর ভাবার্থ এই যে, যে ব্যক্তির যে প্রকার স্বভাব থাকে, সে ব্যক্তির সে স্বভাবের কদাচ অন্যথা হয় না। কুক্কুর রাজপদ প্রাপ্ত হইলেও, সে, চর্ম্মপাদুকা লেহন করিয়া থাকে; তাহার জাতীয় স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয় না।

গুরুদেবের মুখ হইতে উক্ত শ্লোকটী শ্রবণ করিলে পর, রজকের চৈতন্যোদয় হইল। সে ব্যক্তি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাবে স্বীয় গুরুদেবের শ্রীচরণাম্বুজে শত শত প্রণাম করিল, এবং তাঁহার আদেশ ও উপদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। রজক, স্বীয় গুরুদেবের উপদেশ শিরোধার্য্য করতঃ, স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ন্যায়ানুসারে প্রজাপালন ও রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

এই ঘটনার পর হইতে, রঘুবীর, আর তাহার বনিতা বা অপর কাহারও প্রতি, কোন রূপ অত্যাচার, অথবা কাহাকেও অন্যায় রূপে পীড়ন করে নাই। কাহারও প্রতি, তাহার উৎপীড়নের কাহিনী আর শুনা যায় নাই।

অবস্থা উন্নত হইলে, লোকে, পূর্ব্ব হীনাবস্থার বিষয় ভুলিয়া যায়। উচ্চ-বংশীয় ও শিক্ষিত জনগণের মধ্যেও এরূপ অনেক 'রঘুবীর' দৃষ্ট হইয়া থাকে, যাহারা হীনাবস্থা হইতে এক্ষণে 'বড়' হইয়া, পুনর্ব্বার, মনুষ্যের অব্যবহিত পূর্ব্ব জীবের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

গৌরবে না রৌরবে ?

(২য় প্রস্তাব)

সমগ্র ইউরোপ, ভোগ ও বিলাসের প্রশস্ত ক্ষেত্র। পার্থিব সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য, অথবা জাগতিক প্রভুত্ব, সম্মান, অধিকার, ধন সম্পত্তি কিম্বা যশোলাভের জন্য, ইউরোপবাসীরা ধর্ম্মের অমর্য্যাদা করিতে অনেক সময়ে অকাতরে অগ্রসর হয়েন। সাংসারিক স্বার্থের পরিপূরণ জন্য ইউরোপের লোকেরা ধর্ম্মের বিনিময়ে অধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে অনেক সময়ে কুণ্ঠিত হয়েন না, ইহা ধ্রুব সত্য। এই কারণে ইউরোপ মহাদেশের যে সকল লোক সমরক্ষেত্রে উপনীত হইয়া শাণিত তরবারির সহায়তায় নরহত্যায় দক্ষহস্ত বলিয়া সুপরিচিত হয়েন, অথবা যাঁহারা যে কোন উপায়ে হউক রাজ্যবৃদ্ধি ,ধনবৃদ্ধি, বিদেশী জাতির ধ্বংস, নূতন অধিকার স্থাপন,প্রভুত্বের সৃষ্টি, স্বদেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি কিম্বা নিরীহ ও নিরপরাধী বিদেশীর সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াও স্বজাতির শ্রীবৃদ্ধিসাধনে সামর্থ্য প্রদর্শন করিতে পারেন, তাঁহাদের সমস্ত জীবনে ধর্ম্মভাবের অণুমাত্র লক্ষণ না থাকিলেও, ইউরোপীয় ইতিহাসে তাঁহারা নরপুঙ্গব বলিয়া অভিহিত হয়েন ; এইজন্য অজ্ঞাতবংশজ মিষ্টর ক্লাইব, পরিণামে লর্ড ক্লাইব নামে সুপরিচিত হইয়া ঐ দেশের সাহিত্য ও জাতীয় ইতিহাসে "বিশ্ব গৌরব মহানুভব" বলিয়া সমগ্র ইউরোপ ভূমে সুপ্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। লর্ড ক্লাইবের অপরিমিত অধ্যবসায় ও অপ্রতিহত চেষ্টায় এই ত্রিংশ কোটি মানবসমাচ্ছন্ন পৃথ্বী গৌরব ভারতবর্ষ নামক মহাদেশ ইংলণ্ডের অধিকারভুক্ত হইয়াছে। এই দেবদুর্লভ অধিকারের প্রতিষ্ঠাতা—ক্লাইব। কপটতা, মিথ্যাচার, সত্যের অমর্য্যাদা, অন্যায় বলপ্রয়োগ, সমগ্র বঙ্গের সর্ব্বনাশ, হিন্দু ও মুসলমানে বিদ্বেষভাবের উৎপাদন, ধার্ম্মিক ও ধনবান লোকদিগের ধ্বংস, পরমারাধ্য পরমেশ্বরের অনুজ্ঞা লঙ্ঘন এবং ইউরোপের স্বধর্ম্মগুরু যিশুখৃষ্টের মহিমায় দুরপনেয় কলঙ্ক স্থাপন করিয়া, ক্লাইব সাহেব ভারতবর্ষে ইংরাজশাসনের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই বৃহতী ঘটনা সম্যক রূপে বর্ণনা করিবার অবকাশ আমাদের নাই, কিন্তু এই কথা বলিলে আপাততঃ যথেষ্ট হইবে যে, এতদ্দেশীয় তন্তুবায়কুলের উচ্ছেদ, গৌড়ীয় বাণিজ্যের সর্ব্বনাশ, ইউরোপীয় ব্যবসা ভারতে প্রচার এবং বহুপ্রকারে এদেশের চিরস্থায়িনী ক্ষতি করিয়া, ক্লাইব সাহেব ভারতবর্ষ দেশকে ইংরাজের হস্তে সমর্পণ করেন। উমিচাঁদ, মোহনলাল, নন্দকুমার, রাজবল্লভ,সিরাজউদ্দৌলা,

কাশিম প্রভৃতি অসংখ্য সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ ইঁহারই অত্যাচারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ক্লাইবের প্রবলাত্যাচারে চতুর্ব্বিংশখান বিলাতী জাহাজ বঙ্গদেশ হইতে সুবর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রা অপহরণ করিয়া, সমুদ্রপারে বিলাতে লইয়া গিয়াছিল। তাহার পরে কত টাকা গিয়াছে, কত হীরা কত মাণিক কত মূল্যবান বস্ত্র ও দ্রব্যাদি ভারত পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা কে করিবে? তাহাতেই বলিতেছি, ক্লাইবের দ্বারা ইংলণ্ড বা ইউরোপের সহস্র প্রকারে শ্রীবৃদ্ধি লাভ হইয়াছে সত্য বটে, কিন্তু এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ইংরাজপুরুষের দ্বারা ধর্ম্মের, সত্যের ও আধ্যাত্মিক জগতের মর্য্যাদা রক্ষা হইয়াছে কি? কেহ কেহ কহেন, ক্লাইবের অস্থিমাংসভেদী পরিশ্রমে, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে ও অকুতোসাহসে, ভারতবর্ষ, অত্যাচারী মুসলমান হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইয়া, শত সহস্র প্রকারে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ পূর্ব্বক সভ্য সমাজের মানচিত্রে পরম গৌরবে শোভা পাইতেছে। এই অভিমতের যৌক্তিকতা বা অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে মীমাংসার ভার সুবুদ্ধিমান পাঠকের হস্তেই থাকুক; আমি এই কূট বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিনা। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্জ্জনের চেষ্টায় ক্লাইবের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের উদ্যোগ হইতেছে। সুপ্রসিদ্ধ 'বেঙ্গলি' পত্রে এতদুপলক্ষে এক ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন "Clive was a moral leper" অর্থাৎ ধর্ম্মক্ষেত্রে ক্লাইব যেন কুষ্ঠব্যাধি সমাযুক্ত জঘন্য রোগী। ক্লাইব সম্বন্ধে আমার অভিমতও এইরূপ। এই কথা প্রমাণ করিবার জন্যই এই প্রবন্ধের অবতারণা। নেল্‌সনের কথা, ক্লাইবের কথা শেষ করিয়া আলোচনা করিব।

যিশু খৃষ্টের মতাবলম্বী লোকদিগের রাজনৈতিক জীবন সমালোচনা করিতে গিয়া ক্লাইব সম্বন্ধে জনৈক ব্যক্তি সত্য সত্যই লিখিয়াছেন—

The life of Lord Clive, one of the founders of the British Empire, is told in a few words. He caused the name of Admiral Watson to be forged by a colleague (Lushington) for the purpose of cheating Omichand of a few lakhs of rupees. And who was this Omichand? He was no other, to quote Clive's own words, than "that nobleminded and wealthy native merchant of Calcutta" to whom "we the servants of the East India Company should always be grateful." And the same Clive shewed his gratitude to him by cheating him of 30 lakhs of rupees, by forgery,—a crime for which the punishment was death in his native land and for which Manaraja Nanda Kumar was hanged in this country a few years later, even though he did not actually commit it. *

* An Englishman's opinion quoted in the A. B. Patrika of 27th July, 1907. (Daily Edition)

ইহার ভাবার্থ এই—উমিচাঁদ নামক বণিককে প্রতারিত করিবার জন্য ক্লাইব সাহেব তাঁহার সহযোগী লুশীংটনের দ্বারা সেনাধ্যক্ষ ওয়াট্সনের নাম জাল করাইয়াছিলেন। যে উমিচাঁদকে কয়েক লক্ষ টাকার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য ক্লাইব চেষ্টা করিয়া সফলকাম হইয়াছিলেন, সেই উমিচাঁদ সম্বন্ধে ক্লাইব একদা নিজেই কহিয়াছিলেন "উমিচাঁদ কলিকাতার অন্যতম প্রধান বণিক, ইনি উচ্চমনা এবং ইহাঁর কৃত নানা উপকারের জন্য, আমাদের (অর্থাৎ ইংরাজদের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির) উচিত, উমিচাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকা।" এই উমিচাঁদকে ক্লাইব সাহেব পরিণামে ৩০ লক্ষ টাকার জন্য প্রবঞ্চিত করিয়াছিলেন। এই জঘন্য উপায়ে ক্লাইব সাহেব উমিচাঁদকে বঞ্চিত করিবার জন্য "জাল" করিয়াছিলেন; বিলাতে তখন "জাল" করণ জন্য ফাঁসির ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু ক্লাইবের কোন দণ্ডই হয় নাই। এদিকে নিরপরাধী মহারাজা নন্দকুমারের নামে জাল মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়া ইংরাজেরা মহারাজকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়াছিলেন।

ইংরাজ ঐতিহাসিক হেন্‌দ্‌ম্যান সাহেব লিখিয়াছেন * "To say that Clive was a sinless man would be a wicked lie." অর্থাৎ ক্লাইব সাহেব নিষ্পাপ লোক ছিল একথা কহিলে ঘৃণিত মিথ্যা কথা বলা হয়। অনন্তর হেন্‌দ্‌ম্যান সাহেব লিখিতেছেন "Clive was in the iniquitous habit of opening letters which were not addressed to him and with which he had no connection either direct or indirect. Many of these letters were private and some of them were marked *strictly confidential*" অর্থাৎ ক্লাইবের এমন পাপমতি অথবা ঘৃণিত অভ্যাস ছিল যে, সে ব্যক্তি অপরের চিঠি সমূহ খুলিয়া পড়িত। এই সকল চিঠি গোপনীয় এবং ইহাদের মধ্যে অনেক পত্র বিশেষ গোপনীয়। রথার্ড ফোর্ড নামক আর এক ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন—Clive's marriage was a regular semirimitan mystery † অর্থাৎ ক্লাইবের বিবাহটাও সিমিরিমিটশ দ্বীপের লোকদিগের মধ্যে প্রচলিত পুরাতন প্রবাদের ন্যায় এক আশ্চর্য্য প্রহেলিকাবৎ। এই বিবাহে ক্লাইবচরিত্র পরিস্ফুট!! তাহা এখানে অভিব্যক্ত করিবার আর আবশ্যক নাই। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, ক্লাইব গৌরবে কি রৌরবে?

* A Guide to the Studies of Indian History. Part I. P. P 31-32.

† Revd. Dr. Rutherford's Brief History of Indian Empire.

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ সাহেবের জনকের নাম জেম্স্ মিল্। ইনি ভারতবর্ষের এক প্রকাণ্ড ইতিহাস লিখিয়াছেন। ঐ ইতিহাস বিংশ খণ্ডে সমাপ্ত। মিল্ সাহেব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে চাকুরী করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন—"Clive was a man in whom deception, when it suited his purpose, never cost a pang"— James Mill's History of India) অর্থাৎ ক্লাইব এমন প্রকৃতির লোক ছিলেন, যিনি নিজের মতলব পরিপূরণ জন্য জুয়াচুরী করিয়াও কথন দুঃখিত হইতেন না। ম্যালিশন্ সাহেব লিখিতেছেন—

"The greed for money, the ever-increasing demand for the augmentation of the sum originally asked for, the dishonouring trick by which a confederate was to be baulked of his share in the spoil, these are actions the contemplation of which makes and will always make, the heart of an honest man burn with indignation." *

ইহার আর অনুবাদের আবশ্যকতা আছে কি ? রেভরেণ্ড ডাক্তার (পাদ্রী) মার্শমান এবং হিউম সাহেবদিগের ইতিহাসেও ক্লাইব চরিত্র অতি ঘৃণিত ভাবে অঙ্কিত আছে। ইঁহারা ক্লাইবের স্বদেশীয় লোক এবং নিরপেক্ষ লেখক। ইঁহাদের কেহই ভারতবাসী নহেন। (Read History of British India by Hugh Murray, F. R. S. E. and History of India By John Clarke Marshman, Serampore, 1868.)

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে কেহই মহারাজা নন্দকুমারের বিবরণ নিরপেক্ষ ভাবে অথবা সত্যের সহায়তায় লিখিয়া যান নাই। ইংরাজের লিখিত ধার্ম্মিক নন্দকুমারের বিবরণ অলীক কাহিনীতে পরিপূর্ণ। ইংরাজের মধ্যে পাটনা জেলার ভূতপূর্ব্ব ডিস্ট্রিক্ট্ জজ শ্রীমৎ বিভারীজ সাহেব নন্দকুমার সম্বন্ধে যে ইতিহাস লিখিয়াছেন তাহাও আমরা অনুমোদন করিনা বটে, কিন্তু ঐ গ্রন্থে তবুও কতকটা নিরপেক্ষতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলিকাতার "বেঙ্গলী" কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত বন্ধুবর তারাপ্রসন্ন মিত্র মহাশয় সংগৃহীত নন্দকুমারের ইংরাজি ইতিহাস বাস্তবিক অতীব উপাদেয় জিনিস হইয়াছে, ইহাতে নন্দকুমারের নির্দ্দোষিতা ও দুষ্ট ক্লাইবের দুরভিসন্ধি সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

---

* Malleson's History of India, and also his History of the Sepoy war.

"বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ" নামক গ্রন্থে মহারাজ নন্দকুমারের সম্পূর্ণ ও নিরপেক্ষ জীবনচরিত এবং যশের বিবরণ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। মৎপ্রণীত এই গ্রন্থ হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। আমার প্রার্থনা এই, বঙ্গের ব্রাহ্মণ রাজবংশ পুস্তকের পাঠকেরা যেন নন্দকুমারের জীবনচরিতটি একবার পাঠ করিয়া দেখেন। ঐ পুস্তকের ১৪৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "এই নন্দকুমারকে ইংরাজেরা একদিন পরম ধার্ম্মিক, পরম যোগ্য ও বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলিয়া ভক্তি করিত। ১৭৮৬ অব্দের ৯ই আগষ্ট তারিখে কোম্পানীর সিলেক্ট কমিটি লিখিয়াছিলেন, 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানার বাণিজ্য-স্বার্থের প্রসারকল্পে হুগলীর ফৌজদার দেওয়ান নন্দকুমারের আনুকূল্য লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক। এই সুযোগ্য ব্রাহ্মণ উন্নতমনা ও সাধু। ইনি অন্ধকূপের যন্ত্রণাভোগী কয়েদীদিগের জন্য প্রভূত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন।' ১৭৫৪ অব্দের ২০ জুন তারিখে কর্ণেল ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন সাহেব লিখিয়াছিলেন "নন্দকুমার এমন সুযোগ্য, বিশ্বাসী ও কৃতজ্ঞ, বিশেষতঃ আমাদের তিনি এত উপকার করিয়াছেন যে, বর্দ্ধমান হুগলী ও নদীয়া জেলা হইতে আমাদের যে টাকা আদায় হয়, অতঃপর নন্দকুমারের হাত দিয়া তাহা আদায় হওয়াই উচিত।" এখন পাঠকেরা বিবেচনা করিয়া দেখুন, ক্লাইব গৌরবে কি রৌরবে?

নেল্‌সনের কথা বারান্তরে লিখিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

গঙ্গারাম।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমরা এখনও রাধানাথের স্ত্রী রুক্মিণীর কোন পরিচয় দিই নাই। রুক্মিণী ছোট্ট মেয়েটী,—বড় শান্ত, বড় ধীর, বড় লজ্জাশীলা। একমাত্র স্বামী ছাড়া সংসারে রুক্মিণীর আর কেহ ছিল না। কিন্তু সেই সংসারের একমাত্র অবলম্বন—জীবন-তটিনীর একমাত্র গতি স্বামীর নিকটেও সে উপেক্ষিতা অনাদৃতা হইয়াছিল। কেন হইয়াছিল? তবে কি রুক্মিণী সুন্দরী ছিল না?

আমি কেমন করিয়া বলিব রুক্মিণী সুন্দরী নয়? তাহার দেহে চম্পকের আভা নাই, মুখে প্রফুল্ল পদ্মের সৌন্দর্য্য নাই, কেশে কাদম্বিনীর নিবিড়তা নাই,

নীল বারিধি সদৃশ নয়নযুগলে কটাক্ষের বিদ্যুৎ নাই, যৌবনে পূর্ণতোয়া তটিনীর উচ্ছ্বাস নাই। কিন্তু এ সকল না থাকিলেও রুক্মিণী সুন্দরী। বিশাল হ্রদের গভীর বুকে কালো জলের ক্ষুদ্র বীচিমালার সহিত অরুণ সূর্য্যকিরণের নৃত্যে যদি কিছু সৌন্দর্য্য থাকে, তবে রুক্মিণী সেইরূপ সুন্দরী। তরল-মেঘাবৃতা শারদপৌর্ণমাসী যামিনীর স্নিগ্ধ কান্তিতে যদি কিছু সৌন্দর্য্য থাকে, তবে রুক্মিণী সেইরূপ সুন্দরী। চন্দ্রকরোজ্জ্বল-উদ্যানপ্রান্তবাসিনী কৃষ্ণ অপরাজিতার মৃদু আন্দোলনে যদি কিছু সৌন্দর্য্য থাকে, তবে রুক্মিণী সেইরূপ সুন্দরী।

রুক্মিণীর সৌন্দর্য্যে কমনীয়তা আছে, মাদকতা নাই; আলোক আছে, প্রখরতা নাই; সৌরভ আছে, তীব্রতা নাই; প্রভাত আছে, মধ্যাহ্ন নাই। সে সৌন্দর্য্য শরতের তটিনী—শান্ত, স্থির, সুনির্ম্মল। তাহাতে পূর্ণতা আছে, চাঞ্চল্য নাই; লহরী আছে, তুফান নাই; স্বচ্ছতা আছে, আবিলতা নাই। যেমন দুঃখের মধ্যে সুখ, সুখের মধ্যে শান্তি; যেমন মিলনের মধ্যে অশ্রু, অশ্রুর মধ্যে হাসি; তেমনই রুক্মিণীর দেহ মধ্যে সৌন্দর্য্য, সৌন্দর্য্যের মধ্যে কমনীয়তা। যেমন দেহের মধ্যে প্রাণ, প্রাণের মধ্যে করুণা, করুণার মধ্যে অশ্রু, তেমনই রমণীর মধ্যে রুক্মিণী।

কিন্তু এইটুকু সৌন্দর্য্য লইয়া রাধানাথ তৃপ্ত নহেন। সংসারে যে ক্ষুদ্র—যে আপনার প্রভাববিস্তারে পরাঙ্মুখ, কয়জন তাহাকে আদর করে?

তা'ছাড়া রাধানাথের উপেক্ষার আর একটা কারণ ছিল। তিনি জানিতেন, রুক্মিণীকে বিবাহ করিয়া ভাল কাজ করেন নাই। যে লতাটী আজন্ম সম্মুখস্থিত সহকারকে আশ্রয় করিয়া বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহাকে উৎপাটিত করিয়া অন্যস্থানে রোপণ করা নিতান্ত হৃদয়হীনের কার্য্য হইয়াছে।

এখানে আমাদিগকে একটু গোড়ার কথা বলিতে হইবে। কথাটা অনেক দিনের। তখন রুক্মিণী বালিকা। সেই বালিকা বয়সে তাহার একটী সঙ্গী ছিল। সঙ্গী বল, প্রণয়ী বল, সুহৃদ বল, একটী সমবয়স্ক বালক তাহার শৈশব-জীবনের উপর অনেকটা আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। রুক্মিণীর পিতামাতা ছিল না; তাহার সঙ্গীটীও পিতৃমাতৃহীন, পরাশ্রয়ে প্রতিপালিত। অবস্থার সাম্যে সহানুভূতি বা ভালবাসাটা আরও বাড়িয়া যায়। সমাবস্থাপন্ন বালক-বালিকারও তাহাই হইয়াছিল। রুক্মিণীর সঙ্গীটী তাহার অপেক্ষা তিন চারি বৎসরের বড় ছিল।

তারপর ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে রুক্মিণী, প্রতিপালিকা এবং অভিভাবিকা মাতা-

মহীর চেষ্টায় রাধানাথের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধা হইল। বিবাহের পর সে স্বামীগৃহে আসিল। তদবধি আর সে সেই বাল্য সঙ্গীটির দেখা পায় নাই। কেবল রুক্মিণী নহে, তদবধি গ্রামের লোকেরাও আর তাহার কোন উদ্দেশ পায় নাই। সকলেই বলিত, রুক্মিণীর জন্যই সে দেশত্যাগী হইয়াছে।

বিবাহের পর রাধানাথ এ কথাটা শুনিলেন। শুনিয়া একটু অনুতপ্ত হইলেন। অনুতাপের সহিত রুক্মিণীর ভালবাসায় সন্দেহ জন্মিল, সন্দেহে উপেক্ষা আসিল। কিন্তু রুক্মিণীর এখন আর সে কথাটা তত মনে নাই। সে প্রথম প্রথম এই নিরুদ্দিষ্ট সঙ্গীটীর জন্য গোপনে দুই চারি ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিত বটে, কিন্তু তারপর সে স্বামীসেবায় মনোনিবেশ করিল।

রুক্মিণী ভুলিল, কিন্তু রাধানাথ ভুলিলেন না। সুতরাং এত চেষ্টাতেও রুক্মিণী স্বামীর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিল না।

তা' ইহাতে রুক্মিণী বড় একটা দুঃখিত ছিল না। সে জানিত,স্বামী দেবতা। দেবতা উপভোগের বস্তু নহে, পূজার বস্তু। তাই সে পূজা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিত; আরাধ্য দেবতার চরণে হৃদয়-নিঃসৃত ভক্তিধারা ঢালিয়া দিয়াই সে আত্মতৃপ্তি অনুভব করিত, ভোগের জন্য লালায়িত হইত না।

তার পর শ্যামা আসিল। রুক্মিণী ইহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত বা ঈর্ষ্যান্বিত হইল না, বরং সে আপন জ্যেষ্ঠা সহোদরার ন্যায় তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিল, তাহার দুঃখের কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, আপনার হৃদয়ভরা স্নেহ ও ভালবাসা দিয়া তাহাকে সুখী করিতে চেষ্টা করিল। নদী যেমন আপনার হৃদয়নিহিত সুশীতল সলিলরাশি জগতের নিকট বিতরণ করিতে করিতে চলিয়া যায়, জগতের নিকট কিছু প্রতিদান চাহে না, রুক্মিণীও সেইরূপ আপনার হৃদয়ের অগাধ ভালবাসা সংসারের উপর ঢালিয়া দিত, কিন্তু সংসারের নিকট নিজে কিছুই চাহিত না।

তাই বলিয়া রুক্মিণী নির্ব্বোধ ছিল না। সে শীঘ্রই স্বামীর কলুষিত মনোভাবটা জানিতে পারিল; রাধানাথের হৃদয়ে যে শ্যামার একটা ছায়া পড়িয়াছে, শ্যামার জন্য যে তিনি ব্যাকুল, তাহা বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া একটু ভয় পাইল। কিন্তু সে ভয়ের কথা কাহাকেও বলিতে পারিল না। স্বামীকে বলিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু সাহসে কুলাইল না। রুক্মিণী কেবল ভগবানকে আপনার মনের ব্যথা জানাইল, তাঁহার নিকট নিরন্তর স্বামীর মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল।

তার পর সহসা একদিন রাত্রিকালে শ্যামা গোপনে চলিয়া গেল। তোমরা মনে করিও না যে, ইহাতে রুক্মিণী আনন্দিত হইল। প্রভাতে উঠিয়া সে যখন শ্যামাকে দেখিতে পাইল না, তখন সে বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িল। তার পর রাধানাথ চারিদিকে লোক পাঠাইয়াও যখন শ্যামার কোন সন্ধান পাইলেন না, তখন রুক্মিণী কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে শ্যামার অনুসন্ধানের জন্য স্বামীকে ধরিয়া বসিল। যদিও রাধানাথ, তাহার অপেক্ষা ব্যাকুল, যদিও তখন তাঁহার চিত্তের স্থিরতা ছিল না, তথাপি তিনি শ্যামার জন্য রুক্মিণীর এই কাতরতা, এই ক্রন্দন দেখিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাহার এই উদারতা দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্য মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন, ইহা ভাণ—এ ষড়যন্ত্রের মূলে বোধ হয় রুক্মিণীও আছে। আপনার সুখের কণ্টক জ্ঞানে রুক্মিণীই তাহাকে দূরীভূত করিয়াছে। রুক্মিণীর ঐ চক্ষুজলের অন্তরালে নিশ্চয়ই কপটতা—আত্মদোষ সঙ্গোপনচেষ্টা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। রাধানাথ তো রুক্মিণীকে চিনিতেন না।

রাধানাথ সমস্ত দিন ঘুরিয়া শ্যামার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাহার কোন সন্ধানই পাইলেন না। অনেক অনুসন্ধানের পর জানিতে পারিলেন, মঞ্জরী কয়েকদিন হইতে শ্যামার নিকট যাতায়াত করিতেছিল। রাধানাথ ছুটিয়া মঞ্জরীর বাটীতে গেলেন, সেখানে গিয়া দেখিলেন, বাটীর দ্বার তালাবদ্ধ, মঞ্জরী নাই। দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাধানাথ গৃহে ফিরিলেন। শ্যামার পলায়নের জন্য তিনি মনে মনে তুই জনকে দায়ী করিলেন; একজন রুদ্রনারায়ণ, অপর রুক্মিণী।

গৃহে আসিতেই রুক্মিণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রুক্মিণী সমস্ত দিন দারুণ উৎকণ্ঠায় যাপন করিয়াছে। রাধানাথকে দেখিয়া সে ব্যস্ত ভাবে শ্যামার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। রাধানাথ রোষকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—“আর ছলনায় প্রয়োজন নাই, আমি সমস্তই বুঝিয়াছি।”

রুক্মিণী সবিস্ময়ে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। রাধানাথ তীব্রকণ্ঠে বলিলেন,—“শোন রুক্মিণি! আমি বহুদিন হইতে জানি, তুমি আমায় ভালবাস না; জানিলেও সে কথা একদিনও মুখ ফুটিয়া বলি নাই। কিন্তু আজি আর না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আজি তুমি আমার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছ, তাহাতে আমি আর তোমার মুখদর্শন করিতে ইচ্ছা করি না।”

রুক্মিণী দাঁড়াইয়াছিল, কাঁপিতে কাঁপিতে সেইখানে বসিয়া পড়িল। রুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "আমি কি করিয়াছি ?"

রাধানাথ বলিলেন,—"যাহা মানুষে করিতে পারে নাই, স্ত্রী হইয়া তুমি তাহাই করিয়াছ। কিন্তু সে কথায় আর প্রয়োজন নাই, আমি এখন চলিলাম।"

স্বামীর মুখের উপর সজল দৃষ্টিখানি স্থাপিত করিয়া রুক্মিণী বলিল,—"কোথায় যা'বে ?"

রাধানাথ বলিলেন,—"শ্যামার অনুসন্ধানে। যদি শ্যামাকে পাই, তবেই আবার গৃহে ফিরিব, নতুবা এই পর্য্যন্ত।"

রাধানাথ আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া বহির্ব্বাটীতে গেলেন। রুক্মিণী সেইখানে সেই ভাবে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শুনিল, রাধানাথ অশ্বারোহণে চলিয়া গিয়াছেন। রুক্মিণী বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল—কাঁদিল না; সংসার যাহাকে এক মুহূর্ত্তে নির্ম্মম পদাঘাতে দূরে নিক্ষেপ করিল, সে কিজন্য, কাহার জন্য কাঁদিবে ? রুক্মিণী কাঁদিল না, বসিয়া বসিয়া শুধু ভাবিতে লাগিল। সে শতবার মনে মনে প্রশ্ন করিল, "আমার অপরাধ কি ?" বিকট ভ্রূভঙ্গী করিয়া সংসার উত্তর দিতে লাগিল—হিঃ হিঃ হিঃ। রুক্মিণী স্তম্ভিত হৃদয়ে বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। সন্ধ্যার অন্ধকার ধীরে ধীরে আসিয়া পৃথিবীর আলোক নিবাইয়া দিল। আকাশে নক্ষত্র ফুটিল, কিন্তু রুক্মিণীর হৃদয়ে তো একটী খদ্যোতও জ্বলিল না !

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমি হরমণির রূপের বর্ণনা করিতে পারিলাম না। তাহার সেই সুদীর্ঘ সুপুষ্ট দেহযষ্টি, দেহযষ্টির সেই গোলগাল নধর গঠন,—দুগ্ধপূর্ণ কুম্ভ কক্ষে তাহার সেই গজরাজ বিনিন্দিত মৃদুমন্থর গতি, মন্থর গতির মধ্যে সুস্থূল কটিদেশের সেই ঘন আন্দোলন,—তাহার সেই দোক্তাভরা গাল, আর গালভরা হাসি, এ সকলের বর্ণনা করিতে আমি একান্ত অক্ষম। সেই শ্যামবরণা সুস্থূলদেহা ঘটোঘ্নী গোপ-কন্যা হরমণি যখন দুগ্ধপূর্ণকলস কক্ষে মৃদুগতিবিবৃত্ত কলেবরের সৌন্দর্য্য-পসরা লইয়া দোক্তারঞ্জিত অধরের মৃদু হাসি ছড়াইতে ছড়াইতে, সুগোল ভুজ-বল্লরীর ঘন আন্দোলনে দর্শকবৃন্দকে সন্তস্ত্র ও চমকিত করিতে করিতে সোনা-পুরের পথ দিয়া চলিয়া যাইত, তখনকার সেই শোভা—হে পাঠকপাঠিকাবৃন্দ !

তখনকার সেই মনোহারিণী পুরুষচিত্তচাঞ্চল্যবিধায়িনী শোভা আমি কিরূপে তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিব? আর, সেই অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে তৈলমর্দ্দন নিরত বাচস্পতি মহাশয় হইতে বস্ত্রবয়নপ্রবৃত্ত মদন দাসের পর্য্যন্ত মাথাটা যে কিছুতেই ঠিক থাকিত না, ইহাই বা কিরূপে অস্বীকার করিব?

তাই বলিয়া তোমরা হরমণির চরিত্র সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করিও না। হরমণি গোয়ালার মেয়ে, অল্প বয়সে বিধবা, তাই বলিয়া সে দুশ্চরিত্রা নহে। সে কথায় কথায় হাসে, কিন্তু তাহার সে হাসিতে কোন দুষ্ট ভাব নাই। সে গ্রামের স্ত্রী পুরুষ অনেকেরই চরিত্রের সংবাদ রাখে, কিন্তু নিজের চরিত্রটাকে কোন দিনই কলুষিত হইতে দেয় নাই। সে সতের বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া অবধি পিতৃগৃহে আসিয়া একা বাস করিতেছে। এখন তাহার বয়স প্রায় চল্লিশ। কিন্তু এত দিনের মধ্যে কেহই সাহস করিয়া তাহার প্রণয় প্রার্থনায় অগ্রসর হয় নাই। কেবল একবার মোহনদাস বাবাজী তাহাকে বিশুদ্ধ রাধা-প্রেমে দীক্ষিত করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি গুরুদক্ষিণার পরিবর্ত্তে সম্মার্জ্জনী দ্বারা গুরুতর রূপে অভ্যর্থিত হইয়া, শেষে মাতৃসম্বোধন করিয়া, তবে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তদবধি আর কেহই এই অসমসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হয় নাই। সকলেই সভয় দৃষ্টিতে এই বিধবা গোপকন্যার সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিত।

হরমণির কাজ অনেক। তন্মধ্যে প্রথম কাজ, গ্রামের বাড়ী বাড়ী নির্জ্জল গব্যরসের সহিত নূতন নূতন খাঁটী সংবাদ যোগান। স্বগ্রামে বা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে কখন কি ঘটিয়াছে, তাহার সংবাদ সর্ব্বাগ্রে হরমণির কাণে আসিত এবং তাহা বিশিষ্ট অলঙ্কারযুক্ত হইয়া তাহার দ্বারা গ্রামের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইত। তখন যদি দেশে সংবাদ পত্রের প্রচলন থাকিত, তবে অনেক সংবাদপত্র-সম্পাদক তাহাকে বিশেষ সংবাদদাতা করিয়া লইতে পারিতেন।

হরমণির দ্বিতীয় কাজ, কাহার কি অভাব তাহার অনুসন্ধান। প্রথম কাজটার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার এই দ্বিতীয় কাজটাও চলিত। কাহাকেও একসের চাউল, কাহাকেও একটা পয়সা, কাহাকেও দুই পণ কড়ি, কাহাকেও বা মুখের একটু আশ্বাস দিয়া সে এই কাজটা শেষ করিত। তা'ছাড়া দেনার দায়ে কাহারও ঘটী বাটী, গরু বাছুর বিক্রয় হইবার উপক্রম হইলে, কেহ কন্যাদায়ে পড়িলে, কোন ব্রাহ্মণসন্তানের উপনয়নে অর্থাভাব ঘটিলে হরমণি তাহাদিগকে গোপনে সাক্ষাৎ করিতে বলিত। গোপনে গোপনেই খাতকের দেনা পরিশোধের উপায় হইয়া যাইত, কন্যাদায়গ্রস্ত, মাতৃপিতৃদায়গ্রস্ত ব্যক্তি,

দায় হইতে উদ্ধার হইত, ব্রাহ্মণের উপনয়ন হইয়া যাইত। কোথা হইতে কি হইত, তাহা বড় একটা কেহ জানিতে পারিত না। কেবল যে সাহায্য পাইত, সে-ই তাহা জানিত, আর দুই হাত তুলিয়া হরমণিকে আশীর্ব্বাদ করিত। লোকে বলিত হরমণির অনেক টাকা আছে। কিন্তু হরমণি সে কথা স্বীকার করিত না।

ইহা ছাড়া কাহারও ছেলের সর্দ্দি হইলে এক মুঠা বিরৃমি শাক, নজর দোষ হইলে একটু জলপড়া, কাহারও মাথা গরম হইলে, হিমসাগরের পাতা, পেট গরম হইলে একটু ঘোল প্রভৃতি যোগানও হরমণির একটা কাজের মধ্যে ছিল।

হরমণি প্রভাতে শিব, দুর্গা, কালী, ষষ্ঠী, মনসা, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি দেবদেবী-গণের নামোচ্চারণ না করিয়া শয্যাত্যাগ করিত না। তুলসীগাছে জল না দিয়া জল খাইত না। সন্ধ্যাকালে একশত আট বার হরিনাম জপ না করিয়া অন্য কাজে হাত দিত না।

হরমণির বাড়ী খানি ছোট; চারিদিকে মাটীর প্রাচীর দিয়া ঘেরা। বাড়ীর ভিতর দুই খানি মাটীর ঘর। তাহার একখানি শয়ন গৃহ, অপর খানি দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি পঞ্চগব্যের আধার। সেই গৃহের দাবাতেই রন্ধন কার্য্যও হইয়া থাকে। শয়ন গৃহের ভিত্তিগাত্রে খড়ি মাটী দ্বারা নানাবিধ লতাপাতা, পদ্মের ঝাড়, লক্ষ্মীর চরণ চিহ্ন, পেচক, প্রভৃতি অঙ্কিত। তক্তকে বড় উঠান। উঠানের একপাশে খানিকটা জায়গায় নটে শাক, কয়েক ঝাড় বিরৃমি, শ্বেত-পুণ্যা শাক। আর একপাশে একটী তুলসী গাছ; তাহার গোড়াটা ইট দিয়া বাঁধান। তাহারই পাশে দুইটা বেগুন গাছ, একটা নাগদোনা গাছ, একটা সন্ধ্যামণি ফুলের গাছ। বাড়ীর বাহিরে গোয়াল ঘর। গোয়ালে দুইটী হৃষ্ট পুষ্ট গাভী, তিনটী বৎস। বাড়ীর সম্মুখে একটা বড় বকুল গাছ।

ক্রমশঃ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

গান।

পুরবী মিশ্র—যৎ।

মোছ মা মোছ মা নয়ন আসার !
পূরব গগনে উঠিছে রবি—সোণার বরণ আশার ছবি—
দুঃখ, ভয়, লাজ, হরে যাবে সবই—
বিমল দীপ্ত কিরণে তার।

তুমি মা অনাথা—চির পরাধীনা
চির বিষাদিনী দীনা হীনা ক্ষীণা
নির আভরণা মলিনবসনা
(তোর) নয়নে বহি'ছে সদা অশ্রুধার।

দলিত ঘৃণিত তোমার সন্তান,
নাহিক তাদের দাঁড়াবার স্থান—
নিজ দেশে তারা বিদেশী-সমান
বহে সদা শিরে পর-পদ ভার।

(তাই) মোহের স্বপন ত্যজি বুঝি তারা ;
মায়ের আহ্বানে আজি মাতোয়ারা,
মায়ের সম্মান রাখিতে তাহারা
দেহ প্রাণ মন করিছে সার।

(মাতঃ!) অমৃতমন্ত্র তোমারি বচন,
তব নামে জড় হয় সচেতন,
তাই আজি মাগো 'নূতন জীবন'
হৃদয়ে সবার হয়েছে সঞ্চার।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

অঙ্কুর।

বীজাদঙ্কুরনিষ্পত্তিরঙ্কুরাদ্বৃক্ষসম্ভবঃ।
ফলপ্রদোভবেদ্বৃক্ষইত্থমাশাক্রমোমতঃ॥

২য় বর্ষ।] অগ্রহায়ণ, ১৩১৪। [১১শ সংখ্যা।

খোল্‌ফায়ে রাশেদীন্‌।

হজরত মোহাম্মদের স্বর্গলোক প্রাপ্তি ঘটিলে 'খলিফা' পদ লইয়া মক্কা ও মদিনা-বাসীদের মধ্যে মহা-বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল। হজরতের প্রতিনিধি রূপে বৈরীবিপ্লুত দেশে কে মুষ্টিমেয় মোসলমানদের বুক বল হইয়া দাঁড়াইবে, কে প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্তির যোগ্য, এবম্বিধ চিন্তা, সকলকে বিষম সমস্যা-জালে বাঁধিয়াছিল। তাহাতে সর্ব্বত্র বেশ একটু উদ্বেগেরও সঞ্চার হইয়াছিল। যদি হজরত মৃত্যুকালে কাহাকেও 'খলিফা' নির্ব্বাচন করিয়া যাইতেন, তাহা হইলে, মোসলমানদের মধ্যে আত্মদ্রোহিতার বীজ অঙ্কুরিত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। কোন কোন ঐতিহাসিক তাহা হজরতের ধর্ম্ম বন্ধু (আস্‌হাব) দের ভ্রান্তির ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে সময় হজরতের সুপবিত্র শবদেহ খিন্নমান্‌ শত শত নরনারীর অশ্রুরাশি উপহার প্রাপ্ত হইতেছিল, সেই দুঃসময়ে সাফিকা নাম্নী উপনগরীতে আন্‌সারগণ সমবেত হইয়া সায়াদ-বেন্‌-আবাদাকে 'খলিফা' নির্ব্বাচনের জন্য মন্ত্রণা করিতেছিলেন। মহাজ্বেরীনগণ তদ্বৃত্তান্ত অবগত হইয়া হজরতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বন্ধ করত অব্যাজে সফিকা যাত্রা করিলেন। যথা সময়ে তাঁহারা সফিকায় উপনীত হইলেন এবং বিবদমান আন্‌সারদিগকে বিপুল সম্মান প্রদর্শন করিয়া খলিফা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে তাঁহাদের শোচনীয় প্রতিবাদ উত্থাপিত করিলেন। তচ্ছ্রবণে আন্‌সারগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হজরত

মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন (হেজরৎ) করিয়া আসিলে আমরা তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলাম, মক্কার পরাক্রান্ত কাফেরদের নির্দ্দয় হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে কতশত জীবন ব্যয় করিয়াছিলাম, প্রতিনিয়ত আমাদের চক্ষের উপর তাঁহার শব-স্থাপনের শোক-কুটীর দেদীপ্যমান থাকিবে। সুখে দুঃখে সকল সময়ে আমরা তাঁহার কার্য্যে যোগ দিয়াছি, তাঁহার সাধের 'আন্সার' নামে আমরা জগতে পরিচিত হইয়াছি; যথার্থতঃ, আমরাই তাঁহার প্রতিনিধিত্ব প্রাপ্তির যোগ্য।" তাঁহাদের মুখের কথা ফুরাইতে না ফুরাইতে মহাজ্বেরীনগণ বলিয়া উঠিলেন, "আমরাও সুখে দুঃখে সর্ব্ব কর্ম্মে তাঁহার নিকট ঘনিষ্ঠ ভাবে আবদ্ধ ছিলাম। পার্থিব সুখোন্মত্ততা ও আত্মীয়তার বিনোদ বন্ধন চরণ-দলিত করতঃ তাঁহার পলায়ন ব্যাপারে সাহচর্য্য করিয়া আমরা 'মহাজ্বেরীন' নামে কীর্ত্তিত হইয়াছি; একই বংশে ও একই শোণিতে তাঁহার ও আমাদের জন্ম; তাঁহার জন্য আমরা কাফেরদের নিকট জীবনের বহুভাগ অবিচারিত ভাবে যত দুর্ব্বিসহ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছি, তত যন্ত্রণা আর কেহ ভোগ করে নাই। ন্যায়তঃ আমাদের মধ্যেই খলিফা নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত।" এইরূপে উভয় পক্ষে বহু সময় ধরিয়া বাদ-বিসংবাদ চলিতে লাগিল, কিন্তু ক্রমান্বয়ে তাহা আত্ম বিগ্রহের আকারে পরিণত হইয়া উঠিতে লাগিল। তৎকালে মহাত্মা আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) অত্যদ্ভুত বিবেচনা সহকারে সর্ব্বসমক্ষে হজরতের একটী প্রসিদ্ধ বাক্য আবৃত্তি করিলেন এবং প্রিয়ভাষ দ্বারা সকলকে তদ্বাক্য প্রতিপালনের উপদেশ দিলেন। তাহাতেই সকলে বুঝিলেন, কোরেশ বংশের জন্যই হজরত খলিফা-পদ নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। অগত্যা উত্তেজিত ধর্ম্মপ্রাণ আন্সার ও মহাজ্বেরীনগণ তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতি করিয়া তাহাতে আশ্চর্য্যরূপে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

কিন্তু অপ্রীতিভাবাপন্ন আন্সারগণ সমমতাবলম্বী হইলেও বিমনায়মান মহাজ্বেরীন-মণ্ডলীর মধ্যে কে অত্যুন্নত খলিফা-পদ-প্রতিষ্ঠাভাজন হইবেন, তাহাই লইয়া আবার পরস্পরের মধ্যে মনোবাদ ও অনৈক্য সংঘটনের লক্ষণাবলী প্রকাশিত হইতে লাগিল। এক দিকের আগুন নির্ব্বাপিত হইলেও অপর দিক্ হইতে সর্ব্বত্রব্যাপী আগুন জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম হইয়া উঠিল। সকলেই স্বার্থের কুহকে স্ব স্ব শুভানুধ্যানে অন্ধপ্রায় হইয়া পড়িলেন। আত্মবিরোধিতার অবসান হইয়াও হইতে পারিল না। তদ্দৃষ্টে অপরিসীম হৃদয়-বল-সম্পন্ন মহাত্মা ওমর ফারুক (রাঃ) কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সহসা সবেগে সৌম্য দর্শন

সিদ্দিকের নিকটস্থ হইলেন এবং সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মানুসারে তাঁহার কর ধারণ করিয়া তাঁহার অধীনতা (বয়েৎ) স্বীকার করিলেন। এত বাদানুবাদের মধ্যে হঠাৎ পলিতকেশ সিদ্দিকই এস্‌লামের গৌরবপদবীতে ভূষিত হইলেন! সমাগত জন-মণ্ডলী এইরূপ কৌতূহলজনক কাণ্ড দেখিয়া একেবারে চিত্রার্পিতের ন্যায় হইয়া গেলেন! কেহ আর অতুলনীয় পুণ্য-তেজোদ্দীপ্ত ফারুকের প্রতিকূলে কিছু বলিতে পারগ হইলেন না, সকলেই সৌজন্যের বশবর্ত্তী হইয়া বিনা আপত্তিতে তাঁহার পরিগৃহীত পন্থায় চলিলেন। তখন আজিম খলিফার সার্ব্ব-ভৌমিক প্রীতি লাভের আর কোনও প্রত্যূহ থাকিলনা। উদ্রিক্তবীর্য্য ওমরের (রাঃ) ন্যায় মহামনস্বী, এইরূপ স্বাধীন হৃদয়ের পরিচয় না দিলে এই ভীষণ আত্মদ্রোহিতা মুকুলে বিনষ্ট হইত না; এবং হয়ত তাহাতে মোসলমান জাতির নাম জগতের ইতিহাসের কোনও একটী পৃষ্ঠায়ও স্থান পাইত না।

উদ্বেগ একরূপ দূর হইল বটে, কিন্তু অনেকে অনেক প্রকার কথা তুলিতে লাগিল। কেহ বলিতে লাগিল, "হজরতের পিতৃব্য মহাত্মা আব্বাস বেন্ আব্দল মতলব ও পিতৃব্য পুত্র মহাত্মা আলি-বেন্-আবিতালেব বিদ্যমান থাকিতে রাজ্য-পালন-ভার ভিন্ন ব্যক্তিকে সমর্পিত হইল কেন?" কেহ বলিতে লাগিল "হাশেম বংশে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) অবতীর্ণ হওয়ায় হাশেম-বংশ আরবের মধ্যে গৌরবোজ্জ্বল হইয়াছে; তদ্বংশের অবমাননা করা উচিত হয় নাই।" এইরূপে তুমুল বাগ্বিতণ্ডা চলিতে লাগিল; কিন্তু আস্‌হার-বৃন্দের ধর্ম্মার্থ বচন-পরম্পরা শ্রবণে নির্ব্বিবাদে সকল গোল মিটিয়া গেল এবং সকলের ক্রোধোদ্বেল হৃদয়-সমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইয়া পড়িল। সকলেই বুঝিলেন, মহাজ্বেরীন ও হাশেম বংশীয় মহাত্মা ওমর (রাঃ), ওস্‌মান (রাঃ), তাল্‌হা (রাঃ), ও জ্বাবের (রাঃ) প্রভৃতি আস্‌হাবদের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে হজরত আবুবক্কর সিদ্দিক (রাঃ) এস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েন বলিয়া 'শেখ' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি হজরতের ঊর্দ্ধলোক সমূহ পরিভ্রমণের কথা সর্ব্বাগ্রে বিশ্বাস করিয়া 'সিদ্দিক' খেতাবে সমলঙ্কৃত হইয়াছিলেন। অপিচ হজরত পীড়িত হইলে তিনিই নমাজের জন্য তৎপদে 'এমাম' হইতেন। সকলের মধ্যে বয়সে, সম্মানে ও জ্ঞানগৌরবে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সুতরাং ন্যায়তঃ খলিফা পদ তাঁহারই প্রাপ্য। প্রসঙ্গক্রমে দীর্ঘদর্শী ওমর (রাঃ) এরূপ বলিলেন যে, "খলিফা-পদ বংশ গৌরবাভিমানিতার অনুকূলে তিষ্ঠিবে না; তাহা চিরদিন জ্ঞান গৌরব-শালীরই আয়ত্ত থাকিবে। আপনাদের কি স্মরণ নাই, হার্ব্ব-বেন-ওম্মিয়াকে

এক সময় আব্দমান্নাফ বংশীয়েরা জ্ঞান-মর্য্যাদার জন্য আপনাদের নেতৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন ?"

তৎকালে নবনির্ব্বাচিত খলিফা সেই ইষ্টজন সমাকীর্ণ প্রান্তরে বাষ্পপূরিত কণ্ঠে বলিলেন,—"হে মোসলমানগণ, আমি আপনাদের খলিফা নির্ব্বাচিত হইয়াছি। অবশ্য আমি আপনাদের অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ, এরূপ মনে করি না। আপনারা আমার প্রতি সৎকার্য্যে সহায় হইবেন এবং কখন অন্যায় কার্য্য করিলে আপনারা আমার ভ্রম নিরসন করিয়া দিবেন। নিশ্চয় সত্যের জয় হইবে, মিথ্যা টিকিতে পারিবে না। আমি আপনাদের সম্মান প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের দাবী দাওয়া পূর্ণ না করিয়া তাঁহাদের দৌর্ব্বল্য বাড়াইব না এবং হীনাবস্থাদের ন্যায্য অধিকার লাভে বঞ্চিত করিয়া আমার বিরুদ্ধে উত্থিত হইতে দিব না। সকলকে সমান দেখিব। আপনারা জাতীয় স্বত্ব ও ধর্ম্ম জীবন রক্ষার্থে চেষ্টা (জেহাদ) করিতে বিমুখ হইবেন না, যে জাতি ইহাতে কৃতকাম হইতে পারে না, পরমেশ্বর তাহাদিগকে বিপদ সাগরে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। আমি যাবৎকাল এসলামের অনুসরণ করিব, আপনারাও তাবৎকাল আমার আনুগত্য স্বীকার করিবেন। দৈব-দুর্নিমিত্তে যদি আমি তৎ পথ হইতে বিচ্যুত হই, আপনারাও আমাকে পরিত্যাগ করিবেন।" তাঁহার সুকণ্ঠে এই সমুদায় মহদ্বাক্য সমুচ্চারিত হইলে সকলে তাঁহার প্রতি অবিচলিত ভক্তি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেন। সকলের মুখমণ্ডলে পূর্ণশশধর-দ্যুতি ফুটিয়া উঠিল, নয়ন দিয়া হর্ষ-বিষাদ-সম্ভূত অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তখন সকলে মদিনাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন এবং শোক-সংক্ষুব্ধ চিত্তে হজরতের চরম-সৎকার সম্পাদন করিলেন। দুই তিন দিন পর্য্যন্ত হজরতের শবদেহের সৎকার করিবার সুযোগ ঘটে নাই। ইহাতেই পাঠক খলিফা নির্ব্বাচন ব্যাপারের ভীষণত্ব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

অতঃপর নবীন খলিফা সুধার্ম্মিক অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মে মনোনিয়োগ করিলেন। কিরূপে মানবজগতের প্রতি পরিবারকে 'এসলাম' ত্রিদিব-সৌভাগ্য প্রদান করিতে পারিবে, নরোত্তমগণ তদ্বিষয় চিন্তনে সমাবিষ্ট হইলেন। সকলেই আত্ম-কর্ম্ম-রত, এমত সময়ে কতিপয় গৃহশত্রু অদ্ভুত কুটিল স্বভাবের পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল। কেহ আপনাকে 'পীর' বলিয়া রটনা করিতে লাগিল; কেহ আপনাকে 'খলিফা' বলিয়া কীর্ত্তন করিল; কেহবা এককালে যুদ্ধঘোষণা করিয়া বসিল। যে কপটেরা মোসলমান হইয়াও

হজরতের সঙ্গে উপাসনা কালে বাহুমূল-নিম্নে পুত্তলিকা রাখিতে সঙ্কোচ বোধ করিত না, তাহাদের দ্বারা কিনা সম্ভবে ? প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে আসাদবংশীয় তালিহা-বেন-খালেদ,তমীমবংশীয় সুজা ও এমামাবাসী হানিফ গোষ্ঠির সোলেমা প্রভৃতি বিক্রম দুর্দ্দান্ত বীরেশ কুল ধনে জনে সমধিক বলশালী ছিল। তাহারা রাজ্যলাভবাসনায় কূটযুদ্ধনিপুণ বেদুইনদিগকে বশীভূত করিয়া মহা অনর্থ ঘটাইতে আরম্ভ করিল। প্রথমে তাহারা জাকাৎ (একবিধ সাহায্য) দেওয়া বন্ধ করিল এবং সর্ব্বত্র এরূপ প্রচার করিল যে, "জাকাৎ' বর্ব্বরতা-যুগেরই উপযুক্ত ছিল, বর্ত্তমান কালের জন্য নহে।"

শুদ্ধ 'জাকাৎ' দেওয়া বন্ধ করিয়াই দুরাত্মারা ক্ষান্ত হইল না; উত্তরোত্তর তাহাদের পাপ বুদ্ধি উন্মেষিত হইতে লাগিল। ক্রমান্বয়ে তাহারা মহা বিক্রমে মদিনা আক্রমণে অগ্রসর হইল। তখন খলিফা প্রবর বৈরিতেজোহ-পহারী বীর শ্রেষ্ঠ খালেফ বেন্‌-অলীদ আক্‌রমা-বেন্‌-আবু জেহেল ও ওমর-বেন্‌-আসের তত্ত্বাবধানে একাদশ দল বিপক্ষ-দলনক্ষম সৈন্য দিয়া রণ-রঙ্গে প্রেরণ করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহারা শত্রু দলন করিয়া মোস্‌লেম সাম্রাজ্য শত্রু-ভয়-বর্জ্জিত ও উচ্ছৃঙ্খলতা-বিহীন করিলেন। কাফেরেরা এককালে লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। অতঃপর খলিফা সেই পর-বল-প্রমাথী সৈন্য দলকে ত্রয়োদশ হিজরিতে এস্‌লাম প্রচারোদ্দেশ্যে সিরিয়া ও এরাক প্রদেশে প্রেরণ করিলেন। এরমুক নামক স্থানে দুষ্টাত্মা কাফেরদের সহিত মোস্‌লেম বাহিনীর ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল, কিন্তু সহসা খলিফার প্রাণপুরুষ দেব-লোক-বাসী হওয়ায় যুদ্ধ স্থগিত হইল ও সৈন্য-সমূহও মদিনার দিকে যাত্রা করিলেন।

এদিকে মহাত্মা আবুবকর সিদ্দিক (রাঃ) মৃত্যুকালে মহাত্মা ওমর ফারুক (রাঃ) কে খলিফা-পদে মনোনীত করিয়া গিয়াছেন; এস্‌লামের গৌরব-মুকুট তাঁহারই শিরে অর্পিত হইয়াছে। মহাত্মা ওমর ফারুক (রাঃ) ভূতপূর্ব্ব খলিফার পদানুসরণ করিয়া অমিত বিক্রমে মোস্‌লেম জগৎ শাসন করিয়াছিলেন। তিনি ২৪ হিজরির প্রারম্ভকালে তনুত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি মহাত্মা ওস্‌মান গনি (রাঃ) কে খলিকা-পদ অর্পণ করিয়া যান। কর্ম্মবীর গনি (রাঃ) কয়েক বর্ষ শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুকালে মহাত্মা আলি মোর্ত্তাজান (রাঃ) খলিফা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মেতিহাসে উপরি উক্ত চারিজন খলিফা 'খোল্‌ফায়ে রাশেদীন্‌'

নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহাদের শাসনকালের সমষ্টি ত্রিশ বৎসর মাত্র। এই ত্রিশ বর্ষের মধ্যে মরক্কো হইতে ইউফ্রেটীজ নদীর উত্তর ধার দিয়া খোরাষাণ পর্য্যন্ত এস্‌লাম সম্প্রসারিত হইয়াছিল। ইহাতে খোল্‌ফায়ে রাশেদীনের অপরিমেয় প্রকৃতি বলের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 'খোলফায়ে রাশেদীন' গণ নিরুপম গুণনিধান ও দিব্য লক্ষণযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের শাসননীতি সর্ব্বত্র নির্ম্মলতা সেচন করিয়া ছিল। ফলতঃ বিচিত্র-কর্ম্মা খোলফায়ে রাশেদীন দিগের জাতীয় স্বত্ব ও ধর্ম্ম জীবন রক্ষণের অব্যাহত চেষ্টাই তদানীন্তন মোসলমান জাতির অত্যুন্নতির মূল।

সেখ আহাম্মদ সোবাহান।

ভালবাসা।

ভালবাসা, সংসারে বড়ই মধুর জিনিষ। মানব হৃদয়ে ভগবান যতগুলি বৃত্তি দিয়াছেন, তাহার মধ্যে ভালবাসা একটী শ্রেষ্ঠ বৃত্তি। ভালবাসা এই পার্থিব সংসারকে স্বর্গের নন্দনে পরিণত করে। ভালবাসায় এ সংসার স্বর্গ তুল্য হয়। ভালবাসা কথাটা বড় মধুর। কিন্তু এ সংসারে ভালবাসিতে জানে কয়জন?

ভালবাসা মুখের কথা নহে, হৃদয়ের কথা। নতুবা প্রাণের ব্যবসায়ে, প্রাণের ব্যাপারে, ভালবাসার দোকানদারী অনেকেই করিয়া থাকেন; লাভ বা অলাভটা অদৃষ্ট সাপেক্ষ। কিন্তু আমি এ ভালবাসার পক্ষপাতী নই, এ বেচাকেনার কথা বলা আমার উদ্দেশ্যও নয়। আমার মতে, যদি ভালবাসিতে চাও, ভালবাসার অতল সাগরে একেবারে মগ্ন হও। সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিসর্জ্জন দাও। যাঁহাকে ভালবাস তাঁহাকে আত্মোৎসর্গ কর, তাঁহার জন্য আত্মবলি দাও। আমিত্বের লোপ কর। প্রকৃত ভালবাসা হইবে। ভালবাসার বিনিময় চাহিও না। ভালবাসার প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা করিও না। ভালবাসার কামনা রাখিও না। যে ভালবাসা নিষ্কাম নিস্বার্থ সেই ভালবাসাই যথার্থ ভালবাসা। চোখের ভালবাসা বা মুখের ভালবাসা স্বার্থের প্রতিদান মাত্র। যে ভালবাসায় নিজের অস্তিত্ব লোপ হয়, ভেদজ্ঞান লুপ্ত হয়, সেই ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর এই ভালবাসার সাধক ছিলেন। ব্রজগোপিকাগণ

এই নিষ্কাম ভালবাসায় শ্যামসুন্দরের চরণে প্রেমনিগড় পরাইয়াছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব এই ভালবাসায় উন্মত্ত হইয়াছিলেন।

যিনি ভগবানকে ভালবাসেন, বারম্বার তাঁহাকে ডাকিতে ভালবাসেন, বারম্বার তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে ভালবাসেন, তাঁহার ধ্যান করিতে ভালবাসেন, তাঁহার পূজা-অর্চ্চনা-বন্দনা করিতে ভালবাসেন, তাঁহার সেবা করিতে ভালবাসেন, তিনি ভক্ত হইতে পারেন; কিন্তু প্রকৃত ভক্ত-হৃদয় তাঁহার প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা করে না। সাধকের নিকট অন্তরে বাহ্যে সর্ব্বদাই তিনি জাগ্রত। ভগবানই সব। পিতা মাতা ভাই বন্ধু ধন জন সম্পদ, সকলই তিনি। সাধক তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত। প্রেম ভক্তি ভালবাসা অনুরাগ সকলই তাঁহাকে দিয়া পরিতৃপ্ত। তখন সাধকের মনে বিশ্বজনীন ভালবাসা আসিয়া পড়ে; ভক্ত দেখে ঈশ্বর বিশ্বময়, বিশ্বের সকল জী বই ঈশ্বর বিরাজিত. তবে এই বিশ্বের সেবা করি। বিশ্বের সেবা করিলেই বিশ্বময়ের সেবা করা হয়, এই ভাব যখন ভক্তের মনে উদয় হয়, তখন সর্ব্বজনীন ভালবাসা, সর্ব্বজনীন প্রেম. স্বতঃই উপস্থিত হয়। তখন, ভক্ত, ভগবৎপ্রেম লাভ করিতে সমর্থ হয়। ভগবানের চক্ষে শুচি অশুচি নাই। ক্ষুদ্র মহৎ নাই, ভেদাভেদও নাই। (সর্ব্বভূতময় ব্রহ্ম) ভগবান সর্ব্বভূতেই অবস্থান করিতেছেন। জড়ে আছেন, চেতনে আছেন, কীট-পতঙ্গে আছেন, তরু-গুল্মে আছেন। তাই, সাধকের চক্ষে ভেদাভেদ নাই, ভেদের ধর্ম্ম নাই। ভগবান অসীম হইয়া ভক্তের নিকট সসীম রূপে পরিণত। তাই 'কর্ত্তাভজা'দের গানে আছে—' মানুষ ধর্ত্তে গেলে মর্ত্তে হয়)

শ্রীগৌরাঙ্গের বিশ্বজনীন ভালবাসায় সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। গৌর, প্রেমের জন্য গৃহ সংসার, পুত্র পরিবার, ধনজনে জলাঞ্জলী দিয়া, কৃষ্ণ প্রেমে ডুবিয়া যাইতেন। গৌরাঙ্গের ভালবাসায় তন্ময় হইত। হৃদয়ে ভাবের প্রবাহ ছুটিত। তাই, গৌর-প্রেমের তুলনা ছিলনা। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ শুধু গোপীকাদিগের কান্ত ছিলেন না। তিনি তাহাদের সখা স্বামী পুত্র পিতা সকলই ছিলেন। তাহাদের ভালবাসা অপার্থিব ছিল। তাহারা কৃষ্ণময়জগৎ দেখিতেন। পতির ভালবাসা, পুত্রের ভালবাসা, পিতামাতার ভালবাসা সকলই কৃষ্ণময় হইয়াছিল। এ ভালবাসার গতি ছিল অনন্তের দিকে, লক্ষ্য ছিল অনন্তের পথে।

আমরা, সংসারে ভালবাসার দৃঢ় বন্ধনেই আবদ্ধ। ভালবাসার বলেই বলীয়ান। আমাদের হৃদয় পারিবারিক প্রেমের বা ভালবাসার আকর্ষণেই দৃঢ় আবদ্ধ।

সংসারে শত সহস্র তরঙ্গ তুফান ঝটিকা ঝঞ্ঝাঘাতে আমাদের ভালবাসাই সজীব রাখিয়াছে। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে ভালবাসাই আমাদের সঞ্জীবনী মন্ত্র; আমরা যখন সংসারের নানা যন্ত্রণায় কাতর হই, তখন পিতামাতার স্নেহময় ক্রোড়ে গিয়া আশ্রয় লই। তাঁহাদের বাৎসল্য ও ভালবাসায় হৃদয় শান্ত হয়। নিদারুণ শোকের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া আবার পতি পুত্রের ভালবাসায় সন্তপ্ত প্রাণ শীতল করি। ভালবাসার মোহে মত্ত নয় কে, ভালবাসার কুহকে আত্মহারা বা নয় কে?

ভালবাসাই আমাদের মনুষ্যত্ব শিখায়। ভালবাসা হইতেই আমরা সর্ব্বজনীন প্রেম লাভ করিতে পারি। ভালবাসা আমাদের হৃদয়ের প্রসারতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। তাই, পিতা মাতা ভাই বন্ধু স্বামী পুত্র আত্মীয় প্রতিবেশী সকলকেই ভালবাসার চক্ষে দেখিয়া থাকি। তাই বলি—নিস্বার্থ ভালবাসিয়া ভালবাসায় তন্ময় হও। আমিত্বের লোপ কর, ভেদের ধর্ম্ম ভুলিয়া যাও, তবে সেই বিশ্বজনীন ভালবাসা লাভ করিয়া জগতকে ভালবাসিতে শিখিবে। তবে জগৎপতির চরণলাভ হইবে।*

"নীতি কবিতা" রচয়িত্রী শ্রীমতী রত্নমালা দেবী।

রত্নমালা।

(১০১)

লক্ষ্মীর্বসতি বাণিজ্যে তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥

ভাবার্থ——বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস—বহু অর্থ হয়।
তা'র অর্দ্ধ কৃষিকার্য্যে লাভ সুনিশ্চয়॥
কৃষির অর্দ্ধেক লাভ ভূপাল সেবায়।
অর্থের সঞ্চয় কভু না হয় ভিক্ষায়॥

---

* প্রবন্ধটীর বিষয় যেরূপ গভীর ও গুরুতর, সে হিসাবে এ প্রবন্ধে প্রেম-সম্বন্ধে যৎসামান্যই বর্ণিত হইয়াছে।—সহঃ-সম্পাদক।

(১০২)

অধোযাতি ব্রজত্যুচ্চৈর্নরঃস্বৈরেব কর্ম্মভিঃ।
কূপস্য খনিতা যদ্বৎ প্রাকারস্যৈব কারকঃ॥

ভাবার্থ—কর্ম্ম-ফলে, নরে, ঊর্দ্ধ অধোগামী হয়।
কার্য্য-মত হয় ফল জানিবে নিশ্চয়॥
কূপের খনক, যথা কার্য্যে, নিম্নগামী।
প্রাচীর নির্ম্মাণকর্ত্তা হয় ঊর্দ্ধগামী॥

(১০৩)

শুভং বাপ্যশুভং কর্ম্মফল কালমপেক্ষতে।
শরদ্যেব ফলত্যাশু শালির্ন স্বুরভৌ ক্বচিৎ॥

ভাবার্থ—শুভাশুভ কার্য্য-ফল, ফলে উপযুক্ত কালে;
অসময়ে না ফলে কখন।
আশু শালিধান্য যথা, শরতে ফলিত হয়;
বসন্তে না ফলে কদাচন॥

(১০৪)

উদ্যমেন হি সিধ্যন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ॥

ভাবার্থ—উদ্যোগেই সর্ব্বকার্য্য সদা সিদ্ধ হয়।
কল্পনায় কভু নাহি হয় ফলোদয়॥
কেশরী নিদ্রায় যবে রহে নিমগন।
মুখ-মধ্যে মৃগ তা'র পশেনা কখন॥

(১০৫)

অবস্থানুগতা চেষ্টা সময়ানুগতা ক্রিয়া।
তস্মাদবস্থাং সময়ং বীক্ষ্য কর্ম্ম সমাচয়েৎ॥

ভাবার্থ—চেষ্টা, অবস্থার অনুযায়িনী নিশ্চয়।
ক্রিয়া,—সময়ের সত্য অনুগতা হয়॥
সতত অবস্থা আর সময় দেখিয়া।
সাধিবে বিহিত কার্য্য মনে বিচারিয়া॥

(১০৬)

ন মাতা শপতে পুত্রং ন দোষং লভতে মহী।
ন হিংসাং কুরুতে সাধুর্ন দেবঃ সৃষ্টি নাশকঃ॥

ভাবার্থ—সন্তানে সম্পাৎ কভু না দেন জননী।
দোষ পরিগ্রহ কভু করে না ধরণী॥
জীব হিংসা কখন না করে সাধুজন।
দেবতার সৃষ্টিনাশ করে না কখন॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ

ত্রিদেহ।

(২)

আত্ম বিশ্লেষণ করিতে হইলে সকল অবস্থাতেই নিজের কর্ম্ম পরীক্ষা করিতে হয়। আমাদিগের তিন অবস্থা; জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত। তুরীয় অবস্থা এস্থলে ধরা হইল না, কারণ সে অবস্থায় কর্ম্ম নাই। পূর্ব্বোক্ত তিন অবস্থার কর্ম্মই পরীক্ষা করা আবশ্যক। আর, ঐ কর্ম্ম সকলের মধ্যে কোন্ গুলি জ্ঞানগোচরে এবং কোন্ গুলি অজ্ঞাতসারে হয়; এবং কোন্ গুলিই বা জ্ঞানের বিরুদ্ধে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, তাহাও বিবেচনা করা উচিত।

পূর্ব্বে যে সকল দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছি। তাহা জাগ্রত এবং অর্দ্ধ-জাগ্রত অবস্থার। মেস্‌মেরিক (mesmeric) অবস্থা প্রকৃত স্বপ্নাবস্থা নহে, এ কারণ তাহাকে অর্দ্ধ-জাগ্রত বলিলাম। এক্ষণে প্রত্যেক অবস্থার-ই দুই একটী উদাহরণ দিব। তৎপর বিচার করিবার সময় উপস্থিত হইবে।

জাগ্রত। এই অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন কোষ-চৈতন্য, অনেক সময়ে আত্মার বিরুদ্ধে অথবা অসম্মতিতে কিম্বা অজ্ঞাতে কার্য্য করার ন্যায় বোধ হয়। কখন বা ডবল আত্মা থাকার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। দেহ যন্ত্র সকল স্বভাবতঃ যে যে কর্ম্ম করে, আমরা তাহা অনেক সময় জানিতেই পারি না। পারিলেও আত্মার আদেশে সেই সকল কর্ম্ম নিবৃত্ত হয় না। আমি নিষেধ করিলেও হৃৎপিণ্ড, প্লীহা, যকৃৎ ইত্যাদি কর্ম্ম করিবে। আবার আমি আজ্ঞা দিলেও তাহারা আজ্ঞামত কর্ম্ম করিবে না। তাহারা যেন কাহার বশে কর্ম্ম করিতেছে, আমার

অধীনতা স্বীকার করিতেছে না। তাহার পর কোন কোন পীড়ার কথা স্মরণ করুন। বাতব্যাধি হইলে হস্ত পদ সঞ্চালন করিবার ক্ষমতা লোপ হয়। পীড়া হইয়াছে, এই কথা বলিলে কিছুই বুঝা হইল না। আত্মা ইচ্ছা করিলেও ঐ অবস্থায় হস্ত পদ সঞ্চালন করিতে পারে না কেন? মস্তিষ্কের কেন্দ্রবিশেষ বিকৃত হইল, আর হস্ত পদাদির স্নায়ু, পেশি সকল অবশ হইয়া গেল। তাহারা আমার অবাধ্য হইল। আমি তবে কে? মস্তিষ্কের সেই কেন্দ্র-বিশেষ কি আমার আজ্ঞাবহ নহে? উহা ত আমারই দেহ? না কি? যদি ঐ পীড়া পৈত্রিক হয়, অর্থাৎ বংশানুক্রমিক হয়,তবে ত আমি কেহই নয়; ইচ্ছা করিলেও উহাকে নিবারণ করিবার শক্তি নাই। আমি বলিতে যাহাকে বুঝা যায়, দেহের উপর তাহার কতটুকু কর্ত্তৃত্ব?

পীড়ার কথা বলিতে একটী উন্মাদের কথা মনে পড়িয়া গেল। উহার বিশ্বাস ছিল যে, সে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্বামী। সে অনেকের নিকট দরখাস্ত লেখাইতে আসিত। তাহার কল্পিত পত্নীর কিছু টাকা, পাবনার কালেক্টরীর ধনাগারে আছে। কিন্তু একটী দুষ্ট ভৃত্য তাহার সেই টাকা চাহিলেও দেয় না, কি করিল তাহার নিকাশও দেয় না। বলা বাহুল্য, ঐ ভৃত্যটী পাবনার কালেক্টর সাহেব। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, ঐ ব্যক্তি যদিও মহারাণীর স্বামী বলিয়া আপনাকে জানিত, তথাপি সে যে গবর্ণমেণ্টের প্রজা ইহা ভুলে নাই; কারণ সে কালেক্টর সাহেবের নিকটেই দরখাস্ত করিতে চাহিত। সে প্রজা ও প্রভু, এই দুই ভাবে আপনাকে জানিত। ইহার কি ডবল আত্মা ছিল? ইহার আত্মা কি দুই? না, ইহার ব্যক্তিত্ব দুইটী? সে প্রজা ভাবের সহিত প্রভু-ভাব মিলাইল কেমন করিয়া?

এমন অনেক সময় দেখা যায় যে, কোন একটী বিষয় নানারূপ চিন্তা করিয়াও স্মরণ করিতে পারিতেছি না, কিম্বা বুঝিয়া উঠিতে সক্ষম হইতেছি না। কিয়ৎকাল পরে বিনা চিন্তাতেই কে যেন ঐ বিষয়টী আমার মনোমধ্যে আনিয়া দিল; তৎক্ষণাৎ উহা স্মরণ হইল অথবা বুঝিতে পারিলাম। ইহাই বা কি? এ সকল স্থলে মস্তিষ্কের কেন্দ্র বিশেষের উত্তেজনা হইয়াছিল না, পরে হইল; অথবা ভাব-সংযোগ (association of ideas) হইয়াছিল না, পরে হইল;— এইরূপ এক একটা কথা বলার রীতি আছে। কিন্তু তাহা হইতে বুঝা গেল কি? ঐ কেন্দ্র অথবা তদ্গত ভাব কাহার? উহা যদি আমার হয়, তবে আমার আজ্ঞামত উত্তেজিত কিম্বা জাগ্রত হয় না কেন? ইহাই মূল কথা।

ইহার উত্তর কি? শুধু কার্য্যপরম্পরা অবধারণ করিলে প্রকৃত কথা বুঝা হয় না। আত্মা কি এক নহে? উহা কি দেহের প্রভু নহে? মস্তিষ্ক কেন্দ্রেরই হউক, অথবা দেহের অন্য স্থানেরই হউক, কোষ-চৈতন্য এ সকল স্থলে আত্মার অধীনতা স্বীকার করে বলিয়া ব্যবহার দৃষ্টে অনুমান করা কঠিন।

এক্ষণে রিপুগণের কথা বিবেচনা করা আবশ্যক। কাম ক্রোধাদি কি? আমি জানি অর্থাৎ আমার আত্মা জানে যে, অমুককে আঘাত করা উচিত নহে, উহার গৃহে অগ্নি দেওয়া অন্যায়, উহার সম্পত্তি অপহরণ করা অসঙ্গত, উহার গৃহিণীর অবমাননা করা অধর্ম্ম। তথাপি ঐ সকল কার্য্য করি কেন? কখন কখন ঐ সকল কার্য্য করিবার পূর্ব্বে আত্মা নিষেধও করে। বারম্বার বলে, "এমন কার্য্য করিও না।" তথাপি কে তাহার অবাধ্য হইয়া ঐ সকল কর্ম্ম করে? সে কে? সে কি আমি নহে? আমি আমার অবাধ্য, এ কথার প্রকৃত অর্থ কি? কাম, ক্রোধ, লোভাদি রিপু পরবশ হইয়া ঐ সকল কর্ম্ম করিলাম। এই উত্তরে ত কিছুই বুঝা হইল না। কাম ক্রোধাদি কাহার? উহারা আমার অধীন নহে কেন? উহারা যে সকল দেহ কোষকে উত্তেজিত করিয়া কর্ম্ম করায় তাহারা আত্মার অবাধ্য হয় কেন? এইরূপ জাগ্রত অবস্থার বহু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

স্বপ্ন। এই অবস্থা বিবেচনা করিতে প্রথমেই দেখা যায় যে, নিদ্রিত সময়ে আমার কোনই প্রভুত্ব নাই। এই সময়ে গাত্রে মক্ষিকা পড়িল, হস্ত অমনি তাহাকে তাড়াইয়া দিল। যদি বলি আত্মার আদেশেই হস্ত এই কর্ম্ম করিল, তবে জিজ্ঞাস্য এই যে, উহা পরে স্মরণ থাকে না কেন? আত্মা আদেশ দিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ভূলিয়া গেল কেন? কখন বা আত্মা ভুলেও না। নিদ্রাভঙ্গ হইলে স্মরণ থাকে যে, ঘুমের মধ্যে মক্ষিকা কিম্বা মশকে বড়ই উৎপাত করিয়াছিল, তাই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু তখনও একথা স্মরণ হয় না যে, আত্মা আজ্ঞা দিয়া, হস্তাদি সঞ্চালন করাইয়া, মক্ষিকা মশকাদিকে তাড়াইয়া ছিল। সে আজ্ঞা দিলে কি তাহা জানিত না? অথবা এত শীঘ্রই ভুলিয়া যাইত? আর, উৎপাতের কথা স্মরণ রাখিয়াও তাড়না করার কথাটাই কেবল ভুলিয়া যাইত? এ সকল স্থলে প্রচলিত উত্তর, সদুত্তর বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

স্বপ্নাবস্থায় আর এক শ্রেণীর ঘটনা হইয়া থাকে। যাহা আমি নিতান্ত কু-কর্ম্ম বলিয়া জানি, যাহা আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি, এমন কি, মহাপাপ বলিয়া বিবেচনা করি; আমার দ্বারা যাহা কখনও হইতে পারে না, স্বপ্নে দেখি-

লাম যে তদ্রূপ কার্য্য করিতেছি। ইহা কেন হয়? এ স্বপ্ন কে দেখে? এ কার্য্য কে করে? নিশ্চয়ই আমি অর্থাৎ আমার আত্মা এরূপ কার্য্য কখনই করিবে না, তাহার আদেশে এরূপ ঘটনা কখনই হইত না? তবে ইহার কর্ত্তা কে? আত্মা সক্ষম হইলে অবশ্য নিবারণ করিত। তাহার কি এস্থলে কোনই প্রভুত্ব নাই? স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ মনে বিলীন হয়, ইন্দ্রিয়গণের কর্ম্ম থাকে না। কিন্তু মন, বুদ্ধি ইত্যাদি ত লুপ্ত অথবা লীন হয় না। তবে অত বড় গর্হিত কার্য্য আমি স্বপ্নাবস্থাতেও কেন করিলাম? যাহা আমি চিন্তাও করিতে পারি না, তাহাই কি আমি করিলাম? আমি কি তবে করি নাই? কে করিয়াছে?

এ স্থলে আর এক শ্রেণীর অতীব বিস্ময়কর ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনেকে স্বপ্নাবস্থায় বিবেচনা পূর্ব্বক নানারূপ কর্ম্ম করেন। একটী বালক পাঠ্যাবস্থায় কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল। যে দিন প্রাতে যাত্রা করিবে, তাহার পূর্ব্ব রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় সে আপন পুস্তকগুলি যত্ন পূর্ব্বক যথাস্থানে সংরক্ষিত করিল। অন্যান্য দ্রব্য যাহা সে বাড়ী লইবে না তাহাও বিশেষ সাবধানতার সহিত যথাস্থানে রাখিল। বাক্স ইত্যাদি খুলিল, বন্ধ করিল। চাবি অতি সতর্কতার সহিত নিজের নিকট রাখিল। পরে তাহার বাসগৃহ বন্ধ করিয়া তালা আটকাইয়া চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। গৃহটী দ্বিতল ছিল, ঐ বালক তথা হইতে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিল; তাহাতেও তাহার সাবধানতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। যখন সে বাড়ী হইতে বাহির হইবার উপক্রম করিল, তখন অন্যান্য বালক তাহাকে ধরিয়া ফিরাইয়া আনিল। তখন তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। কিন্তু সে যে এত কাণ্ড করিয়াছে, ইহা সে কিছুই জানিত না। তাহার কিছুই স্মরণ ছিল না। এই বৃত্তান্ত আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি। ঐ বালক কাহার আদেশে চলিয়া যাইতেছিল? আত্মার? তবে সে জানে না কেন? কাহার আদেশে বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক এবং সতর্কতার সহিত দ্রব্যাদি সুরক্ষিত করিয়াছিল? আত্মার? তবে সে জানে না কেন? এত শীঘ্র তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল; তখনই কি আত্মার ভুলিয়া যাওয়া সম্ভবপর? এস্থলে somnumbulism একটা বৃহৎ শব্দ উচ্চারণ করিলে এ বিষয়ের ব্যাখ্যা করা হয় না। আত্মা দেহে থাকিয়া কি করেন? তিনি কি কিছুরই খবর রাখেন না? তবে তিনি কর্ত্তা কেমন?

কখন কখন কোন নিদ্রিত ব্যক্তি উঠিয়া গিয়া ঔষধ সংগ্রহ করিয়া আনে; তৎপর পুনরায় পূর্ব্বস্থলে শয়ন করিয়া থাকে। জাগিয়া উঠিলে তাহার ঐ

বৃত্তান্ত কিছুই মনে থাকে না। কিন্তু ঔষধটী হস্তেই আছে। মনে করে যে স্বপ্নে ঔষধ পাইয়াছে। এই সমস্ত কর্ম্ম করিতে দৈহিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদিগকে চালায় কে? আত্মা? তিনি হয়ত ঐ ঔষধের কথা জানিতেনই না; অথবা কোথায় পাওয়া যাইতে পারে সে বিষয় হয়ত তাঁহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। তবে নিদ্রিতের বুদ্ধি দেয় কে? অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যথাযথরূপে চালিত করে কে? কখন কখন জাগ্রত অবস্থা অপেক্ষাও নিদ্রিতাবস্থায় বুদ্ধিবৃত্তির অধিক স্ফুরণ, কর্ম্মে অধিক পটুতা দেখা যায়। একজন গণিত শাস্ত্রালোচনা করিতে ছিলেন। একটী প্রতিপাদ্য বিষয় অনেক চেষ্টা করিয়াও প্রমাণ করিতে সক্ষম হইলেন না। তখন গৃহের দ্বার রুদ্ধ করতঃ নিদ্রা গেলেন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে উঠিয়া দেখেন যে ঐ দুরূহ বিষয়টী তাঁহারই হস্তাক্ষরে প্রতিপন্ন হইয়া রহিয়াছে। যথাস্থানে কাগজে তাহা লিখিত রহিয়াছে। গৃহের দ্বার যেমন রুদ্ধ ছিল, তেমনই রুদ্ধই আছে। তিনিই নিদ্রিত অবস্থায় ঐ প্রতিপাদ্য গণিতটী প্রমাণ করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু তিনি কিছুই জানেন না। ইহা কি তাঁহার আত্মার অথবা সমষ্টি-চৈতন্যের আদেশ মত হইয়াছিল? না কি দেহস্থ স্থান বিশেষের কোষ-চৈতন্য, অন্যের নিরপেক্ষ ভাবে, এই কর্ম্ম করিয়াছিল? এ ব্যাপারের কর্ত্তা কে? আত্মার কর্ত্তৃত্ব আছে কি না? থাকিলে কতটুকু? দেহস্থ কোষ-চৈতন্য কি পৃথক ভাবে কর্ম্ম করে? পাঠক দেখিবেন, আবার সেই পুরাতন প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। এই জন্যই বলিয়াছি, ইহা কল্পান্ত আলোচনার বিষয়।

ক্রমশঃ

শ্রীশশধর রায়।

গঙ্গারাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

তখনও প্রভাতের বিলম্ব আছে। তখনও পূর্ব্বাকাশের কোলে উষার আলো ভাল করিয়া ফুটে নাই; তখনও শোণাপুরের পাখীরা প্রথম ডাক ডাকে নাই; তখনও পতিপার্শ্বশয়িতা নব বধূ চকিত নয়নে গবাক্ষপথে দৃষ্টি

নিক্ষেপ করে নাই। তখনও হরমণির ঘুম ভাঙ্গে নাই। তখনও সে স্বপ্নের ঘোরে ঘোষেদের মেজবোয়ের সহিত ঝগড়া করিতেছিল, এবং সে যে একসের দুধে আধসের জলও দেয় নাই, ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য বহু দেবদেবীর নাম গ্রহণ পূর্ব্বক ঘন ঘন শপথোচ্চারণ করিতেছিল। কিন্তু মেজবউ বড় ছোট লোকের ঘরের মেয়ে। তাই সে তাহার শপথে কিছুমাত্র বিশ্বাস না করিয়া, ছেলের সর্দ্দি, কর্ত্তার দুধে অরুচি প্রভৃতি নানা কারণের উল্লেখ করিতেছিল। এবং অতঃপর যে হারু গয়লার নিকট হইতেই দুধ লওয়া হইবে এরূপ ভয়ও দেখাইতেছিল। কিন্তু হরমণি ভয় পাইবার পাত্রী নহে। সে ছাড়া আর কোন বেটা বেটীই যে এমন নির্জ্জলা খাটী দুধ বাইশ সের দরে দিতে পারিবে না, তাহাই দৃঢ় স্বরে ব্যক্ত করিয়া রাগে গর গর করিতে করিতে সে বাটীর বাহির হইয়া চলিল। এমন সময় পশ্চাতে বৈঠকখানা হইতে মেজবাবু ডাকিলেন,—"মাসি!"

মাসি অভিমানভরে সে ডাকটাকে কাণে না তুলিয়া ধীর গতিকে একটু অধীর করিল। তখন পশ্চাৎ হইতে মেজবাবু আবার ডাকিলেন,—"মাসি, ও মাসি!"

মাসি ভাবিল, এবার উত্তর না দেওয়াটা ভাল দেখায় না। সুতরাং উত্তর দিবার জন্য সে পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল। কিন্তু মেজবাবুকে দেখিতে পাইল না, সে মেজবাবুর উদ্দেশে ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিল। তখন মেজবাবু আরও একটু জোরে ডাকিলেন,—"ও গো মাসি, ও গয়লার বেটী।"

হরমণি চক্ষু মুছিয়া ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল, কিন্তু অন্ধকারের ভিতর মেজবাবুকে দেখিতে পাইলনা। এদিকে ডাকেরও বিরাম নাই। হরমণি ভাবিল, 'এওতো বড় বিপদ। মেজবাবু কি বৈঠকখানায় একটা আলোও জ্বাল্‌তে পারে না।"

"ও মাসি, ও গয়লার বেটী, মরেছিস্ নাকি?"

হরমণি দেখিল, কি আপদ, গলাটা ত মেজবাবুর নয়। সে তাড়াতাড়ি শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিল,—"কে গা?"

উত্তর আসিল,—"আমি গো মাসি।"

হরমণি উঠিয়া ঘরের দরজা খুলিতে খুলিতে বলিল,—"আমি কে?"

"আমি তোর বোন্‌পো, তোর বোনাই এর ছেলে, বুঝলি?

হর ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিল, "ওঃ, তুই? এমন সময় কেন রে?"

"আগে দরজাটাই খোল্‌না গয়লার বেটা।"

হর গিয়া বাহিরের দরজা খুলিল। তখন উষার আলো ফুটিয়া উঠিয়াছে। হর বলিল,—"এমন সময় কি মনে করে রে রতন?"

আগন্তুক রতন। রতন বলিল, "তোমার শ্রাদ্ধ করতে। বাপ যে ঘুম্!"

হর দেখিল, বাহিরে একখানা গরুর গাড়ী। বলিল, "ওকি! গাড়ী কেন রে?"

হর দ্বারের বাহির হইয়া দেখিল, কেবল গাড়ী নয়, গাড়ীর ভিতর একখানা চাঁদপানা মুখ। তখন সে একটু বিস্ময়ের সহিত বলিল, "গাড়ীতে ও আবার কেরে রতা?"

রতন বলিল,—"আমার মা।"

হর গাড়ীর নিকটে গিয়া, গাড়ীর ভিতরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "এমন মা কোথায় পেলি রে?"

রতন বলিল,—"যেখানেই পাইনা, তোর বাবার কি? এখন রাখতে পারবি?

হর বলিল,—কুঁড়ে ঘরের ভিতর কি এত রূপ ধরবে?"

রতন বলিল,—"ইচ্ছা হয় এক লাঠিতে বেটার মাথাটা ভেঙে দি। মাকে আমার নামিয়ে নে। বড় কষ্ট হয়েছে।"

তখন হর গাড়ীর ভিতর উপবিষ্টা রমণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,— "বাইরে এস তো গা, দেখি কেমন তুমি রতার মা।"

হর দেখিল, ম্লান উষালোককে সমুজ্জ্বল করিয়া, চারিদিকে রূপের কিরণ ছড়াইয়া এক রূপলাবণ্যময়ী রমণী মূর্ত্তি গাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। কালো জলের আঁধার বুকে সহসা যেন একরাশ পদ্মফুল ফুটিয়া উঠিল; শোণাপুরের প্রভাত গগনে তরুণ অরুণ রশ্মি ছড়াইয়া পড়িল। সেই মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া চাহিয়া হর বলিল,—তোর মা বটে রতা।"

রতন সগর্ব্ব হাস্য সহকারে বলিল,—"আমার মা ভগবতী।"

হর, রমণীর হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইল। রতন বলিল,—"ভয় নাই মা, যেখানে রেখে গেলাম, এর মত ভাল জায়গা আর আমাদের নাই।"

রতন গিয়া গাড়ীতে উঠিল। হর বলিল,—"এখনি যাবি, কিছু খাবিনে?"

রতন বলিল,—"আজ আর সময় নাই, আর একদিন দেখা যাবে।"

হর। সর্দ্দার কোথায়?

রতন। দু'একদিনের ভিতর দেখা করবে।

রতন গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেল। তখন হর, রমণীর হাত ধরিয়া তাহাকে

বাড়ীর ভিতর আনিল। উঠানে আসিয়া হর দাঁড়াইল, রমণীও দাঁড়াইল। তারপর হর, রমণীর ঘোমটা খুলিয়া দিয়া সবিস্ময় দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার নাম কি গা ?"

রমণী মৃদুস্বরে বলিল,—"শ্যামা।"

হর বলিল,—"শ্যামা যে কাল, তুমি যে সুন্দর !"

রমণী হাসিল। সে হাসিতে উষার হাসির মলিন হইয়া গেল। পূর্ব্বদিক্ আলোকিত করিয়া সূর্য্যদেব দেখা দিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এখন আগে মঞ্জরীর কথাই বলি। মঞ্জরী দৌড়িল,—একবারও পশ্চাতে না চাহিয়া খালখন্দ, কাঁটাখোঁচা কোন বাধা না মানিয়া মঞ্জরী দৌড়িল। তাহার দুই পাশ দিয়া বায়ু হু হু শব্দে বহিয়া যাইতে লাগিল; অন্ধকার সরিয়া সরিয়া পথ ছাড়িয়া দিল; শৃগালদল সম্মুখ হইতে ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া, নিশ্বাস রোধ করিয়া মঞ্জরী ছুটিল।

ছুটিতে ছুটিতে যখন মঞ্জরীর পদদ্বয় ভারি হইয়া আসিল, নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইল, তখন মঞ্জরী দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল। কিন্তু পশ্চাতে কাহাকেও অনুসরণ করিতে দেখিল না। সে ভাবিয়াছিল, তাহার পশ্চাৎ শ্যামা ছুটিতেছে, আর শ্যামার পশ্চাৎ সেই লোকদুটা—লোকদুটা যে ডাকাত তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই—ছুটিতেছে। কিন্তু কৈ, কোথায় শ্যামা, আর কোথায় বা ডাকাত ? তবে কি শ্যামা তাহার অনুসরণ করে নাই ? তাও কি হয় ? সে কি ডাকাতের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া থাকিবে ? তবে হয়তো সে অন্যদিকে ছুটিয়াছে।

মঞ্জরী একবার বেশ করিয়া চারিদিকে চাহিল, কিন্তু অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইল না। কিছুক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া রহিল, কিন্তু বায়ুর হু হু শব্দ আর ঝিল্লীধ্বনি ছাড়া কিছুই কাণে আসিল না। তখন তাহার মনে হইল, শ্যামাকে ছাড়িয়া আসিয়া সে ভাল কাজ করে নাই। হয়তো তাহাকে ডাকাতেরা ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। মঞ্জরী ভাবিল, ছি, ছি, করিলাম কি ? আবার ভাবিল, সেও হয়তো তাহার মত মাঠের কোনখানে দাঁড়াইয়া তাহাকে খুঁজিতেছে। তখন সে চীৎকার করিয়া শ্যামাকে ডাকিতে গেল। কিন্তু তখনও তাহার শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক গতি অবলম্বন করে নাই। সুতরাং অস্পষ্ট কণ্ঠস্বরটা বাহির না হইতেই বায়ুস্তরে মিলাইয়া গেল। তখন মঞ্জরী গলাটা আর একটু

পরিষ্কার করিয়া, আর একটু জোরে ডাকিবার উপক্রম করিল, কিন্তু আর তাহার ডাকা হইল না ; সহসা পশ্চাতে কে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল।

চমকিত হইয়া মঞ্জরী পশ্চাতে চাহিল। দেখিল, আবার একটা ডাকাত। যদিও অন্ধকারে তাহার চেহারাটা ভাল দেখা যাইতেছিল না, তথাপি তাহার মাথার সাদা পাগড়ীটা যে একটা সুদীর্ঘ আকৃতির পরিচয় দিতেছিল, তদ্দারাই মঞ্জরী বুঝিয়া লইল যে, এমন চেহারার লোক ডাকাত না হইয়াই যায় না। কিন্তু হায়, একবার তাহার যে দ্রুতগামী চরণদ্বয় তাহাকে ডাকাতের হাত হইতে বাঁচাইয়াছে, এবার তো তাহারা আর উঠিতে চায় না? অগত্যা মঞ্জরী মরিয়া হইয়া ডাকাতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন ডাকাতটা হাসির বেগ সম্বরণ করিয়া রাসভনিন্দিত কণ্ঠে বলিল, —"তবে চাঁদ, এমন সময় কোথায় যাওয়া হচ্চে?"

মঞ্জরী দেখিল, ডাকাত হইলেও লোকটা নিতান্ত অরসিক নয়। তাহার একটু সাহস হইল। সে সাহসে মুখরা মঞ্জরীর মুখ খুলিয়া গেল। সে বলিল,—"দূর চোক খেগো, চাঁদ কোথায়? আমি যে অন্ধকার।"

ডাকাত বলিল,—"তুমি আঁধার ঘরের মাণিক।"

ভ্রূভঙ্গী করিয়া মঞ্জরী বলিল,—"তোমার যম।"

দুর্ভাগ্যবশতঃ অন্ধকারে ডাকাত ঐ ভঙ্গীটা দেখিতে পাইল না। নতুবা তাহাকে বাণবিদ্ধ কপোতের ন্যায় নিশ্চয়ই মঞ্জরীর পদতলে লুটাইয়া পড়িতে হইত।

ডাকাত বলিল,—"তা' যেই হও, এত রাত্রে মাঠের মাঝে কেন?"

ম। তোমার ঘাড় ভাঙ্‌তে।

ডা। এত দয়া কেন?

ম। ওলাবিবির আদেশ।

ডা। ঘাড় ভাঙ।

ম। এখানে কি, আগে নিমগাছের তলায় চল্।

ডা। এখানে তো নিমগাছ নাই, বটগাছ আছে।

ম। তা' হলেও চল্‌বে।

ডা। তবে এস। ম। তোর কথায় যাব কেন? তুই কে?

ডা। আমি ডাকাত। ম। মাঠের মাঝে ডাকাত কেন?

ডা। পেত্নী ধরতে। ম। একা?

ডা। না, আরও সঙ্গী আছে। ম। কোথায়?

ডা। ঐ বটতলায়।

মঞ্জরী শঙ্কিত নেত্রে সেদিকে চাহিল। ডাকাত বলিল,—"আর ভাবলে কি হবে। ঘাড় ভাঙ্‌বে এস।"

মঞ্জরী বুঝিল, সে এখন ডাকাতের আয়ত্তের মধ্যে। এখন আর বাধা দেওয়া বৃথা, পলায়নের চেষ্টা নিষ্ফল। সে সাহসে বুক বাঁধিয়া ডাকাতের পশ্চাৎ চলিল। ডাকাতটা মাঝে মাঝে পাছু ফিরিয়া দেখিতে লাগিল, পেত্নী পলায় কি না। কিন্তু পেত্নী পলাইল না; সগর্ব্ব পদক্ষেপে তাহার পশ্চাৎ আসিতে লাগিল।

নিকটেই একটা দিঘী। দিঘীটা খুব বড়। তাহার কালজলে অন্ধকার পড়িয়া জলে আঁধারে মিশাইয়া গিয়াছে। কেবল মৃদু বীচিমালার উপর নক্ষত্র বিম্ব নৃত্য করিতেছে। দিঘীর পাড় খুব উঁচু। পাড়ের চারিদিকে বড় বড় অশ্বথ গাছ। এক কোণে একটা প্রাচীন বট গাছ। সেই গাছের তলায় অন্ধকারে অনেক গুলা মানুষ। সকলেরই মাথায় বড় পাগড়ী, হাতে লম্বা লম্বা লাঠী, কোমরে তরোয়াল।

মঞ্জরীকে সঙ্গে লইয়া পূর্ব্বোক্ত ডাকাত সেখানে উপস্থিত হইলে তাহারা আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। মঞ্জরী অন্ধকারে একবার চারিদিকে চাহিল। বুঝিল যে, এই যমদূতগণের হস্ত হইতে সহজে উদ্ধার লাভ অসম্ভব, কৌশলে পলাইতে হইবে। কিন্তু সে জন্য ব্যস্ত হইলে বা ভীরুতা দেখাইলে চলিবে না।

এই সময় পূর্ব্বোক্ত ডাকাত, তাহার সঙ্গিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"এখন আমোদের সময় নয়। এখনই সর্দ্দার আস্‌বে।"

সর্দ্দারের নামে সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল। তারপর তাহাদের পরামর্শে স্থির হইল, আপাততঃ তাহাদের মধ্যে একজন মঞ্জরীকে লইয়া গিয়া কোন একটা নির্দ্দিষ্ট নির্জ্জন স্থানে রাখিয়া দিবে। তখন তাহারা আপনাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে নির্ব্বাচিত করিল। নির্ব্বাচিত ব্যক্তি উঠিয়া মঞ্জরীকে তাহার অনুসরণ করিতে বলিল। মঞ্জরী ঈষৎ হাসিয়া তাহার সঙ্গে চলিল। মনে মনে বলিল,—"এবার তোমাদের মুখে নুড়ো জ্বালাব।"

তাহারা চলিয়া যাইবার অল্পক্ষণ পরেই আর এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবা মাত্র সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল। যে আসিল, সে গঙ্গারাম।

গঙ্গারাম বলিল,—"তোমরা কতক্ষণ এখানে এসেছ ?"

একজন উত্তর করিল,—"প্রায় চার দণ্ড"।

গঙ্গারাম বলিল,—"এদিক্ দিয়ে একটা মেয়ে মানুষকে যেতে দেখেছ ?"

সকলের মুখ শুকাইয়া গেল। কেহ কোন উত্তর করিতে পারিল না। গঙ্গারাম আবার বলিল,—"এদিকে একজন মেয়ে মানুষ এসেছিল ?"

দলের মধ্য হইতে একজন বলিল,—"দেখি নাই।"

গঙ্গারাম সেই অন্ধকারের মধ্যেও তীব্র দৃষ্টিতে একবার সকলের মুখের দিকে চাহিল। কর্কশ কণ্ঠে বলিল,—"সকলে হাজির ?"

উত্তর হইল,—"হাজির।"

গঙ্গারাম আদেশ করিল,—"সার দাও।"

সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইল। গঙ্গারাম একে একে সকলের মুখ পরীক্ষা করিয়া গণনা করিতে লাগিল। গণনা শেষ হইলে বলিল,—রূপচাঁদ কোথায় ?"

দলের মধ্য হইতে একজন বলিল,—"আসে নাই।"

গঙ্গারাম বলিল,—"তুমি কে ?"

কেহ কোন উত্তর দিল না। গঙ্গারাম দাঁড়াইয়া একটু ভাবিল; ভাবিয়া বলিল,—"আজ অনেক বাধা পড়েছে, শিকার মিলবেনা। কাল সব এই খানে জমায়েৎ হইবে।"

দ্বিতীয় কথা না বলিয়া অন্যান্য সকলে চলিয়া গেল। কেবল গঙ্গারাম একা সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে লাঠীর উপর চিবুক রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শিল্প।

অস্মদ্দেশে অধুনা জাতীয় অবনতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পকার্য্যের কতদূর অধঃপতন ঘটিয়াছে, তাহা একবার স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিলে কাহার হৃদয় শোকাভিভূত না হয় ? যখনই শিল্প বিষয়ে আলোচনা করিতে যাই, তখনই মানব জাতির আদিম অবস্থার কথা মনে পড়ে। যে ভারতবাসিগণ বিদ্যা, বুদ্ধি, যুদ্ধ, শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া জগতের মধ্যে

সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন, ঐতিহাসিকগণের মতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আদিমকালে বন্য পশুর ন্যায় ফল, মূল, লতা, পাতা ভক্ষণ করিয়া অরণ্যে বিচরণ করিতেন, পর্ব্বত গহ্বরে বাস করিতেন, বৃক্ষের পত্র ও বল্কল পরিধান করিতেন, কৃষিকার্য্যাদি দ্বারা শস্যোৎপাদন করিতে জানিতেন না, অগ্নিসংযোগে রন্ধনকার্য্য করিতে পারিতেন না। ধাতু ব্যবহারে অনভ্যস্ত আদিম অধিবাসিগণই ইতিহাসে অনার্য্য অর্থাৎ অসভ্য বলিয়া অভিহিত।

বহুকাল পরে কি শুভক্ষণে বিংশ শতাব্দীতে আজ ভারতের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে; জানিনা কোন্ মহাপুরুষের চরণ-ধূলি-স্পর্শে ভারতমাতা (অহল্যার পাষাণ উদ্ধারের ন্যায়) পুনর্জ্জীবিতা হইয়া আপন স্বাভাবিক স্রোতের অনুকূলে প্রবাহিতা হইতেছেন। প্রপীড়িত ভারতবাসীও বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমাদের আর সেদিন নাই, সূচিকা হইতে ভারতের স্বাধীন রাজমুকুট পর্য্যন্ত হস্তান্তরিত হইয়াছে। তাই আজ ভারতসন্তানগণ শিল্পাদি কার্য্য দেশান্তরে গিয়াও শিক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন, দেশীয় শিল্পী প্রভৃতিকে সম্মান করিতে শিখিতেছেন, পূর্ব্বপুরুষদিগের পদানুসরণ করিতে জীবনোৎসর্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ভারতবাসি! যদি পুনঃ শিল্পাদি পৈতৃককার্য্যে অবহেলা করেন, এমন কি ঘৃণা বোধ করেন, তবে নূতন ইতিহাসে আপনারাই যে অনার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইবেন, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। যে দিন আপনারা কয়েক জন মধ্য এসিয়া হইতে ভারতে উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক, ধাতু ব্যবহারে অনভ্যস্ত অনার্য্য দিগকে পরাজিত করিয়া শূদ্র নামে চিহ্নিত করিয়াছিলেন, সেই দিনের কথা মনে পড়ে কি? এবার আপনাদের সেই প্রকার পরীক্ষার দিন আগত প্রায়।

কালের কি পরিবর্ত্তন! যে তন্তুবায়গণ ভারতবাসীকে বস্ত্রবয়ন করিয়া দিত, আজ তাহাদিগকেও বিদেশী বস্ত্র পরিধান করিতে হইয়াছে, যে ধাতুব্যবসায়িগণ (স্বর্ণকার,কর্ম্মকার,কংসকার,প্রভৃতি)ভারতের যাবতীয় ধাতুজ দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া দিত, আজ তাহারাও বিদেশী দ্রব্যের শরণাগত হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিল্পিগণ কলের সাহায্যে প্রয়োজনীয় শিল্প-দ্রব্যাদি স্বল্প সময়ে ও অপেক্ষাকৃত অল্পব্যয়ে এদেশে আমদানি করিয়া এদেশের শিল্পের উচ্ছেদ করিয়াছে, এবং ভারতবাসিগণ স্বদেশী দ্রব্যাদি ও শিল্পিগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন বলিয়াও এতদ্দেশীয় শিল্পকার্য্য বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে। আজ ভারতবাসী নিজের দেশকে চিনিয়াছে,

এবং দেশস্থ সকলকে ভালবাসিতে শিখিয়াছে বলিয়াই কিছু উন্নতির আশা দেখা যাইতেছে।

সেতুবন্ধন কালে সামান্য কাঠবিড়াল পর্য্যন্ত শ্রীরামচন্দ্রকে সীতা উদ্ধারের যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিল, ভারতবাসী ছোট বড় সকলকেই ভারত মাতার উদ্ধারের জন্য সেই রূপ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। যাঁহার বিদ্যা আছে, তিনি বিদ্যা দান করিয়া শিল্পাদির উন্নতিসাধন করুন; যাঁহার অর্থ আছে, তিনি অর্থ সাহায্যে দেশের মঙ্গল বিধান করুন, যাঁহার যে শক্তি আছে, তিনি তদ্দ্বারা যথাসাধ্য সাহায্য করুন। বর্ত্তমান শিল্পযুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যে যুবক গণ জাপান, আমেরিকা,ইংলণ্ড,ফ্রান্স, জার্ম্মণি প্রভৃতি দেশে প্রেরিত হইয়া বিজ্ঞান ও শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদেরই উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে আমরা কখনই আমাদের বিলাতীদ্রব্য-বর্জ্জন-প্রতিজ্ঞা পালনে সমর্থ হইতাম না। এ বিষয়ে আমরা দেশীয় তন্তুবায়দিগের নিকট হইতেই বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। অতএব দেশীয় শিল্পিগণকে উৎসাহিত করা যে কতদূর উপকারজনক, তাহা বর্ণনাতীত।

আমোদ প্রমোদে অর্থব্যয় করিলে অথবা বৃথা সময় অতিবাহিত করিলে চলিবেনা; আমাদিগকে আপন আপন দায়িত্বানুযায়ী কর্ম্ম করিতে হইবে। ভবিষ্যৎ বংশের জন্য টাকা গচ্ছিত না রাখিয়া দেশের কল্যাণের জন্য ব্যয় করিতে হইবে এবং সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করিয়া, ছদ্মবেশী জাপানী বীরগণের আমেরিকা প্রভৃতি দেশে গিয়া যুদ্ধ বিদ্যাদি শিক্ষা করিবার ন্যায়, ভারতীয় বীর যুবকগণকে বিজ্ঞান ও শিল্পাদি শিক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করিতে হইবে।

যন্ত্রাভাবেই যে ভারতীয় শিল্পকার্য্য বিনষ্ট প্রায়, তাহা সহজেই অনুমেয়। মানুষ কায়িক শ্রমে বহুকষ্টে যে কার্য্য করিতে পারে, যন্ত্র সাহায্যে তাহার সহস্রগুণ কার্য্য অনায়াসে সুসম্পন্ন হইতে পারে; সুতরাং হস্তনির্ম্মিত বস্ত্র মহার্ঘ্য বশতঃ যে বিলুপ্ত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? আজ প্রায় তিন বৎসর কাল ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়াও ভারতবাসী কেবল মনের জোরে স্বদেশী দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছেন এবং সেই জন্যই স্বদেশী আন্দোলন তীব্র বেগে আন্দোলিত হইতেছে বলিয়া আর নীরব রহিলে চলিবে না। নানা প্রকার আসুরিক বিড়ম্বনাকে পদ দলিত করিয়া, আমাদিগকে বিদেশী উপায়ে সুলভ বস্ত্র উৎপাদনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে, নতুবা আমাদের আর কষ্টের সীমা থাকিবেনা—সমূলে ধ্বংস হইতে হইবে। নব সুসভ্য জগতে উন্নতি লাভ করিতে হইলে, যন্ত্রের সাহায্যাবশ্যক

এবং তৎসঙ্গে শ্রম বিভাগও বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশের প্রত্যেক শিল্পীকে বাল্যকাল হইতে আপন আপন কার্য্যাভ্যাস করিতে হয় বলিয়া, একজন অন্যের কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে না, কিন্তু বিদেশীয় শিল্পকার্য্যের ফল প্রায়ই এক প্রকার বলিয়া, দৈব দুর্ব্বিপাকে কোন এক শিল্পকার্য্য বন্ধ হইয়া গেলে বিদেশীয় শিল্পিগণ অন্য কার্য্য অনায়াসে গ্রহণ করিয়া আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

আধুনিক সুসভ্যদিগের অসভ্যাবস্থার বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই যে, ভারতবাসিগণ কেবল শিল্প বিষয়ে নহে, সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ ছিলেন,বলা বাহুল্য,একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন ; এমন কি এখনও তাঁহারা অনেক বিষয়ে ভারতের নিকট ঋণী। নানাপ্রকার বিপ্লব, পরাধীনতা,অত্যাচার, প্রভৃতি সহ্য করিয়া হিন্দুদিগের শিল্প নৈপুণ্যের সাক্ষ্য প্রদান করিবার জন্যই ইলোরার গুহা মন্দির * জগন্নাথদেবের মন্দির, সোমনাথের মন্দির, বৌদ্ধগয়া, কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির, গৌড়ের অট্টালিকা, প্রভৃতি এখনও বিদ্যমান্ রহিয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে বখ্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক ১২০৩ খৃঃ অঃ পাল ও সেন বংশীয় স্বাধীন গৌড় অধিকৃত হয়। গৌড়ের মস্জিদ ও অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ, হিন্দুর দেবদেবীর চিত্র বক্ষে ধারণ করিয়া, মুসলমান ভূপতিদিগের অত্যাচারের বিষয় জ্ঞাপন করাইয়া দিতেছে। কাশীর মন্দিরাদি ভগ্ন করিয়া অনেক মস্জিদ নির্ম্মিত হইয়াছে ; নগরকুটের মন্দির ১০০৮ খৃষ্টাব্দে, থানেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির ১০১৪ খৃষ্টাব্দে, সোমনাথের মন্দির ১০২৭ খৃষ্টাব্দে সুলতান মামুদ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত ও চূর্ণীকৃত হয়। এই প্রকারে হিন্দুর কত শিল্পের ও ধর্ম্মের হানি হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত।

ইংরেজ গবর্ণমেণ্টও যে ভারতীয় শিল্পকার্য্য উচ্ছেদের জন্য খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত ঘোষণাটী পাঠ করিলেই সহজে বুঝিতে পারা যায়। যথা ;—"ভারতীয় ছিট্ যে সকল দোকানদার বিলাতে বিক্রয় করিবে, তাহাদিগের ২০০৲ দুইশত টাকা এবং যাহারা উক্ত ছিট্ ব্যবহার করিবে, তাহাদের ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হইবে।" এতদ্ভিন্ন ভারতীয় বস্ত্রের উপর

* সপ্তাশ্চর্য্য ;——ইলোরার গহ্বর (The cave Temples of Ellorah), আগ্রার তাজমহল (বা আলিম্পসের জুপিটর মূর্ত্তি), মিশরের পিরামিড (বা গ্রীসস্থিত ডায়েনার দেবমন্দির), চীনের প্রাচীর (বা এসিয়া মাইনরের মসোলসের সমাধি মন্দির), বাবিলনের দোদুল্যমান উদ্যান, রোড্স্দ্বীপের প্রতিমূর্ত্তি, টেমস্ নদীর তলবর্ত্ম।

শতকরা ৮১৲ টাকা আমদানী মাশুল, বন্দর হইতে জাহাজ ফেরৎ, তন্তুবায়দিগের উপর নির্য্যাতনের একশেষ ও চরকার উপর গুরুতর কর স্থাপন করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই। নানা প্রকার নির্য্যাতন সত্বেও ঢাকা, শান্তিপুর, চন্দ্রকোণার স্থতির কাপড়; খাগড়াই বাসন; বহরমপুরের হস্তিদন্তের কার্য্য ও রেশমী কাপড়; মির্জাপুরী রেশমী কাপড়; বালুচরের পট্টবস্ত্র; ঢাকা ও কটকের গহনা; কাশীর পট্টবস্ত্র; অমৃতসরের শাল ও কার্পেট; মুলতানের রেশম ও শাল; তাঞ্জরের ছুরী ও অস্ত্রাদি; ইত্যাদি এখনও প্রসিদ্ধ *।

ভারতীয় শিল্প, বাণিজ্যাদি খৃঃ ৫ম শতাব্দীতেও সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল; কেননা উক্ত শতাব্দীতে চীনদেশীয় প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান্ সাং ভারতীয় শিল্পদ্রব্য পূর্ণ বাণিজ্য পোতে আরোহণ পূর্ব্বক সিংহল দ্বীপ ও যবদ্বীপ গিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের মতে খৃঃ পূঃ ৬০০ বৎসর হইতে ভারতীয় ও ফিনিসিয় বণিকগণ ইংলণ্ডে বাণিজ্যার্থে গমনাগমন করিতেন।

মৃত্তিকা খনন করিতে করিতে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত তাম্রফলক ইংলণ্ডে পাওয়া যায়। মোক্ষমুলার প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ উক্ত তাম্রফলক পঠনান্তর স্থির করেন যে, খৃঃ পূঃ ২২০০ বৎসর হইতে ভারতীয় বণিকেরা ইংলণ্ডে বাণিজ্যার্থে গমনাগমন করিতেন। যাহা হউক, ভারতীয় শিল্পিগণ অতি প্রাচীনকালেও বাণিজ্যার্থ ইউরোপে যাতায়াত করিতেন।

আজকাল যে বার্ষিক শিল্প-প্রদর্শনী-মেলা ভারতের স্থানে স্থানে হইয়া থাকে, ইহা ভারতীয় শিল্পের উন্নতির একটী প্রধান উপায়। শিল্পপ্রদর্শনীতে যে সকল দ্রব্য প্রেরিত হয়, তাহার যথাযোগ্য পুরস্কার বিতরণের জন্য প্রত্যেক সুসন্তানেরই যথাসাধ্য সাহায্য করা একান্ত কর্ত্তব্য। যাঁহারা শিল্পীদিগের সম্মান করিতে জানেন, তাঁহারাই আজ জগতের সুসভ্য জাতি। যদি কোন শিল্পী মহার্ঘ্য বশতঃ তাঁহার কৃত সুন্দর দ্রব্য প্রচার করিতে না পারেন, তবে তদ্দেশীয় ভদ্রমণ্ডলী বহুল প্রচারের জন্য প্রস্তুতকারককে সাহায্য করিয়া দ্রব্যটীর প্রচার করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে এরূপ কোন ব্যবস্থা হইলে

* The textile manufactures—Shawls, Silks and Carpets of India have been famous for centuries, but many of them have declined before the cheaper and inferior products of the great factories of Britain. But the ivory carvings of Delhi, the jewellery and filigrees of Calcutta and other large towns, and the gold and silver embroideries of Benares, are still celebrated in all parts of the civilised world.—Blackwood's Geographical Reader, Book V, Page 65.

শিল্পের বিশেষ উন্নতি হয়। সুসভ্য জগতের অধিকাংশ রাজার রাজত্ব শিল্প ও বাণিজ্যের উপরই নির্ভর করে, তাঁহারা জমির খাজানার তত ধার ধারেন না, শিল্প বাণিজ্য লইয়াই তাঁহাদের মারামারি। বণিক-প্রধান ইংরাজ আমেরিকার শিল্পোচ্ছেদ করিতে গিয়া আমেরিকা চিরকালের জন্ম হারাইয়াছেন ; ভারতের অদৃষ্টেও ঠিক তদ্রূপ—পরিণামে কি হইবে, কে বলিতে পারে ?

উৎক্ষিপ্ত ইষ্টকখণ্ড যেমন মাধ্যাকর্ষণ বশতঃ (চিরকাল ঊর্দ্ধে না উঠিয়া) ক্ষণকাল স্থিরভাবে অবস্থান পূর্ব্বক নিম্নমুখে পড়িতে থাকে, আমাদের জাতীয় অবনতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পাদির অধঃপতনও ঠিক তদ্রূপ ঘটিয়াছে। যেমন মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে, অথবা পুনঃ পুনঃ বলপ্রয়োগ করিলে উক্ত ইষ্টকখণ্ড কখনই ভূপতিত হইত না, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কালগ্রাসে পতিত না হইলে অথবা তাঁহাদের বংশধরগণ তাঁহাদের ন্যায় উন্নতির সোপানে ক্রমশঃ আরোহণ করিতে চেষ্টা করিলে আমাদেরও এদশা কখনই হইত না। হে ভারতসন্তানগণ! আইস আমরা নিম্নগমনোন্মুখ শিল্পকার্য্যাদির উন্নতি সাধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করি, নতুবা আমাদিগকে শত্রুর নিকট হাস্যাস্পদ, অপমানিত ও ঘৃণিত হইতে হইবে। আমরা ১৯০৫ সালের ১৫ই অক্টোবর তারিখে যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছি, তাহা চিরস্থায়ী করিয়া—ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির জন্য আমাদিগকে জীবনোৎসর্গ করিতে হইবে। বন্দে মাতরম্।

শ্রীকুঞ্জবিহারী লালা।

গৌরবে না রৌরবে ?

(তৃতীয় বা শেষ প্রস্তাব)

ইংলণ্ডের ইতিহাসে যে অমর পুরুষ "বীরবর" এবং "সমুদ্রের মহাবীর" বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন, সেই নেল্‌সনের নৈতিক চরিত্রে এবার হস্তক্ষেপ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। ইনি জলপথে বহু যুদ্ধ করিয়া ইংরাজ জাতির গৌরব ও সৌরভ সম্বর্দ্ধন করিয়াছেন ইহা সত্য ; জীবিতাবস্থায় তজ্জন্য ইনি মহোচ্চ উপাধিতে তদ্দেশীয় নরপতি কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন, ইহাও সত্য ; ইহাঁর পরলোক গমনের পরে ইহাঁর কনিষ্ঠ সহোদর (যিনি গির্জ্জার পাদ্রী ছিলেন) "লর্ড" উপাধি এবং দশ লক্ষ মুদ্রা জ্যেষ্ঠ সহোদরের নামে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন,

তদ্ভিন্ন বার্ষিক ষষ্টি সহস্র মুদ্রার বৃত্তিরও বন্দোবস্ত হইয়াছিল। নেল্‌সনের ভগ্নীগণ প্রত্যেকে রাজভাণ্ডার হইতে এক লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, "সমুদ্রের মহাবীর" অকস্মাৎ সমর-তরণী মধ্যে সমুদ্রোপরে যুদ্ধকালে আহত হইয়া ভবলীলা সম্বরণ করিলে পর, তাঁহার মৃতদেহ স্থলোপরে আনীত হয় এবং রাজা হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত একত্র হইয়া মহা সম্মান ও সমারোহে শবের সমাধি করেন। ইহাতে বেশ বুঝা গেল, ইংরেজ জাতি নেল্‌সনের মহাভক্ত এবং তাঁহার যশোগান শ্রবণে সদাই সমুৎসুক। নেল্‌সনের দ্বারা ইংরাজের রাজ্যবৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি, ক্ষমতা ও গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছিল, কে তাহা অস্বীকার করে? ইংরাজ জাতি যাহা চায়—সাংসারিক সুখ প্রয়াসী ইংরাজ যে প্রকার পার্থিব ভোগের কামনা করে—বীরবর নেল্‌সন তাহা ইংরাজকে যে কোন উপায়ে হউক প্রদান করিয়াছিলেন। ইংরাজের নিকটে নেল্‌সন্ সুতরাং প্রশংসা ও সম্মানের উপযুক্ত পাত্র, কিন্তু ভগবানের ন্যায়ের রাজ্যে নেলসন্ কিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারেন—ধর্ম্মের সুপবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও নিরপেক্ষ রাজ্যে নেল্‌সন্ কি প্রকার বিচারের আশা করিতে পারেন—ইংরাজ তাহা কখন ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি? নেল্‌সনের প্রকৃত চরিত্র এখনও জগতের সম্মুখে অঙ্কিত হয় নাই, তাহা নিরপেক্ষভাবে অঙ্কিত হইলে "গৌরবান্বিত নেল্‌সনের" স্থান ভীষণ রৌরবে ভিন্ন আর কোথাও দেখা যায় না। পাপিষ্ঠ নেল্‌সন্, পাপিষ্ঠ ক্লাইবেরই সমতুল্য, অথচ ইংরাজ শিক্ষক আমাদের তরলমতি বালকদিগকে শিক্ষা দেন "নেলসনের চরিত্র অনুকরণ যোগ্য, তাঁহার নীতিসমূহ শিক্ষার্থীর পক্ষে উচ্চ অঙ্গের নীতি।" হা হতোস্মি!!

আমি নেল্‌সন্ বা ক্লাইবের জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে বসি নাই, তাহা হইলে প্রত্যেক বিষয় সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দিতাম। নেল্‌সন্ জলপথে যুদ্ধকালে ন্যায়ের ও নীতির মস্তকে পদাঘাত করিয়া, সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য করিয়া, নিরপরাধীকে অপরাধী ও অপরাধীকে নিরপরাধী করিয়া, বিবিধ অসৎ উপায়ে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন, ইহা ধ্রুব সত্য। সে সকল প্রসঙ্গ এখন দূরে থাকুক; কেবল তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কলঙ্ক—একটা মহা অমার্জ্জনীয় পাপ—শরীর মন ও আত্মার কলঙ্কনোৎপাদক একটা মহাকলুষের কথা লইয়া এস্থলে কিয়ৎক্ষণের জন্য আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি।

নেল্‌সন্ বিবাহিত পুরুষ ছিলেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র ও দেশাচার মতে তাঁহার

রীতিমত বিবাহ হইয়াছিল, আইনানুসারে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিল। কিন্তু নেল্‌সন্ কিরূপ চরিত্রের লোক ছিলেন তাহা অনেকে এখনও জানেন না। সার উইলিয়ম হামিণ্টন নামে এক গুণবান পুরুষ তৎকালে এক মহোচ্চ পদে নিযুক্ত ছিলেন, ইহাঁর স্ত্রী সে সময়ে সমুদয় ইংলণ্ডে মহা সুন্দরী নারী বলিয়া পরিগণিতা হইতেন। সে সময়ে সমগ্র ইংরাজ জাতি মধ্যে ইহাঁর তুল্য সুন্দরী রমণী আর ছিল না, ইনি ইংলণ্ডের নুরজেহান ছিলেন। হামিণ্টন সাহেবের সহিত নেল্‌সনের বন্ধুতা ছিল, সেইজন্য হামিণ্টনের বাটীতে নেল্‌সনের গতিবিধি ছিল। সরলচেতা সার উইলিয়ম হামিণ্টন এত বড় বিদ্বান, বুদ্ধিমান, বহুদর্শী ও প্রভুত্বশালী মহোচ্চ রাজকর্ম্মচারী হইয়াও কখনও ভাবেন নাই যে, তাঁহার মিত্র নেল্‌সন্ নরাকারে মহাদৈত্য এবং বন্ধুরূপে মহা পাপিষ্ঠ শত্রু। এই বন্ধুত্বের পরিণাম ফল শ্রবণ করিলে রোমাঞ্চ হইতে হয়। "সমুদ্রের মহাবীর" নেল্‌সন্, নিরপরাধী সার উইলিয়ম হণ্টারের সহধর্ম্মিণীকে বিবিধ প্রকার অসৎ উপায়ে কুচরিত্রসম্পন্না করেন এবং অবশেষে তাহার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া গোপনে হামিণ্টন সাহেবকে হত্যা করেন; কেবল তাহাই নহে, এই পাশবীয় হত্যার পরে মহাসুন্দরী হামিণ্টন-পত্নীকে ধন, রত্ন, অলঙ্কার ইত্যাদিসহ পতিঘর হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়া সম্ভোগ করিতে থাকেন। মৃত্যুর মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঐ পিশাচী রমণী ঐ পিশাচ নেল্‌সনের সঙ্গে ছিল। এদিকে নেল্‌সনের ধর্ম্মপত্নী নানাবিধ উপদ্রব ও মনোবেদনা সহ্য করিয়া, বিবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া, চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে ভবলীলা সম্বরণ করেন; নেলসনের হাতে এই সতী স্ত্রী একদিনের জন্যও সদ্ব্যবহার প্রাপ্ত হয়েন নাই। এখন জিজ্ঞাসা করি, ভগবানের দিকে চাহিয়া বল দেখি, বুকে হাত রাখিয়া ধর্ম্মের নামে বল দেখি, ইংলণ্ডের ইতিহাসের "গৌরবান্বিত নেল্‌সন্" গৌরবের রাজ্যে কি রৌরবের নরকে ?

সার উইলিয়ম হামিণ্টন বিলাতের এক কর্ম্মকার জাতীয় লোকের ঘরে বিবাহ করেন, সেই কর্ম্মকারের কন্যা ঐ মহাসুন্দরী হামিণ্টন-পত্নী। এই সুন্দরীর রূপরাশিতে মুগ্ধ হইয়া এক ইংরাজ লেখক একখানি বৃহদাকার পুস্তক লিখিয়াছেন, সেই পুস্তকে ঐ রমণীর চক্ষু, কর্ণ, কেশ, কপোল প্রভৃতির অদ্ভুত বর্ণনা আছে। সে সকল কথা এখন থাকুক, তাহার সহিত এই প্রবন্ধের বিশেষ সম্বন্ধ দেখি না। বলা বাহুল্য, নেল্‌সনের ঔরসে ও হামিণ্টন-পত্নীর গর্ভে এক কন্যার জন্ম হয়। ক্রমে উভয়ের দুশ্চরিত্রের কথা লইয়া ইংলণ্ডে

এমন তুমুল আন্দোলন হয় যে, একজন সাহসী, ধার্ম্মিক, নিরপেক্ষ ও সুলেখক এবিষয়ে একখানি নাটক লিখিয়া একটা থিয়েটার (রঙ্গভূমে) অভিনয় করাইয়াছিলেন। তখন সার উইলিয়ম হামিল্টনের মৃত্যু হইয়াছিল। দর্শক ও দর্শিকাদিগের মধ্যে নেলসনের ধর্ম্মপত্নী উপস্থিতা ছিলেন। তিনি অভিনয় দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হয়েন; বহুযত্নে চৈতন্য সম্পাদন করিয়া রঙ্গভূমের অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে বাটী পাঠাইয়া দেন; কয়েক দিবসের মধ্যে নেলসনের সতী স্ত্রী প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ক্লাইব ও নেলসন উভয়ে ভারতে ও ইউরোপের বহুস্থানে ইংরাজ-রাজ্য স্থাপন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু একজন ধার্ম্মিক লেখক এসম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা একবার পাঠ করিয়া দেখিলে ভাল হয়। ইহার বাঙ্গালা অনুবাদের আবশ্যকতা নাই, ইংরাজি টুকুই যথেষ্ট। তিনি বলেন—"It is possible that God will forgive the most wicked Nelson for this most treacherous act because he won the battle of Trafalgar? A Government is a human institution founded not by any prophet of God Almighty for the benefit of humanity, but by men like Clive and Nelson for selfish purposes. Any wicked act committed in the support of the Government or for its foundation must not be excused or justified by God. No plea will be or can be accepted by the Father in Heaven for the justification of a wicked act committed by the villainous Nelson who was a disgrace to humanity".

১৮১৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের পঞ্চদশ দিবসে দুশ্চরিত্রা হামিল্টন-পত্নীর প্রাণ বিয়োগ হয়। পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই জগতেই হয়; এই সংসারক্ষেত্রই এক প্রকার স্বর্গ ও এক প্রকার নরক। অতীব দারিদ্র্য দুঃখে ও বিবিধ শারীরিক এবং মানসিক ব্যথায় হামিল্টন পত্নীর মৃত্যু হইয়াছিল। নেলসনের মৃত্যুর পরে এই রমণী ভবলীলা সম্বরণ করে। দেনার দায়ে এই স্ত্রীলোক গ্রেপ্তার হইয়া কয়েক মাসের জন্য কারাগারে বন্দিনীরূপে বাস করিতে বাধ্য হয়, অবশেষে মুক্ত হইয়া "কালে" নামক বন্দরে গিয়া এক পিশাচ প্রাকৃতিক দস্যুর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করে। নেলসনের ঔরসে ও তাহার গর্ভে যে কন্যা ও পুত্র জন্মিয়াছিল, তাহারা মাতাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত এবং একটি পয়সাও সাহায্য করিত না। মরিবার সময় ঐ পিশাচী রমণী কহিয়াছিল "অতঃপর মনুষ্য যেন ঈশ্বরকে ভয় করে এবং ধার্ম্মিক হয়"। মরণের কয়েক দিবস পূর্ব্বে

সে তাহার কন্যাকে পত্র দ্বারা লিখিয়াছিল "আমি তোমাকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিতেছি, দেখিও তাঁহাকে ভুলিও না। আমি ভগবানকে ভুলিয়া নরকে যাইতেছি, 'তোমরা সতর্ক থাকিও।" এই কথার উপরে আর কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয় না, ইহাই যথেষ্ট হইতেও যথেষ্টতর। পাপীর অনুতপ্ত হৃদয়ের কথার পরে—মৃত্যুশয্যাগত পিশাচ পিশাচীর পশ্চাৎ তাপদগ্ধ হৃদয়নিঃসৃত কথার পরে—আর কোন কথা কহা অন্যায় ও অপরাধ।

নেলসনেরও কি প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই ? পাপী নেলসনও কি সুখে মরিতে পারিয়াছিল ? না। তাহার অপকর্ম্ম তাহার মেদ, মজ্জা, শুক্র ও শোণিতে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া তাহাকে শয়নে স্বপনে অসুখী রাখিত। বাহিরে যে ভাবেই দেখা যাউক, অন্তরে সেই মহাপাপী নেল্‌সন্ কখন সুখী ছিল না। জগতে অন্যায় ও অসত্যের বীজ বপন করিয়া, শত শত নিরপরাধী মানবকে নির্য্যাতন করিয়া, সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করিয়া, ন্যায় ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, বহু লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া, অসংখ্য প্রাণীর হত্যা সাধন করিয়া, নিরপরাধী, ধার্ম্মিক, সরলচেতা ও বিশ্বাসী বন্ধুর স্ত্রীকে হরণ, যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন এবং পরিণামে ঐ বন্ধুকে হনন করিয়া, যদি কেহ পরমানন্দে জীবন যাপন করিতে পারে, তাহা হইলে আমি পৃথিবীর ধর্ম্মশাস্ত্রগুলাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ম্মনাশার সলিলে নিক্ষেপ করিয়া দিব, ধর্ম্মপ্রচারকগণের সহিত কথোপকথন করিব না এবং ধর্ম্মগুলাকে এক একটা মানুষের দলাদলি ভিন্ন আর কিছুই বিবেচনা করিব না। কিন্তু তাহা নহে ; ধর্ম্ম সত্য, ধর্ম্মশাস্ত্রও সত্য। ধর্ম্মপ্রচারকগণ ধর্ম্মের আলোক এবং ভগবানের লীলা ও নিয়মাবলী (যতই দুর্ব্বোধ্য হউক না) সদাই শুভকর এবং অনন্তযুগ ন্যায় ও সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত। পাপ করিয়া কে কবে পরিত্রাণ পাইয়াছে ? তবে এক কথা এই, তুমি যাহাকে "পাপ" বল, আর একজন হয়ত তাহাকে পাপ বলে না। তুমি যাহা কৃষ্ণ বলিয়া ধারণা করিয়া রাখিয়াছ, হয়ত তাহা প্রকৃত কৃষ্ণ নহে, উজ্জ্বল শোভন শুভ্র। আসল কথা এই, যাহা প্রকৃত পাপ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত আছে ; যাহা প্রকৃত পাপ, তাহার জন্য দণ্ড আছে। নেল্‌সন্ কিরূপ দণ্ড পাইয়াছিল তাহার কথা শুন।

নেল্‌সন ধর্ম্মকে ছাড়িয়া যেদিন হইতে পাপকে আশ্রয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে তাহার জীবনাকাশে সুখসূর্য্য অস্তমিত হইয়া ছিল। সে সূর্য্য আর উঠে নাই। তিনি নানা স্থানে নানা উপায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন

কিন্তু দুই বেলাই তাঁহার ধনাভাব থাকিত। অনেক সময়ে অনেকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে তিনি বাধ্য হইতেন। অনেকের টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় অপমান সহ্য করিতেন, লোকের সহিত বন্ধুতা হারাইতেন এবং মনোব্যথায় দিনযাপন করিতেন। উপপত্নীটা এরূপে অযথা ব্যয় করিত যে এক এক সময়ে একেবারে তাঁহারা উভয়ে কপর্দ্দকশূন্য হইয়া যাইতেন। নেল্‌সন্‌ অত্যন্ত ধনলোভী ছিলেন; তাঁহার অত্যন্ত আশা ছিল, দেশের রাজা তাঁহাকে যথেষ্ট ধন দিবেন। জীবিতাবস্থায় নেলসনের এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। মৃত্যুর পরে তাঁহার ভাই ও ভগ্নীগণ রাজসরকার হইতে অনেক টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নেল্‌সনের তাহা ভোগে আইসে নাই। তিনি যেমন অভাবে থাকিতেন, মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত সেই অভাবই ভোগ করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সমুদ্রোপরে জাহাজের ভিতরে তাঁহার উপপত্নী সঙ্গে ছিল, তাহারও ঐ কষ্ট, ঐ ব্যথা, ছিল।

ফরাসীদিগের সহিত ঘোরতর জলযুদ্ধ কালে, নেলসন সাহেব "স্যান জোশেফ" নাম্নী ফরাসী রণতরণী হইতে নিক্ষিপ্ত জ্বলন্ত বারুদের আঘাতে দগ্ধ দেহ হইয়া যান। সাণ্টাক্রুজ নামক স্থানের যুদ্ধে নেলসনের দক্ষিণ হস্ত কাটা যায় এবং ক্যাভির সমরে তাঁহার বাম চক্ষু দৃষ্টিহীন হইয়া গিয়াছিল। নেলসনের অন্যায় ব্যবহারে সেনাদলের মধ্যেও ইংলণ্ডে ঘোরতর অশান্তির উদ্রেক হয়, অনেক কষ্টে তাহা প্রদমিত হইয়াছিল। জলযুদ্ধকালে শত্রুপক্ষীয় "রিডাটটেবল" নামক জাহাজকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগে বৈরীদিগের নিক্ষিপ্ত গোলা আসিয়া নেলসনের পৃষ্ঠদেশ ভেদ করিয়া উদর মধ্যে প্রবেশ করে। ৪৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে, অক্টোবর মাসে, নেলসনের মৃত্যু হয়। মরে সাহেব প্রণীত ইংলণ্ডের ইতিহাসে (Murray's History of England, P. 668) লিখিত আছে "Almost his last words were to recommend to his country Lady Hamilton with whom he lived." অর্থাৎ মরণোন্মুখ নেলসনের শেষ কথা এই—"কামিনী হামিল্টনকে আমি আমার স্বদেশবাসীদের হস্তে প্রশংসার সহিত সমর্পণ করিতেছি।" মরণের সময়েও কেমন ধৃষ্টতা দেখ !!

প্রখ্যাত লেখক বাবু চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় তাঁহার "ভূপ্রদক্ষিণ" নামক পুস্তকের একস্থলে লিখিয়াছেন, নেল্‌সন্‌ মৃত্যুকালে কহিয়াছিলেন "আমি কোন মহাপাপ করি নাই।" এই কথা কয়েকটির প্রকৃত অর্থ পাঠকমহাশয়েরা বুঝেন কি ? গল্পে শুনা যায় এক সময়ে কদলী ফলাদি চুরি করিবার অভিপ্রায়ে এক ব্যক্তি ঠাকুর ঘরে ঢুকিয়াছিল, কেহ তাহা দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করে

"ঠাকুরঘরে কে হে ?" চোরের মুখ হইতে হঠাৎ বাহির হইল "আমি তো কলা খাইনাই।" নেলসনের কথাও ঠিক তাহাই। খৃষ্টীয় সমাজে, খৃষ্টীয় দেশে এবং খৃষ্টীয় পিতামাতার ঔরস ও গর্ভে নেলসনের জন্ম হয় ; খৃষ্টান শাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ লিখিত আছে, পাপ করিয়া গির্জ্জায় অথবা পাদ্রীর নিকটে কিম্বা অকপট চিত্তে সাধারণ সমীপে যিশুর নামে যে ব্যক্তি তাহা স্বীকার করে, যিশুখৃষ্ট তাহাকে নিশ্চয় মুক্তি দেন এবং সেই ব্যক্তি যথার্থ খৃষ্টান ও যিশুভক্ত বলিয়া গণ্য হয়। যে তাহা গোপন বা অস্বীকার করে সে (বাইবেল মতে) মহাপাপী ও মহা পিশাচ। "পাপ স্বীকার কর" এই নীতির উপরে সমুদয় খৃষ্টধর্ম্ম ও খৃষ্টীয় শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি বলে, আমি পাপ করি নাই, সে ব্যক্তি মহা মিথ্যাবাদী এবং মহা কলঙ্কিত ব্যক্তি। যদি পাপ না করিয়াছ তাহা হইলে ধরাতলে জন্ম হইল কিসে ? ধরাতলে জন্মগ্রহণ ঘটনাটাই তোমার পাপের পরিচয়। সাধু পল (সেন্টপল্) অত বড় বিদ্বান, যোগী ও ধর্ম্মক্ষেত্রে দেবতাবৎ হইয়াও লিখিয়া গিয়াছেন "None—not even one—is righteous on this earth ; every one has come short of the glory of God. Man takes his birth in, sin lives in sin, and dies in sin. Sin is the wages of death". কিন্তু নেল্সন্ সাহেব মৃত্যুকালেও খৃষ্টীয় সমাজকে প্রতারিত করিয়া গিয়াছেন। নরসমাজের চক্ষে ধূলি দেওয়া সহজ, কিন্তু ভগবানের চক্ষে কে ধূলি দিতে পারে ? খৃষ্টীয় শাস্ত্র ও খৃষ্টীয় সমাজ মতেও নেল্সন্ মহাপাপী। তবে নেলসনের স্থান কোথায় ? জগতের ইতিহাসে নেলসন মহাবীর, মহাসাহসী, স্বদেশসেবক, প্রতিভাশালী ও মহিমান্বিত বলিয়া আখ্যাত হউন, ক্ষতি নাই ; মানুষের লেখনী হইতে যত মিথ্যা বাহির হয় তত সত্য বাহির হয় না। মানবের মস্তিষ্কের কল্পনা, মনের ধারণা ও লেখনীর উদ্গীরণকে আমি সদাই তুচ্ছ করি ; ন্যায় ও ধর্ম্ম যাহা বলে তাহাই সত্য, তাহাই গ্রহণীয়। ন্যায় ও ধর্ম্মের হিসাবে ক্লাইব ও নেল্সন্ গৌরবময় ধর্ম্মরাজ্যে নাই, মহা ভীষণ রৌরবে বিদ্যমান।

সমাপ্ত।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

ঢাক বাজাও।

তোমরা ঢাক বাজাও।

আমি সম্পাদক,—সম্মার্জ্জনী পরিত্যাগ করিয়া লেখনী ধারণ করিয়াছি। আমার মত লিখিতে কে পারে? এমন সুশ্রাব্য, সুমিষ্ট, সুরুচিসঙ্গত ভাষা প্রয়োগ করিতে আর কে সমর্থ? খণ্ডিত অখণ্ডিত উভয়বিধ বঙ্গের লেখক লেখিকা, পাঠক পাঠিকা আমার গুণে—আমার সম্পাদকতায় মুগ্ধ। সুতরাং তোমরা একবার আমার হইয়া ঢাক বাজাও।

আমি সমালোচক,—ইহজন্মে বিদ্যালয় নামক ভয়ঙ্কর জীবের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় না থাকিলেও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতা বিদ্যার প্রভাবে আমি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী। সুতরাং আমি শ্রেষ্ঠ সমালোচক। আমি ন্যায়ান্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম, শুদ্ধাশুদ্ধ কিছুই জানি না, অভিধান বা ব্যাকরণের ধার ধারি না। আমি পারি শুধু সমালোচনা করিতে; পারি শুধু শত্রুকে বিচিত্র ভাষায় গালি দিতে, আর মিত্রের প্রশংসাবাদের উচ্চ জয়ধ্বনি তুলিতে। বিশাল সাহিত্যরাজ্যে আমার এখন একাধিপত্য, আমার সমালোচনার ভয়ে সাহিত্যরথিবৃন্দ সদা প্রকম্পিত। সুতরাং তোমরা আমার হইয়া ঢাক বাজাও।

আমি কবি,—আমার ভাষা কবির ভাষা; সে ভাষা অ-কবি তোমরা কিরূপে বুঝিবে? কোন্ বনফুলের কোন্ সন্ধিস্থলে মধুর ভাণ্ডার লুক্কায়িত, সুচতুর মধুকর ব্যতীত তাহার সন্ধান কে পাইবে? কোন্ মিষ্টান্নের কোন্ খানটীতে কামড় দিলে সমুদয় রসটুকু উদরস্থ হইবে অভিজ্ঞ ভোক্তা ব্যতীত ফলারে বামুন তোমরা তাহার কি জানিবে? কিন্তু তোমরা না জানিলেও আমার বড় একটা ক্ষতি নাই। আমি স্বভাব কবি। আমি যখন অগাধ ভাবা-সমুদ্রের উচ্ছ্বসিত বক্ষে কবিতার নূতন নূতন রঙ্গিন পাল তুলিয়া দিয়া আমার সোণার তরীর হাল ধরিয়া বসি, যখন সেই তরণীবক্ষ ভেদ করিয়া, উদ্বেল ভাবাসাগর কম্পিত করিয়া, আমার মধুর সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি সাহিত্য-কানন প্লাবিত করিতে থাকে, তখন কোন্ পাষাণ হৃদয় সমালোচক সমালোচনার মলিন চস্‌মাটী নাকের উপর রাখিয়া কঠোর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিতে সাহস করে? তখন কি গর্ভস্থ ভ্রূণ হইতে বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধার কণ্ঠ ভেদ করিয়া গগনভেদী জয়ধ্বনি উত্থিত হয় না? তবে তোমরা

আমার হইয়া ঢাক না বাজাইবে কেন? তোমরা বাজাইতে না চাহিলেও আমি জোর করিয়া বলিব, তোমরা একবার আমার হইয়া ঢাক বাজাও।

আমি ঔপন্যাসিক,—উপন্যাস লেখাই আমার পেশা বা ব্যবসা। কোন্ শব্দের উত্তর কোন্ ধাতু করিয়া কোন্ প্রত্যয় যোগ দিলে উপন্যাস শব্দের উদ্ভব হয় তাহা আমি জানি না, জানিবার বড় একটা প্রয়োজনও হয় না। আমার হাত বড় সাফাই, আমার তৈললাভের লোভে কৃতজ্ঞ সমালোচক দল মুগ্ধ, মন্ত্রৌষধিরুদ্ধ বীর্য্যভুজঙ্গবৎ নিশ্চল, নির্ব্বাক। সুতরাং সাহিত্য ক্ষেত্রে আমার গতি আছে। উপন্যাস লিখিতে বসিয়া আমি ব্যাকরণ নামক তুচ্ছ অথচ কঠোর বন্ধনের মধ্যে কোন দিনই আপনাকে ধরা দিই না, স্ত্রীলিঙ্গ পুংলিঙ্গের প্রভেদ স্বীকার করি না; যাহারা কাঁচা লেখক, এ সকল বন্ধন তাহাদেরই জন্য। আমি উচ্চে—অনেক উচ্চে; তোমরা জান না, আমার ভয়ে বৈদেশিক কবি সেক্‌সপিয়ার, মিলটন পর্য্যন্ত কম্পিত, আমার বিজয় দুন্দুভি মাথার উপর ঐ দেবলোকে পর্য্যন্ত নিনাদিত। সুতরাং এই নশ্বরময় লোকে বসিয়া তোমরা একবার আমার হইয়া ঢাক বাজাও। আমি আমার অমূল্য উপন্যাস রাশির পুনঃ সংস্করণের উদ্যোগ করি।

আমি দেশহিতৈষী,—দেশের হিতসাধনই আমার ব্রত। দেশের জন্য আমি বক্তৃতা করি, রাত্রি জাগিয়া, তৈল নষ্ট করিয়া, মাথা ঘামাইয়া বড় বড় প্রবন্ধ লিখি, উচ্চ কণ্ঠে স্বরাজ, স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি ধ্বনি তুলিয়া গবর্ণমেণ্টের কর্ণ-জ্বালা উৎপাদন করি। আমার অশন, বসন, শয়ন, গমন, হাবভাব, বিলাস বিভ্রম প্রভৃতি সমস্ত—এমন কি অস্থি মজ্জা শোণিত এবং তদভ্যন্তরস্থ বীজাণুগুলি পর্য্যন্ত বিদেশীর অনুকরণে গঠিত ও চালিত হইলেও আমি স্বদেশের পরম ভক্ত। আমার ভক্তি হিমালয় হইতে উচ্চ, আটলাণ্টিক সাগর হইতেও গভীর এবং অসীম আকাশ অপেক্ষা বিস্তৃততর। সুতরাং তোমরা একবার আমার হইয়া ঢাক বাজাও। ত্রিশকোটি হস্ত-নিক্ষিপ্ত বিজয়মাল্য আসিয়া আমার কণ্ঠ শোভা বর্দ্ধিত করুক।

আমি দাতা,—দানে আমি হরিশচন্দ্রের ন্যায় মুক্তহস্ত। কিন্তু তোমরা চর্ম্মচক্ষে আমার দান খুজিয়া পাইবে না; যাহার দেখিতে ইচ্ছা হয়, সে গিয়া সরকারী রিপোর্টের তাড়া অনুসন্ধান করুক। তখন দেখিবে দেখিয়া বিস্মিত এবং চমকিত হইবে, আমার দানের পরিমাণ কি? হরিশ্চন্দ্র দায়ে পড়িয়া সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় সুস্থশরীরে সরল অন্তঃকরণে

খোস মেজাজে বিনানুরোধে বিনা কায়দায় যথাসর্ব্বস্ব দান করিতে বসিয়াছি। সে কালের মুনিরা পুরাণের মধ্যে হরিশ্চন্দ্রের নামটা লিখিয়া গিয়াছিল, আর একালের কোন ঐতিহাসিকই কি তাহাদের বাঁধান খাতার মধ্যে আমার নামটা টুকিয়া লইবে না? তা' না লউক, তোমরা একবার আমার হইয়া ঢাক বাজাও। তাহা হইলে আগামী বর্ষের উপাধি বর্ষণের দিনে গেজেটের মধ্যে আমার নামটার সহিত নিশ্চয়ই রাজা বাহাদুর উপাধিটী সংযোজিত হইবে।

আমি লেখক,—তোমরা আমাকে চিনিতে পারিবে না, কিন্তু আমি তোমাদিগকে চিনি। আমি নূতন নই, সেই পুরাতন। তবে আমি এখন পুরাতন ছাড়িয়া এই নূতন ব্যবসা ধরিয়াছি। তোমরা আমার হইয়াও একটু ঢাক বাজাও। চারিদিক হইতে গালির কুসুমস্তবক সমূহ আমার মস্তকে পতিত হউক। আমি কৃতার্থ হইয়া অঙ্কুর-সম্পাদককে অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করি।

শ্রীনামহীন শর্ম্মা।

সমালোচনা।

সূরো যে সন্ন্যাসী বা অষ্টাহে।—শ্রীযুত বামাচরণ বসু প্রণীত, একখানি চিত্তাকর্ষক কাব্যগ্রন্থ। লেখক সাহিত্য জগতে একান্ত অপরিচিত নহেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে ইনি "প্রবাহ" নামক মাসিকপত্রে "জয়চাঁদের চিঠি" শীর্ষক একটী চিত্তবিনোদক উপন্যাস প্রকাশিত করিয়া সাধারণের নিকট যশস্বী হন। এতদ্ব্যতীত, অরণ্যপ্রসূন, বিজলী, প্রভৃতি আরও কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আলোচ্যমান গ্রন্থখানি যেরূপ মনোমোহকর, এবং লেখক ইহাতে যেরূপ দক্ষতার সহিত বিভিন্ন চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে একজন চিন্তাশীল ও দূরদর্শী সুলেখক তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়। স্বার্থত্যাগী,আত্মসংযমী সতীরমণী, কিরূপে স্বামীর চরিত্র সংশোধন করিয়া, সমভাগাযুক্তা পরিত্যক্তা স্বপত্নীকে, নিজ স্বামীর হস্তে সমর্পণ করতঃ নিজে বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়াছে, লেখক তাহা অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়া নিজের অপূর্ব্ব লিপি চাতুর্য্য দেখাইয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে, পুস্তক পাঠ করিয়া আমরা পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি।

পরন্তু ইহা যে একেবারে ভ্রমপ্রমাদবর্জ্জিত তাহা আমরা বলিতে সাহস করি না। স্থানে স্থানে, ভাষার কিছু কিছু দোষ দৃষ্ট হয়, তবে তাহা মণি মুক্তা-

গুম্ফিত-ললন্তিকা মধ্যে ২।৪টী স্ফটিক ফল বিদ্যমানতার ন্যায় অননুভূত, সুতরাং উপেক্ষনীয়। পরন্তু সে সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখাও লেখকের কর্ত্তব্য ছিল। এস্থলে আমরা দুই চারিটী মাত্র উল্লেখ করিব।

১১ পৃষ্ঠায়—"ভেসে যায় যেন আঁখি অশ্রুজলে"

'অশ্রু' অর্থই আঁখিজল, এস্থলে নেত্রনীরে লিখিলেই ভাল হইত।

৩০ পৃষ্ঠায়—"অন্-অধিকারে প্রবেশিয়া দোষী"

ভাবোদ্দেশ্যে এস্থলে "অনুমতি বিনা" লিখিলে দোষ হইত না।

৩৬ পৃষ্ঠায়—"অজীয়ন্ত তুচ্ছ অপ্রাণ পদার্থে", অজীয়ন্ত সুষ্ঠু প্রয়োগ নহে। জীব+শতৃ (বিং) এবং জীব+অন্ত (বিং) করিয়া জীবৎ ও জীবন্ত হইয়াছে সুতরাং "অ-জীয়ন্ত" সিদ্ধ হইল কিরূপে? "প্রাণহীন অনিত্য পদার্থে" প্রয়োগ করা যাইতে পারিত।

৩৭ পৃষ্ঠায়—"রমণীর চক্ষে বারি দেখি, ওই
সরসী সলিলে শান্ত বীচিদল,
নিরব পদ্মিনী, আলোকে আঁধার,
নিস্তব্ধ কানন কাঁদিল সকলে
তার সনে। আর, অকায়-সমীর
একটী হিল্লোলে দীর্ঘশ্বাস, জলে
যাইল ফেলিয়া"।

পদ্মিনীর যে রব করিবার ক্ষমতা আছে তাহা আমরা এই প্রথম শুনিলাম বা অবগত হইলাম "নিস্তব্ধ কানন কাঁদিল সকলে" বীচিদল পদ্মিনী, আঁধার, কানন, ইহারাই কি কাঁদিল? কি প্রকারে? "অকায় সমীর * * * * যাইল ফেলিয়া" শব্দার্থ ও ভাব পরিস্ফুট নহে।

৭১ পৃষ্ঠায়—"বিরতি আধারে যুগল বিকাশ"

অর্থ কি? পরন্তু "বিরতি" (বি+রম+তি) বিশেষণ নহে,—বিশেষ্যপদ অর্থ—নিবৃত্তি, বিরাগ, শান্তি।

১১০ পৃষ্ঠায়—(এবং অনেক স্থলে) "নতু", 'নহে' লেখাই উচিত ছিল।

আমরা মাত্র এই কয়েকটীর উল্লেখ করিলাম। ভরসা করি লেখক ইহার পরবর্ত্তী সংস্করণে এই গুলির পরিহার ও স্থলবিশেষে সংস্কার বিষয়ে যত্নবান হইবেন।

পরিশেষে আমরা মুক্তকণ্ঠে ইহা স্বীকার করিতেছি যে লেখক একজন ভাবুক, বহুদূরদর্শী, এবং এই পুস্তকখানি যে ব্যক্তি বিশেষের উপকার সাধন করিয়া সাধারণের নিকট আদৃত হইবে এরূপ আশা করা যায়।

বিবিধ।

প্রাপ্তি স্বীকার।—আমরা মাইলো ফুড্, নেস্‌লেস্ মিল্ক, এবং নেস্‌লেস্ ফুড্ প্রভৃতির ১৯০৮ সালের দুই খানি ক্যালেণ্ডার (দিন পঞ্জিকা) উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। এই পঞ্জিকার দৃশ্য গুলিন যৎপরোনাস্তি মনোহর হইয়াছে। ইহাতে আগ্রার তাজ মহলের একটী সুন্দর ছবি দেওয়া হইয়াছে।

প্রবন্ধের জন্য পুরস্কার।

"কি কারণে বঙ্গদেশে হিন্দুজাতির হ্রাস হইতেছে এবং তাহা নিবারণের উপায় কি?"—এই বিষয়ে যাঁহার প্রবন্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও পুরস্কারের উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে সেই প্রবন্ধ-লেখককে ১০০৲ একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। এবং তাঁহার প্রবন্ধটি বঙ্গদর্শনে ও আবশ্যক হইলে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করা যাইবে। লিখিত প্রবন্ধ, আগামী ১২ই আশ্বিনের মধ্যে ১৯ নং ষ্টোর রোড—বালীগঞ্জ কলিকাতা—এই ঠিকানায় শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের নিকট প্রেরিতব্য। বিচারক:—শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চৌধুরী। *

---

* মজুমদার লাইব্রেরীর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার এই বিজ্ঞাপনটী আমাদের কাগজে প্রকাশ করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। আমরা তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলাম।
সহঃ সং।

অঙ্কুর।

বীজাদঙ্কুরনিষ্পত্তিরঙ্কুরাদ্বৃক্ষসম্ভবঃ।
ফলপ্রদোভবেদ্বৃক্ষইত্থমাশাক্রমোমতঃ॥

২য় বর্ষ।] পৌষ, ১৩১৪। [১২শ সংখ্যা।

ধর্ম্ম বিজ্ঞান।

আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখাইয়াছি, যাঁহারা বলেন, "ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব নহে" তাঁহাদের মতের কোনই সারবত্তা নাই। তাঁহাদের যুক্তি প্রণালী অত্যন্ত ভ্রান্ত এবং নানাপ্রকার স্ববিরোধিতা দোষে দুষ্ট। কিন্তু ইহাতেও আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হইতেছে না। ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞানের পথ নিষ্কণ্টক হইল বটে, কিন্তু আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবার পক্ষে সকল বিঘ্ন নিরাকৃত হইল না। এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহারা মনে করেন, যে মানবের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান সম্ভব, কিন্তু সে জ্ঞান প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তাহা বিচারশক্তির অধিগম্য নহে। ব্রহ্ম মানবের অধিগম্য হইলেও মানবজ্ঞান তৎসম্বন্ধীয় কোন বিচারে সমর্থ নহে। মানবকে যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হয় তবে জ্ঞানের অতীত কোন ইন্দ্রিয় (organ) সাহায্যেই তাহা লাভ করিতে হইবে। জ্ঞানের মীমাংসা সে স্থানে পৌঁছিতে পারে না। মানব চিন্তার (reason or rational thought) সাহায্যে ব্রহ্মকে ধারণা করিতে পারে না। কিন্তু সহজজ্ঞান (intuition) বা বিশ্বাসের (faith) সাহায্যেই তাহাকে লাভ করিতে পারে। অজ্ঞেয়তা-বাদীগণ বলিয়াছেন, সসীম মানবের এমন কোন ইন্দ্রিয়ই নাই যাহা দ্বারা সে অসীম ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে, কেননা, জ্ঞান (reason) ব্যতীত মানবের জানিবার অন্য কোন শক্তি (faculty) নাই এবং জ্ঞানের (reason) দ্বারা জানার অসীমকে সসীম করা *। ইহাঁরা বলিতেছেন, জ্ঞান

* এই যুক্তির ভ্রান্তি আমরা ইতিপূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি।

ব্রহ্মকে ধারণা করিতে অসমর্থ হইলেও অন্য দ্বারে ব্রহ্ম মানব অন্তরে প্রকাশিত হন। ইহাঁদের মতে ব্রহ্মজ্ঞান (knowledge of God) সম্ভব, কিন্তু ব্রহ্মবিজ্ঞান (theology or the scientific treatment of religion) সম্ভব নহে। যেহেতু, মানব চিন্তা (rational thought) ব্রহ্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। এই মত পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞেয়তাবাদের প্রতিবাদ স্বরূপ আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কেন না, "ব্রহ্মকে জানা যায় না" অজ্ঞেয়তাবাদের ধর্ম্মবিনাশকারী এই মত ধর্ম্ম বিশ্বাসীর মনে কখনও স্থান পাইতে পারে না। তাই কুতার্কিকের কূট তর্কজাল ভেদ করিতে অসমর্থ হইয়া স্বীয় স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাসকে অক্ষুন্ন রাখিবার মানসে বিশ্বাসীগণ জ্ঞানকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া, ধর্ম্মরাজ্যের বাহিরে বিদায় করিয়া দিলেন। বলিলেন, ধর্ম্ম জীবনের অভিজ্ঞতায় যাহা পাওয়া যায় জ্ঞান তাহার শতাংশও প্রদান করে না, বরং যাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নিশ্চিত সত্য তাহারই সম্বন্ধে নানা সন্দেহ ও অপূর্ণতা আনিয়া দেয়। সুতরাং ধর্ম্ম জগতে কোন মীমাংসার জন্য জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করা সূর্য্যালোক পরিত্যাগ করিয়া অন্ধকার গৃহে দীপালোকের সাহায্যে বস্তু নির্ণয়ের চেষ্টার ন্যায় হাস্যজনক। উপাসনা কালে সাক্ষাৎ যোগে ব্রহ্মবস্তুকে প্রত্যক্ষভাবে লাভ করা যায়। এই সময়কার ব্রহ্মসত্তার অনুভূতি আত্মানুভূতির ন্যায় উজ্জ্বল। সাধারণ জ্ঞানে বহির্জ্জগতের সত্তা যেমন সকল সন্দেহের অতীত, উপাসনাকালে ব্রহ্মসত্তার জ্ঞানও তেমনই অবিসম্বাদী। এই সময়ে যে ব্রহ্ম সত্তার উপলব্ধি হয় তাহা কোনও প্রমাণ সাপেক্ষ নহে, তাহা ব্রহ্মের সাক্ষাৎ আবির্ভাবের ফল; সুতরাং সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত প্রশ্নের মীমাংসা করা হইয়াছে—কিরূপে সসীম জ্ঞান অসীমকে জানে? কিরূপেই বা সসীম স্বীয় মীমাংসাকে অতিক্রম করতঃ ব্রহ্ম বস্তুকে জানিতে সক্ষম হয়?—এই সকল প্রশ্নের কোন অস্তিত্বই সেখানে নাই। ব্রহ্মবস্তু সাক্ষাৎ দেখিতেছি এবং ইহাঁর অস্তিত্ব জ্ঞান এমন সুস্পষ্ট যে ইহা প্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজনীয়তাই অনুভূত হয় না। সুতরাং বিশ্বাসী মনে করেন, যে সন্দেহের অতীত এই উচ্চভূমি পরিত্যাগ করিয়া সন্দেহের ভূমিতে অবতরণ করতঃ সন্দেহ নিরাকরণ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা একটা মহা ভ্রান্তি ও পণ্ডশ্রম মাত্র। কেন না, সহজজ্ঞান (intuition) বা বিশ্বাস (faith) সাহায্যে আমরা ব্রহ্মবিষয়ক যে বিদ্যা লাভ করি, জ্ঞান (reason) গুণে (qualitatively) বা পরিমাণে (quantitatively) তাহার

শতাংশের এক অংশও প্রদান করিতে সক্ষম নহে। জ্ঞানের বিচারে তো আমরা ঈশ্বরকে পাই না, তাঁহার সম্বন্ধে কেবল কতকগুলি শুষ্ক মীমাংসা (abstract ideas) মাত্র লাভ করি। সুতরাং সে গুলির দ্বারা মনে কোনরূপ শান্তি উৎপন্ন হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। কাজেই ধর্ম্মপ্রবণ হৃদয়ে সে গুলি কখনও স্থান পায় না। চাই খাদ্য, পাথর লইয়া কি করিব? তারপর সহজজ্ঞানে বা বিশ্বাসে (intuition or faith) বস্তু সম্বন্ধে যে একত্ব ও সমষ্টির ধারণা হয়, জ্ঞান (reason) তাহা কখনও দিতে পারে না। জ্ঞান (reason) বরং সেই একত্বকে নানা খণ্ডে বিভক্ত করে, সেই সমষ্টিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অংশ করতঃ তাহার সমষ্টিত্ব বিনষ্ট করিয়া দেয়। যদিও জ্ঞান (reason) পরে আবার ঐ একত্ব ও সমষ্টিত্ব প্রদান করিতে চেষ্টা করে কিন্তু কিছুতেই সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারে না। বিশেষতঃ মানব জ্ঞান (reason) যত কেন উন্নত হউক না, সে সসীম। সুতরাং অসীমের মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলেই সে গ্রহণ করিতে সক্ষম নহে। কাজেই, সে যখন সমষ্টি করিতে যায়, তখন সেই পূর্ণ অসীম বস্তুটী দিতে পারে না। কেন না, যখন সে বিশ্লেষণ (analyse) করিয়াছিল সে সময়ে যখন সমগ্র বস্তুটীর সকল অংশ পায় নাই, তখন তাহার সমষ্টি কিরূপে সমগ্র বস্তুটী দিবে? সুতরাং সহজজ্ঞান বা বিশ্বাস (intuition or faith) আমাদিগকে যে বস্তুটী প্রদান করে বিজ্ঞান (scientific knowledge) যত কেন উন্নত হউক না, সে কখনও তাহা দিতে সক্ষম নহে। জড় বিজ্ঞান এক সময়ে সসীম জগতের একটা পূর্ণ জ্ঞান মানবাত্মার সম্মুখে উপস্থিত করিলেও করিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মবিষয়ক পূর্ণ জ্ঞান কখনও বিজ্ঞানের নিকট আশা করা যায় না। জড়বিজ্ঞান সম্ভব হইলেই ব্রহ্মবিজ্ঞান সম্ভব নহে। বিশেষতঃ বিজ্ঞান সাহায্যে ব্রহ্মকে ধারণা করিতে যাওয়াতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, ব্রহ্ম অপেক্ষাও উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ কিছু আছে। অসীম সসীমের নিকট আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু জীব স্বীয় জ্ঞানবলে ব্রহ্মবস্তুকে ধারণা করিবে ইহা অতি অসম্ভব কথা। কেন না, মানবের সসীম জ্ঞানে (reason) যদি অসীম ব্রহ্মের অস্তিত্ব ও স্বরূপের প্রমাণ বর্ত্তমান থাকে, তবে ইহাই বলা হয়, যে সসীম অসীম অপেক্ষাও বড়। সুতরাং যে ব্রহ্মকে জ্ঞান (reason) প্রমাণ করিতে সক্ষম তাহা কখনই ব্রহ্ম নহে। উহা ক্ষুদ্র সসীম মানবজ্ঞান অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। এই আলোচনা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে,

ব্রহ্মলাভের পক্ষে দার্শনিক জ্ঞান (reason) নহে, কিন্তু সহজজ্ঞান বা বিশ্বাসই (intuition or faith) একমাত্র উপায়।

এখন দেখা যাক্, ব্রহ্মবিজ্ঞানের (scientific knowledge of God) বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে তাহাদের যুক্তিযুক্ততা কতদূর।

সর্ব্বপ্রথম ইহা বলা যাইতে পারে, যে এই আপত্তিগুলির প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, আপত্তিকারিগণ ধর্ম্মবিষয়ে জ্ঞানের (reason) কার্য্য (function) বুঝিতে ভুল করিয়াছেন। উপাসনা কালের অভিজ্ঞতা, আত্মপ্রত্যয় (intuition) বা বিশ্বাস (faith) এবং জ্ঞান ইহাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। ইহারা ধর্ম্মজীবনের বিভিন্ন সোপানে অবস্থিত। বিশ্বাসই ধর্ম্ম। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসে উপনীত হইতে হইলে জ্ঞান চাই। বিশ্বাসী যোগে অবস্থিত হইয়া যে ভাব উপলব্ধি করেন, ধর্ম্মবিজ্ঞান কখনও সে ভাব মানুষকে দিতে পারে না। কিন্তু এই ধর্ম্ম-বিজ্ঞান ব্যতীত ঐ যোগের পথ কখনও মানবাত্মার নিকট প্রকাশিত হয় না। সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞান যেমন বস্তুকে সুন্দর করে না, নীতিবিজ্ঞান যেমন মানুষকে নৈতিক জীবনসম্পন্ন করে না, সেইরূপ ধর্ম্মবিজ্ঞানও মানুষকে ধার্ম্মিক করে না। ধর্ম্মবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য তাহা নহে। ইহার উদ্দেশ্য পথ প্রদর্শন করা। বিশ্বাস ধর্ম্মজীবনরূপ মহাবৃক্ষের অমৃতময় ফল। কিন্তু ধর্ম্মবিজ্ঞান, কি প্রণালীতে পূর্ব্বে এই ফল ফলিয়াছে ও পরেও ফলিতে পারে এবং আমরা যদি আমাদের জীবনে সেই ফললাভ করিতে চাই তবে আমাদিগকে কি প্রণালী ও কি উপায় সকল অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাই নির্দ্দেশ করে। সুতরাং আত্মপ্রত্যয় বা সহজজ্ঞানই (intuition) বল, প্রত্যক্ষ ব্রহ্মানুভূতিই বল বা বিশ্বাসই (faith) বল, কাহারও সঙ্গে জ্ঞান (reason) বা ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের কোনও বিরোধ নাই। ইহাদের কার্য্যক্ষেত্র স্বতন্ত্র। সুতরাং ইহাদিগকে তুলনায় সমালোচনা করিয়া একটীকে অন্যটী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা নিকৃষ্ট বলা সঙ্গত নহে।

আবার যে বলা হইয়াছে, আত্মপ্রত্যয়, সহজজ্ঞান বা বিশ্বাসের ভূমি হইতে নামিয়া আসিয়া জ্ঞান যে ব্রহ্মবিষয়ক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তাহাতে আমরা ব্রহ্মবস্তুকে হারাইয়া তৎসম্বন্ধে কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন অসংলগ্ন মীমাংসা প্রাপ্ত হই এবং সহজ চক্ষে যাহা এক ও সমগ্র বলিয়া প্রতিভাত হইতেছিল তাহা বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে, এই আপত্তিও যুক্তিযুক্ত নহে। কেন না,

বিজ্ঞান যে একত্ব সম্পাদন করিতে চায় তাহা সহজ জ্ঞানে প্রতিভাত একত্ব অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্থানে অবস্থিত। সহজ জ্ঞানে প্রতিভাত একত্বে আপাত-বিরুদ্ধ এবং পরস্পর বিভিন্ন ভাব গুলির কোনও যুক্তিসঙ্গত মিলনভূমি প্রদর্শিত হয় না। সকলগুলিকেই একত্র গ্রহণ করা হয় বটে, কিন্তু তাহারা কিরূপে একত্রিত হইতে পারে তাহার কোনও কারণ নির্দ্দেশ করা হয় না। এই একত্ব প্রকৃত একত্ব নহে। উহা সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিম। উহা একত্বের ছায়া মাত্র। কিন্তু এই বাহ্যিক (superficial) একত্বকে অতিক্রম করিয়া বিজ্ঞান এক উন্নততর একত্বের দিকে ধাবিত। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিজ্ঞান এই বাহ্যিক একত্বকে বিনষ্ট করতঃ উহাকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ফেলে, এবং দেখাইয়া দেয়, যে যাহা সহজজ্ঞানের নিকট একত্ব বলিয়া মনে হইতেছিল তাহা প্রকৃত একত্ব নহে। কিন্তু এই বহুত্বের মধ্যে একত্ব যে কোথায় সহজজ্ঞান তাহা নির্ণয় করিতে অসমর্থ, তাই বিজ্ঞানের বহুত্ব প্রদর্শনকারী এই প্রাথমিক কার্য্য সহজজ্ঞানের নিকট বড়ই অপ্রীতিকর। কিন্তু উচ্চ লক্ষ্য-সাধনের জন্য বিজ্ঞান যাহা ভাঙ্গিয়াছে, বিজ্ঞানই তাহা গড়িবে। বিজ্ঞান এই বাহিরের একত্বকে বিনাশ করে বটে, কিন্তু অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্মদৃষ্টিবলে ইহা এমন এক যোগসূত্র আবিষ্কার করে যাহাতে "সূত্রেমণি গণাইব" সমস্ত বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে। সহজজ্ঞানের চক্ষে বহুত্বপূর্ণ এই দৃষ্ট জগতের একটী কৃত্রিম একত্ব প্রতিফলিত হয়; কিন্তু বিজ্ঞানাবিষ্কৃত এই যোগসূত্রের দ্বারা দৃষ্ট অদৃষ্ট,এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড স্বীয় বহুত্ব রক্ষা করিয়াও এক হইয়া যায়। সুতরাং বিজ্ঞানের প্রথম কার্য্য একত্ব বিরোধী বলিয়া মনে হইলেও একটী মহত্তর একত্বের পথ উন্মুক্ত করাই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানের এই কার্য্য ব্রহ্ম বিজ্ঞানের স্থলেই আপত্তিকর বলিয়া মনে করা হয়, জড়বিজ্ঞানের স্থলে সে সম্বন্ধে কোনও আপত্তিই উত্থাপিত হয় না। শারীর বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত, ছুরিকা হস্তে দেহকে খণ্ড বিখণ্ড করতঃ যখন তাহার বাহ্যিক একত্বকে বিনাশ করিয়া আভ্যন্তরীণ একত্ব নির্ণয় করেন তখন তাহা কাহারও নিকটে আপত্তিজনক বলিয়া মনে হয় না। সহজজ্ঞানের নিকট একটী শব্দ কেমন মধুর, একটী রূপ কেমন সুন্দর। কিন্তু আলোতত্ত্ববিদ্ বা শব্দতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ঐরূপ বা শব্দটীকে বিশ্লেষণ করিয়া তত্তৎ স্থানে আলো বা শব্দের উৎপত্তি বা লয়ের কতকগুলি নিয়ম প্রদান করেন। কিন্তু বাহ্যিক একত্বের অনুরোধে কি মানুষ বিজ্ঞানবিদের মীমাংসাগুলিকে পরিহার করে?

কখনই না। যেহেতু, ঐ বাহ্যিক একত্বের স্থানে বিজ্ঞানবিদ্ যে একত্বের জ্ঞান প্রদান তাহা ঐ বাহ্যিক একত্ব অপেক্ষা লক্ষগুণে অধিক শোভনীয়। আর বিজ্ঞানের কার্য্য আংশিক বলিয়া তাহা কখনও পরিত্যাক্ত হয় না। এ কথা ঠিক, যে সহজজ্ঞানের নিকট যে স্থূল একত্ব ও জগতের সমগ্রত্ব প্রকাশিত হয় এবং বিজ্ঞানের হাতে যাহা বিনষ্ট হয় তাহা কখনও পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় না। বিজ্ঞানের নানা বিভাগের ফল একত্রিত করিলে একটা সমগ্র জগৎ পাই না। তাই বলিয়া কি বিজ্ঞান পরিত্যাগ করিতে হইবে? কখনই নহে। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড গ্রন্থের উপরিভাগটা দেখিয়া সন্তুষ্ট থাকা অপেক্ষা ইহার একটী পৃষ্ঠার তত্ত্ব সবিশেষ অবগত হওয়া কি সহস্র গুণে অধিক বাঞ্ছনীয় নহে? যিনি প্রত্যহ ঐ প্রকাণ্ড মহাভারত গ্রন্থখানিকে নাড়িয়া চাড়িয়া উহার বাহিরটা দেখিয়া অত্যন্ত যত্নের সহিত ফুলচন্দন উপহার দিয়া, তসরের কাপড় দ্বারা বান্ধিয়া রাখেন, কিন্তু উহার মধ্যে কি তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে তাহা জানিবার কোনই আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না, তাহা অপেক্ষা কি যিনি মহাভারতের বাহ্যিক স্থূল একত্বকে বিনাশ করতঃ প্রত্যহ এক এক অধ্যায় পাঠ করিয়া আয়ত্ব করিতে চেষ্টা করেন, তিনি মহাভারতের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করেন না? এই পন্থা অবলম্বনেই, আমরা আশা করিতে পারি যে, একদিন মানবাত্মা সৃষ্টির মধ্যে যে জ্ঞান নিহিত রহিয়াছে তাহার সাক্ষাৎকার লাভ করিবে এবং তখনই প্রকৃত একত্ব আবিষ্কৃত হইবে। এই জন্যই বিজ্ঞান আদরণীয়। বিজ্ঞানের সকল বিভাগেরই কার্য্যপ্রণালী যখন ঐরূপ, তখন স্থূল বাহ্যিক একত্ব বিনাশকারী আপাত বিরক্তিকর ঐ কার্য্য দেখিয়া শুধু কেবল ধর্ম্মবিজ্ঞানকেই কেন পরিহার করিতে হইবে? পরিহার করা কখনও যুক্তিসিদ্ধ নহে। আবার যে বলা হইয়াছে বিজ্ঞান ব্রহ্ম সম্বন্ধে কেবল কতকগুলি অসম্পূর্ণ মীমাংসা মাত্র প্রদান করে, তাহা যথার্থ নহে। কেন না, স্বরূপের দিক হইতে ব্রহ্ম বিন্দুতেও পূর্ণ, সিন্ধুতেও পূর্ণ। সুতরাং তাঁহার স্বরূপ বিষয়ক মীমাংসা আংশিক হইতে পারে না। স্বরূপ সর্ব্বত্রই সমান। আমরা যখন তাহার কোনও স্বরূপের সম্মুখীন হই, তখন পূর্ণ ব্রহ্মেরই সম্মুখীন হই! আর, তাহার স্বরূপগুলি এক অখণ্ড বস্তুর বিভিন্ন দিক্‌মাত্র, খণ্ড পদার্থ নহে—অদ্বয় চিদ্বস্তু। সুতরাং স্বরূপের দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এক অখণ্ডপূর্ণ বস্তুই আমাদের জ্ঞানে প্রকাশিত হন। তবে রূপের দিক্ সম্বন্ধে এ কথা কখনও বলা যায় না। কেন না, রূপ দেশে ও কালে প্রকাশিত; দেশকালে পূর্ণত্ব

ও সমগ্রত্ব (totality) নাই। সুতরাং আমাদের কাছে রূপের পূর্ণ জ্ঞান অসম্ভব। তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। পিন্ সূঁচ হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় জাহাজ বাড়ী পর্য্যন্ত লৌহের দ্বারা কি কি জিনিস প্রস্তুত হয় তাহা না জানিয়াও, "লৌহ জল অপেক্ষা এগারগুণ ভারী" উহার এই আপেক্ষিক গুরুত্ব, উহাকে টানিয়া কত সরু তার করা যায়, উহা দ্বারা কত সূক্ষ্ম পাত প্রস্তুত হয়, এই গুলি জানা থাকিলেই উহা দ্বারা কি কি বস্তু প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা তাহা পূর্ণরূপে জানা হয়। কেন না, রূপ স্বরূপের উপরেই নির্ভর করে। পক্ষান্তরে, সহজজ্ঞান যে প্রকার সমগ্রত্ব দিতে চায় তাহা যে সমগ্রত্ব ও একত্বের ছায়া মাত্র তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাইবে। যাহা হউক, জ্ঞান যে ব্রহ্মজ্ঞান গঠন করিতে প্রয়াসী হয় তাহার একটা কারণ আছে। কারণ এই যে, জ্ঞানপ্রধান জীবন মানবের চিন্তা প্রবাহের অন্যান্য বিভাগের ন্যায় ধর্ম্মও জ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। তাহা না হইলে জ্ঞান (reason) কখনও ধর্ম্ম লইয়া আলোচনা করিতে পারিত না। সুতরাং মানব চিন্তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ধর্ম্ম বিষয়ক আলোচনা হইতে জ্ঞানকে রুদ্ধহস্ত করিলে, জ্ঞানপ্রধান জীবন মানবকে তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকার হইতে বঞ্চিত করে। তাহাতে কুফল ব্যতীত কোনই সুফলের আশা নাই। বিজ্ঞানের সাহায্যে যেমন মানব চিন্তার অন্যান্য বিভাগ পরিপুষ্ট হইয়া বিশেষ ভাবে উন্নত হইতেছে, ধর্ম্ম বিজ্ঞানের সাহায্যে ধর্ম্মেরও সেইরূপ উন্নতি আশা করা যাইতে পারে। অথবা এই কথাই ঠিক যে, ধর্ম্ম বিজ্ঞানের সাহায্য ব্যতীত ধর্ম্ম কখনও প্রকৃত পথে চলিতে পারে না। সুতরাং ধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতি ধর্ম্ম বিজ্ঞানের সাহায্য সাপেক্ষ।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

সমস্যা।

অধুনা সমগ্র ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া যে একটা ব্যস্ততার মহা কোলাহল সমুত্থিত হইয়াছে, তাহার অভ্যন্তরে কি গূঢ় রহস্য প্রচ্ছন্নভাবে নিহিত রহিয়াছে, তাহার মর্ম্মোদ্ভাবনে বাস্তবপক্ষেই ন্যায় দর্শন ইত্যাদি সমস্ত সম্প্রদায় উদাস নীরবতায় নিমজ্জিত রহিয়াছে। পৃথিবীর প্রত্যেক মহাদেশ প্রদেশ হইতে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন নানাবিধ যুক্তিনিষ্পেষিত, কারুখচিত, বৈচিত্র্য-

ময় আবিস্ক্রিয়া লইয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে; আমরা কি শুধু আমাদের অনন্তরন্ধ্রবিশিষ্ট, তৃণাচ্ছাদিত, বংশবিনির্ম্মিত জীর্ণ পর্ণকুটীরের ছিন্নকন্থা বিস্তৃত ও সহস্র প্রকারের আবর্জ্জনা পরিবেষ্টিত অভ্যন্তর হইতে স্বহস্তপুষ্ট নিরীহ সরল সুহৃদের সহিত আপনার ঔদ্ধত্যসমুদ্ভূত দুই চারিটী যৌক্তিকতার খুটিনাটি লইয়া আনন্দিত রহিব? জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাদের কি কিছু বলিবার নাই?

বিমানস্পর্শী গিরিকন্দর হইতে স্রোতস্বিনী ধীর, মন্থর ও বঙ্কিম গতিতে পার্শ্বদেশকে স্নিগ্ধ করিয়া বহুদূরের আকাঙ্ক্ষিত সাগরোদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহার ক্ষীণ জীবনের পথিমধ্যে ক্রমে ক্রমে অনন্ত স্রোতস্বিনী মিলিত হইয়া এক কূলপ্লাবিনী মহাস্রোতে উছলিয়া চলিয়াছে। উভয়কূল হইতে প্রকৃতি তাহার নীলিমাপূর্ণ ঊর্ম্মিমতী তরল উচ্ছ্বসিত বক্ষের উপর আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য বর্ষণ করিতেছে। সহস্র বিপদসঙ্কুল বাধাকে পদদলিত করিয়া সে আপনার হৃদয়ে নবযৌবনের জাগ্রত সংহারিণী উদ্যম লইয়া নাচিয়া ছুটিয়াছে। কে তাহার গতি রোধ করিবে? কে তাহার বিশ্ব-মুখরিত জয়নাদকে বিভীষিকাময় ভয়প্রদর্শনের ভীমভৈরবতায় নীরব করিবে?

বর্ত্তমান ভারতের সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি যে সমস্ত সমস্যার সন্মীমাংসার নিমিত্ত সহস্র ফরাসী-রাষ্ট্র-বিপ্লব সংঘটিত করিয়া আন্দোলিত হইতেছে, তাহার অভ্যন্তরীণ নিষ্ফলতার নিয়ামক হেতুকীই এই প্রবন্ধের আলোচ্য।

আজকাল সংবাদপত্রের স্তম্ভ প্রায়সই নানাবিধ প্রবন্ধে পূর্ণ দৃষ্ট হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, ঈদৃশ প্রবন্ধাবলী হইতে পাঠকসমাজ কিছুই প্রাপ্ত হন না। যাঁহারা আপনার ভিতর আপনাকে দাঁড় করাইয়া আপনার কষ্টকল্পিত যুক্তিপ্রহরণ ধারণ করিয়া কল্পিত তর্ক যুদ্ধ বিজয়ান্তর আপনি উল্লাসে অধীর হইয়া পড়েন তাঁহারাই প্রায়স ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনীতিক দুই চারিটী হেতুবাদ লইয়া প্রবন্ধ রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহারাই বিশেষতঃ এই প্রবন্ধের লক্ষ্যস্থল। বলা বাহুল্য যে, এই সম্প্রদায়ের দার্শনিক মহা-মহোপাধ্যায়গণ হইতেই সর্ব্ববিধ অকল্যাণকর কর্ম্ম অনুদিন সূচিত ও সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে।

স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে বাংলার কর্ম্মস্রোত স্বতন্ত্রভাবে মন্থর গতিতে প্রবাহিত হইতেছিল। তখন দর্শন ও বিজ্ঞান সুচারুরূপে আপনার কার্য্য

নির্ব্বাহিত করিতেছিল। বর্ত্তমান যুগান্তরে সেই স্রোতের মধ্যে এমন এক ভীষণ আবর্ত্ত আবর্ত্তিত হইয়াছে যে তাহার খর উদ্বেলতায় নৈয়ায়িকতা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। সাময়িক উত্তেজনার বশবর্ত্তী প্রগল্‌ভ ব্যক্তি সমূহ আপনার আবেগময় উচ্ছ্বাসে কর্ত্তব্যকে ডুবাইয়া দিতেছে। তদ্ধেতুই, অধুনা দেশব্যাপী একটা সমস্যার কোলাহল সমুত্থিত হইয়াছে। কে জানে, ইহার শেষফল কীদৃশ? দুর্ভাগ্য ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে,বিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও নির্ব্বোধ, বিদ্বান্ ও মূর্খ প্রত্যেকেই এই উত্তেজনায় উত্তেজিত; এই প্রবাহ প্রকম্পনে প্রকম্পিত এবং এই সংশয়ে সংশয়িত। মর্ম্মগ্রাহী সুবিবেচক সম্প্রদায়কে যে ইহা কোন প্রকার অনর্থকর বিভ্রমে পাতিত করিতে পারিবে না, ইহা সত্য বটে, কিন্তু তরলমতি সাধারণের ভাবনা এবং অবধারণাকে ইহা নিতান্তই বিপথচালিত করিতেছে, ইহা নিসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

জাতীয় শক্তির উদ্বোধন লইয়া ভারতের নানা দিগ্দেশ হইতে নানাবিধ উদ্ভাবনা উদ্ভাবিত হইতেছে;প্রত্যেক উদ্ভাবনাই আপনাকে সুন্দররূপে আবশ্যক যুক্তিতে সংরক্ষিত করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেছে। সাধারণের সরল সমালোচনার সন্ধান তাহাদিগের আবরণ ভেদ করিয়া উঠিতেছেনা বলিয়াই আমাদের যত শঙ্কা, যত উদ্বেগ, ও যত নৈরাশ্য। যদিও সাধারণে আপনার যৌক্তিকতা লইয়া পরকীয় ভ্রম নির্দ্দেশান্তর অভিজ্ঞতা বলে আপনার কর্ত্তব্য নির্ব্বাচনে সমর্থ হইত তবে বড় ভাবনা বা শঙ্কার কোন কারণ ছিলনা। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এমন ভাবে একবার সমগ্র ইউরোপ জুড়িয়া এক মহা আন্দোলন হয়। এমনভাবে তদ্দেশীয় জন সাধারণ একবার সহস্র বিভ্রমে পাতিত হইয়াছিল। ফ্রান্স, স্পেন, রুশিয়া, দেনমার্ক ও ইংলণ্ড জুড়িয়া এমন ভাবে তৎকালে একবার ভৈরব কোলাহল উঠিয়াছিল। ফরাসীজাতি আপনার সংশয়ের মধ্যে দৈববাণী শ্রবণ করিয়া আত্মক্ষমতার অনুবলে জাতীয় স্বাধীনতার গৌরবপ্রদ স্বাতন্ত্র্য সংস্থাপিত করিল; আর ইংরাজ এই বিভ্রমের মধ্য দিয়া অনন্তকালের জন্য আপনার অঙ্গে দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপিত করিল। ওয়াটার্লুর ভীষণ যুদ্ধে ইংরাজ আপনার বীরত্বের সহিত বীরেন্দ্রসমাজ ঘৃণিত নারকীয় কাপুরুষতার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত করিয়াছে, যতদিন ইতিহাস থাকিবে, যতদিন জগৎ থাকিবে, যতদিন বীরধর্ম্মের সর্ব্বোজ্জ্বল অমলজ্যোতির স্নিগ্ধ মধুর সৌন্দর্য্য প্রস্ফুট থাকিবে, ততদিন ইংরাজ জাতির নাম ঘৃণিত, ধীকৃত এবং

নিক্ষিপ্ত নিষ্ঠীবন সংপৃক্ত হইয়া রহিবে। কে বলিতে পারে যে আমাদের বর্ত্তমান বিভ্রমের মধ্য দিয়া অনন্তকালের জন্য আমরা ভগবানের পবিত্র ইঙ্গিতবশে আপনার মহতী কল্যাণ প্রাপ্ত হইব না? আর ইহাও বা কে বলিতে পারে যে এই বিভ্রমের মধ্য দিয়াই আমাদের জাতীয় হৃদয়ের উপর বিষম ব্যাসঙ্গময় অকল্যাণ আরোপিত হইবে না? যাহা হউক, কীদৃশ উপায়ে আমরা আমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষিত সাধনার পথে অবিচলিতভাবে নির্ব্বিঘ্ন যাত্রা সমাপ্ত করিতে পারি, ইহাই বর্ত্তমানের আলোচ্য। হয়ত প্রসঙ্গ ক্রমে, ইহার আলোচনার দুই একটী দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণাও হইতে পারে।

এই সমস্যার মৌলিকতা এবং মনুষ্য হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার বিষয়ক আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ মানুষকে ভাগচতুষ্টয়ে বিভক্ত করিয়া লওয়া সুসঙ্গত। যাঁহারা মনুষ্য জাতির আদর্শস্থল, যাঁহারা জাতীয় জীবনের অন্ধকারাবৃত অমানিশার উজ্জ্বল ধ্রুবতারা; এবং যাঁহারা বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞান বলে, অন্ধকারে আলোকজাল বিস্তার করেন, তাঁহাদিগের আলোচনাই সর্ব্বাগ্রে করণীয়। তাঁহাদিগের হৃদয় প্রশান্ত মহাসাগরের মত স্থির, ধীর ও গম্ভীর। তাঁহাদিগের হৃদয়ে সংসারের বা সমাজের বিশৃঙ্খল উদাস প্রবাহ অন্তঃসার শূন্য নিরর্থক প্রবল উচ্ছ্বাসের ঝটিকা তুলিতে সমর্থ হয় না। তাঁহাদিগের হৃদয় কখনও একটু উত্তেজনায় উদ্বেল, কিংবা অকারণ সঞ্জাত ভীতির কল্পনায় সঙ্কুচিত হয় না। তাঁহারা প্রবাহে স্থির; অবধারণে ধীর, এবং অবলম্বনে গম্ভীর। তাঁহারা সহস্র প্রলোভনের মধ্যে রহিয়াও অলুব্ধ এবং সহস্র আকাঙ্ক্ষায় বিজড়িত রহিয়াও বিষয় নিস্পৃহ। তাঁহারা ভোগী হইয়াও যোগী। তাঁহাদিগকে কোন অভিমত সমস্যায় পাতিত করে না। বাগ্মীর চাতুর্য্যময় অশেষবিধ যুক্তি সমন্বিত অভিমত তাঁহাদিগকে অধীর করিয়া তুলিতে সমর্থ হয় না। তাঁহারা স্বীয় প্রতিভাবলে সৎ হইতে অসৎ, ভাল হইতে মন্দ এবং শুভ হইতে অশুভ বাছিয়া লইতে পারেন। সুতরাং তাঁহারা ঈদৃশ কোন সমস্যাতেই ভ্রান্ত হয়েন না। তাঁহারা লোকাভিজ্ঞানের নিকট নির্ব্বোধ এবং অকর্ম্মণ্য প্রতীত হইলেও বাস্তবিকতার পুণ্যমন্দিরে মানবের আন্তরিকতার অর্চ্চনা পাইয়া থাকেন। লোক চক্ষুর অগোচরে তাঁহাদিগের দেবত্ব বিকশিত। তাঁহারাই মানবজাতির অগ্রনায়ক। তাঁহারা মনুষ্যের পদপ্রান্তে রহিয়াও কৌস্তভের শোভা বিকাশ করেন। তাঁহারা সাধু

ও পুণ্যশীল। তাঁহারা মনুষ্যের হৃদয় মন্দিরের উপাস্য দেবতা। তাঁহাদিগের অনুষ্ঠান কল্যাণকর। ফলতঃ তাঁহাদিগের পরিচালনে সাধারণ বিভ্রমোৎপাদিত বিবাদে আপতিত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব।

যাঁহারা এই প্রবন্ধের লক্ষ্যস্থল, তাঁহারা সাধারণতঃ ভাগত্রয়ে বিভক্ত। অতঃপর আমরা একাধিক্রমে প্রত্যেক বিভাগের রীতিনীতি আলোচনা করিব। এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা আত্মগঠিত অভিমতের অনুসারক। আমরা তাঁহাদিগকে উদ্ধতই বলিব। আত্মাভিমান তাঁহাদিগের মনোবৃত্তির বিকাশভূমি ও পরিচালক। তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারের আলোচনাকে আপনার ভ্রান্ত অভিমতের দ্বারা আলোচিত করিয়া এমন একটা অবতারণা করিয়া বসেন যে, যদি নৈয়ায়িকতা সহস্রবারে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের ভ্রান্তি প্রদর্শিত করিয়া দেয় তথাপি তাঁহারা আপনার অন্ধ বিশ্বাসের উপর আপনাকে অবস্থিত রাখিতে প্রয়াস পান। তাঁহারা কোন যুক্তিকে অবলম্বনীয় মানিয়া লইতে একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। সুতরাং তাঁহারা অবিনীত বা উদ্ধত। তাঁহাদিগের ঔদ্ধত্যের পরিণাম ঈদৃশ ভয়াবহ হইয়া দাঁড়ায় যে তাঁহারা অবশেষে আপনার আলোকাকীর্ণ চতুর্দ্দিককে ঘন অন্ধকারের গণ্ডী বলিয়া অনুমান করেন। তখনই তাঁহাদিগের জৈবস্রোতের উপরে সমস্যা আবর্ত্তিত হয়। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস ইহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মন্ত্রিসভার যৌক্তিক নীতিকে পদদলিত করিয়া চার্লস তাঁহার ঔদ্ধত্যের শোচনীয় ও বিস্ময়াবহ পরিণাম দেখিবার জন্য জীবিত ছিলেন। ইংলণ্ডে মার্স্টন মুর নেস্‌বি এবং স্কটলণ্ডে ফিলিপা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভাবিলেন—আপনার দৃঢ়তা সংবলিত ঔদ্ধত্যের অনুসরণই তাদৃশী জয়শ্রী লাভের উপাদান। এবংবিধ ধারণায় তিনি আপনি স্ফীত ও গর্ব্বিত হইতে ছিলেন। কিন্তু ভগবানের রাজ্যে দুর্নীতির জয়লাভ ক্ষণস্থায়ী। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আপনার দুর্ব্বিনীত চরিত্রের লোমহর্ষণ পরিণতির উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত সংস্থাপিত করিবার জন্য আপনার বহুমূল্য জীবনকে উৎসর্গীকৃত করিয়াছিলেন। যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ততদিন ইহা স্বর্ণাক্ষরে মানবচক্ষুর উপরে উদ্ভাসিত রহিবে। যাঁহারা আপনার বিশ্বাস ও ধারণায় আপনি অন্ধ, তাঁহাদিগের পক্ষে চার্লসের দৃষ্টান্ত অবলোকনীয়।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা ঔচিত্যের মৃদুল উপদেশকে উপহাস করেন। তাঁহারা আপনার অভিমত লইয়া আপনি গর্ব্বিত। তাঁহারা

প্রায় সকল বিষয়েই দম্ভের এক বিকট মূর্ত্তি ধারণ করেন। তাঁহারা অন্ধ বিশ্বাস লইয়া আপনি এমন গর্ব্বিত যে পরকীয় সদুপদেশকে পদদলিত করিতে একটুকুও কুণ্ঠা বোধ করেন না। তাঁহাদিগের মনোবৃত্তি সমাজের সহিত অসমঞ্জসীভূত। তাঁহারা আপনার ভ্রান্তিকে লইয়া আপনি উন্মাদ। তাঁহারা ভ্রান্তির সেবক। তাঁহাদিগের চরিত্র ঔদ্ধত্যে চিহ্নিত। তাঁহারাও শেষ জীবনে বিষম সমস্যায় পতিত হইয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলেন। তাঁহারা জগতের একতানের সহিত আপনার কণ্ঠ মিলাইয়া লইতে আপনি অনিচ্ছায় মৃতপ্রায় হয়েন। তাঁহাদিগের পরিণামও যে ভয়াবহ ইহা নিঃসন্দেহ সত্য। ল্যাংসাইডের যুদ্ধে পরাজিতা, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া স্কটরাণী মেরি এলিজাবেথের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া ইংলণ্ডে পলায়ন করিলে, তাঁহার গর্ব্বিত অবিমৃষ্যকারিতার কীদৃশ পরিণতি হইয়াছিল, ইহা ইতিহাস পাঠকের অবিদিত নহে। দিল্লীর অধীশ্বর প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা জয়চন্দ্রের গর্ব্বিত চরিত্রের শোচনীয়তা পৃথ্বীরাজের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, আত্মপ্রকাশ করে। রাজচক্রবর্ত্তিত্বে আপনাকে বরিত করিবার নিমিত্ত রাজা জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজকে হীনতা স্বীকারের জন্য আহ্বান করিয়া, এবং তোরণদ্বারে দ্বাররক্ষকরূপে পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া যেই গর্ব্বের দাম্ভিকতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা রাজকন্যা সংযুক্তার স্বয়ম্বরে চূর্ণীকৃত হইয়াছিল। যাঁহারা ঈদৃশ গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া পরকীয় যৌক্তিক উপদেশকে অবজ্ঞা করিয়া আপনার অযুক্তিক অভিমতকে অবিচলিত ও অসংযত রাখিতে প্রয়াস পান, তাঁহাদিগের গোচরীভূত করিবার জন্য মেরি এবং জয়চন্দ্রের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তই একমাত্র আদর্শ।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহারা সহজ ও সরল বিষয়ের অবধারণেও বিষম সমস্যায় পতিত হয়েন। তাঁহাদিগের হয়ত অসাধারণ প্রতিভা আছে, তাঁহারা হয়ত আপনার প্রতিভাবলে এবং বুদ্ধিবলে আপনাকে সংশয়মুক্ত করিতে সমর্থ। কিন্তু তাঁহারা তৎসাধনে সমর্থ হয়েন না। তাঁহাদিগের এই অসমর্থতার একটা প্রধান অন্তরায় রহিয়াছে। যতদিন না তাহার সংহার হয়, ততদিন তাঁহারা সহস্র কল্পিত ভয়ে আক্রান্ত রহেন। তাঁহারা ভীত। এই অন্তরায়কে আমরা সন্দেহ বলিয়া বলিব। ইহা এক প্রকার আপনাকে অবিশ্বাস। তাঁহাদিগের দৌর্ব্বল্যের মধ্য দিয়া এই অন্তরায় প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়। তাঁহারা কোনমতেই এই অন্তরায়

ভেদ করিতে সমর্থ হয়েন না। দিগন্তের মত একটির পর একটি করিয়া, এই অন্তরায় তাঁহাদিগকে ঘেরিয়া রাখে। ইংলণ্ডের এথেল্‌রেড্‌ ও বাঙ্গালার লক্ষ্মণসেন এই গণ্ডির মধ্যে পড়িয়া আপনার হিতাহিত জ্ঞানকে হারাইয়াছিলেন। কর্ত্তব্যাবধারণের সমস্যায় পড়িয়া এথেলরেড্‌ ডেইনের চরণতলে আপনার নিরীহ ভক্ত প্রজার বুকের শোণিত অঞ্জলি দিয়াছিলেন। এবং এই সমস্যায় পতিত হইয়া লক্ষ্মণসেন অষ্টাদশ অশ্বারোহীর আক্রমণে প্রাণাধিক স্ত্রীপুত্র ও পরিজনকে হোমানলের বিলোল-শিখা-মুখে আহুতি অর্পণ করিয়া পলায়ন করত ভারতীয় রাজন্যবর্গের অক্ষয় বিজয় কীর্ত্তিস্তম্ভে কলঙ্কের রেখাপাত করেন।

অধুনা আমরাও সেই সমস্যায় পতিত হইয়াছি। আমাদিগের চারিদিক হইতে বহু কোলাহল আমাদিগের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আমাদিগের প্রত্যেকের মধ্যে এমন একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে—আমাদের কর্ত্তব্য কি? আমরা অদ্যাপি তাহার অবধারণে সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াছি বলিয়া বোধ হয় না। যদ্যপি আমার ঈদৃশ অনুমান অমূলক হয়, তবে বহু দিবসের সমগ্র ভারতের জাতীয় মহাসম্মিলনী প্রাচীন কংগ্রেসের উপরে এমন একটা প্রচণ্ড আঘাত পড়িবে কেন? আমাদিগের বহুদিবসের কঠোর সাধনার ফল, যাহা আমরা আপনার ঔদ্ধত্য, গর্ব্ব এবং কল্পিত ভয়ের তাড়নায় হারাইলাম, তাহা কি আর কখনও ফিরাইয়া পাইবার আশা করিতে পারি? তদ্ধেতুই বলিতেছিলাম, আমরা ভারতবাসী, বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিভিন্ন সমস্যা লইয়া আপনার গৃহকোণে অবস্থিত আছি। বাহিরের কোন কোলাহল আমাদিগের কর্ণগোচর হইলেই, আমরা লাফাইয়া উঠিয়া তাহার সহিত যোগদান করি। ভালমন্দ, সদসদ, শুভাশুভ চিন্তা না করিয়াই কখন কখন ন্যায়ের প্রতিকূলে এবং অন্যায়ের অনুকূলে আপনাদিগকে ভাসাইয়া দিই। যতদিন না আমরা আমাদিগের এই সমস্যাকে হৃদয় হইতে দূরীভূত করিয়া প্রকৃত মর্ম্মজ্ঞ হইতে পারি, ততদিন আমাদিগের পক্ষে জাতীয় উন্নতির আকাঙ্ক্ষা আকাশ-কুসুম। যাহার জন্য ভারতবর্ষ ব্যাপিয়া একটা তুমুল আন্দোলন উত্থিত হইয়া পৃথিবীকে চমকিত এবং স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছে, তাহা যদি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সমস্যা বিজড়িত অভিমতের অন্ধ সেবায় নিষ্ফলতার আকার ধারণ করে, তবে আর দুঃখের অবধি রহিবে কেন?

শ্রীমতী শচীবালা বিশ্বাস।

তুমি যে দেবতা মোর।

তুমি যে দেবতা মোর।
তোমারই সাথে, জীবন আমার
হ'য়ে আছে আঁখি-লোর!
জীবনের পথে চলিতে চলিতে
দিক্‌গুলি যবে হারাই চকিতে;
পারিনা যখন কিছুই দেখিতে,
তখন যে হাত তোর,
আঁধারের মাঝে, যায় চলে নিয়ে
হাতখানি ধরি' মোর।
তুমি যে দেবতা মোর
তোমারই সাথে, জীবন আমার
হ'য়ে আছে আঁখি-লোর!

তুমি যে দেবতা মোর।
নিরাশ,—তরাস,—বিষাদ-বেদন
ফেলে ঢাকি' যবে ঘোর,—
যখন অতীত লইয়া কুহকে
বিষাদ লহরী তোলে সারাবুকে;
যখন পাইনা ভাবিয়া কাহাকে,
তুমি, নাথ, থাক মোর
সম্মুখে দাঁড়া'য়ে শান্ত করিতে
বাঁধিয়া প্রেমের ডোর।
তুমি যে দেবতা মোর
নিরাশ,—তরাস,—বিষাদ-বেদন
ফেলে ঢাকি' যবে ঘোর।

তুমি যে দেবতা মোর।
জীবনের শত ছাড়াছাড়ি মাঝে
তুমি যে বাঁধন-ডোর।
জগতের দুখে যখন পরাণ
গলি' একেবারে হয় ম্রিয়মাণ,
যখন পারিনা করিতে ধেয়ান
শোভন-চরণ তোর
পলক-শ্রান্তি—অবসাদ মাঝে
যবে ঘুমে রহি' ঘোর।
তুমি যে দেবতা মোর,
জীবনের শত ছাড়াছাড়ি মাঝে
তুমি যে বাঁধন-ডোর!

তুমি যে দেবতা মোর।
সুখ-দুখ গাথা জীবন-যামিনী
তুমি করে দাও ভোর।
আঁধারের মাঝে আলোক ফুটা'য়ে,
জগতের সাথে দৃষ্টি বাঁধিয়ে,
তুমি দাও দেব! প্রফুল্ল করিয়ে
ঐ হৃদয়খানি মোর!
ভক্তি-মলিন করে দেয় ধৌত
আপন আঁখির লোর।
তুমি যে দেবতা মোর,
সুখ-দুখ গাথা, জীবন-যামিনী
তুমি করে দাও ভোর!

তুমি যে দেবতা মোর।
যখন পারি না, কিছুই জানিতে
কে আপন কেবা তোর।
বিভীষিকা মাঝে শত ছলনায়
যখন হারাই আপনা আমার

পাই খুঁজি কা'র দয়ায় অপার
ভগন আমারে মোর ?
রহি উৰ্দ্ধমুখে, চেয়ে শূন্য বুকে ;—
কে তুমি পরাণ মোর ?—
তুমি যে দেবতা মোর,
যখন পারি না, কিছুই জানিতে
কে আপন কেবা তোর ?

তুমি যে দেবতা মোর।
সংসারের যবে ঝটিকা-তুফান
ঘেরিবে আমারে ঘোর ;
আঁধারের মাঝে পড়িয়ে একেলা
তরঙ্গ-আঘাতে যা'বে ভেঙ্গে খেলা,
দৈন্য-ভীতি-শঙ্কা বসাইবে মেলা
জীবনের 'পরে মোর ;
আমি-হারা মোরে নিও তুলে, নাথ,
কৃপার হস্তে তোর।
তুমি যে দেবতা মোর
সংসারের যবে ঝটিকা-তুফান
ঘেরিবে আমারে ঘোর !

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

চক্র-মাহাত্ম্য।

চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যো ন সেব্যঃ কেবলং নৃপঃ,
অহো চক্রস্য মাহাত্ম্যাৎ ভগবান্ ভূততাং গতঃ ॥

'ভগবান্ পণ্ডিত' নামা জনৈক ব্রাহ্মণ কোন এক নরপতির রাজসভাসদ ছিলেন। তিনি, স্বীয় বিদ্যাবলে, ও বুদ্ধি-কৌশলে, অতি অল্পকাল-মধ্যেই সেই অধীশ্বরের নিরতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভগবান পণ্ডিতের বহুবিধ সদগুণে একান্ত বিমুগ্ধ হইয়া, নরপতি তাঁহাকে স্বীয় রাজকার্য্যের বিশেষ বিশেষ ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ভগবান পণ্ডিতকে এক দণ্ড কাল দেখিতে না পাইলে, রাজ্যাধিপতি একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। ভগবানের সহিত পরামর্শ বা যুক্তি না করিয়া, রাজা কোন কার্য্যই করিতেন না। বাস্তবিক, বলিতে কি, ভগবান পণ্ডিত অতি অল্পকাল মধ্যেই রাজার এতাদৃশ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন যে, ভগবান যাহা বলিতেন, তাহার শুভাশুভ বিচার না করিয়াই, রাজা তৎক্ষণাৎ সে কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। নরপতির উপর ভগবান্ পণ্ডিতের এবম্প্রকার প্রভাব পরিদৃষ্টে রাজ অমাত্যাদি প্রধান প্রধান সভাসদবর্গ, 'ভগবানের' উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া, তাহার প্রতি যথেষ্ট হিংসা করিতে আরম্ভ করিল ; এবং কি উপায়ে ভগবান্‌কে রাজপুরী হইতে দূরীকৃত করিবে, সকলে সমবেত হইয়া, দিবানিশা সে বিষয়ের পরামর্শ

করিতে লাগিল। মন্ত্রণা স্থির হইলে, তাহারা সকলেই একত্র সম্মিলিত হইয়া, রাজ ভবনের সিংহদ্বার রক্ষককে নিষেধ করিয়া দিল যে, সে ব্যক্তি যেন ভগবান পণ্ডিতকে, কোন ক্রমেই আর রাজপুরোমধ্যে প্রবেশ করিতে না দেয়। রাজা স্বয়ং এইরূপ আদেশ দিয়াছেন, ইহার অন্যথা হইলে দ্বার রক্ষক রাজ-দণ্ডে বিশেষভাবে দণ্ডিত হইবে। ভগবান্ পণ্ডিতকে যেন কোন সূত্রেই রাজপুরে আসিতে দেওয়া না হয়। তোরণ-দ্বার রক্ষক রাজাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, ভগবান্ পণ্ডিতকে আর রাজ সভায় প্রবেশ করিতে দিলনা। এইরূপে দুই এক দিবস অতিবাহিত হইলে পর, ভগবান্ পণ্ডিতের অদর্শনে রাজা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-চিত্ত হইলেন এবং সভাসদ্বর্গকে ভগবান্ পণ্ডিতের রাজ সভায় অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সভাসদেরা সকলেই একবাক্যে উত্তর প্রদান করিল যে,—"মহারাজ, আমরা সকলেই অত্যন্ত শোক-সন্তপ্ত-চিত্তে নিবেদন করিতেছি যে, ভগবান্ পণ্ডিত সম্প্রতি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে আমরা সকলেই একান্ত মর্ম্মাহত ও যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়াছি। তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ ও বিদ্যা বুদ্ধি সম্পন্ন সভাসদের অকাল মৃত্যুতে রাজসভা যেন অঙ্গহীনা হইয়াছে এইরূপ জ্ঞান করিতেছি।" রাজার সর্ব্বপ্রধান বৈদ্যও, সভাসদগণের এই অলীক বাক্যের অনুমোদন করিয়া, কৃত্রিম শোক প্রকাশ করিলেন। ভগবান্ পণ্ডিত ইহ-জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন বুঝিয়া, রাজা অত্যন্ত শোক ও কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে পর, এক দিবস নরপতি নগর পরিভ্রমণার্থ রাজ-প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়াছেন, এমন সময় ভগবান্ পণ্ডিত, রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আত্ম-কাহিনী প্রকাশ করিবার অভিপ্রায়ে রাজ-সমীপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; কিন্তু অতিরিক্ত জনতা ও রাজার বহুসংখ্যক অনুচর ভেদ করিয়া রাজ-সমীপবর্ত্তী হইতে একান্ত অসমর্থ হইলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া অগত্যা তিনি একটী সু-উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক, রাজার আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্ষণ পরে রাজা, সেই বৃক্ষটীর সমীপবর্ত্তী হইলে, সেই সময়ে, ভগবান্ পণ্ডিত অতি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতঃ রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—"মহারাজ! অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি করুন। আমি আপনার সেই ভগবান। আমি আপনার সেবক ভগবান।" ভগবান

পণ্ডিতের এই কৌশল পরিদৃষ্টে, রাজার প্রধান প্রধান সভাসদেরা ভীত হইয়া উঠিল। মনে করিল, যদি এই সুযোগে ভগবান সকল কথা রাজার কর্ণগোচর করে, তাহা হইলে মহা অনিষ্ট সংঘটিত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব এই মুহূর্ত্তেই ইহার প্রতিকার একান্ত আবশ্যক। এইরূপ জ্ঞান করিয়া, প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ চিৎকার করিয়া উঠিল এবং রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিল—"মহারাজ! ঐ দেখুন, সম্মুখবর্ত্তী ঐ প্রকাণ্ড পুন্নাগ পুষ্প বৃক্ষের উচ্চ শাখায় দেখুন, ভগবান পণ্ডিত স্বীয় কর্ম্মফলে ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। ঐ দেখুন ঐ উচ্চ শাখাটীকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। আর ওদিকে অগ্রসর হওয়া বিধেয় নহে। এক্ষণে—এই সন্ধ্যার প্রাক্কালে—উহা হইতে কোন না কোনরূপ বিপদ ঘটিতে পারে; অতএব অবিলম্বে অন্য পথে গমন করুন।" অমাত্যগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া নরনায়ক অধীশ্বর ভয়বিহ্বল হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ সে পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পথান্তরে গমন করিলেন। হতভাগ্য ভগবানের উদ্দেশ্য বিফল হইয়া গেল। নিরাশার বিষম বেদনায় তাঁহার হৃদয় বিকল হইয়া উঠিল। এই অচিন্ত্যনীয় ঘটনা পরিদৃষ্টে, ভগবান পণ্ডিত অত্যন্ত আক্ষেপ করতঃ, উপরোক্ত শ্লোকটী বলিয়াছিলেন। উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, রাজার সেবা করা যেরূপ কর্ত্তব্য, চক্রেরও তদ্রূপ সেবা করা কর্ত্তব্য। চক্র সেবা না করিয়া, কেবল মাত্র নৃপতিসেবা করিলে কোনই ফলোদয় হয় না। অহো! এই চক্রের মাহাত্ম্যে ভগবানকেও আজি ভূত হইতে হইল।

আমাদের দেশে "দশচক্রে ভগবান্ ভূত" কথাটি যে আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে শুনা যায়, এই ঘটনাটীই তাহার মূল।

গল্পটী "ফুলরাণী"কে উপহার দিলাম।

শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ঘোষ।

রত্নমালা।

(১০৭)

যস্যার্থাস্তস্য মিত্রাণি যস্যার্থাস্তস্য বান্ধবাঃ।
যস্যার্থাঃ স পুমাঁল্লোকে যস্যার্থাঃ স হি পণ্ডিতঃ॥

ভাবার্থ—ধন আছে যা'র,
সবে মিত্র তা'র;
বান্ধব তাহার হয় সর্ব্বজন।

আছে যা'র ধন,
সমাজে সে জন,
পুরুষ বলিয়া সদা গণ্য হন ॥
আছে ধন যা'র,
এ ধরা-মাঝার,
পণ্ডিত বলিয়া তিনি খ্যাতি পান।
ধনের প্রভাবে,
সর্ব্ব সিদ্ধ ভবে,
ধন-বলে সবে হয় বলবান ॥

(১০৮)

সহ্যং তেজীয়সস্তেজস্তেন তেজীয়সো ন হি।
মূর্দ্ধি সহ্যংরবেস্তেজো ন পদ্ভ্যাং তাপিতং রজঃ ॥

ভাবার্থ—স্বীয় তেজে তেজোময় হয় যেই জন।
তা'র তেজ সহ্য নহে কঠিন তেমন ॥
পরঃ তেজে তেজঃবান যেই জন হয়।
তা'র তেজঃ সহ্য করা কঠিন নিশ্চয় ॥
তীব্র রবি-তেজ, শিরে সহ্য করা যায়।
রবিতেজে তপ্ত বালু নাহি সহে পায় ॥

(১০৯)

ঈর্ষী ঘৃণীত্বসন্তুষ্টঃ ক্রোধনো নিত্য শঙ্কিতঃ।
পরভাগ্যোপজীবী চ ষড়েতে দুঃখ ভাগিনঃ ॥

ভাবার্থ—ঈর্ষী ঘৃণী অসন্তুষ্ট, ক্রোধন শঙ্কিত নিত্য,
পরভাগ্য উপজীবী এই ছয় জন।
অতিশয় দুঃখ ভাগী, হয় ভবে নিরন্তর
মিথ্যা নহে কভু—ইহা শাস্ত্রের বচন ॥

(১১০)

সন্তোষম্পরমাবস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখ মূলং বিপর্য্যয় ॥

ভাবার্থ—সুখার্থী যে জন, হইবে সংযত,
লাভ করি' পরম সন্তোষ।

যেহেতু,—সন্তোষ সর্ব্ব-সুখ-মূল ;—
দুঃখ-মূল হয় অসন্তোষ ॥

(১১১)

সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে এব মধুরে ফলে।
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সঙ্গমশ্চাপি সজ্জনৈঃ ॥

ভাবার্থ—এ সংসার বিষবৃক্ষে আছে দু'টী সুধাময় ফল।
কাব্যসুধারসাস্বাদ, আর সাধুসঙ্গই কেবল ॥

(১১২)

বিস্ময়ঃ সর্ব্বথাহেয়ঃ প্রত্যূহঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
তস্মাদ্বিস্ময়মুৎসৃজ্য সাধ্যে সিদ্ধির্বিধীয়তাম্ ॥

ভাবার্থ—দেখা যায় পূর্ব্বাপর, মনের বিস্ময়।
নিখিল কার্য্যের বিঘ্নস্বরূপ নিশ্চয় ॥
বিস্ময়ে সর্ব্বথা ত্যাগ করি জ্ঞানবান।
করিবেক সাধ্যকর্ম্মে সিদ্ধির বিধান ॥

(১১৩)

এক ভূরু ভয়োরেক দলয়োরেক কাণ্ডয়োঃ।
শালিশ্যামা কয়োর্ভেদঃ ফলেন পরিচীয়তে ॥

ভাবার্থ—এক ক্ষেত্রে শালি শ্যামা জন্মে দুই ধান।
উভয়ের দলকাণ্ড সকলি সমান ॥
প্রভেদ দোঁহের কিছু নাহি দেখা যায়।
ফলেতেই উভয়ের প্রভেদ জানায় ॥

(১১৪)

অস্তি পুত্রো বশে যস্য ভৃত্যো ভার্য্যা তথৈব চ।
অভাবে যস্য সন্তোষঃ স্বর্গস্থোঽসৌ মহীতলে ॥

ভাবার্থ—বশীভূত সুত যা'র, অনুগত ভৃত্য দার,
অভাবেও সন্তোষ যাঁহার।
সেই ভাগ্যবান জন, সদা সুখভাগী হন ;
মিলে বিশ্বে স্বর্গ-সুখ তাঁর ॥

(১১৫)

নিজ প্রয়োজনোদ্দেশাদর্চ্চয়ন্তি ন ভক্তি তঃ।
দুগ্ধদাত্রীতি গৌর্গেহে পোষ্যতেহন্যথা ন তু॥

ভাবার্থ—সকলেই এ সংসারে, অন্যের অর্চ্চনা করে;
স্বার্থসিদ্ধি লক্ষ্যই তাহার।
ভক্তি হেতু নাহি করে; দেখা যায় পূর্ব্বাপরে
ইষ্টলাভ উদ্দেশ্য পূজার॥
দুগ্ধ দেয়—তার তরে, লোকে গোপালন করে,
গোধনের হিত হেতু নয়।
দুগ্ধ যদি নাহি দিত, গো রক্ষণ কে করিত?
স্বার্থপূর্ণ এ বিশ্ব নিলয়॥

(১১৬)

অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা চ পৃষ্ঠকে।
স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংসে চ মূর্খতা॥

ভাবার্থ—অপমানে অগ্রে করি', মানটীকে পশ্চাতে করিয়া।
উদ্ধারিবে বিজ্ঞজনে নিজ কার্য্য—সতর্ক হইয়া॥
যেহেতু, কার্য্যের ধ্বংসে মূর্খতার সুপ্রকাশ হয়।
যত্ন দ্বারা কৃতকার্য্য ব্যর্থ হ'লে ক্ষোভ নাহি রয়॥

(১১৭)

অহিংসা পরমোধর্ম্ম ইত্যেবং পরমা মতিঃ।
অহিংসা পরমংদানমিত্যেব কবয়ো বিদুঃ॥

ভাবার্থ—বিজ্ঞজনে কয়, "অহিংসা"ই হয়,
শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—ধরায় নিশ্চয়।
শাস্ত্রের বিধান, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দান
অহিংসাই—মিথ্যা কথা নয়॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ, বিদ্যাবিনোদ

সুকথা।

১। সুমধুরবচন সংযুক্ত দান, গর্ব্ববিরহিত জ্ঞান, ক্ষমাগুণ সমন্বিত শৌর্য্য এবং দানগুণান্বিত বিত্ত,এই চারিটী শুভ লক্ষণ,এবং জগতে অতি দুর্লভ।

২। দরিদ্র ব্যক্তির দান, প্রভুর প্রশান্ত ভাব, যুবার তপশ্চরণ, জ্ঞানী ব্যক্তির মৌনভাব, সুখীর ইচ্ছা নিবৃত্তি এবং সর্ব্বজীবে দয়া, এই কয়েকটী গুণ মনুষ্যকে স্বর্গগামী করিয়া থাকে।

৩। মূর্খব্রাহ্মণ, বৃদ্ধকামাতুর, অর্থহীন গৃহী, ধনবান তপস্বী, কুরূপা গণিকা, এবং বিধর্ম্মী রাজা, এই ছয়টী জীবলোকে বিড়ম্বনা মাত্র।

৪। যাহাদিগের প্রচুর অর্থ আছে কিন্তু গর্ব্ব বা অভিমান নাই, যাহারা যুবা হইয়াও চঞ্চল নহে, এবং প্রভুত্ব থাকিতেও যাহারা সর্ব্বদা অপ্রমত্ত ও সর্ব্বদা নম্রভাবে থাকে, তাহারাই মহামহিমবান্।

৫। এ জগতে শরীরধারিগণের শরীরের পূজা হয় না। অবস্থারই পূজা হইয়া থাকে। মনুষ্য যখন যে অবস্থায় থাকে, তখন সেইরূপ অবস্থানুযায়ী সম্মান বা পূজা প্রাপ্ত হয়।

৬। সুন্দর ও উপাদেয় ফলপুষ্পপূর্ণ রম্য কাননে শূকরসমূহ যেমন কেবলমাত্র পুরিষের অনুসন্ধান করে, সেই রূপ, খলগণ গুণপূর্ণ বস্তুতেও দোষের অন্বেষণ করিয়া থাকে।

৭। জ্ঞাতিগণ বিদ্যাধন ভাগ করিয়া লইতে সমর্থ হয় না; তস্করগণও উহা হরণ করিতে পারে না; দান করিলেও বিদ্যাধনের ক্ষয় হয় না। অতএব বিদ্যাধনই মহাধন।

৮। বর্ষারম্ভে মধুরকণ্ঠ কোকিলগণ যে নীরবে বাস করে, তাহা ন্যায়-সঙ্গত। কেননা, যেখানে ভেক বক্তা, সেস্থলে কোকিলের মৌনাবলম্বনই শোভা পায়।

৯। ফলিত বৃক্ষ ও গুণবান ব্যক্তিই নম্র হয়। কিন্তু শুষ্ক কাষ্ঠ ও মূর্খ ব্যক্তি ভগ্ন হইবে, তথাপি নম্রতা ধারণ করিবে না।

১০। বিদ্যা উপার্জ্জনে যে কিরূপ গুরুতর পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা

কেবলমাত্র বিদ্বানই অবগত আছেন, মূর্খ তাহা জানিতে পারে না। যেমন, বন্ধ্যানারী প্রসব বেদনা বুঝিতে পারে না।

১১। বিদ্যা, তপঃ, দান, বিনয়, সৌজন্য, সুপুত্র, যশঃ, জলাশয়খনন, দেবতাপ্রতিষ্ঠা—এই সকলের দ্বারা পুণ্য লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

১২। ফল ফুরাইয়া গেলেই পক্ষীগণ বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া থাকে; সলিল শুষ্ক হইলেই জলচর পক্ষীরা সরোবর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র উড়িয়া যায়; মধু ফুরাইলেই মধুকরেরা পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যায়; বন, দাবাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া গেলে, মৃগাদি পশুগণ তথা হইতে অন্য বনে চলিয়া যায়; ধনহীন হইলেই সে পুরুষকে বন্ধুগণ পরিত্যাগ করে; রাজ্যভ্রষ্ট হইলেই সে রাজাকে অমাত্যগণ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। দেখা যায়—এ সংসারে স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্তই একে অন্যের মিত্র হইয়া থাকে। স্বার্থ ফুরাইলে কে কাহার বন্ধু বা প্রিয় হয়?

শ্রীমতী উৎপলিনী সিংহ।
(কোন্নগর)

গঙ্গারাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শ্যামার পলায়নের বৃত্তান্তটা একদিনেই গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। রুদ্রনারায়ণও ইহা শুনিলেন, শুনিয়া একটু উদ্বিগ্ন হইলেন। তখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে। তিনি রাধানাথকে ডাকিয়া আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। লোক ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, রাধানাথ বাড়ীতে নাই, তিনিও অশ্বারোহণে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। তখন মঞ্জরীর ডাক পড়িল; কিন্তু মঞ্জরীও নাই। রুদ্রনারায়ণ তখন রাধানাথ ও মঞ্জরী উভয়ের উপরই খড়্গহস্ত হইলেন।

কিন্তু মঞ্জরীর উপর রাগিলেও তিনি তাহার কিছু করিতে পারিলেন না। হাতের নিকট পাইলেও যাহা হয় একটা করিতেন, কিন্তু সে তখন হাতের বাহিরে। সুতরাং তাঁহার সমস্ত রাগটা রাধানাথের উপরই পড়িল। তিনি বুঝিলেন, রাধানাথই শ্যামাকে লইয়া পলাইয়াছে। তখন রুদ্রনারায়ণ জনৈক কর্ম্মচারীকে ডাকাইয়া বজরা প্রস্তুত করিতে এবং প্রভাতেই রাধানাথের

প্তাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইতে আদেশ দিলেন। কর্ম্মচারী সবিনয়ে জানাইল—"শুনিতেছি কলিকাতা হইতে তিন হাজার ইংরাজ সৈন্য রওনা হইতেছে।"

রুদ্রনারায়ণ উগ্রস্বরে বলিলেন,—"সেকথা পরে শুনিব, আগে আমার আদেশ প্রতিপালন কর।"

কর্ম্মচারী আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না, সে প্রভুর আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল।

অবিলম্বে বজরা প্রস্তুত হইল। রুদ্রনারায়ণ সন্ধ্যার পর বজরায় উঠিয়া বজরা ছাড়িতে আদেশ করিলেন। বজরা দক্ষিণ মুখে ছুটিল।

আমার অপরাধ কি প্রভু! কি দোষে আমায় ত্যাগ করিলে? আমি তোমায় ভালবাসিনা—ভালবাসা কাহাকে বলে তা' যে আমি জানি না। আমায় শিখাইয়া দেও, কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, কেমন করিয়া ভালবাসিলে তুমি তৃপ্ত হও। আমি জ্ঞানহীনা রমণী, তুমি না শিখাইলে কে আর আমায় শিখাইবে দেবতা? আমায় শিখাও, কেমন করিয়া দেবতাকে ভাল বাসিতে হয়, কেমন করিয়া দেবতার পূজা করিতে হয়, কেমন করিয়া দেবতার পায় আত্মবলি দিতে হয়। আমি তো তোমায় আমার করিতে চাই না, আমি তো তোমার ভালবাসা চাই না; আমি চাই তোমার পূজা করিতে, তোমার চরণে আমার সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিতে। তবে কেন আমায় নিদয় হও প্রভু! আমি যে তোমার চরণাশ্রিতা দাসী, আমায় ছাড়িয়া যাইও না; একবার এস—এস আমার দেবতা, এস আমার আরাধ্য, এস আমার ধ্যানের ধন; বুঝাইয়া দেও তোমাকে কি দিয়া পূজা করিলে তুমি আমার পূজা গ্রহণ করিবে। আমায় ফেলিয়া যাইও না; তুমি ত্যাগ করিলে আমি আর কাহার কাছে দাঁড়াইব? আমার আর কে আছে? এস এস প্রভু, এস গুরু, এস শিক্ষাদাতা, শিখাও আমাকে, কি করিলে দাসী তোমার দাসী হইতে পারিবে।

কিন্তু রুক্মিণীর এ আকুল প্রার্থনা কে শুনিবে? যে শুনিবে সে তখন বহুদূরে। কিন্তু রুক্মিণীর সে জ্ঞান ছিল না। সে তখন তাহাকে আপনার মানসনয়ন সমক্ষে রাখিয়া তাহার চরণে হৃদয়ের আকুল আহ্বান ঢালিয়া দিতেছিল। গম্ভীরা প্রকৃতি স্থিরভাবে বসিয়া তাহার ক্ষীণ কণ্ঠের এই কাতর আহ্বান শুনিতেছিল।

অনেক কাঁদিয়া অনেক ডাকিয়াও রুক্মিণী যখন দেবতার নিকট একটীও উত্তর পাইল না, তখন সে ভাবিল, মরি না কেন,—দেবতার প্রীতির জন্য দেবতার সম্মুখে আপনাকে বলি দিই না কেন? সহসা রুক্মিণীর চমক্ হইল। চাহিয়া দেখিল, দেবতা কোথায়—কত দূরে? রুক্মিণীর আর মরা হইল না। কিন্তু না মরিয়া সে কি করিবে? কাহার মুখ চাহিয়া কি জন্য সে সংসারে থাকিবে? মৃত্যুই তো এখন তাহার একমাত্র আশ্রয়, শান্তিস্থল।

কিন্তু রুক্মিণী ভাবিল, না এখন মরিব না। যাহার জন্য তিনি আমাকে শত্রু স্থির করিয়াছেন, আগে সেই শ্যামাকে খুঁজিয়া বাহির করিব। তারপর তাহাকে তাঁহার হাতে দিয়া বলিব, আমি ভালবাসিতে জানি না, তাই তোমাকে ভালবাসিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারি না; কিন্তু তাই বলিয়া আমি তোমার শত্রু নই, আমি তোমার সুখের পরিপন্থী নই। তোমার সুখের জন্য, তোমার তৃপ্তির জন্য আমি সব করিতে পারি। এই দেখ তোমার জন্য আজি আমি—

"রি—রি—রি—রি" রজনীর গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিকট শব্দ উঠিল; "রি—রি—রি—রি"। চমকিত হইয়া শ্যামা উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার—আবার নৈশগগন প্রকম্পিত করিয়া সেই ভীষণ শব্দ উত্থিত হইল। রুক্মিণী ছুটিয়া গবাক্ষের নিকটে গেল। দেখিল বাহিরে কতকগুলা মশাল জ্বলিতেছে। তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কতকগুলা বিকটাকার লোক ভীষণ চীৎকার করিতেছে। রুক্মিণী বুঝিল বাড়ীতে ডাকাত পড়িয়াছে। সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল।

তারপর লাঠীর ঠক্ঠকি, অস্ত্রের ঝন্ঝনা, লোকজনের চীৎকার, সকল মিলিয়া এক তুমুল শব্দ উৎপন্ন করিল। রুক্মিণী বুঝিল, শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে, ডাকাতেরা বাটীতে প্রবেশ করিয়াছে। সে তখন আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, আত্মরক্ষার জন্য যত না হউক, ধর্ম্ম রক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সে ছুটিয়া ঘরের বাহিরে আসিল। দেখিল, একদল ডাকাত সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিতেছে। নীচে যাইবার জন্য আর একটা গুপ্ত সিঁড়ি ছিল, রুক্মিণী সেই সিঁড় বহিয়া একবারে বাটীর পশ্চাদ্দ্বারে উপস্থিত হইল, এবং ত্রস্তভাবে দ্বার খুলিয়া বাটীর বাহির হইল। সেখানেও একজন ডাকাত মশাল জ্বালাইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু রুক্মিণী তাহাকে লক্ষ্য না করিয়াই উর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিল। যে ডাকাত দাঁড়াইয়াছিল সে ইহা দেখিল, দেখিয়া সেও রুক্মিণীর পশ্চাৎ ছুটিল। * ক্রমশঃ।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

* স্থানাভাবে এবারে গল্পটীর এক পরিচ্ছেদ মাত্র দেওয়া হইল। সহঃ-সং।

সখী-রূপ।

তুমি কি হে রাজ, আসিয়াছ আজ
সখীর বেশে ?
এরূপ তোমারি লব কিবা বরি'
মরম-দেশে !
আমার সকল হৃদয় হরিতে,
আমারে তোমার আপনা করিতে,
শূন্য জীবনে আমরা ভরিতে
মধুর হেসে—
তুমি কিগো হরি, সখী-বেশ ধরি'
দাঁড়ালে এসে !

তব আঁখি-দুটি কি মদিরা লুটি'
আবেশ ভরা !
তব হাসি মাঝে কি জানি কি রাজে
মানস হরা !
প্রতি কথা তব আজি কোথাকার
না বুঝিগো আসে কিবা সমাচার
দগ্ধ পরাণ নিমেষ মাঝার
শীতল করা !
তব পায় পায় বাজিছে কি হায়
সপ্তস্বরা !

চির-সুন্দর দেবতা হে মোর !
হে মোর সখি !
বাহিরের কোন হীন-আভরণ
লওনি দেখি !
তোমার মুক্ত সুষমা অপার
গায় জয়-গীতি তব মহিমার,
পূর্ণ চাঁদিমা কনকের হার
কভু মাগে কি ?—
সহজ সরল তুমি সুবিমল
সবে উপেখি' !

মরমের কোণে নীরবে গোপনে
যে ভাবরাশি
রহিত ঘুমায়ে ধূলায় লুটায়ে
দিবস-নিশি !
নূতন জীবন দান করি সবে
জাগাইয়ে প্রভু ! দিলে তুমি কবে,
তা'দেরে কি বুকে তুমি তুলে লবে
ভালবাসি !
ওগো গুরু মোর, ওগো মন-চোর,
ওগো রূপাস !

মোর মন মাঝ যতটুকু আজ
শূন্য পড়ে'—
পদ-রেণু দানি' দিবে কি তা' রাণি,
পূর্ণ করে' !
কাঁদিয়া বেড়ায় মোর যে সকল
সাধ-আশা-তৃষা বিফলে কেবল,
তুমি কি তা'দের লবে আজি বল,
তোমারি তরে !—
তব সুখে দুখে মিশাতে কৌতুকে
আবেগ ভরে !

সকল সাধনা সকল কামনা
আমার আজ
করিতে সফল তুমি কি কেবল
এসেছ রাজ !
লও, লও তবে, লওগো আমায়
অর্ঘ্য করিয়া তোমারি পূজায়;
ভকত সেবক তব করুণায়
বিশ্ব-মাঝ
ধন্য হইবে তোমারি গৌরবে
সখীলো আজ !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

স্বদেশী স্বর্ণকারের কারখানা।

বর্ত্তমান ভারতবাসীর পূর্ব্বপুরুষদিগের জ্ঞানবিষয়ণী কথা বলিতে গেলে বলিবার অনেক আছে; কিন্তু সেই ঋষিকল্প পূর্ব্বপুরুষগণের অলৌকিক কার্য্যকলাপ বর্ণনা করিতে গিয়া যদি আমরা—অধম সন্তানগণ, কেবল আত্মাভিমানে স্ফীত হইয়া সুখলব্ধ স্বপ্নে বিভোর হইয়া থাকি, আমরা কত ক্ষুদ্র, আমাদের শক্তিই বা কতটুকু, তদ্বিষয়ে বিবেচনাবিহীন হইয়া কেবল ঋষিগণের শক্তিপ্রভাবের প্রশংসার ছলে আত্মপ্রশংসায় নিরত থাকি তাহাতে আমাদের উপকার অপেক্ষা অপকারের সম্ভাবনাই অধিকতর; উহাতে আমরা নিজের অসামর্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকিয়া উন্নতিকল্পে চেষ্টাবিহীন হওয়ায় আত্মোন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলি। তবে যদি সেই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া দিন দিন উন্নতির পথে, জ্ঞানের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে পারি, আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণের অঙ্কিত পথ বলিয়া যদি কর্ত্তব্য বুদ্ধি আমাদিগকে সেই পথে পরিচালিত করে, তবে তাহাতে আমাদের সমধিক উপকারের সম্ভাবনা। সেই আশা বুকে ধারণ করিয়া আজ একটী অতীতের কথা বর্ণনা করিতে অভিলাষ করিয়াছি।

বৎসায়ন বিরচিত কামসূত্র নামক গ্রন্থে যে চৌষট্টিবিধ কলার (Art and Science) বর্ণনা আছে তাহাতেই সকলে অনুমান করিতে পারেন, হিন্দুগণ কত বিবিধ বিষয়ে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থে ধাতুবাদ (chemistry and metallurgy) নামে যে বিষয়ের আলোচনা আছে তাহারই কিয়দংশ বর্ণনা করিয়া হিন্দুগণের রসায়ন শাস্ত্রাভিজ্ঞতা সাধারণের জ্ঞানগোচর করিতে চেষ্টা করিব।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের সুযোগ্য অধ্যাপক খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় "হিন্দুরসায়ন" (Hindu Chemistry)নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন,তাহাতে আমাদের দেশীয় স্বর্ণকারগণ কি উপায়ে অলঙ্কারাদি রঙ্ করিয়া থাকে ও সেই সকল প্রণালীর আধুনিক ব্যাখ্যাই বা কিরূপ ইত্যাদি বিষয়ের যে বর্ণনা আছে প্রধানতঃ তদবলম্বনেই বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত।

উল্লিখিত বিষয়টীকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বুঝিতে হইবে।

প্রথমতঃ—স্বর্ণকারগণ কি কি উপায়ে অলঙ্কারে রং ফলাইয়া থাকে এবং তাহাতে কি কি ভাবে অলঙ্কারের সোণা অব্যবহার্য্যরূপে নষ্ট হইয়া যায়।

দ্বিতীয়তঃ—কি কি উপায়ে ঐ নষ্ট সোণার পুনরুদ্ধার সাধিত হইতে পারে।

স্বর্ণকারগণ গহনা প্রস্তুত করণের প্রথম হইতে রংফলান শেষ করা পর্য্যন্ত যে সমস্ত প্রক্রিয়ায় সোণা নষ্ট করিয়া থাকে তাহা আবার প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা ;—

(ক) অলঙ্কারে "পা'ন" দিবার সময় বিস্তর সোণা অপচয় হয়।

(খ) উখা (file) দিয়া ঘসিয়া পালিস করিতে ও অন্যান্য খোদাই অস্ত্র দ্বারা অলঙ্কারের উপর লতাপাতা প্রভৃতি খোদিত করিতে অনেক সোণা অনর্থক নষ্ট হইয়া যায়।

(গ) রংফলানের প্রক্রিয়া গুলিতে রাসায়নিক উপায়ে অনেক সোণা নষ্ট হয়।

উপরোক্ত বিষয় তিনটী একে একে বুঝিতে চেষ্টা পাইব।

(ক) পা'ন দেওয়া।—সোণা গলাইয়া পিটিয়া পাত করিয়া পরে ঐ পাতকে আবশ্যক মত কোনও আকার দিয়া তাহার উপর কাজ করিতে হয়। এইরূপ দুই বা ততোধিক পাতকে জোড়া লাগাইতে হইলে ঐ জোড়ের মুখে সোণা গালিয়া দিতে হয়; ইহাকেই পা'ন দেওয়া বলে। এই পান দেওয়া কালে স্বর্ণকারগণ অনেক অসততার পরিচয় দিয়া থাকে। পা'ন, একই সোণার না হইয়া, কম মূল্যের সোণার সহিত অন্য নিকৃষ্ট ধাতুর খাদের সংমিশ্রণে, তৈয়ার হইয়া থাকে। পরে রং করিবার সময় ঐ পানের রং গহনা যে সোণায় প্রস্তুত তদনুরূপ রং করিয়া খরিদদারগণকে বঞ্চিত করিয়া থাকে। ঐ অলঙ্কার গালাইলে কাজে কাজেই কম মূল্যের সোণা হইয়া যায়। অতঃপর পা'ন দিবার সময় সরু, বক্র-গ্রীব, লৌহের নলের মুখে ফুঁ দিয়া প্রদীপের যে শিখা অলঙ্কারের উপর পাতিত করা হয়, তাহাতেও ঐ স্থানের সোণা কিয়ৎপরিমাণে তরল হইয়া বাষ্পীয় আকার (Volatilisation) ধারণ করে। এই শেষোক্ত প্রকারে যে সোণা নষ্ট হয় তাহার পুনরুদ্ধারের কোনই উপায় নাই এবং তাহার পরিমাণ একশত ভরি স্বর্ণে ৭১৯ পাই।

(খ) খোদাই ও নক্সা করা।—এই বিষয়টী বুঝিবার জন্য বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। ইহা সহজেই বোধগম্য হয় যে, সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা নক্সা করিতে গেলে অনেক সোণা চূর্ণাকারে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া

পড়ে। এবং ফাইল দিয়া পালিস্ করিবার কালেও ঐ আকারে কতক সোণা নষ্ট হইয়া থাকে। এই প্রকারে নষ্ট সোণার অনেকাংশই পুনরুদ্ধৃত হইতে পারে ; যথাস্থানে তাহার বিষয় বর্ণিত হইবে।

(গ) রংফলান।—এই প্রক্রিয়াগুলি সাধন করিবার সময়ে অনেক পরিমাণ সোণা (যাহা স্বর্ণকারগণ নিজেরাও বুঝিতে পারে না) রাসায়নিক উপায়ে নষ্ট হইয়া থাকে।

রংফলান একটী মাত্র প্রক্রিয়া নহে। ইহা করিবার পূর্ব্বে তিনটী প্রক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে ; তন্মধ্যে প্রথম দুইটীর উদ্দেশ্য অলঙ্কারগুলিকে পরিষ্কার করা, তৃতীয়টীর উদ্দেশ্য পূর্ব্বোক্ত পা'নের সাদাটে রংকে আসল সোণার রংএ পরিণত করা।

(১) অলঙ্কার পরিষ্কার করণ।

খাটী সোণায় অলঙ্কার প্রস্তুত হইলে ভাল হয় না। কেন না খাটী সোণা অত্যন্ত নরম, সহজেই নোয়াইয়া যায়। সেজন্য তাহার উপর কাজ করা সহজ নহে। এজন্য প্রয়োজনানুযায়ী কিঞ্চিৎ পরিমাণে তামা, সোণার সহিত খাদ মিশান থাকে। সোণা ও তামা গলিয়া একটি মিশ্র ধাতু (alloy) প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই মিশ্রাবস্থা একটু বুঝান আবশ্যক। কেহ যেন মনে না করেন যে, এই তামা ও সোণা মিশিয়া একটি রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ (chemical compound) সৃষ্ট হয়। তামা ও সোণা মিশিয়া যখন মিশ্র পদার্থ (mixture or alloy) প্রস্তুত হয়, তখন সোণার অণুগুলির পাশাপাশি তামার অণুগুলি সন্নিবেশিত থাকে বুঝিতে হইবে।

এইরূপ সোণা দিয়া যখন অলঙ্কার প্রস্তুত হয় তখন অগ্ন্যুত্তাপে তামার অণুগুলি বায়ুস্থ অম্লজানের (oxygen) সহিত মিলিত হইয়া একটি কাল রঙ্গের যৌগিক পদার্থ (copper-oxide) প্রস্তুত হইয়া অলঙ্কারের উপরিভাগে ঈষৎ কাল রং করিয়া তুলে। যদি তামার পরিমাণ অল্প থাকে, তবে, সোণার রং ঐ কাল রং ছাপাইয়া উঠে, এজন্য তত কাল বোধ হয় না। কিন্তু হাতুড়ী দিয়া একটু পিটিলেই ঐ কাল অণুগুলি উপরিভাগে বেশী পরিমাণে আসিয়া পড়ে এজন্য সমস্ত অলঙ্কারখানি কাল দেখায়। স্বর্ণকারগণকে এই কালো হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে যে, লোহার হাতুড়ীর রং লাগিয়াছে। এই সঙ্গে জানিয়া রাখা উচিত যে, সোণাকে যতই উত্তাপ দেওয়া যাউক না কেন, তাহা তরল হইয়া বাষ্পীয় আকার ধারণ করিবে তথাপি অম্লজানের

সহিত রাসায়নিক উপায়ে মিশ্রিত হইবেনা। কেবল উত্তাপ সেজন্য যথেষ্ট নহে, অন্য সামগ্রী আবশ্যক। যথা স্থানে এই বিষয়টীর আলোচনা করিব!

এখন অলঙ্কার পরিষ্কার করণ প্রক্রিয়ার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, যাহাতে অলঙ্কারের উপরিভাগ হইতে উপরোক্ত কাল রংয়ের তামার অংশ দূরীভূত হইতে পারে।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে, স্বর্ণকারেরা অতি সহজেই অলঙ্কারের কাল রং পরিবর্ত্তিত করিয়া সোণার রং প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা অলঙ্কার গুলিকে অগ্নির উত্তাপে রাখিয়া, কয়লা দ্বারা ঢাকা দিয়া, জোরে বাতাস দিতে থাকে; কিছুকাল পরে, উপরিস্থিত কয়লার উপর জল প্রক্ষেপ দ্বারা অগ্নির তাপ মৃদু করিয়া যখন অলঙ্কার বাহিরে আনে, তখন সোণার রং কাঁচা হলুদের ন্যায় সুন্দর দেখায়। স্বর্ণকারগণকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলিতে পারে না। আমরা উহার কারণ নিম্নে বর্ণনা করিব। অলঙ্কার গুলি যখন অগ্নির অভ্যন্তরে রাখিয়া কয়লা চাপা দিয়া বাতাস করা হয়, তখন কয়লা আপন প্রকৃতিগত ক্ষমতায় কাল রংএর তামা হইতে অম্লজানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া নিজে তাহার সহিত রাসায়নিক সংযোগে আবদ্ধ হয়। এরূপ অবস্থায় জল প্রক্ষেপ দ্বারা শীতল করিয়া অলঙ্কারটীকে বাহিরে আনিলে তদুপরিস্থিত তামা আর অম্লজানের সহিত মিলিয়া কালো হইতে না পারায়, অলঙ্কারের রং খাটী সোণার ন্যায় উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ দেখায়।

এই অবস্থায় অলঙ্কারের রং অধিকদিন স্থায়ী হয় না। কেননা, অলঙ্কারের উপরিস্থিত তামার অণুগুলি আস্তে আস্তে আবার কাল হইয়া আসে। কাজেই অলঙ্কার গুলি উপরোক্ত উপায়ে অতি সহজে পরিষ্কৃত হইলেও, উহা অলঙ্কার গুলিকে স্থায়ীভাবে পরিষ্কার করিবার প্রকৃষ্ট উপায় নহে। অলঙ্কারের উপরিভাগ হইতে তামার অণুগুলি রাসায়নিক উপায়ে দূরীভূত করাই পরিষ্কার করণ প্রক্রিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে।

• প্রথমতঃ—কাঠকয়লার অগ্নিতে অলঙ্কার গুলিকে উত্তপ্ত করিয়া, তেল, কয়লা ও অন্যান্য ময়লা বিদূরিত করতঃ একটী মাটীর পাত্রে কাঁচা তেঁতুল সিদ্ধ করিয়া তাহার ঘন আঠার ন্যায় পদার্থের মধ্যে অলঙ্কার গুলিকে ডুবাইয়া খোলায় (গহনাদিতে তাপ দেওয়ার জন্য স্বর্ণকারের কারখানায় যে কয়লার

চুল্লী থাকে তাহাকে খোলা কহে) চড়াইয়া দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ তাপ দেওয়ার পর খোলা হইতে নামাইয়া পরিষ্কার জলে অলঙ্কার-গুলিকে ধৌত করা হয়। তেঁতুলের গাদে যথেষ্ট পরিমাণে টার্টারিক য়্যাসিড (Tartaric Acid) ও অন্যান্য য়্যাসিড থাকা হেতু গহনার উপরিস্থিত কালো তামার অণুগুলি গলিয়া বিদূরিত হয়। উপরিভাগে কাজেই কেবল স্বর্ণঅণুগুলি গলিয়া যায়। এজন্য গহনা গুলিতে সোণার রং ফলিত হয় ও পরিষ্কার দেখায়।

দ্বিতীয়তঃ—অলঙ্কারের পরিমাণ অনুসারে কিছু সাধারণ লবণ ও কিছু ফটকিরি একত্র চূর্ণ করিয়া জলসংযোগে ঘন কাদার ন্যায় করিয়া গহনা গুলিতে মাখিয়া আগুনের উপর ধরা হয়। পরে শুকাইয়া গেলে গহনা গুলি পূর্ব্বের ন্যায় ধৌত করা হয়; তাহাতে গহনার রং আরও একটু উজ্জ্বল ও পরিষ্কৃত বলিয়া বোধ হয়। প্রথম বারে যে সকল কৃষ্ণ বর্ণ তাম্রাণু বিদূরিত হয় নাই, শেষোক্ত প্রকারে তৎসমুদায় দূরীভূত হওয়ায় স্বর্ণের রং অধিকতর ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হয়।

শ্রীঃ—

নীহারবালা।

(মৃত্যু—১৩১৪ সাল, ১১ই মঙ্গলবার, কৃষ্ণ ৭মী, রাত্রি ৩—৪০ মিনিট)

যেথা' হ'তে যত জীব আসে এ ধরায় ;
লীলা সাঙ্গ হ'লে, পুনঃ, যেথা' চলি' যায় ;
সেই পুণ্য পুরে প্রাণ-পুতলী 'নীহার,'
গিয়াছে মোদের অগ্রে—আঁধারি' সংসার।
ক্ষণ অদর্শনে যা'র হ'তাম অজ্ঞান ;
সে বিনা সংসার হেরি শ্মশান-সমান।
পুণ্যবতী পুণ্য-বলে গেছে পুণ্য লোকে ;
দহি'ছে অনলে অঙ্গ,—প্রাণ-বালা শোকে।
দাও শান্তি, শান্তিদাতা! 'নীহারবালায়',
দাও শান্তি, কণ্ঠাগত প্রাণ বাপ মায়।
ভুলোনা মোদের, বালা!—মরণের পরে
জুড়া'ব হৃদয়-জ্বালা, তোরে হৃদে ধরে।
হ'বে তিন প্রাণ এক ;—মিলিবে 'নীহার'।
নিখিল যন্ত্রণা হ'তে পাইব নিস্তার॥

'নীহারবালার' হতভাগ্য পিতামাতা।

সমালোচনা।

নববোধন।—শ্রীযুত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত। ইহাঁর অধিক পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। ইনি বঙ্গসাহিত্য সংসারে একজন সুলেখক ও "স্বদেশী" নামক মাসিক পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক। পরন্তু ইহাও তাঁহার গুণের বিশিষ্ট পরিচায়ক নহে। স্বর্গীয় বঙ্কিমবাবু যে ভাষা লিখিয়া চিরযশস্বী হইয়া গিয়াছেন, যে অলঙ্কার ও সুললিত শব্দবিন্যাসে তিনি সাহিত্য-সেবীদিগের নিকট চির আদরণীয় ও পূজনীয় হইয়া গিয়াছেন, পূজ্যপাদ নারায়ণ বাবুর লেখনীনিঃসৃত রচনাবলি তদপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। আলোচ্যমান গ্রন্থখানি পাঠ করিতে বসিলে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না, পরন্তু গ্রন্থনায়ক রূপনাথের ও তদীয় উপযুক্ত ভার্য্যা কমলার অদ্ভুত বীরত্ব, স্বদেশ ও স্বধর্ম্ম সংরক্ষণার্থ আত্মত্যাগ, তাঁহার শিষ্য শঙ্করের ঔদার্য্য, গুরুভক্তি, স্বদেশভক্তি, প্রভৃতি পাঠ করিতে করিতে হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় উত্তেজনা ও আনন্দের উৎস উথলিয়া উঠে। লেখক বলিয়াছেন যে 'বর্ণনীয় কালে উচ্চ নীচ সকল শ্রেণীর মধ্যেই লাঠী খেলা একটা সাধারণ ক্রীড়ার মধ্যে পরিগণিত ছিল। প্রায় সকলেই তাহাতে অল্প বিস্তর শিক্ষিত হইত। * * সেই অসভ্য যুগে লাঠীর সাহায্যেই যে বাঙ্গালী আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষণ করিয়াছিল ইহা নিশ্চয়।' এবিষয়ে আমাদেরও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় আজ এই বিংশ শতাব্দীর অভ্যুদয়ে বঙ্গীয় যুবকবৃন্দ, ক্ষণিক বিলাস ও বিভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া, সুখসিন্ধুর খরস্রোতে গা ভাসাইয়া সেই সকল শিক্ষায় বঞ্চিৎ। আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, সমাজ রক্ষা ও স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য আজ অপরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। হায়! সেই আর্য্যকালের, সুবর্ণ প্রথা আজ অতীতের অন্ধ তামসগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। হায়! বাঙ্গালীর বাহু কি তবে এতই দুর্ব্বল? না!! আমরাও গ্রন্থকারের সঙ্গে বলি না, 'বাঙ্গালীর বাহু দুর্ব্বল নহে, বাঙ্গালীর হৃদয় দুর্ব্বল, বাঙ্গালী শক্তি-হীন নহে, বাঙ্গালী সাহসহীন, বাঙ্গালী ক্ষমতাশূন্য নহে, বাঙ্গালী একতাশূন্য।' অনুশীলন অভাবে বাঙ্গালী হীনবীর্য্য। তবে সম্প্রতি স্রোত যেভাবে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে আশা করা যায় যে কালে বাঙ্গালী আপনা-দিগের লুপ্তরত্ন উদ্ধারে সফলকাম হইবে—বাঙ্গালী আবার জননীর মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইবে।

পুস্তকের অপরাপর লোকচরিত্র বর্ণনা ও সেই সকলের সামঞ্জস্য যথাযথ ভাবে সংরক্ষিত হওয়ায় পুস্তকখানি বড়ই উৎকৃষ্ট ও মনোজ্ঞ হইয়াছে। ইহা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই সুখপাঠ্য। ব্যক্তি মাত্রেরই এইরূপ উপাদেয় পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য। মূল্য এক টাকা।

কথাকুঞ্জ।—উক্ত লেখক কৃত কতকগুলি গল্পসংগ্রহ। ইহার গল্পগুলি বড়ই মধুর ও চিত্তরঞ্জক। গল্পগুলি পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশিত ও তৎসমুদায়ের খ্যাতিপূর্ণ সমালোচনা বিভিন্ন সাময়িক পত্রে বাহির হইয়াছিল, সুতরাং ঐ সকলের পুনঃ সমালোচন নিষ্প্রয়োজন। মূল্য ॥০ আনা।

ভূতের খেলা।—শ্রীযুত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত এবং শ্রীযুত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য চারি আনা। একখানি ক্ষুদ্র নাটক। পুস্তকখানি নিতান্ত মন্দ নহে; ইহাতে অঙ্কিত চরিত্র কয়েকটী সুস্পষ্টই হইয়াছে; তবে মধ্যে মধ্যে ভূতের উপদ্রব ও পাগলের পাগ্‌লামীর মাত্রাধিক্য হওয়ায় কিঞ্চিৎ বিসাদৃশ্য ঘটিয়াছে। তাহা হইলেও, গ্রন্থকার ইহাতে নিজের যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। এতদ্দ্বারা গ্রন্থকারের আয়াস সার্থক হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠযোগ্য।

বিবিধ।

প্রাপ্তি স্বীকার।—আমরা ১৩১৫ সালের একখানি "গুপ্তপ্রেশ" পঞ্জিকা উপহার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। এ পঞ্জিকা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করা বাহুল্য মাত্র। তবে দিন পঞ্জিকা ব্যতীত ইহাতে যে সকল অত্যাবশ্যক জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে তদ্দ্বারা যে সাধারণের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আজ কাল এরূপ বিশুদ্ধ ও প্রামাণিক পঞ্জিকা অতি বিরল।
